তাফসীরে তাবারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ
ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী শরীফ

পঞ্চম খন্ড

আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ
ইব্‌ন জারীর তাবারী (রহ.)

তাফসীরে তাবারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর তাবারী
রহমাতুল্লাহি আলায়হি

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে তাবারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

তাফসীরে তাবারী শরীফ প্রকল্প

প্রকাশকাল ঃ
বৈশাখঃ ১৪০১
যিলকাদ ঃ ১৪১৪
মে ঃ ১৯৯৪

ইফাবা. অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১২২
ইফাবা. প্রকাশনা ঃ ১৭৫৭
ইফাবা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৭
ISBN ঃ 984-06-0143-1.

প্রকাশক ঃ
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা – ১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
তাওয়াক্কাল প্রেস
৯/১০, নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা –১১০০

বাঁধাইকার ঃ
আল–আমীন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা–১১০০

প্রচ্ছদ অংকনে ঃ রফিকুলইসলাম

মূল্য ঃ ১৬০·০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র।

TAFSIR-E TABARI SHARIF (5th Volume) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Allama Abu Jafar Muhammad Ibn Jarir Tabari (Rh) in Arabic, translated into Bengali under the Supervision of the Editorial Board of Tabari Sharif and published by Director, Translation and Compilation Section, Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarram, Dhaka-1000. May – 1994

Price : Tk. 160.00 U. S. Dollar : 8.00

আমাদের কথা

কুরআনুল করীম আল্লাহ্ তা'আলার কালাম। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এর তাফসীর রচনার ইতিহাস সূচীত হয়। প্রাচীন তাফসীরগুলোর মধ্যে 'আল-জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন' কিতাবখানি তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে মশহুর। ইহা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.)-এর এক বিশেষ অবদান। কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জানা এবং উপলব্ধি করার জন্য এই কিতাবখানি অন্যতম প্রধান মৌলিক সূত্ররূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। মূল কিতাবখানি ত্রিশ খন্ডে সমাপ্ত।

আরবী ভাষায় রচিত এই পবিত্র গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। দেশের কয়েকজন প্রখ্যাত আলিম ও মুফাস্সির নিয়ে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। এ পরিষদের তত্ত্বাবধানে বিশিষ্ট আলিমদের দ্বারা গ্রন্থখানি তরজমা করানো হচ্ছে এবং পরিষদ তা সম্পাদনা করে যাচ্ছেন। আমরা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কিতাবখানির বাংলা তরজমার পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করতে পারায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করি, একে একে সকল খন্ডের বাংলা তরজমা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারবো, ইনশাআল্লাহ্। আমরা আরো আশা করি, বাংলাভাষায় কুরআন মজীদ চর্চা ও ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা কর্মে এই তাফসীরখানি মূল্যবান অবদান রাখবে।

আমি এর অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ এর প্রকাশনায় সামান্যতম অবদানও যাঁদের আছে, তাঁদের সকলকে মুবারকবাদ জানাই।

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে কুরআনী যিন্দেগী নির্বাহের তাওফীক দিন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

দাউদ-উজ্ জামান চৌধুরী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অশেষ রহমতে তাফসীরে তাবারী শরীফের বাংলা তরজমার পঞ্চম খন্ড প্রকাশিত হল।

কুরআন মজীদের ভাষা আরবী। তাই এর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা জানার জন্য যুগে যুগে নানা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ ও ভাষ্য রচিত হয়েছে। ভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তাফসীর গ্রন্থকে মৌলিক, প্রামাণ্য ও প্রাচীন হিসাবে গণ্য করা হয় তাফসীরে তাবারী শরীফ তার মধ্যে অন্যতম। এ তাফসীরের রচয়িতা আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি (জন্ম ঃ ৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ–২২৫ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৯২৩ খ্রীস্টাব্দ– ৩১০ হিজরী)। কুরআন মজীদের ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় যত তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া গিয়েছে তা তিনি এতে সন্নিবেশিত করেছেন। ফলে এই তাফসীরখানা হয়ে উঠেছে একটি প্রামাণ্য মৌলিক তাফসীর, যা পরবর্তী মুফাস্‌সিরগণের নিকট তাফসীর প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই তাফসীরখানা তাফসীরে তাবারী শরীফ নামে সমধিক পরিচিত হলেও এর আসল নাম ঃ "আল–জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন।"

পাশ্চাত্য দুনিয়ার পন্ডিত মহলে ঐতিহাসিক এবং সমালোচনামূলক গবেষণার জন্য এই তাফসীরখানা বিশেষভাবে সমাদৃত। আমরা প্রায় সাড়ে এগারো শ' বছরের প্রাচীন এই জগৎ বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থখানির বাংলা তরজমা প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ইনশাআল্লাহ্ আমরা ক্রমান্বয়ে তাফসীরে তাবারী শরীফের প্রত্যেকটি খণ্ডের তরজমা প্রকাশ করব।

তাফসীরে তাবারীর শ্রদ্ধেয় অনুবাদক ও সম্পাদকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। সেই সংগে এই খণ্ডখানি প্রকাশে যারা আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি নির্ভুলভাবে এই পবিত্র গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে। তবুও এতে যদি কোনরূপ ভুলভ্রান্তি কোন পাঠকের নজরে পড়ে, মেহেরবানী করে তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মদ লুতফুল হক
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	সভাপতি
২.	ডঃ এ, বি, এম, হাবীবুর রহমান চৌধুরী	সদস্য
৩.	মাওলানা মুহাম্মদ ফরীদুদ্দীন আত্তার	”
৪.	মাওলানা মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন	”
৫.	মাওলানা মোহাম্মদ শামসুল হক	”
৬.	জনাব মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য–সচিব

অনুবাদক মন্ডলী

১. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
২. মাওলানা আবূ তাহের
৩. মাওলানা আ, ন, ম, রূহুল আমীন চৌধুরী
৪. মাওলানা ইসহাক ফরিদী

সূচীপত্র

আয়াত	২. সূরা বাকারা	পৃষ্ঠা

তাবারী শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

সূরা বাকারা

(অবশিষ্ট অংশ)

হযরত দাউদ (আ.) জালূত বাহিনীকে পরাজিত করেন।

(২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৫১. তারপর তারা আল্লাহ্‌র হুকুমে তাদেরকে (জালূত বাহিনীকে) পরাজিত করল এবং দাউদ হত্যা করল জালূতকে। আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব এবং হিকমত দান করলেন; এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।

আল্লাহ্ পাকের বাণী— فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ —এর ব্যখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন— فَهَزَمُوْهُمْ এর অর্থ হল, তালূত ও তাঁর সৈন্যরা জালূতের বাহিনীকে পর্যুদস্ত ও পরাজিত করেছে এবং দাউদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন।

এ আয়াতের কিছু অংশ উহ্য আছে। প্রকাশ্য অংশ দ্বারা উহ্য অংশের মর্ম বুঝা যায়, তাই তা উহ্য রাখা হয়েছে।

আয়াতাংশের মর্ম হলো, তারা যখন জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হলো তখন বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য নাযিল করুন, আমাদেরকে অবিচল রাখুন এবং আমাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রার্থনা কবুল

করলেন, তাদেরকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক দান করলেন, তাদেরকে অবিচল রাখলেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদেরকে সাহায্য করলেন। ফলে, আল্লাহ্র হুকুমে তালূত বাহিনী তাদেরকে (জালূত বাহিনীকে) পরাজিত করল। فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ (আল্লাহ্র হুকুমে মু'মিনগণ তাদেরকে পরাজিত করল) এ বাণী দ্বারা ইঙ্গিত মিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করেছেন, তাই উপরোক্ত বাক্যগুলো উল্লেখ করেননি, বরং উহ্য রেখেছেন। فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللهِ অর্থ, আল্লাহ্র ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের বদৌলতে তাদেরকে হত্যা করেছে। বলা হয় هَزَمَ الْقَوْمُ الْجَيْشَ هَزِيْمَةً وَهَزِيْمَى (সম্প্রদায়টি সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছে)।

قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ (দাউদ হত্যা করেছে জালূতকে) এ দাউদ হলেন দাউদ ইব্ন আইশা, মহান আল্লাহ্র প্রিয় নবী (আ.)। দাউদ (আ.) কর্তৃক জালূত হত্যার ঘটনা নিম্নরূপঃ

৫৭৪০. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তালূত যখন জালূতের বিরুদ্ধে বের হলেন, তখন জালূত বলেছিল, "তোমাদের সেই যোদ্ধাকে আমার সামনে নিয়ে এস, যে আমার সাথে লড়বে, সে আমাকে হত্যা করলে তোমরা আমার রাজ্যের মালিক হবে, আর আমি যদি তাকে হত্যা করি, তাহলে তোমাদের রাজ্যের মালিক হব আমি। এরপর দাউদ (আ.)-কে নিয়ে আসা হলো তালূতের নিকট। তালূত ও দাউদ (আ.) চুক্তিবদ্ধ হলেন, যদি তিনি (দাউদ) তাকে (জালূতকে) হত্যা করতে পারেন, তবে তাঁর নিকট নিজ কন্যা বিয়ে দিবেন এবং তাঁর সম্পদে তাঁকে নির্বাহী বানাবেন। তালূত ও দাউদ (আ.) চুক্তিবদ্ধ হলেন। তালূত হযরত দাউদ (আ.)–কে অস্ত্র পরিয়ে দিলেন। কিন্তু দাউদ (আ.) তা পরিধান করে যুদ্ধ করা পসন্দ করলেন না, বরং বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে সাহায্য না করেন, তাহলে এ অস্ত্রগুলো আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তিনি একটি কুঠার এবং থলিতে কিছু পাথর নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং জালূতের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জালূত তাঁকে দেখে বলল, আরে! তুমি কি আমার সাথে লড়বে! দাউদ (আ.) বললেন, অবশ্যই। সে বললঃ তুমি যে কুঠার আর পাথর নিয়ে এসেছ। মানুষ তো কুকুর মারতে গেলে এগুলো নিয়ে যায়। আমি তোমার শরীরের গোশ্ত টুকরো টুকরো করে পশু–পাখীকে খাওয়াব। দাউদ (আ.) বললেন, বরং তুমি আল্লাহ্র দুশমন, তুমি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। এ কথা বলেই তিনি একটি পাথর বের করলেন এবং ফিঙ্গাতে লাগিয়ে জালূতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। পাথরটি তার দু'চোখের মাঝ বরাবর লেগে মস্তিষ্কে ঢুকে গেল। পরিণামে সে আছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার সাথীরা পলায়ন করল। তার মাথা কেটে ঝুলিতে নিলেন হযরত দাউদ (আ.)। এ দিকে সেনাবাহিনী তালূতের নিকট গিয়ে অনেকেই নিজেকে জালূতের হত্যাকারী বলে দাবী করল। প্রমাণস্বরূপ কেউ দেখাল জালূতের তরবারি, কেউ তার অস্ত্র এবং কেউ তার মৃতদেহের কোন একটা অংশ দেখাতে লাগল। দাউদ (আ.) কিন্তু জালূতের মস্তকটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। তালূত বললেন, যে ব্যক্তি জালূতের মাথা নিয়ে আসবে সে–ই প্রকৃত হত্যাকারী প্রমাণিত হবে। দাউদ (আ.) মাথা নিয়ে আসলেন। তিনি তালূতের নিকট প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবী জানালেন। এক্ষণে তো তার সাথে তালূতের মেয়ে বিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অপমানবোধ তাঁকে পেয়ে বসে এবং তিনি দাউদ (আ.)–কে হত্যার সংকল্প করেন। দাউদ (আ.) পালিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যান। সেখানে তথায় পৌঁছে তালূত তাঁকে অবরোধ করেন। এক রাতে তালূত ও তাঁর সঙ্গীরা ঘুমে আচ্ছন্ন হলে পর দাউদ (আ.) তাঁর নিকট এলেন। তালূতের

উযূ ও পানপাত্র হস্তগত করলেন। তাঁর কয়েক গাছি দাড়ি কেটে নিলেন এবং পোশাকের আঁচল কেটে আপন স্থানে ফিরে আসলেন। তারপর তালূতকে ডেকে বললেন, আপনার প্রহরীরা কেমন যেন? আমি তো ইচ্ছা করলে গত রাতে আপনাকে খুন করতে পারতাম। এই দেখুন না আপনার লোটা, এই দাড়ি ও কাপড়ের আঁচল। এগুলো তিনি তালূতের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তালূত অনুধাবন করলেন যে, দাঊদ (আ.) ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করতে পারতেন। অবশেষে তিনি দাঊদ (আ.)-এর প্রতি দয়াবান হলেন এবং তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁর পক্ষ থেকে কোন আক্রমণ আসবে না। তারপর তিনি চলে গেলেন। পরে আবার তালূত দাঊদ (আ.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। তালূত যার সাথেই লড়তেন পরাজিত হতেন। অবশেষে তিনি মারা গেলেন।

বর্ণনাকারী বিকার (র.) বলেন, ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আর আমি শুনছিলাম যে, তালূত নবী ছিল কি না? তাঁর প্রতি কি ওহী আসত? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'না, তাঁর নিকট ওহী আসত না, তবে তাঁর সাথে একজন নবী থাকতেন। নবীর নাম ছিল শামুঈল (আ.)। নবীর প্রতি ওহী আসত। ইনিই তালূতকে রাজা বানিয়েছিলেন।

৫৭৪১. ইব্‌ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাঊদ (আ.) নবী ছিলেন। তাঁর আরও চার ভাই ছিল। তাঁর বৃদ্ধ পিতাও তাঁদের সাথে থাকতেন। তারপর পিতা আলাদা হয়ে গেলেন তাদের থেকে। দাউদ (আ.)– ও ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন পিতার ছাগল চরানোর জন্যে। তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার ছোট। অপর চার ভাই তালূতের সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল। পিতা দাউদ (আ.)-কে ডাকলেন। উভয় সেনাদল পরস্পর কাছাকাছি ও মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে।

ইব্‌ন ইসহাক (র.) বলেন, ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (র.) এর সূত্রে কেউ কেউ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, দাঊদ (আ.) ছিলেন আকারে খাটো, বর্ণ ছিল নীল, মাথার চুল স্বল্প, পবিত্র ও নির্মল অন্তর। তাঁর পিতা বললেন, বেটা! তোমার ভাইদের জন্য আমরা কিছু সাজসরঞ্জাম তৈরি করেছি, এগুলো দিয়ে ওরা শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি পাবে, তুমি তা নিয়ে ওদেরকে দিয়ে আস, তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। তিনি বললেন, ঠিক আছে তা–ই করব। তিনি বের হলেন, সাথে নিলেন সাজসরঞ্জাম। আর নিলেন তাঁর ~~থলে~~ থলেতে তিনি পাথর টুকরো রাখতেন। সাথে ফিঙ্গাটিও নিলেন। ফিঙ্গার সাহায্যে তিনি ছাগল পালকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতেন। পিতা থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যাত্রা করলেন। এক পাথরের পাশ দিয়ে যাবার সময় পাথর বলে উঠল, 'দাউদ' (আ.)! আমাকে তুলে আপনার থলেতে রাখুন, আমাকে দিয়ে আপনি জালূতকে হত্যা করতে পারবেন, আমি হযরত ইয়াকূব (আ.)–এর পাথর। তিনি পাথরটি তুলে থলেতে ভরে যাত্রা করলেন। তিনি চলছেন। অপর একটি পাথর ডেকে উঠল, হে দাউদ (আ.)! আমাকে আপনার থলেতে তুলে নিন, আমাকে দিয়ে আপনি জালূতকে হত্যা করতে পারবেন। আমি ইসহাক (আ.)–এর পাথর। তিনি তা–ও উঠিয়ে থলেতে ভরলেন। তিনি আবার রওয়ানা করলেন। পথের ধারে একটি পাথর বলে উঠল, "দাউদ (আ.)! আমাকে থলেতে ভরে নিন, আমাকে দিয়ে আপনি জালূতকে হত্যা করতে পারবেন। আমি ইবরাহীম (আ.)–এর পাথর।" তিনি সেটিও তুলে নিলেন। তিনি অবশেষে সেনাদলের নিকট পৌঁছে ভাইদের সরঞ্জামাদি তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি সৈন্যদের মুখে জালূতের কথা, তার বীরত্ব ও গাম্ভীর্য, লোকের মনে তার ব্যাপারে ত্রাস এবং তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা পোষণের

কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা কি এ লোকটিকে এতই গুরুত্ব দাও? 'সে একটা কিছু' আমি তো তা মনে করি না। আল্লাহ্‌র কসম, আমি যদি তার দেখা পেতাম তো তাকে খুন করে ছাড়তাম। তোমরা আমাকে রাজার নিকট নিয়ে যাও তো! তাঁকে রাজা তালূতের দরবারে নেয়া হলো। তিনি বললেন, 'জনাব! আমরা দেখছি যে, আপনারা আল্লাহ্‌র এ দুশমনটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি তাকে পেতাম তো খুন করে ছাড়তাম। তালূত বললেনঃ তোমার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শক্তির বর্ণনা দাও তো, শুনি। দাঊদ (আ.) বললেন, একবার নেকড়ে এসে আমার বকরী পালে আক্রমণ করে। আমি তাকে কাবু করে ফেলি, তার মাথা ঝাপটে ধরে চোয়াল দুটো ছিঁড়ে ফেলি। তারপর সেটির মুখ চেপে ধরি। আমাকে একটি বর্ম দিন আমি তা পরিধান করে দেখি। একটি বর্ম হাযির করা হলো। তিনি তা পরলেন। এটি তাঁর দেহে যথাযথভাবে লেগে গেল, হলো মানানসই। এতে তালূতসহ উপস্থিত ইসরাঈলীয়গণ পরম আনন্দিত হলো। তালূত বললেন, সম্ভবত এর হাতেই আল্লাহ্ তা'আলা জালূতকে ধ্বংস করবেন। রাত্রি অবসানে সবাই জালূতের দিকে রওয়ানা করলেন। উভয় পক্ষ মুখোমুখি। দাঊদ (আ.) বললেন, 'জালূত কই', ওকে আমাকে চিনিয়ে দাও। ওরা জালূতের দিকে ইঙ্গিত করল। জালূত ছিল বর্ম পরিহিত তার অশ্বে উপবিষ্ট। তাকে দেখামাত্রই থলের ভেতরে পাথরগুলো লাফালাফি, দাপাদাপি আরম্ভ করে দিল। এটি বলে আমাকে নিন, ওটি বলে আমাকে। তিনি একটি পাথর নিয়ে ফিঙ্গাতে সেট করলেন। তারপর তা পাকিয়ে জালূতের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। পাথর গিয়ে লাগল জালূতের দু'চোখের মাঝ বরাবর এবং মস্তিষ্কে ঢুকে গেল। জালূত ঘোড়া হতে পড়ে মারা গেল। দাঊদ (আ.) হত্যা করলেন জালূতকে। অবশেষে তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করলে জনতার মুখে একটাই বুলি, দাঊদ (আ.) জালূতকে হত্যা করেছেন। তালূত জনতা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। জনসাধারণ তালূতের স্থলে দাঊদ (আ.)-এর প্রতিই আকৃষ্ট হলো। এমনকি তালূতের নাম শোনাই গেল না। ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ধারণা, তালূত যখন দেখলেন ইসরাঈলীয়রা তাঁকে ছেড়ে দাঊদ (আ.)-এর প্রতি ঝুঁকছে, তখন তিনি দাঊদ (আ.)-কে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ অপকর্ম হতে তাঁকে বিরত রাখলেন এবং হযরত দাঊদ (আ.)-কে বাঁচালেন। অবশেষে আপন অপরাধ মেনে নিয়ে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে তাওবা করলেন।

এক্ষণে আমরা দাঊদ (আ.) ও তালূত সম্পর্কে যে দুটো ভাষ্য পেশ করলাম ওয়াহ্‌ব-ইব্‌ন মুনাব্বিহ্- হতে এর বিপরীত একটি বর্ণনা রয়েছে। তা হলো ঃ

৫৭৪২. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন তালূতের রাজত্ব মেনে নিল, তখন তাদের একজন নবীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করলেনঃ "তালূতকে বল, মাদইয়ানবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, ওদের কাউকেই সে যেন জীবিত না রাখে, অতিসত্বর তাকে আমি ওদের ওপর বিজয় দান করব। তালূত লোকজন নিয়ে মাদইয়ান আসলেন এবং সেখানকার রাজা ব্যতীত সবাইকে হত্যা করলেন। রাজাকে বন্দী করে নিয়ে আসলেন। সাথে সাথে ওদের যত পশু–পাখী, জীব–জন্তু সব নিয়ে এলেন। নবী শামুঈল (আ.)–এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করলেন, বললেনঃ তুমি কি তালূতের কান্ড দেখে বিস্মিত হও না? আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি সে তা অমান্য করেছে, ওদের রাজাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে এবং পশু–পাখীগুলোকেও। তুমি তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে বল, আমি তার বংশধর থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেব, কিয়ামত পর্যন্ত তার ঘরে রাজত্ব

আর যাবে না। আমি মর্যাদাবান করি তাকে, যে আমার আনুগত্য করে। যার নিকট আমার নির্দেশ গুরুত্বহীন মনে হয়, তাকে আমি অপমান করি। নবী (আ.) তালূতের সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনি করলেন কি? ওদের রাজাকে বন্দী করলেন কেন? কেনইবা পশু সম্পদ নিয়ে এসেছেন? উত্তরে তালূত বললেন, মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করার জন্যে পশুগুলো এনেছি। শামুঈল (আ.) জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর বংশ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা রাজত্ব ছিনিয়ে নিবেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর বংশে আর রাজত্ব আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা শামুঈল (আ.)–এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, "তুমি আইশা নিকট যাও, সে তার সন্তানগুলো তোমার সামনে নিয়ে আসবে, তারপর আমি যার সম্পর্কে নির্দেশ দেই, তাকে তুমি পবিত্র তৈল লাগিয়ে দেবে, ফলে সে ইসরাঈলীয়দের রাজা হবে। নবী শামুঈল (আ.) আইশার নিকট গেলেন। তারপর বললেন, আপনার ছেলেগুলো আমার সামনে নিয়ে আসুন। আইশা তাঁর বড় ছেলেকে ডাকলেন, স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ছেলেটি উপস্থিত হলে শামুঈল (আ.) তার প্রতি তাকালেন এবং খুশী হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সর্বদ্রষ্টা। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করলেন, 'তোমার চক্ষুদ্বয় তো বাহ্যিক অবস্থা দেখে। আর আমি দেখি অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত। কাংক্ষিত ছেলে এটি নয়। অন্য একজন ডাক। অপরজন এলো। আল্লাহ্ বললেন, "এ কাংক্ষিত ব্যক্তি নয়। একে একে ছয় পুত্র আনা হলো, সবার ব্যাপারে একই উত্তর। কাংক্ষিত ও উদ্দিষ্ট ছেলে এটি নয়। শামুঈল (আ.) বললেন, আপনার অন্য কোন ছেলে আছে কি? আইশা বলল, আমার অপর একটি শিশু সন্তান আছে বইকি। সে তো বকরী চরায়। শামুঈল (আ.) বললেন, লোক পাঠিয়ে ওকে নিয়ে আসুন। তারপর সাদা বর্ণের কম চুলবিশিষ্ট দাউদ (আ.) উপস্থিত হলেন। শামুঈল নবী (আ.) তাঁকে তৈল লাগিয়ে দিলেন এবং পিতা আইশাকে বললেন, ঘটনাটি গোপন রাখুন। কারণ, তালূত যদি জানতে পারে, তবে একে হত্যা করবে। আপন লোকজনসহ জালূত যাত্রা করল ইসরাঈলীয়দের দিকে। সে সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়ে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। অপরদিকে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তালূত যুদ্ধে বের হলেন এবং সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন। জালূত সংবাদ প্রেরণ করল তালূতের নিকট, আপনি আমার সম্প্রদায়কে হত্যা করতে পারবেন না, বরং আমি আপনার লোকজনকে হত্যা করব। আপনি আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত হন কিংবা অপর কাউকে পাঠিয়ে দিন। তবে কথা এই, যদি আপনাকে আমি হত্যা করতে পারি, তাহলে পুরো রাজত্ব আমারই হবে। অন্যথায় পুরো রাজত্ব আপনার -ই হবে। "জালূতের বিরুদ্ধে লড়বার কে আছে, জালূতকে যে হত্যা করতে পারবে রাজা তার নিকট আপন কন্যা বিয়ে দিবেন এবং রাজত্বে অংশীদার করবেন।" এ ঘোষণা সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে দিলেন। নবী শামুঈল (আ.) দাউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছিলেন অন্যান্য ভাইদের নিকট, তারা তখন সৈন্যদলের মধ্যে ছিল। শামুঈল (আ.) বললেন, তুমি ওদের নিকট যাও, এ জিনিসপত্রগুলো দিয়ে আসো এবং ব্যাপার কি তা আমাকে জানাও। দাউদ (আ.) ভাইদের নিকট এসে একটি ঘোষণাটি শুনলেন। ঘোষক বলছিল "জালূতের বিরুদ্ধে লড়াই করার কে আছে, জালূতকে যে হত্যা করতে পারবে রাজা তার কন্যা বিয়ে দেবেন সে ব্যক্তির নিকট। দাউদ (আ.) আপন ভাইদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যে জালূতের বিরুদ্ধে লড়তে পারে? জালূতকে হত্যা করে রাজকন্যা বিয়ে করার মত কেউ কি তোমাদের মধ্যে নেই? তারা বলল, তুমি নির্বোধ ছেলে। জালূতের বিরুদ্ধে কে লড়তে পারে? সে তো প্রতাপশালী রাজাদের অন্যতম। দাউদ (আ.) যখন বুঝতে পারলেন যে, কেউ এতে আগ্রহী নয়, তখন তিনি বললেন, আমি–ই যাব, আমি তাকে হত্যা করব। ওরা অনেক ধমক

দিল, ও রাগ করল। যখন এ ব্যাপারে তারা একটু অসর্তক হলো, তখন তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘোষকের নিকট গিয়ে পৌঁছলেন। বললেন, আমি জালূতের বিরুদ্ধে লড়ব। ঘোষক তাকে নিয়ে বাদশার নিকট গেলেন এবং বললেন, এই বালক ব্যতীত বনী ইসরাঈলের কেউ ডাকে সাড়া দেয়নি। রাজা বললেন, বৎস ! তুমি কি জালূতের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, অবশ্যই। বাদশাহ বললেন, ইতিপূর্বে তুমি কি এ ধরনের কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হয়েছ? দাউদ (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি ছাগলের রাখাল। একবার একটা বাঘ এসে আমার বকরী-পালে আক্রমণ করল। আমি সেটির দু' চোয়াল ঝাপটে ধরে ছিঁড়ে ফেলেছিলাম। তিনি বালকের জন্যে তীর–ধনুক ও যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র আনার নির্দেশ দিলেন। দাউদ (আ.) এগুলো পরিধান করে ঘোড়ায় চড়ে কিছুদূর মাত্র অগ্রসর হলেন। তারপর ঘোড়া ফিরিয়ে রাজার নিকট এসে পড়লেন। রাজা ও উপস্থিত লোকজন বলল, ছেলেটি তো সাহস হারিয়ে ফেলেছে! তিনি এসে রাজার সম্মুখে দাঁড়ালেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি জালূতকে হত্যা না করেন এ ঘোড়া ও অস্ত্র তো তাকে হত্যা করতে পারবে না। আমাকে অনুমতি দিন আপন ইচ্ছানুযায়ী আমি লড়তে যাই। রাজা অনুমতি দিলেন। হযরত দাউদ (আ.) আপন থলেটি গলায় ঝুলালেন, তাতে কয়েক টুকরো পাথর ভরলেন এবং যে মিকলা (পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র) নিয়ে বকরী চরাতেন সেটি নিলেন। এরপর জালূতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জালূত–বাহিনীর নিকট যখন পৌঁছলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, জালূত কোথায়? তাকে জালূতকে দেখিয়ে দেওয়া হলো। পরিপূর্ণ অস্ত্র–সজ্জিত জালূত অশ্বে আরোহণ করে বেরিয়ে পড়ল। দাউদ (আ.)-কে দেখে জালূত বলল, 'আমি কি তোমার সাথে লড়াই করব? দাউদ (আ.) বললেন, হ্যাঁ। সে দাউদ (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলল, (তুমি তো কুকুর শিকারীদের ন্যায় পাথর নিক্ষেপের যন্ত্র ও পাথর নিয়ে এসেছ। দাউদ (আ.) বললেন, তাই বটে। জালূত হুংকার ছেড়ে বলল, অনতিবিলম্বে তোমার দেহের গোশতগুলো কেটে টুকরো টুকরো করে আকাশের পাখি এবং জীবজন্তুকে খাওয়াব। দাউদ (আ.) বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমার দেহের গোশতকে খন্ডবিখন্ড করে দেবেন। এরপর দাউদ (আ.) একটি পাথর তাঁর পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্রে সেট করলেন। তারপর পাক দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন জালূতের দিকে। তার শিরস্ত্রাণের নাক বরাবর লেগে পাথরটি মাথার ভেতরে প্রবেশ করল। ফলে জালূত ঘোড়া হতে নিচে পড়ে গেল। দাউদ (আ.) অগ্রসর হয়ে তরবারি দিয়ে তার মাথা কেটে থলেতে ভরে নিলেন। অস্ত্র–সজ্জিত জালূতের মৃতদেহ টেনে এনে তালূতের সামনে রাখলেন। জনতা এতে পরম আনন্দিত হলো। তালূত প্রস্থান করলেন। রাজধানীতে এসে তালূত লোকমুখে শুধু দাউদ (আ.)-এর প্রশংসাই শুনতে লাগলেন। এতে তিনি রুষ্ট হলেন। এরপর দাউদ (আ.) এসে বললেন, আমার স্ত্রীকে আমার নিকট হস্তান্তর করুন। তালূত বললেন, বিনা মোহরে রাজকন্যা চাও? দাউদ (আ.) বললেন, মোহরের শর্ত তো তখন করেননি, এখন আমার নিকট তো অর্থ নেই। রাজা বললেন, তোমার সামর্থের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দিব না।

তিনি মোহরানা আদায় করলেন এবং বললেন, আপনার শর্ত পূর্ণ করেছি। এবার আমার স্ত্রী আমাকে দিয়ে দিন। শেষ পর্যন্ত তালূত আপন কন্যাকে দাউদ (আ.)-এর নিকট বিয়ে দিলেন। জনসাধারণ সর্বদা দাউদ (আ.)-এর প্রশংসায় মুখর। তাঁর জনপ্রিয়তা এখন সর্বোচ্চে। এতে তালূত ঈর্ষান্বিত। ষড়যন্ত্রের নতুন চাল আরম্ভ হলো। ছেলেকে ডেকে বললেন, তুমি দাউদকে খুন করবে। বিস্ময়াভিভূত ছেলে বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ্! সেতো আপনার পক্ষ হতে এমন আচরণ পেতে পারে না। তালূত ছেলেকে বুঝালেন, তুমি

তো বোকা ছেলে, দাউদ তো অনতিবিলম্বে পরিবার–পরিজনসহ তোমাকে দেশ হতে বহিষ্কার করবে। পিতার মন্তব্য শুনে সে আপন বোনের বাড়ীতে ছুটে গেল। বলল, তোমার পিতার পক্ষ থেকে আমি আশংকা করছি যে, তিনি তোমার স্বামীকে হত্যা করবেন। তোমার স্বামীকে বলো সতর্কতা অবলম্বন ও দূরে সরে থাকতে। স্ত্রী তাঁকে ঘটনা জানালেন। ফলে তিনি তখনি আত্মগোপন করলেন। প্রত্যুষে দাউদ (আ.)-কে ডেকে নেয়ার জন্য তালূত লোক পাঠালেন। এদিকে স্ত্রী করল কি! নিদ্রিত ব্যক্তির কাঠামো তৈরি করে লেপ দিয়ে ঢেকে দিল। তালূতের পিয়ন এসে জিজ্ঞেস করল দাউদ কোথায়? রাজা তাঁকে ডেকেছেন। মহিলা বললেন, উনি সারারাত অসুস্থ ছিলেন, এখন ঘুমিয়ে আছেন। বাহকেরা তালূতকে এ সংবাদ জানাল। কিছুক্ষণ পর আবার বাহকের আগমন। মহিলা বললেন, তিনি এখনও ঘুমে। ঘুম ভাঙ্গেনি। বাহক রাজ দরবারে গিয়ে জানাল। তৃতীয় বারে রাজার নির্দেশ, ঘুমন্ত হলেও তাকে আমার নিকট হাযির কর। বাহকগণ এসে দেখল বিছানায় কেউ নেই। ওরা রাজাকে রিপোর্ট করল। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন সে মিথ্যা কথা বলল? কন্যার উত্তর, আমি যদি তা না করি তো সে আমাকে খুন করে ফেলবে এ আশংকায় আমি শংকিত ছিলাম। এদিকে দাউদ (আ.) পাহাড়ে চলে গেলেন। অবশেষে তালূত নিহত হলো এবং পরবর্তীতে দাউদ (আ.) রাজ–সিংহাসনে বসলেন।

৫৭৪৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তালূত ছিল সেনাধ্যক্ষ। হযরত দাউদ (আ.)–এর পিতা কিছু সাজ–সরঞ্জাম দিয়ে দাউদ (আ)–কে পাঠিয়েছিলেন তাঁর ভাইদের নিকট। তালূতকে উদ্দেশ্য করে দাউদ (আ.) বলেছিলেন, জালূতকে হত্যা করতে পারলে বিনিময়ে আমি কি পাব? তালূতের উত্তর, আমার সহায়-সম্পত্তির এক–তৃতীয়াংশ পাবে এবং আমার কন্যা বিয়ে দিব তোমার নিকট। দাউদ (আ.) তাঁর থলে কাঁধে নিলেন, তাতে ভরে নিলেন ধারালো পাথর তিনটি। পাথর তিনটির নাম রাখলেন, এটি ইবরাহীম (আ.)–এর পাথর, এটি ইসহাক (আ.)–এর পাথর এবং এটি ইয়াকূব (আ.)–এর পাথর। তারপর থলেতে হাত ঢুকালেন। বললেন, আমার ইলাহ্ –এর নামে, ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূব আলায়হিমুস্ সালামের ইলাহ্‌র নামে হাত দিলাম। ইবরাহীম (আ.)–এর পাথর তাঁর হাতে উঠল। সেটিকে পাথর নিক্ষেপণ–যন্ত্রে ফিট করলেন। পাথরটি তার মাথা থেকে ৩৩ টি (তেত্রিশ) শিরস্ত্রাণ উড়িয়ে নিয়েছে এবং তার পেছনের দিকে ত্রিশ হাজার সৈন্যকে হত্যা করেছে।

৫৭৪৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তালূতের সাথে সেদিন যারা নদী অতিক্রম করেছিল, তাদের মধ্যে তেরটি ছেলে সন্তানসহ হযরত দাউদ (আ.)-এর পিতাও ছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। হযরত দাউদ (আ.) একদিন তাঁর পিতাকে বললেন, "আব্বাজান! আমি যা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ি তা–ই তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে।" তিনি বললেন, "হে আমার প্রিয় ছেলে! সু–সংবাদ নাও, আল্লাহ্ তা'আলা শিকারের মধ্যে তোমার জীবিকা নিহিত রেখেছেন। আবার এসে হযরত দাউদ (আ.) বললেন, "আব্বাজান! আমি পাহাড়ী এলাকায় গিয়েছিলাম, বিশ্রামরত একটি বাঘ দেখে তার দু'কান ধরে পিঠে চড়ে বসলাম। সেটি তো আমাকে দেখে গর্জন করে নি।" পিতা বললেন, প্রিয় বৎস! সুসংবাদ গ্রহণ কর, একটি কল্যাণকর ব্যাপার আল্লাহ্ তোমাকে দিবেন। অন্যদিন হযরত দাউদ (আ.) এসে বললেন, আব্বাজান! আমি পাহাড়ে চলতে চলতে তাসবীহ্ পড়ছিলাম। দেখি কি পাহাড়ের সব কিছুই আমার সাথে তাসবীহ পড়ছে।" তিনি বললেন, "হে বৎস! সুসংবাদ গ্রহণ কর, একটি কল্যাণ আল্লাহ্ তোমাকে দিয়েছেন।"

হযরত দাউদ (আ.) ছাগল চরাতেন, তাঁর পিতা তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি পিতা ও ভাইদের নিকট খাদ্য নিয়ে যেতেন। তৎকালীন নবী (আ.) একটি শিং (বোতল) ভর্তি করে তৈল ও একটি লৌহ বর্ম পাঠালেন তালূতের নিকট এবং বললেন, আপনার যে সৈন্য জালূতকে হত্যা করবে, তার মাথায় এ শিংটি রাখলে পরে তা টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকবে এবং তার মাথাটি তৈলাক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তার মুখমন্ডলে এক ফোঁটা তৈলও পড়বে না। এটি তার মাথায় মুকুট হিসাবে শোভা পাবে। সে এ পোশাকটি পরলে তা তার গায়ে মানানসই হবে। তারপর তালূত বনী ইসরাঈলের সবাইকে ডাকলেন। তিনি তাদের সবাইকে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কারো সাথে তা মিলল না। সকলকে পরীক্ষা করার পর হযরত দাউদ (আ.)–এর পিতাকে তালূত বললেন, আপনার কোন সন্তান অবশিষ্ট রয়ে গেল কি? যে এখানে আসেনি? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমার ছেলে দাউদ অবশ্য রয়ে গেছে, সে আমাদের খাবার-দাবার নিয়ে আসে।

দাউদ (আ.) আসছিলেন, পথিমধ্যে তিনটি পাথর ছিল। সেগুলো বলে উঠল, 'দাউদ'। আমাদেরকে সাথে নিন, আমাদের দ্বারা আপনি জালূতকে হত্যা করতে পারবেন। তিনি সেগুলোকে উঠিয়ে তার থলেতে নিলেন। তালূতের ঘোষণা ছিল জালূতের হত্যাকারীর নিকট তিনি আপন কন্যা বিয়ে দিবেন এবং তার সীলমোহর তালূতের রাজ্যে প্রচলিত হবে। দাউদ (আ.)-এর আগমনের পর শিংটি তার মাথায় স্থাপনের সাথে সাথে তা টগবগিয়ে ফুটে উঠল, মাথা তৈলাক্ত হয়ে গেল। পোশাকটি পরানো হলে তা তাঁর দেহে ফিটফাট ও আঁটসাঁটভাবে লেগে গেল। অথচ তিনি ছিলেন হলুদ বর্ণের রুগ্ন লোক। ইতিপূর্বে যারাই পোশাকটি পরিধান করেছে, তাদের গায়ে ঢিলে হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আ.)-এর গায়ে তা মানানসই হয়ে গেছে। এরপর তিনি জালূতের দিকে যাত্রা করলেন। জালূত ছিল শ্রেষ্ঠতম সুঠামদেহী ও শক্তিশালী। দাউদ (আ.)-এর প্রতি নজর পড়তেই জালূতের মনে ভীতির সৃষ্টি হলো, সে বলল, বালক! ফিরে যাও, তোমাকে হত্যা করতে আমার দয়া হচ্ছে। দাউদ (আ.) বললেন, 'না, না বরং আমি তোমাকে হত্যা করবই।' তিনি পাথরগুলোকে পাথর নিক্ষেপণ–যন্ত্রে ফিট করলেন, প্রতিটি পাথর নেয়ার সময় এক একটি নাম রাখলেন। বললেন, 'এটি আমার পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নামে, এটি আমার পূর্বপুরুষ ইসহাক (আ.)–এর নামে এবং এটি আমার পূর্বপুরুষ ইয়াকূব (আ.)-এর নামে। তারপর তিনি নিক্ষেপণ যন্ত্রে চক্কর লাগালেন, তিনটি পাথর একটিতে পরিণত হলো, তিনি সেটি জালূতের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। পাথর গিয়ে লাগল জালূতের দু'চোখের মাঝে। তা তার মাথায় ঢুকে গেল এবং তিনি জালূতকে হত্যা করলেন। তারপর সে পাথরটি পর পর মানুষ হত্যা করা আরম্ভ করল, যার গায়েই লাগে তার সর্বাঙ্গ ছেদ করে ঢুকে যায়। অবশেষে তাঁর আশে পাশে আর কেউ থাকল না এবং তারা পরাজিত হলো। হযরত দাউদ (আ.) হত্যা করলেন জালূতকে। তালূত দেশে ফিরে আপন কন্যা বিয়ে দিলেন দাউদ (আ)–এর নিকট এবং রাজ্যে তাঁর সীলমোহর চালু করে দিলেন। দিন দিন মানুষ দাউদ (আ.)–এর দিকে ঝুঁকছে, তাঁকে সবাই ভালবাসছে। তা দেখে তালূতের মনে, বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তিনি তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করতে লাগলেন । অবশেষ তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করলেন। কিছুক্ষণ পর দাউদ (আ.) সম্মুখ দিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। তালূত তখন নিদ্রামগ্ন। তিনি দুটো বর্শা তালূতের দু'পায়ের নিকট এবং অপর দুটো তার ডান ও বাম পার্শ্বে রেখে গেলেন। সজাগ হয়ে বর্শা দেখেই তালূত বুঝে নিল এ কর্মের নায়ক কোন্ লোক। তালূত বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ.)-কে করুণা করুন। সে তো আমার চেয়ে ভাল। আমি সুযোগ পেলে তাকে হত্যা করতাম, অথচ সে পূর্ণ সুযোগ পেয়েও আমাকে আক্রমণ করেনি, হত্যাও করেনি।

একদিনের কথা। ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করছিলেন তালূত। উপত্যকায় দেখতে পেলেন দাউদ (আ.)-কে। পায়ে হেঁটে চলছেন। তালূত বললেন, এ–ই মোক্ষম সুযোগ, আজ আমি তাকে খুন করবই। বিপদের আভাস পেলে দাউদ (আ.)-কে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। তালূত পিছু নিলেন হযরত দাউদ (আ.)-এর। তালূতের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে দাউদ (আ.) পলকে ঢুকে পড়লেন এক গুহায়। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাকড়সাকে নির্দেশ দিলেন গুহার মুখে জাল তৈরি করে দিতে। মাকড়সা অনতিবিলম্বে তাই করল। গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তালূত ভাবলেন, সে গর্তে ঢুকে থাকলে তো এ জাল অবশ্যই ছিঁড়ে যেত। সাত-পাঁচ ভেবে তালূত সে স্থান ত্যাগ করলেন।

৫৭৪৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, দাউদ (আ.) তাঁর ভাইদের নিকট আগমনের সময় থলেতে ভরে তিনটি পাথর নিয়ে এসেছিলেন। দাম্ভিক জালূত উন্মুক্ত ময়দানে দাঁড়িয়ে বলল, এ কজন বীরের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে কি কোন বীর আছে? তালূত তার অধীনস্থ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জালূতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তাদের মধ্যে কেউ আছে কিনা, নতুবা তালূত নিজেই বেরুবেন। দাউদ (আ.) বেরিয়ে এলেন, তিনি বললেন 'আমি আছি' । তালূত তাঁকে যুদ্ধবর্ম পরিয়ে দিলেন, তাঁকে চমৎকার মানিয়েছিল। তালূত ভীষণ খুশী। তালূত তাঁর ব্যক্তিগত সব অস্ত্রশস্ত্র তাঁকে পরিয়ে দিলেন। এদিকে দাউদ (আ.) আগমনের সময় তিনটি পাথর নিয়ে এসেছিলেন। দাউদ (আ.) তাঁর শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে একটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। তা গিয়ে পড়ে লোকজনের মধ্যে। তারপর নিক্ষেপ করলেন দ্বিতীয়টি। তা–ও গিয়ে পড়ল জালূতের সেনাবাহিনীর মধ্যে। তৃতীয় পাথরে নিহত হয় অহংকারী জালূত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ.)-কে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাঁর ইচ্ছা মুতাবিক জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। অবশেষে দাউদ (আ.) তাদের নেতৃত্ব লাভ করলেন। তারা সবাই তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করল।

৫৭৪৬. ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ .

অর্থ ঃ তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল প্রধানদেরকে দেখনি? তারা যখন তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্যে এক রাজা নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করতে পারি। সে বলল, এ তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হলে তখন আর তোমরা সংগ্রাম করবে না? তারা বলল, আমরা যখন স্ব-স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহ্র পথে কেন সংগ্রাম করব না? তারপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হলো, তখন তারা স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত"। (২ ঃ ২৪৬) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.)–এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অমুক ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে একজন সাহসী ছেলে আছে, তাকে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জালূতকে হত্যা করবেন। ছেলেটি খুঁজে বের করার উপায় হলো এ শিংটি তার মাথায় রাখলে পরে তা থেকে পানি ঝরতে থাকবে। নবী এলেন উল্লিখিত লোকটির নিকট।

তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন যে, অমুক ব্যক্তির সন্তানদের মধ্যে একজন সাহসী লোক আছে, তাকে দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জালূতকে হত্যা করাবেন। সে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! হ্যাঁ আমার কয়েক ছেলে আছে বটে। এরপর থামের ন্যায় লম্বা–চওড়া বারো জন ছেলে সন্তান নবী (আ.)-এর নিকট হাযির করল। তাদের একজন ছিল সৌন্দর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুদর্শন। তিনি নির্ধারিত শিংটি দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু শিংটিতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। একে একে সবাইকে তিনি পরীক্ষা করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করলেন "আকৃতি দেখে আমি লোক মনোনীত করি না, বরং অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিপক্বতাই আমার মনোনয়নের চাবিকাঠি।"

নবী বললেন, হে আমার প্রতিপালক! সে তো বলছে তার আর ছেলে সন্তান নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন সে তাহলে মিথ্যা বলছে। নবী (আ.) লোকটিকে ডেকে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তো বলছেন আপনার আরো ছেলে সন্তান আছে। সে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলেছেন, আমার আরো একটি ছেলে আছে। তবে সে সবচেয়ে খাটো ও ক্ষুদ্র। লোক–লজ্জার ভয়ে আমি তাকে জনসমক্ষে আসতে দিই না। তাকে আমি বকরীর পাল দেখাশোনায় নিয়োজত রেখেছি। "এখন সে কোথায়?" নবী (আ.) জিজ্ঞেস করায় সে বলল, বকরী নিয়ে অমুক পাহাড়ের অমুক স্থানে আছে। নবী (আ.) যাত্রা করলেন। তাঁর তাঁবুতে যেতে পথে একটি ঝর্ণা। তিনি দেখলেন সেই ছেলেটি দুটো বকরী ঘাড়ে বহন করে ঝর্ণা পাড়ি দিচ্ছে। বকরী দুটোর গায়ে একটুও পানি লাগছে না। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে এ–ই সেই প্রার্থিত ব্যক্তি। পশুর প্রতি যার এত দরদ মানুষের প্রতি সে নিঃসন্দেহে আরো অধিক দয়া পরবশ হবে। তিনি শিংটি বালকের মাথায় রাখলেন। দেখা গেল তা থেকে পানি বেরুচ্ছে। তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি কি এখানে বিস্ময়কর কিছু লক্ষ্য করছ? দাউদ (আ.) বললেন, হ্যাঁ, আমি যখন তাসবীহ পাঠ করি, তখন পর্বতগুলো আমার সাথে তাসবীহ্ পাঠ করে। নেকড়ে বাঘ ও হিংস্র পশুগুলো আমার বকরী পালে আক্রমণ করে মুখে তুলে নিলে আমি গিয়ে তার দু'চোয়াল মুচড়ে ধরে বকরী ছাড়িয়ে নিই। পশুটি কিন্তু আমার উপর রাগ দেখায় না, হুংকার ছাড়ে না। বালকটির সাথে তাঁর চামড়ার থলিটি ছিল। সে পায়ে হেঁটে চলছিল। তিনটি পাথর এ বলে চিৎকার করছিল যে, দাউদ (আ.) আমাকেই তুলে নিবেন। অপরটি বলছিল, না, আমাকেই নিবেন। তৃতীয় পাথরটি বলছিল, না, তিনি নিবেন আমাকেই। তিনটি পাথরই তিনি তাঁর থলিতে তুলে নিলেন। নবী (আ.)-এর সাথে যখন তিনি আগমন করলেন এবং লোকজন যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে এলো, তখন নবী (আ.) বললেন, إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ عَلَيْكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا –আল্লাহ্ তা'আলা তালূতকে তোমাদের জন্যে রাজা করেছেন।"

এ প্রসংগে তাদের সাথে নবী (আ.)-এর যে কথোপকথন হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন।

এরপর ইব্ন যায়দ (র.) সূরা বাকারার ২৪৭, ২৪৮ ও ২৪৯ নম্বর আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এ দলের লোকেরা সকলে ঐক্যমতে পৌঁছেছিল এবং তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ। তিনি وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ "কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর" আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে জালূতের দম্ভোক্তি প্রসংগে ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, হাতে তীর–ধনুক নিয়ে মিশ্র রঙের এক অনারব ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে জালূত বেরিয়ে এল যুদ্ধক্ষেত্রে। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, "কে এগিয়ে আসবে আমার সাথে যুদ্ধ করতে? তোমাদের সেনাপতিকে পাঠিয়ে দাও।" ভয় পেয়ে গেলেন তালূত। তাঁর সৈনিকদেরকে ডেকে বললেন, আমার পক্ষে জালূতকে শায়েস্তা করার কে আছে? 'আমি, আমি,' দাঊদ (আ.) উত্তর দিলেন। "তবে এগিয়ে এসো" তালূত বললেন। আপন বর্ম খুলে তিনি দাঊদ (আ.)-কে পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপন শক্তি ফুঁকে দিলেন দাঊদ (আ.)-এর মধ্যে।

জালূত একটি তীর ছুঁড়ল হযরত দাঊদ (আ.)-এর প্রতি। হযরত দাঊদ (আ.)-এর বর্মে এসে লাগল তীরটি। তাঁর সামান্য ক্ষতিও হয়নি তাতে। তীরটি হাতে নিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন তিনি। তিনি বললেন, এবার আমার আক্রমণ গ্রহণ কর। দাঊদ (আ.) তাঁর পাথর তিনটিকে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করে পাথরগুলোকে একটি পাথরে পরিণত করে দিতে বললেন। আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে একত্রিত করলেন। সেগুলো একটি পাথরে পরিণত হলো। পাথর নিক্ষেপণ–যন্ত্রে তিনি পাথরটি বসিয়ে তা ঘুরাতে লাগলেন নিক্ষেপ করার জন্যে। জালূত বলল, এ কি! নেকড়ে ও পশু শিকারের ন্যায় তুমি কি আমার দিকে পাথর নিক্ষেপ করবে? আমার সাথে যুদ্ধ করতে হলে তীর–ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হও। "এটিই আমি তোমার দিকে ছুঁড়ব এবং এটি দিয়েই আমি তোমাকে হত্যা করব" দাঊদ (আ.) বললেন। আপন উক্তি পুনরাবৃত্তি করল জালূত। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি আমার নিকট নেকড়ের চেয়েও অধম–হীন –তুচ্ছ" বললেন দাঊদ (আ.)! তিনি তাঁর যন্ত্র ঘুরাতে লাগলেন। তাতে ছিল মহান আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি ও ক্ষমতা। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের ভিত্তিতে তিনি তা নিক্ষেপ করলেন। এক খন্ড মেঘ এসে পাথরটি দ্বারা আঘাত করল জালূতের দু'চক্ষুর মাঝে। দু'চক্ষুর মাঝ দিয়ে প্রবেশ করে ঘাড়ের পেছন দিকে বেরিয়ে তার পশ্চাতে অবস্থানরত অনেক সৈন্যকে হত্যা করল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করলেন, করলেন পর্যুদস্ত।

৫৭৪৭. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ (আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন) আয়াতে উল্লিখিত নদীটি তারা যখন অতিক্রম করে, অপরদিকে জালূত আবির্ভূত হয়ে যখন তালূতকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের চ্যালেঞ্জ দেয়, তখন যুদ্ধে অংশগ্রহণ তালূতের জন্যে দুষ্কর হয়ে পড়ল। তাঁর লোকজনের মধ্যে তিনি ঘোষণা দিলেন, যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করতে পারবে, তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ এবং তাঁর মালিকানাধীন সবকিছুর অর্ধাংশ তিনি তাকে দিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা দাঊদ (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তখন পাহাড়ে বকরী চরাতেন। সৌন্দর্যে, আকৃতিতে এবং দৈহিক কাঠামোতে তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং তালূতের নিকট অধিক পরিচিত তাঁর অপর নয় ভাই তাঁকে বকরীর দায়িত্বে রেখে নিজেরা যুদ্ধে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা দাঊদ (আ)-এর অন্তরে মহান ভাব সৃষ্টি করলেন। আমার বকরীর পাল আল্লাহ্ তা'আলার হিফাযতে রেখে আমি লোকজনের নিকট যাব এবং জালূত–হত্যাকারীর জন্যে ঘোষিত পুরস্কারের কি হয় তা দেখব। দাঊদ (আ.) মনস্থির করলেন। তিনি এসে পৌঁছলেন। বকরীর পাল ছেড়ে আসায় ভাইয়েরা তাঁকে বকাবকি করল। তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি উত্তর দিলেন। 'জালূতকে হত্যা করতে এসেছি'। আমার হাতে জালূতের মৃত্যু ঘটাতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম। তারা সবাই বিদ্রূপের হাসি হাসল।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেন, দাউদ (আ.)-এর পিতা কিছু জিনিসপত্র সহ তাঁকে তাঁর ভাইদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। দাউদ (আ.) একটি থলি নিলেন। তাতে তুলে নিলেন তিনটি পাথর। পাথরগুলোর নাম রাখলেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব। ভাষ্যকার ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, দাউদ (আ.) ছিলেন দুর্বল ও অগোছালো লোক। তিনি হেঁটে যেতে লাগলেন। পথ চলতে চলতে পেলেন তিনটি পাথর। "আমাদেরকে আপনার থলেতে তুলে নিন, আমাদের সাহায্যে আপনি জালূতকে হত্যা করতে পারবেন" পাথরগুলো তাঁকে ডেকে বলল। পাথরগুলো তুলে তিনি থলেতে রাখলেন। তিনি শুনছিলেন, থলেতে পাথরগুলোর একটি বলছে, আমি হারুন (আ.)-এর পাথর, আমাকে দিয়ে তিনি অমুক রাজাকে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয়টি বলছে, আমি মূসা (আ.)-এর পাথর, আমাকে দিয়ে তিনি অমুক রাজাকে হত্যা করেছেন। তৃতীয় পাথরটি বলছে আমি দাউদ (আ.)-এর পাথর, আমি জালূতকে হত্যা করব। প্রথম দুটো পাথর তৃতীয়টিকে বলল, দাউদ (আ.)-এর পাথর! জালূত– হত্যায় আমরা তোমাকে সাহায্য করব। অনন্তর পাথর তিনটি এক পাথরে পরিণত হয়ে গেল। পাথর বলল, হে দাউদ (আ.)! আপনি আমাকে জালূতের দিকে নিক্ষেপ করুন, আমি বায়ুর সাহায্যে জালূতের দিকে এগিয়ে যাব। আল্লাহ্–ই জানেন— কথিত আছে যে, জালূতের শিরস্ত্রাণের ওজন ছিল প্রায় নয় মণ পঁচিশ সের (ছ'শ' রিত্ল) । ইব্ন জুরাইজ (র.)-এর বর্ণনা, তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেন, দাউদ (আ.) একটি পাথরকে ইবরাহীম, একটিকে ইসহাক এবং একটিকে ইয়াকূব নামে অভিহিত করেছিলেন। তারপর সে গুলোকে পাথর নিক্ষেপণ–যন্ত্রে স্থাপন করেছিলেন।

ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, এরপর হযরত দাউদ (আ.) তালূতের নিকট গিয়ে বললেন, জালূত হত্যা-কারীর জন্যে আপনি আপনার রাজত্বের অর্ধেক এবং আপনার মালিকানাধীন সব কিছুর অর্ধেক দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি তাকে হত্যা করি, তবে আমাকে তা দিবেন কি? অবশ্যই , অবশ্যই দিব, তালূত উত্তর দিলেন। অন্যান্য লোকজন বিশেষত দাউদ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করছিল।

জালূতকে হত্যা করার জন্যে কেউ এগিয়ে এলে তালূত তার বর্মটি তাকে পরিয়ে দেখতেন। তার গায়ে যথাযথ ভাবে মানানসই না হলে তা খুলে নিয়ে লোকটিকে বিদায় করে দিতেন। তালূতের অন্যান্য বর্মের চেয়ে এটি বড় ছিল। এবার বর্মটি দাউদ (আ.)-কে পরিয়ে দিলেন। এটি তাঁর দেহে চমৎকার ভাবে মানিয়ে গেল। তাঁকে নির্দেশ দিলেন সম্মুখে অগ্রসর হতে। দাউদ (আ.) অগ্রসর হয়ে এমন একস্থানে দাঁড়ালেন, যেখানে ইতিপূর্বে কেউ দাঁড়ায়নি। তিনি ছিলেন বর্ম পরিহিত। তাঁকে দেখে দয়ার সুরে জালূত বলল, তুমি তো ছোট্ট ছেলে–তুমি দুর্বল বালক, তোমার প্রতি আমার দয়া হয়, তুমি ফিরে যাও। রাজ, রাজন্যবর্গের কেউ আসুক, আমি তার সাথে যুদ্ধ করব। দাউদ (আ.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিতে আমিই তোমাকে হত্যা করব। তোমাকে হত্যা না করে আমি এ স্থান ত্যাগ করব না। দাউদ (আ.)-এর দৃঢ়তা দেখে জালূত পূর্ণ শক্তিতে এগিয়ে এলো তাঁকে কাবু করার জন্যে। আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে পাথর ছুঁড়লেন হযরত দাউদ (আ.) । দমকা বাতাসে জালূতের শিরস্ত্রাণ উড়ে গেল। পাথরটি গিয়ে লাগল তার মাথায়। ঢুকে গেল মাথা ভেদ করে ভুঁড়িতে। সে নিহত হলো।

তাফসীরকার মুজাহিদ (র.) বলেন, পাথরটি নিক্ষেপের পর তা ভেঙ্গে তেত্রিশ টুকরো হয়ে যায়। তার শিরস্ত্রাণ খসিয়ে দেয় এবং তার পেছনে অবস্থানরত ত্রিশ–হাজার শত্রুসেনাকে হত্যা করে। আল্লাহ্

তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করলেন "وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ" (দাউদ হত্যা করল জালূতকে)। দাউদ (আ.) তালূতকে বললেন, প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। –তালূত প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকৃতি জানাল। তখন দাউদ (আ.) বনী ইসরাঈলের এক শহরে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। এ সময় তালূতের মৃত্যু হলো। তখন বনী ইসরাঈলের লোকজন দাউদ (আ.)-কে তাদের রাজা হিসাবে বরণ করে নিল। তালূতের ধন ভান্ডার তাঁর হাতে তুলে দিল। তারা স্বীকার করল যিনি জালূতকে হত্যা করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নবী। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, দাউদ জালূতকে হত্যা করলে আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ (আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব এবং হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ.)-কে রাজত্ব দিয়েছেন, হিকমত দিয়েছেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করলেন তা শিক্ষা দিলেন। وَآتَاهُ বাক্যের ه "তাকে" সর্বনাম দ্বারা দাউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 'মুল্‌ক' মানে রাজত্ব, হিকমত মানে নবূওয়াত। "তিনি যা ইচ্ছা করলেন তা শিক্ষা দিলেন" মানে বর্ম তৈরি ও বর্ম তৈরিতে যথাযথ পরিমাণ নির্ধারণের জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ আমি তাকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে (২১ ঃ ৮০)।

وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ (আল্লাহ্ তা'আলা তাকে রাজত্ব ও হিকমত দিয়েছেন।)-এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ.)-কে দান করেছেন তালূতের রাজত্ব ও শামুঈল (আ.)–এর নবূওয়াত।

৫৭৪৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ তালূতের মৃত্যুর পর দাউদ (আ.) বাদশাহ হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবী বানিয়েছেন। وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ আল্লাহ্‌র উক্ত বাণী দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, হিকমত অর্থ নবূওয়াত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শামুঈল (আ.)–এর নবূওয়াত ও তালূতের রাজত্ব দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۔

অর্থঃ (আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল (২ ঃ ২৫১)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা যদি একদল মানুষ দ্বারা অর্থাৎ তাঁর অনুগত ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী জনগণ দ্বারা অপর দল মানুষকে তথা তাঁর অবাধ্য ও তাঁর সাথে শিরককারী লোকদেরকে প্রতিহত না করতেন।

স্মর্তব্য যে, জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিনে তালূতের সৈন্যদের মধ্যে যারা পানি পান করে কুফরী ও অবাধ্যতার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে যেতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল, আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা স্থাপনকারী

ও ধৈর্যশীল সৈনিকদের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে প্রতিহত করেছেন। অথচ সূচনাতে তিনি তাদের দু'আ কবূল করেছিলেন, যখন তারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্যে একজন রাজা প্রেরণের প্রার্থনা জানিয়েছিল। এভাবে যদি আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের দ্বারা কাফিরদেরকে প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ – এর অর্থঃ আল্লাহ্‌র শাস্তিতে পৃথিবীর অধিবাসী সব ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে পৃথিবী হয়ে পড়ত বিপর্যস্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি দয়াবান ও অনুগ্রহশীল। তাই তিনি প্রতিহত করেন তাঁর পুণ্যবান সৃষ্টি দ্বারা পাপাচারী সৃষ্টিকে, অনুগত দ্বারা অবাধ্য সৃষ্টিকে এবং মু'মিন দ্বারা কাফিরকে।

আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের মুনাফিক ও কাফিরদের জন্যে ঘোষণা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও অর্ন্তদৃষ্টি সম্পুন্ন মু'মিনদের ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি থেকে রক্ষা করছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শত্রু ও রাসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ইহকালে তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান ও আখিরাতে জান্নাত তৈরির মাধ্যমে তা পালন করে যাচ্ছেন।

তাফসীরকারগণের একটি দল আমাদের বক্তব্যের অনুরূপ তাফসীর করেছেন। যারা এমত পোষণ করেনঃ

৫৭৪৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - (আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যবানদের বদৌলতে পাপীদের থেকে যদি অকল্যাণ প্রতিহত না করতেন এবং অন্যান্য লোকজনের একদলের উসিলায় যদি অপর দলকে রক্ষা না করতেন, তবে পৃথিবীর অধিবাসিগণ ধ্বংস হয়ে পৃথিবীটাই বিপর্যস্ত হয়ে যেত।

৫৭৫০. মুজাহিদ(র.) থেকে অন্যসূত্রে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, পুণ্যবানগণের উসিলায় যদি পাপীদের থেকে অমঙ্গল প্রতিহত না করতেন এবং অন্যান্য লোকের একদলের উসিলায় যদি অপর দল থেকে অকল্যাণ প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবীর সকল অধিবাসীই ধ্বংস হয়ে যেত।

৫৭৫১. আবূ মুসলিম (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। আমি হযরত আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, মুসলিমগণ যদি না থাকত, তবে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতে।

৫৭৫২. রবী' (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত অর্থাৎ পৃথিবীতে বসবাসকারী সবই ধ্বংস হয়ে যেত।

৫৭৫৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একজন পুণ্যবান মু'মিনের উসিলায় আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতিবেশী একশত পরিবারকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। এরপর ইব্‌ন উমর (রা.)– وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

৫৭৫৪. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, একজন পুণ্যবান মুসলিম ব্যক্তির উসিলায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি–নাতিনীকে তার পাড়ার লোকদেরকে এবং পার্শ্ববর্তী পাড়ার লোকদেরকে পুণ্যবান বানিয়ে দেন। এ মুসলিম ব্যক্তি যতদিন তাদের মধ্যে অবস্থান করে, ততদিন তারা আল্লাহ্র হিফাযতে থাকে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, 'আলামীন (الْعَالَمِيْنَ) শব্দের তাফসীর আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

دَفْعُ اللّٰهِ –এর কিরাআত তথা পাঠ পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এক পক্ষ পড়েছেন دَفْعُ اللّٰهِ (প্রতিহতকরণ) যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা একাই মানুষের বিপদাপদ প্রতিহত করেন। এমন নয় যে, প্রতিহত করণে কেউ তাঁকে বাধা দেয় তারপর তিনি জয়ী হন। অপরপক্ষ পড়েছেন دِفَاعُ اللّٰهِ প্রতিহত করণে তিনি জয়ী হন।" এ পক্ষের যুক্তি হলো, আল্লাহ্ তা'আলার শত্রু কাফির –মুশরিকরা আল্লাহ্র প্রতি তাদের শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তাঁর দীনের অনুসারীদের প্রতি, তাঁর ওলী –আউলিয়া ও বন্ধুগণের প্রতি এবং তাঁর অনুগত ও মু'মিন বান্দাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে থাকে এবং নিজেদের অজ্ঞতা, বাতিল ও অসারতা দ্বারা দীনদার, ইবাদাতকারী ও মু'মিনদেরকে প্রতিহত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আউলিয়া থেকে, অনুগত ও মু'মিনদের থেকে তাদেরকে প্রতিহত করেন, প্রতিরোধে জয়ী হন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন– আমার মতে উভয় পাঠরীতির মাঝে অর্থগত কোন তারতম্য নেই। যেহেতু জালূত ও তার সেনাবাহিনী তালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র সৈনিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়েছিল আর তা ছিল প্রকারান্তরে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে লড়াই করা ও জয়ী হওয়ার প্রচেষ্টা। আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্যের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত তাঁর বন্ধুদের থেকে জালূত ও তার বাহিনীকে প্রতিহত করেছেন এবং তাতে জয়ী হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○ (٢٥٢)

২৫২. এ সমস্ত আল্লাহ্র আয়াত, আমি তোমার নিকট তা যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি, নিশ্চয়ই তুমি রাসূলগণের অন্যতম।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন– تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ (এসব আল্লাহ্র আয়াত) এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো, যাতে ব্যক্ত হয়েছে মৃত্যু ভয়ে ভীত আবাসভূমি পরিত্যাগকারী লোকদের কথা, মূসা (আ.)-এর পরবর্তী লোকদের কথা যারা নিজেদের নবীর নিকট রাজা আনয়নের অনুরোধ জানিয়েছিল। 'আল্লাহ্র আয়াত' মানে আল্লাহ্র দলীলসমূহ, ঘোষণাসমূহ ও প্রমাণসমূহ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)। পলায়নরত হাযার হাযার মানুষকে এক মুহূর্তে মৃত্যু দেওয়া, এরপর পুনরুজ্জীবিত করা, রাজ পরিবারের তো নয়ই, বরং চর্মকার কিংবা সাকী পরিবারের হওয়া সত্ত্বেও তালূতকে ইসরাঈলীদের রাজা বানানো, আবার আমার অবাধ্য হওয়ায় তা ছিনিয়ে নেওয়া, আমার অনুগত হওয়ায় দাউদ (আ.)-কে সে রাজ্য প্রদান করা, তালূত বাহিনী সংখ্যায় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও

আমার সাহায্যের প্রেক্ষিতে জালূতের বিশাল ও শক্তিশালী বাহিনীকে পরাভূত করা সম্পর্কে আমার কুদরত ও শক্তির যে সকল নিদর্শন আমি আপনাকে জানিয়েছি এগুলো হলো দলীল ও প্রমাণ সে সকল লোকের বিরুদ্ধে, যারা আমার নিয়ামত ও অনুগ্রহ অস্বীকার করেছে, আমার নির্দেশ অমান্য করেছে এবং আমার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এগুলো প্রমাণ কিতাবী দু'জাতি তথা ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে। যারা আমার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ তারা জানে যে, এসকল অজানা তথ্য ও ইতিহাস, যা আমি আপনাকে অবহিত করছি সব সত্য, এগুলোর কোনটিই আপনি অনুমান ভিত্তিক বলেননি। কিংবা বানিয়ে বলেননি। আপনি তো গতানুগতিক শিক্ষা নেননি, যাতে তারা সন্দেহ করতে পারে এবং দাবী করতে পারে যে, তাদের কোন কিতাব থেকে আপনি তা পাঠ করেছেন, জেনেছেন। এ সবই আমার প্রমাণাদি, যা আমি আপনার নিকট আবৃত্তি করছি সুদৃঢ় সত্য সহকারে। প্রকৃত তথ্য থেকে এতে কোন অতিরঞ্জন নেই, নেই কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি।

"হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি তো রাসূলগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আপনি রাসূল, আপনার খেয়াল–খুশীর বিরুদ্ধে আমার আনুগত্যে আমার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দানে অবিচল। এক্ষেত্রে আপনার পথ হলো আপনার পূর্বেকার রাসূলগণের পথ, যারা আমার নির্দেশের উপর অটল থাকত, নিজেদের ইচ্ছার বিপরীতে আমার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিত, নিজেদের খেয়ালখুশী ও পার্থিব লোভ–লালসা তাদেরকে সত্যচ্যুত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে তালূতের মনস্কামনা ও আমার বন্ধুদের জন্যে প্রস্তুতকৃত নিয়ামতরাজির বিপরীতে তার রাজত্বকে প্রাধান্য দেওয়া তাকে সত্যচ্যুত করেছিল। হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি তো আমার নির্দেশ ও বিধানকে সর্বদাই প্রাধান্য দিয়ে যান, যেমনি আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণ প্রাধান্য দিয়েছিলেন আমার নির্দেশকে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٢٥٣) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○

২৫৩. এই রাসূলগণ, আমি তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যাঁর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মারইয়াম–তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁকে শক্তিশালী করেছি। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হবার পর পারস্পরিক যুদ্ধ–বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল। ফলে, তাদের কতক বিশ্বাস করল এবং কতক কুফরী করল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ–বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন। কাফিররাই জালিম।

নবীগণকে পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, এই কয়েকজন রাসূল যাদের ঘটনা এই সূরায়ে বর্ণিত হয়েছে, যেমন মূসা (আ.) ইব্ন

ইমরান, ইবরাহীম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকূব (আ.), শামুঈল (আ.), দাউদ (আ.), আরো অন্য সব নবী–রাসূল(আ.) যাঁদের কথা এ সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কাউকে কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার সাথে আমি কথা বলেছি যেমন মূসা (আ.), আবার কাউকে অন্যের চেয়ে অধিক উচ্চ মর্যাদায় ও সম্মানে ভূষিত করেছি।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৭৫৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি অত্রআয়াতাংশ "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ" –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেছেন, "রাসূলগণের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন, যাঁদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন এবং তাঁদের কাউকে কারোর উপর উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যেমন মূসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ (সা.)-কে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর কাছে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন।

৫৭৫৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেছেন, "আমার উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণের জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি সমধিক প্রসিদ্ধ।

৫৭৫৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমাকে পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বেকার অন্য কোন নবী (আ.)-কে দান করা হয়নি। তা হচ্ছে ঃ

প্রথমত ঃ লাল, কালো অর্থাৎ আরব ও অনারব সকলের জন্যে আমি নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।

দ্বিতীয়ত ঃ দুশমনের অন্তরে আমার ভয়ভীতি সঞ্চার করে দিয়ে আমাকে সাহায্য–সহায়তা করা হয়েছে। কাজেই এক মাসের পরিভ্রমণের দূরত্বে অবস্থিত থেকেও দুশমনরা আমাকে ভয় করতো এবং আমার ভয়ে তারা শংকিত হয়ে পড়তো।

তৃতীয়ত ঃ আমার ও আমার উম্মতের জন্যে আল্লাহ্র পৃথিবীর সর্বত্র মসজিদের যোগ্য স্থান কিংবা পবিত্র স্থান বলে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন।

চতুর্থত ঃ আমার ও আমার উম্মতের জন্যে গনীমতের মাল ভক্ষণ করা বৈধ করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে কারোর জন্যে তা বৈধ করা হয়নি।

পঞ্চমত ঃ আমাকে বলা হয়েছে, তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দান করা হবে। তারপর আমি সে দানকে উম্মতের জন্যে শাফায়াত বা সুপারিশের রূপদান করেছি। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের উম্মতদেরকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, "তারপর এটা তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করেনি, তারাই তা আল্লাহ্ চাহেতো অর্জন করতে পারবে।"

পরবর্তী আয়াতাংশ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ –এর তাফসীর সম্পর্কে ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন "এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, 'আমি মারইয়াম–তনয় ঈসা (আ.)– কে কতিপয় নিদর্শন প্রদান করেছি এবং কতগুলো প্রকাশ্য প্রমাণ ও অকাট্য দলীলের মাধ্যমে– যেমন কুষ্ঠ ও শ্বেতরোগের আরোগ্য লাভ এবং মৃতকে জীবিত করে তোলার ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতা প্রদানের বিষয়াদির মাধ্যমে তাঁর নবূওয়াতকে

সুপ্রমাণিত করেছি। এর পূর্বে আমি তাঁকে ইনজীল কিতাব প্রদান করেছি এবং তাঁর উপর যা কিছু অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে সবকিছুই এ কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ অর্থাৎ "মারইয়াম–তনয়" ঈসা (আ.)-কে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাঁকে আমি শক্তিশালী করেছি।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "পবিত্র আত্মা বলে এখানে জিবরাঈল (আ.)–কে বুঝানো হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "পবিত্র আত্মার" অর্থ নিয়ে উলামা কিরামের মধ্যে যে মতানৈক্য রয়েছে, তা আমি সবিস্তারে এ তাফসীরের অন্যত্র বর্ণনা করেছি। তাই এখানে তার দ্বিরুক্তি প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হবার পর পারস্পরিক যুদ্ধ–বিগ্রহে লিপ্ত হতো না।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "মহান আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে এ সত্যটি উপস্থাপন করেছেন, যে সকল নবী–রাসূল (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন ও তাঁদের কাউকে কারোর থেকে অধিক মর্যাদাবান করেছেন বলে প্রশংসা করেছেন, তাদের ও মারইয়াম–তনয় ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীরা পারস্পরিক যুদ্ধ–বিগ্রহে লিপ্ত হতো না। কেননা, তাদের নিকট এরূপ সাবধান বাণী সম্বলিত আল্লাহ্ তা'আলারনিদর্শনাদিএসেছে, যা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সঠিক পথে পরিচালিত ও অনুমতিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান সৎপথে গমনেচ্ছুদের জন্যে সুনির্ধারিত।" তিনি আরো বলেছেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত নিদর্শন দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার এমন নিদর্শনগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলো তাদের জন্য সত্য ও সত্যের পথকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।"

আবার কেউ কেউ বলেছেন, "এ আয়াতাংশে তথা مِنْۢ بَعْدِهِمْ– এ উল্লিখিত " بَعْدِ " শব্দের পর " هِمْ " সর্বনামটি দ্বারা হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে।" উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে বক্তব্য ঃ

৫৭৫৮. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এ আয়াতাংশ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ এ– উল্লিখিত مِنْۢ بَعْدِهِمْ আয়াতাংশ দ্বারা مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى وَعِيْسٰى অর্থাৎ 'হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)–এর পরে' –এ অর্থ বুঝানো হয়েছে।

৫৭৫৯. হযরত রাবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এ আয়াতাংশ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ –এ উল্লিখিত مِنْۢ بَعْدِهِمْ আয়াতাংশ দ্বারা مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى وَعِيْسٰى অর্থাৎ 'হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)–এর পরে' –এ অর্থ বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ .

(কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল। ফলে, তাদের কতক বিশ্বাস করল এবং কতক কুফরী করল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হতো না; কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (২ঃ২৫৩)

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যখন পরবর্তী উম্মতের নিকট নরহত্যা ও মতভেদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে ফরমান জারী হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ, রাসূলগণের রিসালাত ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত কিতাব তথা ওহীর যথার্থতার সপক্ষে অকাট্য দলীল- প্রমাণাদি নাযিল করা হলো, আর নবী-রাসূলগণের প্রেরণের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ সম্পর্কে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত রাখার ইচ্ছা করলেন, তখনি তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর নির্দশনগুলোকে অস্বীকার করলো, আবার কেউ কেউ এগুলো মেনে নিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করার মানসে পরবর্তী উম্মতেরা তাদের স্বেচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তি ও দলীলের মাধ্যমে অবহিত হবার পরও তারা কুফরী ও যাবতীয় পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ ক্ষমতা ও দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে পাপের কাজ থেকে বিরত রাখার ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা যে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে এবং মতভেদের আশ্রয় নিয়েছে, তারা তা কোন দিনও করতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করেন। যাকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার ও তারপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের তাওফীক প্রদান করেন, সে তাঁর প্রতি ঈমান আনেন ও তাঁর বাধ্য হন। আর যাকে তিনি অপমান ও লাঞ্ছিত করতে চান, সে তাঁকে অবিশ্বাস করে ও তাঁর অবাধ্য হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

(٢٥٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৫৪. হে মু'মিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি, তা হতে তোমরা ব্যয় করো, সেদিন আসবার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না এবং কাফিররাই জালিম।

"আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে ইরশাদ করেছেন, "হে মু'মিনগণ তোমরা আমার দেয়া সম্পদ থেকে মহান আল্লাহ্র পথে দান-খয়রাত ও ব্যয় করো এবং তোমাদের সম্পদে তোমাদের উপর আমি যে অংশ দান করা নির্ধারণ করেছি, তা যথাযথ আদায় করো।"

আল্লাহ্ পাকের দেয়া সম্পদ থেকে দান কর ঃ

৫৭৬০. হযরত ইব্ন জুরাইজ (র.)-ও এ আয়াতের তাফসীর অনুরূপ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীস প্রণিধানযোগ্য ঃ

হযরত ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি এ আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এর অর্থ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদের আমি যা দান করেছি, তা থেকে তোমরা ফরয যাকাত ও নফল সাদকা হিসাবে দান–খয়রাত করো। এমন দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন ক্রয়–বিক্রয়, বন্ধুত্ব কিংবা সুপারিশের অবকাশ থাকবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, এ পৃথিবীতে তোমাদের সম্পদ থেকে মহান আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, গরীব–মিসকীনকে দান–খয়রাত করে এবং মহান আল্লাহ্র নির্ধারিত ফরয যাকাত আদায় করে মহান আল্লাহ্র কাছে নিজেদের জন্যে সম্পদ সঞ্চয় করো। যতদিন পর্যন্ত এরূপ লাভজনক ক্রয়–বিক্রয়ের সুযোগ থাকে, আল্লাহ্র প্রিয়তম বান্দাদের জন্যে সুরক্ষিত মান–মর্যাদাকে পার্থিব সম্পদ দ্বারা নিজেদের জন্যে খরিদ করে নাও। সম্পদ থেকে এরূপ ব্যয় করতে আমিই তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি ও এ কাজের জন্য আমিই তোমাদেরকে আহবান করেছি। এরূপ কাজটি এরূপ দিন আসার পূর্বেই সম্পাদন করে নাও, যেদিন তোমরা এখন পৃথিবীতে আল্লাহ্র নির্দেশ ও আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু সম্পদ ব্যয় করার সামর্থ্য রাখ, সেরূপ সমর্থ হবে না। কেননা, ঐ দিনটি হবে পুরস্কার ও ছওয়াব কিংবা শাস্তি পাবার দিন। অন্যদিকে সেই দিনটি কোন কিছু অর্জন, কাজ, ইবাদত বা পাপের কাজ সম্পন্ন করার দিন নয়। কাজেই তারা ঐ দিন সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে কিংবা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার উদ্দেশ্যে কোন কাজ সম্পাদন করার মাধ্যমে মর্যাদাবান ওলীগণের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "এ দিনটিতে সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং মর্যাদা লাভের কোন সুযোগ থাকবে না। কেননা, সেদিন কোন সম্পদই কারোর অধিকারে থাকবে না। সেদিন দুনিয়ার ন্যায় কোন প্রকার লাভজনক বন্ধুত্বও থাকবে না। দুনিয়ায় কেউ বিপদে পড়লে অথবা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তখন বন্ধু–বান্ধব এসে তাকে সাহায্য করতে পারত বা বিপদমুক্ত করতে পারত। কিন্তু সেই দিন তার জন্য এরূপ কোন সুযোগই থাকবে না। এ ধরনের সুযোগ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিরাশ করে দেবেন। কেননা, কিয়ামতের দিবসে একে অন্যকে আল্লাহ্র আদেশ ও অনুমতি ব্যতীত সাহায্য করতে পারবে না। বরং পারস্পরিক বন্ধুরা একে অন্যের দুশমন হয়ে যাবে। তবে মুত্তাকিগণ আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষে একে অন্যের সাহায্য করতে পারবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমের অন্যত্র ইরশাদ করেছেন। এরূপে তাদেরকে আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, দুনিয়াতে যেরূপ তাদের সম্পদ ব্যয় করে, বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে একে অন্যের প্রতি দয়া–দাক্ষিণ্য দেখাতে পারত এরূপ সুযোগ আর আজকের দিনে নেই। দুনিয়াতে যেরূপ তাদের সুপারিশকারী ছিল, আজ তাদের জন্যে সেরূপ কোন সুপারিশকারী নেই। দুনিয়াতে তারা একজন অন্যজনকে পড়শী, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিংবা অন্য কিছুর খাতিরে সাহায্য–সহায়তা ও সুপারিশ করত, আজ এসব সুযোগ বিনষ্ট হয়ে গেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমের অন্যত্র যথা (২৬ ঃ ১০১ ও ১০২) সংবাদ দিয়েছেন, فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র দুশমনগণ আখিরাতে দোযখবাসী হবে, তখন তারা আফসোস করে বলবে, "পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই।")

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "উল্লেখিত আয়াতটি সুপারিশ সম্বন্ধে বর্ণনাকালে সাধারণভাবে নেয়া হয়ে থাকে; কিন্তু এটা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ

হচ্ছে, "যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কুফরী করছে, তাদের জন্যেই ঐদিন কোন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশের সুযোগ থাকবে না। কিন্তু যারা ঈমানদার ও আল্লাহ্ওয়ালা, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে একে অন্যের জন্যে সুপারিশ করবে।" তিনি আরো বলেন, "এরূপ বিশুদ্ধ বর্ণনা অন্যত্র সবিস্তারে আমি উত্থাপন করেছি, যার পুনরোক্তির প্রয়োজন অনুভূত নয়। ইমাম কাতাদা (র.)-ও এব্যাপারে অনুরূপ উক্তি পেশ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

৫৭৬১. কাতাদা(র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "অত্র আয়াত ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ·

এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, "দুনিয়াতে কিছু সংখ্যক লোক একে অন্যকে ভালবাসে এবং প্রয়োজনে একে অন্যের সুপারিশ করে; কিন্ত কিয়ামতের দিবসে মুত্তাকীদের ব্যতীত অন্য কারোর প্রেমপ্রীতি থাকবে না।"

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর স্বীয় বক্তব্য وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-এর মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করায় জালিম হিসাবে পরিগণিত হয়েছে অর্থাৎ যা অস্বীকার করার নয় তা তারা অস্বীকার করে, তাদের যা করা উচিত নয় তারা তা করে এবং তাদের যা বলা উচিত নয় তারা তা বলে। এ তাফসীরের অন্যত্র আমি জুলুমের অর্থ সবিস্তারে প্রমাণাদিসহ বর্ণনা করেছি। এখানে পুনরোক্তি নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু অত্র আয়াতে কাফিরদেরকে জালিম বলে আখ্যায়িত করায় জালিম শব্দটি সম্বন্ধে আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যা শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। পুনরায় অত্র আয়াতাংশ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ (অর্থাৎ উক্ত দিবসে কোন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না) শুধুমাত্র কাফিরদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। আর এজন্যই এ বর্ণনার পরপরই বলা হয়েছে- কাফিররাই জালিম। তাই অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ

কাফিরদের ক্ষেত্রেই উক্ত দিবসে আমি কোন প্রকার সাহায্য, বন্ধুত্ব, নিকট-আত্মীয় ও অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কোন প্রকার সুপারিশ ইত্যাদি অবৈধ করে দিয়েছি। পক্ষান্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করার বেলায়ও আমি জালিম বা অন্যায়কারী নই। কেননা, তারা পূর্বে যে সব গর্হিত কাজ করেছিল এ আচরণ হচ্ছে তাদের পূর্বকৃত কর্মের প্রতিফল মাত্র। তারা দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার কুফরী করেছিল। বস্তুত কাফিররা তাদের কৃতকর্মের দ্বারা তাদের প্রতিপালক থেকে শাস্তি পাবার যোগ্য হয়েছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, অত্র আয়াতে কেমন করে শুধুমাত্র কাফিরদের জন্যই শাস্তির বিধান উল্লেখ করা হলো, অথচ আয়াতের শুরুতে ঈমানদার বান্দাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাহলে এ প্রশ্নের জবাব এভাবে দেয়া যায় যে, এর পূর্বের আয়াতটিতে দু'ধরনের লোকদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যথা ঈমানদার ও কাফিরদের কথা। আর এ আয়াতটি হলো ঃ " وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ " অর্থাৎ তাদের কতক বিশ্বাস

করল এবং কতক কুফরী করল। এরপর ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার বিশেষ সুযোগ–সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদেরকে এমন একটি দিবস আসার পূর্বে কাফির দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পুরস্কার লাভ করার জন্যে বলা হয়েছে, যে দিবসের ভয়াবহতার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। পুনরায় এ আয়াতে কাফিরদের প্রকৃতি ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রদর্শিত সরল ও সঠিক পথ থেকে জনগণকে বিরত রাখার জন্যে দু'হস্তে অর্থ ব্যয় করে থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মু'মিনগণ, আমি তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছি, তা থেকে তোমরা আনুগত্য অর্জনের জন্যে ব্যয় কর। কেননা, কাফিররা আমার নাফরমানী করার লক্ষ্যে ব্যয় করে থাকে। আর এব্যয় এমন একটি দিবস আসার পূর্বেই সম্পাদন কর, যেদিনে কোন প্রকার ক্রয়–বিক্রয় ও লেনদেনের ব্যবস্থা থাকবে না। তখন কাফিররা দুনিয়ায় কিরূপ অসার বস্তু খরিদ করার ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেছিল এবং কিরূপ মূল্যবান বস্তু খরিদ করার ব্যাপারে অবহেলা করেছিল, তা পুরোপুরি অনুধাবন করবে। উক্ত দিবসে কাফিরদের জন্য কোন বন্ধুও থাকবে না যে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাদের জন্যে সুপারিশ করার কোন লোকও থাকবে না যার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে এবং এ সুপারিশ তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আরোপিত শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। আর ঐদিন তাদের সাথে উপরোক্ত ব্যবহার করা হবে একমাত্র তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল হিসাবেই। আর তারাই জালিম, আল্লাহ্ তা'আলা জালিম নন এবং তিনি কখনও তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

৫৭৬২. হযরত আতা ইব্ন দীনার (র.) থেকে বর্ণিত, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَالَ: وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ وَلَمْ يَقُلْ وَالظَّالِمُوْنَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে সমস্ত প্রশংসা, যিনি বলেছেন, কাফিররাই জালিম এবং বলেননি যে, জালিমরাই কাফির।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٢٥٥) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

২৫৫. "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদেরে রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না ; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"

'আল্লাহ্' শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ কালিমাটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ এ কালিমায় আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা চিরঞ্জীবী, চিরস্থায়ী। তাছাড়া, তিনি অন্যান্য গুণেরও অধিকারী, যা এ আয়াতে তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ এমন এক সত্তা, শুধু যার জন্যই সৃষ্টির ইবাদত নির্ধারিত। তিনি চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা কারোর ইবাদত করো না। কেননা, তিনি এমন চিরঞ্জীবী চিরস্থায়ী যাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। এ আয়াতে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল (সা.)-এর দেয়া আহকাম ও নির্দশনাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তারা রাসূলগণের আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাদির মধ্যে মতভেদ করেছে। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত করেছেন যে, তিনি রাসূল (সা.)–গণের মধ্যে কাউকে আবার কারোর থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন। বান্দাগণ মতভেদ করার পর একে অন্যের সাথে বিবাদ করেছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ ঈমান নিয়েছে, কেউ আবার কুফরী করেছে। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা, যিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস করার জন্যে আমাদের শক্তি দান করেছেন এবং তাঁকে স্বীকার করার জন্যে তাওফীক প্রদান করেছেন।

এখানে اَلْحَىُّ কথাটির অর্থ যিনি চিরঞ্জীবী, যার অস্তিত্বের শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছু লয়প্রাপ্ত হয়ে যাবে। সৃষ্টি মাত্রেরই জীবন আছে, কিন্তু তাদের জীবনের শুরু ও শেষ নির্ধারিত। সময় অতিক্রান্ত হবার পর তারা বিলীন হয়ে যাবে। প্রতিটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হলে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৭৬৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এখানে اَلْحَىُّ শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন জীবন যার মৃত্যু নেই।

৫৭৬৪. রবী' (র.) থেকে অন্য এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "তাফসীরকারগণ اَلْحَىُّ শব্দটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে জীবিত বলে আখ্যায়িত করেছেন, কেননা, তিনি সকল সৃষ্টিকে পরিবর্তন করেন এবং নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করেন। কাজেই এখানে জীবিত মানে জীবন নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে পরিচালনাকারী, যাকে জীবিত কথাটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, "এখানে জীবিত (اَلْحَىُّ) মানে জীবনের অধিকারী। এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি অক্ষয় গুণ বিশেষ।

কেউ কেউ বলেছেন, اَلْحَىُّ শব্দটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা জন্যে নির্ধারিত নামগুলো থেকে একটি নাম। তিনি এ নামে নিজেকে অভিহিত করেছেন। তাঁর বশ্যতা স্বীকার করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে আমরা এ নামে অভিহিত করে থাকি।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত اَلْقَيُّوْمُ কথাটি فيعول এর পরিমাপে قيام শব্দ থেকে নিঃসৃত। القيوم শব্দটি মূলে ছিল والقيووم এর মধ্যে عين كلمه টি واو হয়েছে এবং তার পূর্বে ياء ساكن এসেছে। واو কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء কে ياء তে ادغام করা হয়েছে। তাই ياء مشدده তে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রতিটি শব্দে যেখানে عين كلمه টি واو হয় এবং তার পূর্বে ياء ساكن হয়, আরবরা তাকে ياء তে পরিবর্তন করে ياء কে ياء তে ادغام করে নেয়। সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী বিরাজমান, আপন সত্তার জন্যে যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন অথচ সর্বসত্তার যিনি ধারক, তাঁকেই القيوم (আল-কাইয়ূম) বলা হয়। যেমন কবি উমাইয়া বলেছেন ঃ

لم تخلق السماء والنجوم والشمسُ معها قمر يقوم

قدّ ره المهيمن القيوم و الجسو والجنة الجحيمُ

الاّ لامر شانه عظيم

অর্থাৎ "আকাশ, তারকারাজি, সূর্য, তার সাথে নির্ভরশীল চাঁদ, বিধাতা ও রক্ষক কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত সেতু, জান্নাত ও দোযখকে একমাত্র স্রষ্টার মহান শানের অভিব্যক্তির জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এ মতের সমর্থনে বক্তব্য ঃ

৫৭৬৫. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, اَلْقَيُّوْمُ -এর দ্বারা এমন এক সত্তাকে বুঝানো হয়, যিনি প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

৫৭৬৬. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, اَلْقَيُّوْمُ -এর অর্থ যিনি প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন, উপজীবিকা দান এবং হিফাযত করেন।

৫৭৬৭. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, "اَلْقَيُّوْمُ" -এর অর্থ এমন সত্তা, যিনি রক্ষণাবেক্ষণকারী।'

৫৭৬৮. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, "اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ" -এর অর্থ, যিনি সার্বক্ষণিক রক্ষণা- বেক্ষণকারী।

আয়াতাংশ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁকে এমন তন্দ্রা স্পর্শ করে না যাতে তিনি তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন কিংবা তাঁকে এমন নিদ্রাও স্পর্শ করে না যাতে তিনি নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি আরো বলেন, "আয়াতাংশে উল্লিখিত سِنَة শব্দটি وَسَن শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ, নিদ্রালুতা। এরূপ অর্থ 'আদী ইব্ন রুকা' -এর কবিতায়ও পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, وسنان اقصده النعاس فرنقت * فى عينه سنة وليس بنائم

অর্থাৎ বর্শার ফলার শপথ! যাকে তন্দ্রায় ঝুঁকিয়ে দিয়েছে কেননা, তখন তার চোখে তন্দ্রা দেখা দিয়ে ছিল অথচ সে এমতাবস্থায় যে নিদ্রিতও নয়।

পুনরায় سنة -এর অর্থ, নিদ্রাবেশ বা নিদ্রার আগমন বার্তা হিসাবে যা মানব চোখে স্থান করে নেয়। এরূপ অর্থ গ্রহণের শুদ্ধতা প্রমাণার্থে এখানে মাইমূন ইব্ন কাইস আশার নিম্নোক্ত বাণীটি উপস্থাপন করা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

تعاطى الضجيعَ اذا اقبلت * بعيدَ النّعاسِ وقبل الوسن

অর্থাৎ যখন প্রেমিকা প্রেমিকের সম্মুখে আগমন করে, তখন প্রেমিকা প্রেমিক শয্যাসঙ্গীকে বিভিন্ন ছলনায় এমন অবস্থায় নিপতিত করে, যা نعاس -এর পরবর্তী এবং وسن -এর পূর্ববর্তী অবস্থা। অন্য কথায়, এদুটো অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থায় নিমগ্ন রাখে।"

অন্য এক কবি বলেছেন ঃ

باكرتها الاعراب فى سنة النو * م فتجرى خلال شوك السيال -

অর্থাৎ আরবরা শত্রুদের দ্বারপ্রান্তে প্রত্যুষে পৌঁছলো, যখন আক্রান্তরা ঘুমের তন্দ্রায় নিপতিত ছিল, প্রকৃতই আরবরা যেন বন্যার পানিকে ভেদ করে সম্মুখ দিকে ধাবিত হচ্ছিল। অর্থাৎ তাদের আক্রমণের সময় আক্রান্তরা নিদ্রারসে আপ্লুত ছিল।

৫৭৬৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এ আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلسِّنَةُ -এর অর্থ তন্দ্রা আর উল্লিখিত النوم শব্দের অর্থ নিদ্রা।"

৫৭৭০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ আয়াতাংশে উল্লিখিত سِنَةٌ শব্দটির অর্থ 'তন্দ্রা'।

৫৭৭১. হযরত কাতাদা (র.) ও হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা দু'জনই বলেন, لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ বাক্যাংশে উল্লিখিত سِنَةٌ -এর অর্থ তন্দ্রা।

৫৭৭২. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ বাক্যাংশে উল্লিখিত سِنَةٌ -এর অর্থ اَلْوِسْنَةُ বলেছেন। যার অর্থ নিদ্রা থেকে হালকা, আর النوم -এর অর্থ ভারী ঘুম।

৫৭৭৩. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, اَلسِّنَةُ অর্থ তন্দ্রা, আর اَلنَّوْمُ অর্থ নিদ্রা।

৫৭৭৪. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ তালিব (র.) সূত্রেও হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৭৭৫. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ আয়াতাংশে উল্লিখিত سِنَةٌ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, "তা ঘুমের প্রথম অবস্থা, যার চিহ্ন প্রথমত মানুষের মুখমন্ডলে প্রকাশ পায়, এরপরই মানুষ তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়ে।

৫৭৭৬. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ আয়াতাংশে উল্লিখিত سِنَةٌ শব্দটি সম্বন্ধে বলেন, "এটা وَسِنَانٌ থেকে নিঃসৃত। এটার অর্থ ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা।

৫৭৭৭. হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন রফী' (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ আয়াতাংশে উল্লিখিত শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, -এর অর্থ اَلنُّعَاسُ অর্থাৎ তন্দ্রা।

৫৭৭৮. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَاتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ আয়াতাংশে উল্লিখিত سِنَةٌ শব্দটি وَسِنَانٌ শব্দ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ঘুমের প্রাথমিক অবস্থা, এতে মানুষ চেতনাশূন্য হয়ে যায়। এমতাবস্থায় মানুষ এমনকি তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "মহান আল্লাহ্ তা'আলা لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ আয়াতাংশে ইরশাদ করছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ও আপদ-বিপদ স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে তন্দ্রা ও নিদ্রা হচ্ছে শরীরের দু'টি অবস্থার নাম, যা ধীশক্তিসম্পন্ন লোকের ধীশক্তি ঢেকে ফেলে, অবচেতন করে দেয় এবং এ দুটো অবস্থা যাকে স্পর্শ করে, তার মধ্যে পূর্বাবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ও পরিবর্তিত অবস্থার জন্ম দেয়। এখন আমাদের ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটির অর্থ হলো ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক সত্তার নাম , যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাস্য নেই। যিনি জীবিত, তাঁর কোন মৃত্যু নেই, তিনি ব্যতীত অন্য সকলের যিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন, রিযিক দান করেন এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়া ও যাবতীয় কাজ কারবার সম্পাদন করার সকলকে তাওফীক দান করেন। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। কোন বস্তু অন্যের মধ্যে যেরূপ পরিবর্তন সাধন করে, তাঁর মধ্যে এরূপ পরিবর্তন সাধন করে না। রাত-দিন, যুগ-যুগান্তর ও বিভিন্ন পরিবর্তনশীল অবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য বস্তুতে যেরূপ অহরহ পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে, তাঁর মধ্যে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। বরং তিনি পরিবর্তনহীন একই অবস্থায় সর্বকালে বিরাজমান এবং তিনি সমগ্র মাখলুকের রক্ষণাবেক্ষণে সদা সর্বদা সচেতন ও সুযত্নবান। কাজেই যদি তাঁকে নিদ্রা স্পর্শ করত, তাহলে তিনি প্রভাবিত হয়ে পড়তেন, কেননা নিদ্রা নিদ্রায় মগ্ন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যদি তিনি তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়তেন, তাহলে আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান, তা ধ্বংস হয়ে যেত। কেননা, এসবের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁরই তদবীর ও কুদরতের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়ে থাকে। অথচ নিদ্রা রক্ষণাবেক্ষণকারীকে তার রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম পরিচালনা থেকে বিরত রাখে। অনুরূপভাবে তন্দ্রাও তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে তাঁর কর্তব্য কাজ যথাযথ আঞ্জাম দিতে দেয় না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৭৭৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি কালামে এলাহীর অত্র আয়াতাংশ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "একদা হযরত মূসা (আ.) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি নিদ্রা যান? তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রতি ওহী নাযিল করেন এবং আদেশ দিলেন তারা যেন মূসা (আ.)-কে তিন রাত ঘুম থেকে বিরত রাখেন অর্থাৎ নিদ্রা যাবার সুযোগ না দেন। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করলেন। এরপর তাঁরা তাঁকে দু'টি বোতল প্রদান করেন ও এগুলোকে মযবুত করে ধরে রাখার জন্যে তাঁকে নির্দেশ দেন। এরপর তাঁরা হযরত মূসা (আ.) থেকে বিদায় নেন এবং সাবধান করে যান যেন তিনি এদুটো বোতলকে ভেঙ্গে না ফেলেন। মূসা (আ.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন অথচ বোতল দু'টি তাঁর হাতে। এরপর তিনি জেগে উঠেন, আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং জেগে উঠেন। এরূপে কয়েকবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হবার পরও জেগে উঠার পর একবার এমনভাবে তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন যে, অচৈতন্যের ফলে একটি বোতল অপরটির সাথে সংঘর্ষ লেগে যাবার কারণে দু'টি বোতলই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। বর্ণনা সূত্রের একজন বর্ণনাকারী মা'মার (র.) বলেন, "এটা একটা উপমা, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্যে তা বর্ণনা করেছেন।" তিনি আরো বলেন, "বোতলের ন্যায় আসমান ও যমীন আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের হাতে অবস্থান করে রয়েছে।

৫৭৮০. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মিম্বরের উপর দন্ডায়মান অবস্থায় মূসা (আ.) সম্পর্কে ঘটনা বর্ণনাকালে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদিন মূসা (আ.)-এর অন্তরে একটি প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ্ তা'আলা কি নিদ্রা যান? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন এবং এ ফেরেশতা মূসা (আ.)–কে তিন রাত ঘুম থেকে বিরত রাখেন। এরপর তাঁকে দু'টি বোতল প্রদান করলেন, প্রতি হাতে একটি করে বোতল স্থাপন করলেন এবং এদু'টি বোতলের হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণ করারও তাঁকে আদেশ দিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "মূসা (আ.) তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং দুটো হাতে সংঘর্ষ লাগার উপক্রম হয়ে পড়ল। তখন তিনি জেগে উঠলেন এবং একটি বোতলকে অন্যটি থেকে পৃথক করলেন। এরপর আবার নিদ্রায় এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়লেন যে দুটো হাতই একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষে পতিত হলো। তাতে দুটো বোতলই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।" আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, "এঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা একটি উপমা পেশ করলেন। এতে প্রমাণ হয় যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা ঘুমাতেন, তাহলে আসমান, যমীন এমনকি সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ আর হতো না।

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ (অর্থ ঃ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?) -এর ব্যাখ্যা ইমাম-আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতের এঅংশে مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুর মালিকই তিনি, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। অন্য সকল ভ্রান্ত মাবূদ ও উপাস্য সৃষ্টিকর্তা নয়। তিনি আরো বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ কালিমা দ্বারা এ অর্থ নেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর ইবাদত করা উচিত বা সঙ্গত নয়। কেননা, মালিকানা সম্পত্তি মালিকের হাতেরই পুতুল বিশেষ। মালিকের অনুমতি ব্যতীত মামলূক ব্যক্তি বিশেষ অন্যের সেবা করতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তার সমস্তই আমার মালিকানা সম্পদ ও আমার সৃষ্টি। সুতরাং আমার মাখলুকের কারোরই অন্যের উপাসনা করার অধিকার নেই। আমিই তার মালিক। কেননা, কোন গোলামের জন্যে সঙ্গত নয় যে, সে তার মালিক ব্যতীত অন্যের ইবাদত বা সেবা করবে। সুতরাং সে তার মালিক ও প্রভু ব্যতীত অন্যের আনুগত্য স্বীকার করে না। তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ –এর মাধ্যমে প্রশ্ন রাখছেন যে, কে তার মালিকের কাছে অন্য সকলের জন্য সুপারিশ করতে পারে যদি মালিক তাদেরকে শাস্তি দিতে চায়। হ্যাঁ, যদি সে তাদেরকে দায়মুক্ত করেন এবং তাকে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেন, তাহলে সে তা পারে। আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত ঘোষণা দেন, কারণ মুশরিকরা বলেছিল, আমরা এসব মূর্তির অর্চনা শুধুমাত্র এজন্য সম্পাদন করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে সক্রিয় সাহায্য–সহায়তা করবে। প্রতি উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেন, আকাশ ও পৃথিবীতে এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু বর্তমান রয়েছে সব কিছুরই মালিকানা স্বত্ব আমারই। কাজেই আমার ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা সঙ্গত নয়। সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজা করো না, যাদেরকে তোমরা ধারণা করছ যে, তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য লাভে সাহায্য-সহায়তা করবে। তারা আমার কাছে তোমাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা তোমাদের কোন অভাবও মিটাতে পারবে না। তবে যদি কাউকে অনুমতি

দেয়া হয়, তাহলে সে সুপারিশ করতে পারবে। তাঁরা হচ্ছেন আমার পয়গাম্বর, ওলী ও বাধ্যগত বান্দাগণ।

পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ অর্থাৎ তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু রয়েছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তাঁরা আয়ত্ত করতে পারে না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে বা হবে সবকিছুর সম্বন্ধেই তিনি অবগত, তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই।" তিনি আরো বলেন, আমার এ বক্তব্য তাফসীরকারগণ সমর্থন করেছেন।

৫৭৮১. আল-হাকাম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ আয়াতাংশে উল্লিখিত مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ দ্বারা দুনিয়া এবং وَمَا خَلْفَهُمْ দ্বারা আখিরাত বুঝানো হয়েছে।

৫৭৮২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ আয়াতাংশে উল্লিখিত مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ দ্বারা দুনিয়া সম্পর্কিত যা কিছু অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং وَمَا خَلْفَهُمْ দ্বারা যা কিছু আখিরাত সম্পর্কিত অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তা বুঝানো হয়েছে।"

৫৭৮৩. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ আয়াতাংশে উল্লিখিত مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ দ্বারা তাদের উপস্থিতিতে দুনিয়া সম্পর্কিত যা কিছু অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং وَمَا خَلْفَهُمْ দ্বারা তাদের পরে দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কিত যা কিছু ঘটবে তাই বুঝানো হয়েছে।

৫৭৮৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ আয়াতাংশে উল্লিখিত مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ দ্বারা দুনিয়া এবং وَخَلْفَهُمْ দ্বারা আখিরাত বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ আয়াতাংশের মাধ্যমে ইরশাদ করেন যে, তিনি এমন জ্ঞানী যাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই এবং প্রত্যেক জিনিসকেই স্বীয় জ্ঞান দ্বারা আয়ত্তাধীন রেখেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ গুণের অধিকারী নন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তিনি যা ইচ্ছা করেন তার চেয়ে অধিক কোন কিছুর জ্ঞান রাখে না। অন্য কথায়, তিনি যে জ্ঞান সম্বন্ধে কাউকে অবগত করাবার ইচ্ছা করেন, সে তা-ই জানে, এর চেয়ে অধিক জানে না। এটা এজন্য যে, যদি কোন ব্যক্তি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত না হয়, তাহলে তার সত্তার ইবাদত করা সঙ্গত হতে পারে না। আর যারা কিছুই বুঝে না। যেমন মূর্তি ও দেবদেবী, তাদের ইবাদত কিভাবে সঙ্গত হতে পারে? এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন, "তোমরা এমন সত্তার জন্যে ইবাদতকে নির্ধারণ করো, যিনি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তাঁর কাছে ছোট-বড় কোন কিছুই গোপন থাকে না।"

তিনি আরো বলেন, আমি যে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম তা খ্যাতনামা বিশ্লেষণকারিগণ সমর্থন করেন।

৫৭৮৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় ইল্ম থেকে যা কিছু অবগত করাবার ইচ্ছা করেন শুধু তা-ই

তারা জানতে পারে –এর বেশী তারা আয়ত্ত করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ "তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার كُرْسِيّ বা আসন আকাশ ও পৃথিবীময় সুবিস্তৃত। তবে বিশ্লেষণকারীরা অত্র আয়াতে উল্লিখিত كُرْسِيّ (কুরসীর) অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান। যাঁরা এরূপ অভিমত প্রকাশ ও সমর্থন করেছেন, তারা দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেছেন।

৫৭৮৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আয়াতাংশে উল্লিখিত 'কুরসী' শব্দটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মহাজ্ঞান।

৫৭৮৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় اَلَا تَرٰى وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا কথাটি বর্ধিত করা হয়েছে। অর্থাৎ তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।

আবার কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত كُرْسِيّ (কুরসী) দ্বারা দু'পাও রাখার স্থানকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ অভিমত পোষণকারিগণের দলীলাদি নিম্নরূপ ঃ

৫৭৮৯. আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, " كُرْسِيّ (কুরসী) শব্দের অর্থ দু'পাও রাখার স্থান, যার মধ্যে উটের পালানের ন্যায় শব্দ শুনা যায়।"

৫৭৯০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "আকাশ ও পৃথিবী কুরসীর মধ্যে অবস্থিত। আর কুরসী রয়েছে আরশের সামনে। এটাই আল্লাহ্ তা'আলার দু' কুদরতী পা রাখার স্থান।

৫৭৯১. দাহ্হাক (র.) বর্ণনা করেন। তিনি وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "কুরসী আরশের নিম্নে অবস্থিত থাকে। আর কুরসীর উপরেই সাধারণত বাদশাহগণ পা রেখে থাকেন।"

৫৭৯২. মুসলিম আল-বাতীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরসী শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, "এটাই দু'পা রাখার স্থান।"

৫৭৯৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, যখন وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ নাযিল হয়, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) আমরা জানি, كرسى (কুরসী) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, তবে আরশ শব্দটির ব্যাখ্যা কি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা যুমারের নিম্ন বর্ণিত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

(অর্থাৎ ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা তাঁর সাথে যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। ৩৯ ঃ ৬৭)

৫৭৯৪. ইবন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার কুরসীর মধ্যে সাতটি আকাশমন্ডলীর অবস্থানের উপমা হলো যেন একটি ঢালের মধ্যে সাতটি দিরহাম বা মুদ্রাকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।' তিনি আবূ যার (রা.)-এর উধৃতিও এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যার (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, 'আরশের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার কুরসীর অবস্থানের উপমা হলো যেন একটি লোহার বেড় ভূ–পৃষ্ঠে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে।' আবার অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, কুরসী মানে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার আরশ মুবারক। তাদের দলীল রূপে উপস্থাপিত নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

৫৭৯৫. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইমাম আল-হাসান বসরী (র.) বলতেন, কুরসীই আল্লাহ্ তা'আলার আরশ।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "উপরোক্ত প্রত্যেকটি মতামত উপস্থাপিত হবার পিছনে এক একটি কারণ এবং মাযহাব রয়েছে। তবে আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রহণীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে যা নিম্নবর্ণিত হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ঃ

৫৭৯৬. আবদুল্লাহ্ ইবন খালীফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) ! আপনি মেহেরবানী করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করেন ও বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার كُرْسِيٌّ (কুরসী) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এটাতে আসন গ্রহণ করবেন চার অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানও এতে আর অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর তিনি অঙ্গুলিগুলোর দিকে ইংগিত করেন এবং এগুলোকে একত্র করেন ও বলেন, "একটি নতুন পালান তার আরোহীর ভারে যেমন শব্দ করতে থাকে, তদ্রূপ কুরসীটিও মহান আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতী ভারে শব্দ করতে থাকবে।"

৫৭৯৭. হযরত উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৭৯৮. আবদুল্লাহ্ ইবন খালীফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদিন একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন .... । এরপর উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে যে অভিমতটির সমর্থন কুরআনুল কারীমের প্রকাশ্য আয়াতে পাওয়া যায় তা হচ্ছে, আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.)–এর অভিমত অর্থাৎ কুরসী মানে আল্লাহ্ তা'আলার ইলম বা জ্ঞান। জা'ফর ইবন আবিল মুগীরা (র.) সাঈদ ইবন জুবাইর (র.) থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, "কুরসীর মানে হচ্ছে তাঁর জ্ঞান।"

পরবর্তী আয়াতাংশ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا প্রমাণ করে যে, আয়াতে উল্লিখিত كرسى (কুরসী) শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতের পরবর্তী অংশে যে সংবাদ দিয়েছেন তার অর্থ হচ্ছে, তিনি যা জানেন তার রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। বরং তাঁর জ্ঞান আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। তিনি ফেরেশতাদের কার্যাদি সম্বন্ধেও সংবাদ দিচ্ছেন যে, ফেরেশতাগণ তাদের দু'আয় বলে থাকে رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا (অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।) অনুরূপভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । তদ্রূপ এটিও একটি ঘোষণা যে, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ বস্তুত كرسى-এর মূল হচ্ছে জ্ঞান। আর এজন্যই ছোট ছোট কিতাবকে كُرَّاسَةٌ বলা হয়। কেননা, এর মধ্যে জ্ঞান লিপিবদ্ধ থাকে । পুনরায় একারণেই কোন এক শিকারীর প্রশংসার ক্ষেত্রে আর-রাজিয(আবৃত্তিকারী) বলেছেন, حتى اذا ما احتازها تكرسا অর্থাৎ "এমনকি যখন সে এটাকে জেনে-শুনে সংগ্রহ করল।" এখানে تكرسا শব্দটি كرس থেকে নিঃসৃত। এর অর্থ হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান। এজন্যই উলামায়ে কিরামকে كراسى বলা হয়। কেননা, তারা নির্ভরযোগ্য। যেমন তাদেরকে বলা হয়ে থাকে اوتاد الارض অর্থাৎ পৃথিবীর পেরেক বিশেষ। কেননা, উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে পৃথিবী পুনঃ পুনঃ সংস্কার হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন এক কবি বলেছেন ঃ

يحف بهم بيض الوجوه وعصبة * كراسى بالاحداث حين تنوب

অর্থাৎ আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি যদি কোন বালা-মুসিবত বা আপদ-বিপদ আপতিত হয়, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য মহান ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষিত যুবকবৃন্দ আমার গোত্রীয় সদস্যদের চারদিকে ভিড় জমায়।

উপরোক্ত কবিতার পংক্তিতে উল্লিখিত كراسى দ্বারা দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ কবলিত লোকদের সাহায্যার্থে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত শিক্ষিত যুব সমাজকে বুঝানো হয়েছে বলে বিশ্লেষকগণ প্রত্যয় প্রকাশ করেছেন।

আরবগণ প্রতিটি বস্তুর সার ও মূলকে كرس বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। যেমন- একজন খান্দানী ভদ্র লোককে বলা হয় فلان كريم الكرس অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি মূলত (বংশগত) ভদ্রলোক।

আল-'আজ্জাজ নামক একজন খ্যাতনামা কবি বলেছেন ঃ-

قد علم القدسُ مولى القدس * ان ابا العباس اولى نفس -

بمعدن الملك الكريم الكرس * او فى معدن العز الكريم الكرس -

অর্থাৎ পবিত্র কুদ্স (বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর অধিপতি পবিত্র সত্তা জেনে গেছেন যে, আমার পূজনীয় আবুল আব্বাস নিশ্চয় সম্মানিত ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশগত কুলীন ও ভদ্র বাদশাহর পরিবারভুক্ত অথবা সম্ভ্রান্ত বংশগত ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তির পরিবারভুক্ত। পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ অর্থ ঃ এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না, এদের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর কোন কষ্ট হয় না এবং তাঁর কাছে তা বোঝা হিসাবেও গণ্য হয় না। এজন্যই বলা হয়ে থাকে قد ادنى هذا الدمر فهو يؤدنى অর্থাৎ ঃ এ কাজটি আমাকে ক্লান্ত করেছে সুতরাং এটা আমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। ماضى -এর صيغه -এ বলা হয়ে থাকে اودا এবং مصدر এ বলা হয় ايادا এরূপও বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ তোমাকে যা ক্লান্ত করেছে এটা আমার জন্যও ক্লান্তিজনক ما ادك فهولى ائد । অর্থাৎ তোমার কাছে যেটা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, আমার কাছেও এটা ভারী বলেই অনুভূত।

তিনি আরো বলেন, "আমার উপরোক্ত অভিমতকে খ্যাতনামা তাফসীরকারগণ সমর্থন করেছেন এবং প্রমাণ ও দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন ঃ

৫৭৯৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে لا يثقل عليه অর্থাৎ তাঁর জন্য কোন অসুবিধার কারণ হয়না।

৫৮০০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত আয়াতাংশ – وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا -এর অর্থ হচ্ছে لا يثقل عليه حفظهما অর্থাৎ এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য ক্লান্তিজনক নয়।

৫৮০১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا-এর অর্থ হচ্ছে لا يثقل عليه لا يجهده حفظهما অর্থাৎ তাঁর কোন অসুবিধা হয় না, এদের রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর জন্য কোন কষ্ট হয় না।"

৫৮০২. হাসান (র.) ও কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তারা দু'জনই বলেন, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে "لا يثقل عليه شى" অর্থাৎ "তাঁর জন্য কোন কিছুই কঠিন হয় না।"

৫৮০৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে لا يثقل عليه حفظهما অর্থাৎ "এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্যে কঠিন হয় না।"

৫৮০৪. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا আয়াতাংশের অর্থ "لا يثقل عليه حفظهما" অর্থাৎ "এসবের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্যে কোন কঠিন কাজই নয়।"

৫৮০৫. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে অনুরূপ আরো বর্ণনা রয়েছে।

৫৮০৬. হযরত আবূ আবদুর রহমান মাদীনী (র.) থেকে বর্ণিত। وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا আয়াতাংশের অর্থ لا يكثر عليه অর্থাৎ তা তাঁর প্রতি অতিরিক্ত মনে হয় না।

৫৮০৭. হযরত মুজাহিদ (র.) وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا এ আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ لا يكرثه অর্থাৎ "এদের রক্ষণাবেক্ষ ্ তাঁকে ক্লান্ত করে না।"

৫৮০৮. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, "وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا" এর অর্থ "তাঁর কাছে তা কোন কঠিন কাজ নয়।"

৫৮০৯. হযরত রবী‘ (র.) থেকে বর্ণিত, "لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا" আয়াতাংশের অর্থ لايثقل عليه حفظهما অর্থাৎ "এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কঠিন নয়।"

৫৮১০. হযরত ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, وَلَا يَئُودُهُ حفظهما আয়াতাংশের অর্থ "এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর কাছে কোন প্রকার কঠিন ব্যাপার নয়।"

ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, حِفْظُهُمَا শব্দের মধ্যে অবস্থিত ضمير-هما দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর কথা বুঝানো হয়েছে। কাজেই পুরা আয়াতে কারীমাহর ব্যাখ্যা হলো, "তাঁর জ্ঞান ও শক্তি আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত এবং আকাশ ও পৃথিবীর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর কাছে কোন কঠিন কাজ নয়।" তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الْعَلِيُّ আয়াতাংশের অর্থ "এবং আল্লাহ্ তা‘আলা মহান।" আর العلى শব্দটি فعيل এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর থেকে ماضى- এর صيغه হবে علا এবং مضارع-এর صيغه হবে يعلو আর مصدر হবে علوا এবং اسم فاعل- এর صيغه হবে عال অর্থাৎ "তিনি সুমহান।" আবার العلى-এর অর্থ মর্যাদাবান এবং স্বীয় কুদরতের দ্বারা নিজের সৃষ্টির উর্ধ্বে মহীয়ান ও গরীয়ান। الْعَظِيمُ শব্দটির তাফসীরও হচ্ছে অনুরূপ। সুতরাং الْعَظِيمُ -এর অর্থ "মহান বা বড়, তিনি ব্যতীত কোন বস্তুই তাঁর চেয়ে বড় নয়। অন্য কথায়, তাঁর চেয়ে অধিক বড় অন্য কেউ নেই। এরূপ তাফসীরের সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৫৮১১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْعَظِيْمُ শব্দটির অর্থ- এমন সুমহান সত্তা, যিনি আপন মহত্ত্বে শ্রেষ্ঠ।

وَهُوَ الْعَلِيُّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, وَهُوَ الْعَلِيُّ বা "তিনি মহান" অর্থ এমন সত্তা, যিনি তুলনাহীন ভাবে মহান। তাঁরা এর অর্থ 'শীর্ষ স্থানীয় হওয়া'কে অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা কোন জায়গায় থাকবেন না এরূপ হতে পারে না। সুতরাং কোন স্থান বিশেষে তাঁর মহান হবার অর্থ নেয়া যাবে না। কেননা, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, তিনি একস্থানে আছেন এবং অন্যস্থানে নেই।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, وَهُوَ الْعَلِيُّ -এর অর্থ, তিনি তাঁর সৃষ্টির নির্ধারিত স্থানসমূহ থেকে অধিকতর উচ্চস্থানে অবস্থান করছেন। কেননা, তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির বহু উর্ধ্বে রয়েছেন এবং সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নিম্নে অবস্থান করছে। যেমন, তিনি স্বয়ং তাঁর প্রশংসায় ঘোষণা করেছেন, তিনি তাঁর আরশেরও উর্ধ্বে।" একারণেই তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে অধিক উর্ধ্বে অবস্থান করছেন বলে এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তাফসীরকারগণ অনুরূপ ভাবে اَلْعَظِيْمُ-এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, এস্থলে اَلْعَظِيْمُ -এর অর্থ مُعظم অর্থাৎ মহান। যেমন فعيل অর্থ مفعل। যেমন পুরাতন মদকে বলা হয়ে থাকে خمر عتيق অর্থাৎ خمر معتقة-এখানে عتيق শব্দটি فعيل বা معتقة শব্দটি مفعل শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। জনৈক কবি বলেছেন ঃ

وَكَانَ الْخَمْرُ الْعَتِيقُ مِنَ الْاِ * سَفَنْطِ مَمْزُوجَةٌ بِمَاءٍ زُلَالِ

অর্থাৎ স্পঞ্জের তৈরী পুরাতন মদটি স্বচ্ছ পানি মিশ্রিত ছিল। এখানে الْعَتِيقُ শব্দটি معتقة শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্যই তারা বলেন, "এ আয়াতাংশে উল্লিখিত الْعَظِيمُ শব্দটি ব্যবহারের দিক দিয়ে معظم অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, যাঁকে তাঁর সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, তাঁর সম্মান করে, তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই তাকওয়া অবলম্বন করে।"

তাঁরা আরো বলেন, কোন ব্যক্তি যদি বলেন, هُوَعَظِيمٌ তাহলে عَظِيمٌ শব্দটির দুটো অর্থের মধ্যে যে কোন একটি অর্থে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। প্রথম অর্থটির দিকে আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বর্ণনায় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন। দ্বিতীয় অর্থ, তিনি সকল বিষয়ে মহান। এখন যদি দ্বিতীয় অর্থটি অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে প্রথম অর্থটি সঙ্গত বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

আবার কেউ কেউ বলেন, " الْعَظِيمُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। অন্য কথায়, শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর একটি গুণ বিশেষ।" তবে তাঁরা আবার এটাও বলেন, "তাঁর এ শ্রেষ্ঠত্বকে আমরা একটি বিশেষ অবস্থার সাথে জড়িত করি না, বরং আমরা তাঁর জন্যে এগুণটি রয়েছে বলে প্রমাণ করি। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া যায়, ঐরূপ শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের সাদৃশ্যকে আমরা অস্বীকার করি। অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বে কোন সাদৃশ্য আছে বলে আমরা স্বীকার করি না। আর এ দু'প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্থ এক হতে পারে না। অন্যথায় সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে সাদৃশ্য স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অথচ এদুয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান ও বিরাজমান।"

এসব বিজ্ঞ তাফসীরকার আমার প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে অর্থাৎ اَللّٰهُ مُعَظَّمٌ বা আল্লাহ্ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্বে আসীন অস্বীকার করেন। তাদের যুক্তি হলো, যদি عَظِيمٌ এর অর্থ مُعَظَّمٌ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্বে আসীন বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে ধরে নেয়া হবে যে, সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার মধ্যে এ শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। আর সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবার পরও এ শ্রেষ্ঠত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। কেননা, তখন তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে শ্রেষ্ঠতর বলে তুলনা করার মত কোন অবকাশ থাকবে না।

আবার কোন কোন তাফসীরকার বলেন, " الْعَظِيمُ একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে এগুণে গুণান্বিত করেছেন।" তাঁরা আরো বলেন, "তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সকলই তাঁর থেকে ক্ষুদ্র। কেননা, তাঁদের এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই কিংবা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব তুলনায় ক্ষুদ্রতর।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٢٥٦) لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৫৬. "দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই ; সত্যপথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।" যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে যা কখনও ভাংগবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।"

এর ব্যাখ্যা ঃ তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত মদীনার আনসারগণের কোন সম্প্রদায় কিংবা তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তি সম্পর্কে এ

আয়াত নাযিল হয়েছে। কারণ ছিল এই যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আনসারগণ তাদের সন্তানদের সত্য ধর্ম হিসাবে ইয়াহূদী অথবা খৃষ্টান হবার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয় কিন্তু যখন সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম ইসলামের শুভাগমন হয়, তখন তারা তাদের সন্তানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে জোরজবরদস্তির আশ্রয় নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে একাজ করতে নিষেধ করেন এবং ঐরূপ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের ইসলাম গ্রহণে কিংবা প্রত্যাখ্যানে পুরোপুরি আযাদী ও স্বাধীনতা প্রদান করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন, তাঁদের বক্তব্য ঃ

ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ ঃ

৫৮১২. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইসলামের পূর্বে আনসারদের স্ত্রীলোকদের কোন কোন সময় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েই মরে যেত। তখন তারা এ বলে মানত করত যে, যদি তাদের সন্তান বেঁচে যায় অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হবার পরপরই মরে না যায়, তাহলে তারা তাদের সন্তানদের ইয়াহূদী বানাবে। মদীনা থেকে যখন বনূ নযীর ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে তাদের কুকর্মের শাস্তি স্বরূপ শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো তখন তাদের মধ্যে ঐ ধরনের ইয়াহূদী আনসার পুত্র অনেক ছিল। তাদের পিতাগণ বলতে লাগলেন, "আমরা আমাদের সন্তানদের এভাবে ছেড়ে দেব না, বরং তাদেরকে মুসলমান হবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –দীন সম্পর্কে কোন জোর–জবরদস্তি করার দরকার নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

৫৮১৩. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আনসারদের কোন কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর পর অথবা কিছু দিন পর মরে যেত। তাই তারা মানত করত যে, যদি তাদের সন্তান বেঁচে যায়, তাহলে তাঁরা তাদেরকে ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত করবে। তারপর যখন বনূ নযীর ইয়াহূদীদেরকে শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো তাদের মধ্যে বিপুল পরিমাণে ঐ ধরনের আনসার–তনয় ইয়াহূদী ছিল। তখন আনসারগণ বলতে লাগলেন, 'আমরা আমাদের সন্তানদের নিয়ে এখন কি করতে পারি? এরপরই এ আয়াতটি নাযিল হয় ঃ لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –দীন সম্পর্কেঃ কোন জোর–জবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, 'যারা মদীনায় থাকতে ইচ্ছা করেছিল, তাদেরকে থাকতে দেয়া হয়েছিল। আর যারা মদীনা ত্যাগ করতে ও ইয়াহূদীদের সাথে চলে যেতে চেয়েছিল, তাদেরকে বিনা বাধায় যেতে দেয়া হয়েছিল।

৫৮১৪. আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আনসারদের কোন কোন স্ত্রীলোকের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মরে যেত। তাই তারা মানত করত যে, যদি তাদের সন্তান বেঁচে থাকে, তাহলে তারা তাদেরকে ইয়াহূদীদের সাথে ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত হতে সক্রিয় ভূমিকা নেবে। এরপর ইসলামের আবির্ভাব হয়, অথচ আনসারদের বহু সংখ্যক সন্তান–সন্ততি ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত রয়ে যায়। তখন তাঁরা বলতে লাগল, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ইয়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত করেছিলাম এবং ঐ ধর্মকে আমাদের ধর্ম থেকে অধিক ভাল মনে করতাম। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইসলাম ধর্ম দান করেছেন, যা সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। তাই আমরা আমাদের সন্তানদের ইসলাম ধর্মে আনয়নের জন্যে

জোরজবরদস্তির আশ্রয় নেব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন - لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ –দীনে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই।"

আমির (রা.) বলেন, যারা ইয়াহুদী এবং যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে এ আয়াতটি ছিল একটি সীমারেখা। তাই যারা ইয়াহুদীদের সাথে মিলিত হয়েছিল, তারা ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছিল, আর যাঁরা মদীনায় থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হাদীস শরীফের শব্দসমূহ দুই জন বর্ণনাকারীর মধ্যে বর্ণনাকারী হুমাইদ (র.)-এর পরিবেশিত।

৫৮১৫. আমির (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও একই রূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি হাদীসের শেষাংশে শুধু এতটুকু পরিবর্তন করেন যে, "সুতরাং তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বনূ নযীরকে শহর বা দেশ ত্যাগ করার আদেশটি ছিল একটি সীমারেখা। যারা মুসলমান না হয়ে ইয়াহুদী রয়ে গেল, তারাই ইয়াহুদীদের সাথে মিলিত হয়ে গেল। আর যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তারা মদীনা রয়ে গেলেন, দেশত্যাগ করলেন না।"

৫৮১৬. আমির (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে এতটুকু তিনি পরিবর্তন করে বর্ণনা করেন যে, বনূ নযীরকে খাইবারের দিকে দেশত্যাগ করার আদেশটি ছিল সীমারেখা। যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা মদীনায় থেকে গেলেন, আর যারা ইসলাম গ্রহণ করাকে পসন্দ করল না। তারা খাইবারে গিয়ে অন্য ইয়াহুদীদের সাথে মিলিত হয়ে গেল।

৫৮১৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, "আনসারদের বনূ সালিম ইব্ন আউফ নামী গোত্রের এক ব্যক্তি সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। উক্ত ব্যক্তিটিকে আল-হাসীন (রা.) বলা হতো। তাঁর ছিল দু'জন খৃষ্টান ছেলে। আর তিনি নিজে ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। একদিন তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)! আমার দু'টি খৃষ্টান ছেলে ইসলাম ধর্ম কবুল করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। আমি কি তাদের উপর জোরজবরদস্তি চালাতে পারি? তখন তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ –অর্থ ঃ দীনে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নেই।"

৫৮১৮. আবূ বাশার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরআনুল কারীমের পবিত্র আয়াত لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –এর শানে নুযূল সম্বন্ধে সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি প্রতি উত্তরে বলেন, এ আয়াতটি আনসারদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে। আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করলাম, এটা কি তাদের জন্যেই বিশেষভাবে নাযিল হয়েছিল? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, তাদের জন্যেই বিশেষভাবে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তিনি আরো বলেন, ইসলামের পূর্বে অন্ধকার যুগে স্ত্রীলোকেরা মানত করত যে, যদি তাদের সন্তান হয়, তাহলে তারা তাদের সন্তানদেরকে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করবে। এরূপ মানতের দ্বারা সন্তানের তারা দীর্ঘায়ু কামনা করত। আবূ বাশার (র.) বলেন, এরপর ইসলামের আবির্ভাব হলো এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে ছিল অনেক আনসারী ইয়াহুদী। এরপর যখন বনূ নযীরকে দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হলো তখন আসনারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের ছেলে ও ভাইয়েরা ইয়াহুদীদের মধ্যে রয়েছে। আবূ বাশার (র.) বলেন, প্রতি উত্তরে

রাসূলুল্লাহ্(সা.) মৌনতা অবলম্বন করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে ঘোষণা করেন যে, দীনের মধ্যে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ মিথ্যা পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

আবূ বাশার (র.) আরো বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের সঙ্গীদেরকে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে– যদি তারা তোমাদেরকে গ্রহণ করে, তাহলে তারা তোমাদের মধ্যেই থাকতে পারবে। আর যদি তারা ইয়াহুদীদের ধর্ম গ্রহণ করে, তাহলে তারা ইয়াহুদীদের মধ্যেই গণ্য হবে।

আবূ বাশার (র.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আনসারী ইয়াহুদীদেরকে বনু নযীর ইয়াহুদীদের সাথে দেশ ত্যাগ করতে নির্দেশ প্রদান করলেন।

৫৮১৯. মূসা ইব্ন হারূন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইমাম আস–সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি অত্র আয়াত لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ...... لَا انْفِصَامَ لَهَا –এর শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, এ আয়াতটি একজন আনসারী ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়, যার নাম ছিল আবুল হাসীন (রা.)। তাঁর ছিল দু'পুত্র। কয়েকজন তেলের ব্যবসায়ী সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমন করে। যখন তারা তেল বিক্রি শেষ করল এবং প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করল। তখন আবুল হাসীন (রা.)–এর দু'পুত্র তাদের সাথে দেখা করল। তারা তাদেরকে খৃস্টান হতে আহবান জানাল। তারা খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে খৃস্টানদের সাথে সিরিয়ায় চলে গেল। তাদের পিতা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.), আমার দু'পুত্র খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে দেশ থেকে বের হয়ে চলে গেছে। আমি কি তাদেরকে খোঁজ করে আনব? তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং ঘোষিত হয়, দীনে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই। সত্য পথ মিথ্যা পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তখনও কিতাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যেন আমাদের থেকে দূরে রাখেন, তারা দু'জনই সর্বপ্রথম কাফির হলো। তাদের খোঁজে আবুল হাসীন (রা.)–কে বের হতে অনুমতি না দেয়ায় আবুল হাসীন (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন। তখন সূরা নিসার ৬৫নং আয়াত নাযিল হয় ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

অর্থাৎ কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ ! তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ–বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে; এরপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তাদের তা মেনে না নেয়।

তারপর لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ আয়াতটির আদেশ সূরা বারাআতে উল্লিখিত কিতাবীদের বিরুদ্ধে লড়াই সংক্রান্ত আদিষ্ট আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়।

৫৮২০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী আউস গোত্রের কিছু সংখ্যক লোককে দুধ পান করায়।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ইয়াহুদীদেরকে মদীনা শহর ত্যাগের নির্দেশ দেন, তখন আউস গোত্রে যারা দুধ পান করেছিল, তারা বলল, "আমরা ইয়াহুদীদের সাথে চলে যাব এবং তাদের ধর্মে দীক্ষিত হবো। তখন তাদের পরিবারবর্গ তাদেরকে বারণ করে এবং তাদের ইসলাম ধর্মে অটল থাকার জন্যে জোরজবরদস্তি করতে থাকে। তখন তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ নাযিল হয়। অর্থাৎ দীনে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই।"

৫৮২১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ এ আয়াতাংশের শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক বনু কুরায়যা গোত্রের কিছু সংখ্যক লোককে তাদের সন্তানদের দুধ পান করাবার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন। বনু কুরায়যাকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেয়ার পর আনসারগণ বনু কুরায়যার কিছু সংখ্যক লোককে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জোর জবরদস্তি করতে মনস্থ করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ অর্থ ঃ দীনে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই, সত্য পথ মিথ্যা পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫৮২২. হযরত ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেছেন, বনু কুরায়যা ছিল ইয়াহুদী গোত্র। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আনসারদের কিছু সংখ্যক লোককে দুধ পান করিয়েছিল। এরপর আল-কাসিম (র.) মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র.)-এর হাদীসের ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, তাঁর কাছে আবদুল করীম (র.) বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, আউস সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক বনু নযীরের ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।"

৫৮২৩. হযরত শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত। আনসারগণের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক মানত করেছিল যে, যদি তার ছেলে জীবিত থাকে, অর্থাৎ বাল্যকালে মারা না যায়, তাহলে সে তাকে ইয়াহুদীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে। যখন ইসলামের আবির্ভাব হয়, তখন আনসারগণ হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের সন্তান যারা ইয়াহুদীদের ঘরে লালিত-পালিত হয়েছে এবং এখনও তাদের মধ্যে রয়েছে, তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্যে কি আমরা জোরজবরদস্তির আশ্রয় নিতে পারবো? আমরাই তাদেরকে কোন এক সময় ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছিলাম। আর তখন আমাদের ধারণা মতে ইয়াহুদী ধর্মই ছিল উত্তম ধর্ম। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলাম দান করেছেন। আমরা কি এখন তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জোরজবরদস্তি করতে পারবো? আল্লাহ্ তা'আলা তখন এ আয়াত নাযিল করেন, "দীনে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই, সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।

৫৮২৪. হযরত শা'বী (র.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য তিনি আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেন, তা হলো, বনু নযীরকে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ ছিল, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং যারা ইয়াহুদীদের সাথে চলে যাবে, তাদের মধ্যে তা ছিল পার্থক্যকারী বিষয়। বস্তুত যারা বনু নযীরের সাথে বের হয়ে চলে যায়, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায় এবং যারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫৮২৫. হযরত ইব্‌ন যায়িদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ اِلى .... بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى এ আয়াতের হুকুম বা কার্যকারিতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।"

৫৮২৬. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আনসারগণের কিছু সংখ্যক লোক বনূ নযীরের কিছু সংখ্যক লোককে দুধ পান করাবার কাজে নিযুক্ত করে। তারপর যখন বনূ নযীরকে দেশত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন আনসারী সন্তানদের পরিবারবর্গ তাদেরকে নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবার জন্যে ইচ্ছা করেন, (এমনকি তাদেরকে এব্যাপারে জোরজবরদস্তিও করেন)। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীর সম্বন্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের অভিমত পেশ করার লক্ষ্যে বলেন যে, এর অর্থ– যদি কিতাবিগণ যথারীতি জিযিয়া কর আদায় করে, তাদের প্রতি ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জোরজবরদস্তি করা যাবে না এবং তাদেরকে তাদের ধর্মে থাকার সুযোগ দিতে হবে। তাঁরা আরো বলেন যে, এ আয়াত নির্দিষ্ট কাফিরদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আয়াতের কোন অংশই বা কোন অংশেরই হুকুম বা কার্যকারিতা রহিত হয়নি। যাঁরা উপরোক্ত অভিমত পোষণ করেন, তাঁরা তাদের দলীল হিসাবে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেনঃ

৫৮২৭. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আরবের বিশিষ্ট কবিলাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জোরজবরদস্তি করা হয়েছিল। কেননা, তাঁরা ছিল নিরক্ষর জাতি, তাদের জন্যে কোন গ্রন্থ ছিল না, তারা গ্রন্থ কি তা চিনত না, তাই তাদের থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হয়নি। আর কিতাবীরা যদি জিযিয়া বা খারাজ আদায় করে, তাহলে তাদেরকে ইসলাম কবুল করার জন্যে জোরজবরদস্তি করা চলবে না। তাদের ধর্ম–কর্ম পালনে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করা চলবে না, বরং তাদের ধর্মের অনুশাসনগুলো পালনের ব্যাপারে উদ্ভূত যাবতীয় প্রতিরোধসমূহ থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখতে হবে।

৫৮২৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ আয়াতাংশের তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, "আরবের বিশিষ্ট কবিলার উপর ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জোরজবরদস্তি চালানো হয়েছিল। তাদের সাথে যুদ্ধ অথবা তাদের কাছ থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছ কবুল করা হয়নি। কিন্তু কিতাবীদের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ যুদ্ধ ঘোষিত হয়নি।

৫৮২৯. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতাংশের তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, আরব বদ্বীপের মূর্তি উপাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আদিষ্ট হন। তাদের থেকে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই) অর্থাৎ ঈমান কিংবা লড়াই ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হয়নি। এরপর তাদের ব্যতীত অন্য যারা ছিল, তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। তারপর নাযিল হয় لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ –অর্থাৎ দীনে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

৫৮৩০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, আরবদের কোন উল্লেখযোগ্য ধর্ম ছিল না। এজন্য তাদের উপর ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে অস্ত্রের মাধ্যমে জোরজবরদস্তি চালানো হয়েছে। কিন্তু ইয়াহুদ, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জবরদস্তি করা হয়নি। এশর্তে তারা রীতিমত জিযিয়া আদায় করে থাকে।

৫৮৩১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার এক খৃস্টান গোলাম জারীরকে বললেন, "হে জারীর! তুমি মুসলমান হয়ে যাও।" এরপর তিনি তাকে ঐসব কথা বললেন যা অন্য খৃস্টানদের বলা হয়ে থাকে।

৫৮৩২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি (لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ) আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এ বিধান তখনকার, যখন মক্কা ও মদীনার জনসাধারণ ইসলামে প্রবেশ করেন এবং কিতাবীরা জিযিয়া আদায় করে। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্বন্ধে আবার কেউ কেউ বলেন যে, এ আয়াতের হুকুম বা কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে। যুদ্ধ ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হবার পূর্বে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৫৮৩৩. ইয়াকূব ইব্ন আবদুর রহমান যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা.)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্(সা.) মক্কা মুকাররমায় দশ বছর অতিবাহিত করেন। এর মধ্যে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জোরজবরদস্তি করেননি। এরপর মুশরিকরা যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতে রাযী হলো না, তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনুমতি দেন।

উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে উত্তম অভিমত হলো, যেখানে বলা হয়েছে যে, এ আয়াত বিশিষ্ট কিছু লোকের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে আর বলা হয়েছে যে, আহলি কিতাব, অগ্নিপূজক এবং সত্য ধর্মের পরিবর্তে অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি নিজের ধর্ম বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করে, তাদের থেকে জিযিয়া আদায় করা হয়, তাদের ক্ষেত্রে কোন জোরজবরদস্তি করা হবে না। আর এ অভিমতে আরো বলা হয় যে, এ আয়াতের কোন প্রকার হুকুম বা কার্যকারিতা রহিত হয়নি।

উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র এ অভিমতকে উত্তম বলার যাবতীয় কারণসমূহ আমি আমার লিখিত কিতাব كتاب للطيف من البيان عن اصول الاحكام -এ বর্ণনা করেছি। তার মধ্যে উল্লিখিত কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হলো, নাসিখ বা হুকুম কিংবা কার্যকারিতা রহিতকারী। রহিতকারী আয়াত তখনই রহিতকারী আয়াত হিসাবে স্বীকৃত হবে, যখন তা রহিত আয়াতের হুকুম বা কার্যকারিতাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে সক্ষম হবে। কাজেই, এ দুটোর অর্থাৎ নাসিখ ও মানসূখের হুকুম একত্র হতে পারে না। কিন্তু কোন আয়াত বা নাসিখের প্রকাশ্য অর্থ যদি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য যদি হুকুম বা আদেশ কিংবা নিষেধ প্রযোজ্য হয়, আর বাতিন বা অপ্রকাশ্য অর্থ যদি خاص বা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে এখানে নাসিখ-মানসূখ গ্রহণীয় হতে পারে না। এ নিয়মটির বৈধতার কথা বিবেচনা করে আমরা বলতে পারি যে, নিম্নোক্ত মন্তব্যটি অসম্ভব নয়, যেমন

কেউ বলে থাকে, "যার থেকে তুমি জিযিয়া কর আদায় করছ, তাকে তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্যে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি করতে পার না।" আর আমরা যে অর্থ নিয়েছি তার বিপরীত অর্থ আয়াতেও নেবার কোন প্রকার দলীল, সংকেত বা আলামতও নেই। আবার মুসলমানগণ সকলেই হযরত নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদলকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য জোরজবরদস্তি করেছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। আর তারা যদি ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে তাদেরকে হযরত রাসূলুল্লাহ্(সা.) হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন। যেমন আরবের মুশরিকদের মধ্যে যারা মূর্তিপূজক ছিল অথবা যারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করার পর তা থেকে বিচ্যুত হয়ে কুফরীর দিকে ধাবিত হয়েছিল কিংবা তাদের ন্যায় অন্যান্য লোক। পুনরায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অন্য একদলকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি, বরং তাদের থেকে জিযিয়া কবুল করেছেন। আর তারাও তাদের বাতিল ধর্মের উপর স্থির থাকার অংগীকারপত্র দিয়েছিল, এদের উদাহরণ কিতাবিগণ। অর্থাৎ যারা তাওরাত ও ইনজীলের অধিকারী বলে দাবী করে। এরূপে যারা তাদের অনুরূপ ধর্ম অবলম্বন করে রয়েছিল। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দীনে জোরজবরদস্তি নেই বলা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিদের জন্য, যারা ইসলামের অনুশাসনগুলোর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং জিযিয়া আদায় করার জন্যে ইসলামী সরকারের অনুমতি নিয়েছে। তবে যারা মনে করছে যে, এ আয়াতের হুকুম বা কার্যকারিতা জিহাদের অনুমতির দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, তাদের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি কি ঐসব বর্ণনা বিশ্বাস করেন যা ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং অন্যদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতটি আনসারদের এক গোত্র সম্বন্ধে নাযিল হয়, যারা তাদের সন্তানদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে জবরদস্তি করার মনস্থ করেছিলেন। প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, এরূপ অভিমত শুদ্ধ হবার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। তবে কোন সময় কুরআনে করীমের আয়াত বিশেষ কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়, এরপর একই রকম প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তার হুকুম প্রযোজ্য হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা.) ও অন্য তাফসীরকারগণের বর্ণনানুযায়ী এ আয়াতটি যাদের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছিল তারা হচ্ছে এমন একটি সম্প্রদায় যারা ইসলাম প্রসারের পূর্বে তাওরাত অনুসারীদের ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জোরজবরদস্তি করে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। আর এ নিষেধাজ্ঞার জন্যে একটি আয়াত নাযিল করেছেন যার হুকুম একই রকম বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে প্রযোজ্য। তারা বিভিন্ন ধর্ম থেকে যে কোন একটির অনুসারী হতে পারে যে কারণে তাদের থেকে জিযিয়া কর আদায় করা ন্যায়সঙ্গত, যেহেতু তারা যেকোন ধর্মের অনুসারী বলে স্বীকারও করেছে। সুতরাং لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ -এর অর্থ হবে দীনে-ইসলাম কবুল করার লক্ষ্যে কাউকে জোরজবরদস্তি করা যাবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, اَلدِّيْنُ শব্দটিতে আলিফ লাম (ال) ব্যবহার করা হয়েছে। তাই তার অর্থ হবে নির্দিষ্ট একটি ধর্ম যা আল্লাহ্ তা'আলা لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতাংশের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন। আর তা হচ্ছে ইসলাম। আবার কোন কোন সময় اَلدِّيْنُ -এর পরে একটি

উহ্য ০ ধরে নেয়া হয়। তখন বাক্যের রূপ হবে নিম্নরূপঃ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا اِكْرَاهَ فِى دِيْنِهٖ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ অর্থাৎ আর তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠ, তাঁর দীনে কোন জোরজবরদস্তি নেই। সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এ অভিমতটি আমার নিকট অধিক গ্রহণীয়। তবে قَدْتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ বাক্যাংশে উল্লিখিত اَلرُّشْدُ শব্দটি মাসদার (مصدر) যেমন কেউ বলে থাকে ঃ رَشَدْتُ فَانَا اَرْشُدُ رَشْدًا وَرُشْدًا وَرَشَادًا আর এ ধরনের বাক্য তখনই বলা হয়ে থাকে, যখন সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়।" পুনরায় তিনি বলেন, اَلْغَيِّ শব্দটিও মাসদার (مصدر) ; যেমন বলা হয়ে থাকে ঃ قَدْ غَوٰى فُلَانٌ فَهُوَ يَغْوِىْ غَيًّا وَغَوَايَةً –আবার কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, غَوِىَ فُلَانٌ يَغْوٰى অর্থাৎ قد শব্দটি ব্যতীতও পড়ার নিয়ম আছে। পাবিত্র কুরআনের সূরা আন–নাজমের ২য় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা غوى শব্দটি ব্যবহার করে ইরশাদ করেন, مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى –অর্থাৎ তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয় এবং বিপথগামীও নয়। অত্র আয়াতে উল্লিখিত غوى শব্দটির " غ " অক্ষরকে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে, আর এটাই দুটো পঠনরীতির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ। যখন কেউ সত্য ও সঠিক পথকে অতিক্রম করে যায়, তখন বলা হয়ে থাকে ضَلَّ অর্থাৎ বিপথগামী হয়েছে। সুতরাং এখন পূর্ণ বাক্যটির অর্থ দাঁড়াবে এরূপ ঃ যখন সত্য অসত্য থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সত্য ও সঠিক পথের অনুসন্ধানকারীর জন্যে তার উদ্দেশ্যের প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে, তখন সে অসত্য ও বিপথে গমনকে চিনতে পেরেছে। সুতরাং এখন দুই কিতাব যথা– তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারী এবং যে তোমাদের দীনের অনুশাসনগুলিকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তোমাদেরকে জিযিয়া দিয়ে যাচ্ছে, তাদের উপর জোরজবরদস্তি করো না। কেননা, সঠিক পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে সঠিক পথ অতিক্রম করে যায়, তার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ছেড়ে দিতে হবে এবং তিনিই তাকে পরকালে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র মালিক।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(অর্থ ঃ যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করবে, সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে, যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।) –এর তাফসীর প্রসঙ্গে **ইমাম** আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, বিশ্লেষণকারিগণ তাগূতের অর্থ সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, তাগূত অর্থ শয়তান।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৮৩৪. হযরত উমর (রা.) বলেছেন, তাগূত শব্দের অর্থ 'শয়তান'।

৫৮৩৫. উমর (রা.) থেকে অন্য এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৮৩৬. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি طَاغُوْتَ (তাগূত) শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, "এখানে طَاغُوْتَ –এর অর্থ শয়তান।"

৫৮৩৭. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত তাগূত শব্দের অর্থ 'শয়তান'।

৫৮৩৮. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাগূত শব্দের অর্থ 'শয়তান'।

৫৮৩৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাগূত طَاغُوْتَ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শয়তান'।

৫৮৪০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ আয়াতাংশে উল্লিখিত তাগূত শব্দের অর্থ 'শয়তান'।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তাগূতের অর্থ 'জাদুকর'।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৮৪১. আবুল 'আলীয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত তাগূত শব্দের অর্থ হচ্ছে জাদুকর।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা মতভেদ করেছেন। তা পরবর্তীতে আমি উল্লেখ করব।

৫৮৪২. মুহাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাগূত শব্দের অর্থ হচ্ছে জাদুকর। কেউ কেউ বলেছেন, তাগূতের অর্থ গণক।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৮৪৩. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়াতে উল্লিখিত তাগূত শব্দের অর্থ 'গণক'।

৫৮৪৪. রফী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাগূত শব্দের অর্থ হচ্ছে গণক।

৫৮৪৫. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ আয়াতাংশে উল্লিখিত তাগূত শব্দের অর্থ গণকবৃন্দ। তাদের কাছে শয়তানরা আগমন করে তাদের অন্তরে ও মুখে ঢেলে দিয়ে যায়।

আবুয যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁকে তাগূত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আর এসব তাগূতের কাছে কাফিররা তাদের বিবাদ মীমাংসার জন্যে গমন করত। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, জুহায়না সম্প্রদায়ের একটি তাগূত, আসলাম সম্প্রদায়ের অন্য একটি তাগূত। এরূপে প্রতিটি সম্প্রদায়ে একটি একটি করে তাগূত ছিল। তারা ছিল গণক, তাদের কাছে শয়তান (শতাধিক মিথ্যা মিশ্রিত দৈব বাণী নিয়ে) আসত।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "তাগূতের অর্থ সম্পর্কে উল্লিখিত অভিমতগুলোর মধ্যে আমার নিকট অধিকতর সঠিক হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া নির্ধারিত সীমা লংঘনকারী মাত্রই তাগূত বলে চিহ্নিত। তারপর তার অধীনস্থ ব্যক্তি চাপের মুখে তার উপাসনা করে অথবা তাকে তোষামোদ করার জন্য বা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার উপাসনা করে থাকে। এ

উপাস্যটি মানুষ কিংবা শয়তান বা মূর্তি অথবা অন্য যেকোন বস্তুই হতে পারে।" ইমাম তাবারী (র.) আরো বলেন, طَاغُوْتِ শব্দটি আসলে ছিল طَغُوْوت -ماضى ومضارع- এ রূপান্তর করতে গেলে বলা হয় طغا فلان يطغو -এ বাক্যটি ঐ সময় ব্যবহার করা হয়, যখন কেউ তার জন্য নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যায়। অন্য কথায়, সীমালংঘন করে। যেমন جبروت শব্দটি تجبر থেকে এবং خلبوت শব্দটি خلب শব্দ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। جبروت শব্দটির অর্থ ক্ষমতাবান। এধরনের অনেক শব্দ দেখতে পাওয়া যায়, যেগুলো فعلوت -এর وزن -এ আসে। এখানে واو এবং تا কে অতিরিক্ত আনা হয়েছে। طَغُوْوت শব্দ থেকে طاغوت কিরূপে গঠিত হলো এ সম্পর্কে আল্লামা তাবারী বলেন, এ শব্দের لام كلمه অর্থাৎ প্রথম واو কে স্থানান্তর করে عين كلمه -এর স্থলে স্থাপন করা হয়েছে এবং ع عين كلمه অর্থাৎ غين অক্ষরকে لام كلمه -এর স্থানে স্থাপন করা হয়েছে, এরপর واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে? আরব দেশে جذب শব্দকে جبذ -ও পড়া হয়। جابذ -কে- جاذب -ও পড়া হয়। صاعقه শব্দকে صاقعه -ও পড়া হয়। এ ধরনের বহু উদাহরণ আরবী ভাষায় বিদ্যমান। উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে বাক্যের অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত যে কোন উপাস্যের প্রভুত্ব ও উপাসনাকে অস্বীকার করে এবং তাকেও অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে স্বীকার করে যে, তিনিই তার উপাস্য, প্রতিপালক ও মা'বূদ। তাহলে সে এক মযবূত হাতল ধরবে। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে সে যেন অধিকতর মযবূত হাতল ধরল।

৫৮৪৬. আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। "একদিন তিনি তাঁর পড়শী রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে গেলেন এবং তিনি তাকে বাজারের কোন গৃহে পেলেন। রোগী গরগর করছিল, লোকজন বুঝতে পেরেছিল যে, সে কি বলতে চায়। আবূ দারদা তাদেরকে প্রশ্ন করলেন, সে কি কথা বলতে চায়? তারা বলল, সে বলতে চায়, اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالطَّاغُوْتِ অর্থাৎ আমি আল্লাহে বিশ্বাস রাখি এবং তাগূতকে অস্বীকার করি।" আবূ দারদা (রা.) বলেন, "এটা তোমরা কেমন করে জানলে?" তারা বলল, "সে বারবার একথা বলতেছিল যতক্ষণ না তার কথা বন্ধ হয়ে আসছিল। কাজেই আমরা জানতে পেরেছি যে, সে এ কালিমাটি উচ্চারণ করে কথা বলতে চেয়েছিল। আবূ দারদা (রা.) বলেন, "তোমাদের সাথী সফলকাম হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থ- যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে, সে এমন একটি মযবূত হাতল ধরল, যা কখনও ভাঙ্গবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى -এ উল্লিখিত العروة দ্বারা ঈমানকে বুঝানো হয়েছে যে, ঈমানকে মু'মিন বান্দা আঁকড়িয়ে ধরেন। ঈমানকে ধরা ও আঁক্ড়িয়ে থাকাকে এমন একটি বস্তুকে আঁকড়িয়ে ধরার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যার হাতল রয়েছে এবং হাতলকে মযবূত করে ধরা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেকটি হাতলধারী বস্তুকে মযবূত করে ধরার সময় তার হাতলকে মযবূত করে ধরা

হয়। আল্লাহ্ তা'তালা বলেছেন, কাফির তাগূতকে আঁকড়িয়ে ধরে; আর মু'মিন বান্দা আল্লাহ্র প্রতি ঈমানকে আঁকড়িয়ে ধরে। তন্মধ্যে ঈমানই অধিক মযবূত হাতল হিসাবে গণ্য। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত الوثقى শব্দটি فعلى এর ওযনে وثاقة মাযদার থেকে নির্গত। পুংলিঙ্গে বলা হয় اوثق আর স্ত্রীলিঙ্গে বলা হয় وثقى ; যেমন বলা হয় فلان افضل (অর্থাৎ অমুক পুরুষ উত্তম) এবং فلانة فضلى (অর্থাৎ অমুক স্ত্রীলোক উত্তম) উপরোক্ত ব্যাখ্যা বহু খ্যাতনামা তাফসীরকার সমর্থন করেছেন। তাদের উপস্থাপিত দলীলসমূহ থেকে নিম্নে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করা হলো ঃ

৫৮৪৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত العروة الوثقى –এর অর্থ হচ্ছে 'ঈমান'।"

৫৮৪৮. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৫৮৪৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত العروة الوثقى – এর অর্থ হচ্ছে 'ইসলাম'।"

৫৮৫০. আহমদ ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى – এর অর্থ হচ্ছে কালিমা তায়্যিবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ্ নেই ।)

৫৮৫১. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৫৮৫২. দাহ্হাক (র.) فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى আয়াতাংশ সম্বন্ধে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ لَا انْفِصَامَ لَهَا

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত لَا انْفِصَامَ لَهَا বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে لا انكسارلها (অর্থাৎ এর কোন ভাঙ্গন নেই)। لَهَا –এর মধ্যে অবস্থিত " ها " সর্বনামটি দ্বারা اَلْعُرْوَةَ কে বুঝানো হয়েছে । সুতরাং বাক্যটির অর্থ হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে, সে আল্লাহ্র আনুগত্যকে এমনভাবে আঁকড়িয়ে ধরল যে, এ আঁকড়িয়ে ধরা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আখিরাতের ভয়াবহ বিপদের কালে তার অপমানিত হবার কোন আশংকা থাকবে না। তার এ আঁকড়িয়ে ধরাকে কোন বস্তুর হাতল আঁকড়িয়ে ধরার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে হাতল ভেঙ্গে যাবার কোন আশংকা নেই। اِنْفِصَام শব্দটি فصم শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে ভেঙ্গে যায়া। বনী সা'লাবার 'আশা নামক কবি বলেছেন وَمَبْسَمُهَا عَنْ شَتِيتَ النَّبَاتُ غَيْرِ اَكْس وَلَا مُنْفَصِمْ (অর্থাৎ তার প্রিয়তমার হাসির স্থান অর্থাৎ তার দাঁতগুলো কিশলয়ের অগ্রভাগের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তবে তা ভাঙ্গবার কোন অবকাশ নেই)। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ আমার উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৮৫৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "অত্র আয়াতাংশ لَا انْفِصَامَ لَهَا – এর মাধ্যমে সূরা রা'দের ১১ নং আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে।

৫৮৫৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৫৮৫৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, لَا انْفِصَامَ لَهَا –এর অর্থ হচ্ছে لَا انْقِطَاعَ لَهَا (অর্থাৎ তার কোন ভাঙ্গন নেই)।

আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও প্রজ্ঞাময়)–এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও তাগূতকে অস্বীকারকারীর ঈমানকে শুনেন। যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য যথা মূর্তি ইত্যাদি থেকে পবিত্র থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এসব শুনেন। আর আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদকে স্বীকার করা, তাঁর জন্য একাগ্রচিত্তে ইবাদত সম্পাদন করার দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করা, তাগূতসমূহ যথা মূর্তি ও দেব–দেবীর উপাসনা থেকে নিজেকে বহুদূর রাখার দৃঢ় প্রত্যয় এ ছাড়াও সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর মনের মধ্যে সুপ্ত ইচ্ছাসমূহ সম্বন্ধে তিনি জানেন। তাঁর কাছে কোন বস্তু গোপন থাকে না। সবকিছুর প্রতিদান তিনি কিয়ামতের দিন প্রদান করবেন। কোন ব্যক্তি কোন কথাকে মুখ দিয়ে বের করেছেন অথবা বের করেননি, অন্তরে রেখেছেন, মন্দ হোক আর ভাল হোক সবকিছুই তিনি জানেন।

(٢٥٧) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৫৭. "যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাদের সাহায্যকারী, তাদেরকে অভিভাবক হিসাবে সাহায্য–সহায়তা করেন। তাদের নেক কাজের তাওফীক দান করেন। তাদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোকে নিয়ে আসেন। এখানে অন্ধকার দ্বারা কুফরীকে বুঝানো হয়েছে। আর কুফরীর জন্যে অন্ধকারকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, অন্ধকার যেভাবে কোন বস্তুর অনুধাবন ও অনুভূতি থেকে দৃষ্টিকে অন্তরাল করে রাখে, অনুরূপভাবে কুফরীও ঈমানের মহত্ত্ব, তার শুদ্ধতা ও তার উপকরণসমূহের শুদ্ধতাকে অনুধাবন করা থেকে অন্তরচক্ষুকে অন্তরাল করে রাখে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে ঈমানের হাকীকত, রাস্তাসমূহ, উপকরণসমূহ ও দলীলসমূহ সম্বন্ধে অবগত করিয়ে দেন। তিনিই তাদের প্রকৃত পথ–প্রদর্শনকারী এবং তাদেরকে এমন সব দলীল সম্বন্ধে অবগত হবার তাওফীক দেন, যেগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের যাবতীয় সন্দেহ দূর করতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাছে কুফরীর

উপকরণ ও অন্তরচক্ষুর আবরণের যাবতীয় কারণগুলো প্রকাশ করে দেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্বন্ধে ইরশাদ করেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদকে অস্বীকার করে, তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হচ্ছে তাগূত। তাগূতের আভিধানিক অর্থ সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতির মূলবস্তু, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে। শয়তান কল্পিত দেব–দেবী এবং যাবতীয় উপায়–উপকরণ তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত এ তাগূতদের তারা উপাসনা করে থাকে। এ তাগূতসমূহ তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। আলোক দ্বারা এখানে ঈমানকে বুঝানো হয়েছে। আর অন্ধকার দ্বারা কুফরীর অন্ধকার এবং সন্দেহের আবরণকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো অন্তরচক্ষুর অন্তরাল হয় এবং ঈমানে আলো, রাস্তা, দলীলসমূহের অবলোকন ও অনুধাবনে বাধা–বিঘ্নের সৃষ্টি করে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৮৫৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ –এর অর্থ হচ্ছে مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى (অর্থাৎ বিভ্রান্তি থেকে সত্য পথের দিকে)। পুনরায় আয়াতাংশে উল্লিখিত তাগূত অর্থ শয়তান এবং উল্লিখিত مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ –এর অর্থ مِنَ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالَةِ যার অর্থ হচ্ছে সত্যপথ থেকে বিভ্রান্তির দিকে।

৫৮৫৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত الظُّلُمَات -এর অর্থ কুফরী এবং النُّور –এর অর্থ ঈমান। পুনরায় وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمٰتِ –এর অর্থ হচ্ছে يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ (অর্থাৎ তাগূত তাদেরকে ঈমান থেকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়)।

৫৮৫৮. আর-রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত– اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে কুফরী থেকে ঈমানের দিকে নিয়ে যায়। আবার তিনি وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে ঈমান থেকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়।"

৫৮৫৯. মুজাহিদ (র.) কিংবা মিকসাম (র.) থেকে আল্লাহ্র বাণী ঃ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত ঃ এক সম্প্রদায় ঈসা (আ.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং অন্য একদল তাঁকে অস্বীকার করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)–কে প্রেরণ করেন । তাঁকে ঐ সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন, যাঁরা ঈসা (আ.)–কে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাঁকে ঐ সম্প্রদায় অস্বীকার করে, যারা ঈসা (আ.)–কে স্বীকার করেছিল । অর্থাৎ যাঁরা ঈমান নেয়ার জন্যে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি ঈমান আনার জন্যে তাওফীক প্রদান করেন। আর যারা কুফরী করতে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের অভিভাবক হলো শয়তান। তারা ঈসা (আ.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে বটে, কিন্তু মুহাম্মাদ (সা.)–কে অস্বীকার করে। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তাগূত তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে আসে।

৫৮৬০. আবদাতা ইব্‌ন আবী লুবাবা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ .... اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ - -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাঁরা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.)-কে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে যখন মুহাম্মাদ (সা.) আগমন করেন, তখন তাঁরা তাঁকে অবিশ্বাস করেন। তাঁদের সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, 'উপরোক্ত দু'টি হাদীসের মাধ্যমে (যা মুজাহিদ (র.) ও আবদাতা ইব্‌ন আবী লুবাবা থেকে বর্ণিত) প্রমাণিত হয় যে, অত্র আয়াতটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর যদি প্রকৃত ব্যাপারটি এরূপ হয়, তাহলে প্রমাণ হবে যে, অত্র আয়াত এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা খৃষ্টান এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বিশ্বাস করেনি। অথবা এমন মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ঈসা (আ.)–এর নবূয়াতকে স্বীকার করেনি। আর এ সমস্ত সম্প্রদায় সম্পর্কেও নাযিল হয়েছে, যারা ঈসা (আ.)–কে অবিশ্বাস করেছে। ইমাম তাবারী (র.) আরো বলেন, 'যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.)–কে প্রেরণের পূর্বে খৃষ্টানরা কি সত্য পথে ছিল না? পরে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে মিথ্যা জ্ঞান করেছে? উত্তরে বলা যায়, যারা ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.)–এর ধর্ম কবুল করেছিলেন তারা অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।) আবার যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ –এর দ্বারা কি উপরোক্ত দু'টি হাদীসে অর্থাৎ মুজাহিদ ও আবদাতা ইব্‌ন আবী লুবাবা বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যদেরকে বুঝানো যেতে পারে? অর্থাৎ ঈসা (আ.)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী অথবা তারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত নন এবং ঈমানদারও নন। উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ, এরূপ অর্থ নেয়া যেতে পারে। তার বিশদ ব্যাখ্যা হলোঃ যারা কুফরী করেছে তাদের অভিভাবক তাগূত, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বা তাদের উপাস্য কল্পিত দেব–দেবী। এসব তাগূত তাদের মধ্যে এবং তাদের ঈমানের মধ্যে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে, তাতে তারা কুফরী করে। সুতরাং বাহ্যত তাদের পথভ্রষ্টতা তাদের নিজের হলেও তাগূতরাই যেন তাদেরকে ঈমান থেকে বের করে নিয়ে এসেছে। কেননা, তারা তাদেরকে ঈমান থেকে দূরে রেখেছে এবং তাদেরকে সম্ভাব্য কল্যাণ থেকে বিশেষভাবে বঞ্চিত করেছে, যদিও তারা কোন সময় এ কল্যাণ উপভোগ করেনি বা এ কল্যাণে তারা ছিল না। তার উদাহরণ হলো যেমন কোন ব্যক্তি বলে, "আমার পিতা আমাকে তাঁর মীরাছ থেকে বের করে দিয়েছে বা বঞ্চিত করেছে, যখন পিতা তার জীবনে অন্যকে তার সম্পত্তির মালিক করে দিয়েছে, অথচ তার সন্তানকে দিল না। সন্তান পিতার জীবিতকালে সম্পত্তির মালিক না হওয়া সত্ত্বেও ভবিষ্যত মালিকানার দাবী করে বলছে, আমাকে আমার পিতা তাঁর মীরাছ থেকে বের করে দিয়েছে। তার কারণ পিতার এ আদেশ তার মধ্যে এবং সম্পত্তির মালিক হবার মধ্যে একটি অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, আর এটাকেই ব্যাহ্যত বলা হয়ে থাকে মীরাছ থেকে বঞ্চিত করেছে, যদিও সে কোন দিন মীরাছের মালিকই হয়নি।

অন্য একটি উদাহরণ হলো, যেমন কেউ বলে থাকে, অমুক ব্যক্তি আমাকে তার পরিবার থেকে বের করে দিয়েছে। অর্থাৎ তাকে তার পরিবারভুক্ত করেনি। কেননা, সে কোন দিন তার পরিবারভুক্ত ছিল

না। কাজেই বহিষ্কারের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখেই বহিষ্কারাদেশ বলে এ কাজটিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত- يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ -এর অর্থ নেয়া যায় যে, তাগূতরা তাদেরকে (ভবিষ্যত সম্ভাবনাময়) ঈমান থেকে বের করে কুফরীর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তবে মুজাহিদ (র.) ও আবদাতা ইব্‌ন আবূ লুবাবাহ (র.)-এর বর্ণনা, আয়াতের তাফসীরের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, "এ আয়াতে আরো একটি প্রশ্ন করা যায়, সুতরাং যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓءُ هُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ আয়াতাংশে طاغوت -এর خَبَرْ -কে বহুবচন নেয়া হয়েছে, এজন্য يُخْرِجُوْنَهُمْ বলে جمع -এর ضمير নেয়া হয়েছে অথচ طَاغُوْتُ শব্দটি واحد বা একবচন, এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?

উত্তরে বলা যায়, طَاغُوْتُ শব্দটি واحد ও جمع উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, যদিও طَاغُوْتُ শব্দটির جمع কোন কোন সময় طواغيت আসে। সুতরাং একই শব্দে যখন واحد ও جمع উভয়টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরূপ ব্যবহারে অলংকার শাস্ত্রের নীতি বহির্ভূত কোন কাজ করা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বলে থাকি- رجل عدل এবং قوم عدل ; অনুরূপভাবে رجل فطر ও قوم فطر ; এধরনের বহু উহাদরণ পাওয়া যায়, যেগুলো واحد ও جمع উভয় রূপে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন আব্বাস ইব্‌ন মারদাস কবি বলেছেনঃ فَقُلْنَا اَسْلِمُوْا اِنَّا اَخُوْكُمْ ! فَقَدْ بَرِئَتْ مِنَ الْاِحَنِ الصُّدُوْرُ -

অর্থাৎ আমরা তাদেরকে বললাম, মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে আমি তোমাদের ভাই। কেননা, আমি হিংসুটে অন্তরগুলোর প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে আসছি।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -এর ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যারা কুফরী করেছে, তারা দোযখের অধিবাসী, যারা সর্বদাই এ দোযখে থাকবে। অন্যান্য পাপী, কিন্তু ঈমানদার, তারা অনাদি অনন্ত কালের জন্যে কাফিরদের ন্যায় দোযখে অবস্থান করবে না।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ

(٢٥٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ ○

২৫৮. "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্‌রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সে বলল, আমিওতো জীবনদান ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্‌রাহীম বলল,

আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও। তারপর যে কুফরী করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতের মাধমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী (সা.)–কে জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া মুহাম্মাদ (সা.)। আপনি কি অন্তর্দৃষ্টিতে ঐ ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে ইব্রাহীম (আ.)–এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। এ প্রশ্নটি আশ্চর্য বিষয়ের প্রতি ইংগিত দেবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এটি খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, কেমন করে ঐ ব্যক্তিটি তার প্রতিপালক সম্বন্ধে ইব্রাহীম (আ.)–এর সাথে বির্তকে লিপ্ত হয়েছিল, আপনি তার দিকে অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। এজন্যেই اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ আয়াতাংশের মধ্যে اِلَى অব্যয়টি ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আরবরা যখন কোন ব্যক্তির আশ্চর্যজনক জঘন্য ক্রিয়াকলাপের প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, তখন তারা اِلَى অব্যয়টি ব্যবহার করে বলে থাকে– مَاتَرَى اِلَى هٰذَا –তুমি কি এর দিকে লক্ষ্য করেছ?

কথিত আছে, যে ব্যক্তি ইব্রাহীম (আ.)–এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেল, সে ছিল একজন শক্তিধর। তার বাসস্থান ছিল বাবেল শহরে এবং তার নাম ছিল নমরূদ ইব্ন কিন্‌আন ইব্ন কূশ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্ (আ.)। কেউ কেউ বলেন, "তার নাম ছিল নমরূদ ইব্ন ফালিখ ইব্ন 'আবির ইব্ন শালিখ ইব্ন আরফাখশায ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্ (আ.)।

যাঁরা এ মত পোষণ করনেঃ

৫৮৬১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, "অত্র আয়াতাংশ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ- –এ উল্লিখিত ব্যক্তিটি হচ্ছেন নমরূদ ইবন কিন্‌আন।

৫৮৬২–৬৩–৬৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বিভিন্ন সনদে অপর তিনটি সূত্রে অনুরূপ তিনটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৫৮৬৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতাম যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিটি হচ্ছে নমরূদ। সে ছিল প্রথম রাজা যে পৃথিবীতে অহংকারের আশ্রয় নিয়েছিল। সে ছিল বাবেল শহরে অবস্থিত প্রথম আকাশচুম্বী অট্টালিকার নির্মাতা।"

৫৮৬৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিটির নাম হচ্ছে নমরূদ, যে অহংকারের আশ্রয় নিয়েছিল এবং স্বীয় প্রতিপালক সম্বন্ধে ইব্রাহীম (আ.)–এর স্বাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল।"

৫৮৬৭. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ- আয়াতাংশের প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তিটি ইবরাহীম (আ.) –এর সাথে তাঁর প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সে ছিল একজন বাদশাহ। তার নাম

ছিল নামরূদ এবং সে ছিল বিশ্বের প্রথম শক্তিশালী রাজা। আর সে ছিল বাবেল শহরে উঁচু অট্টালিকার নির্মাতা।

৫৮৬৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত সে লোকটি ছিল নমরূদ ইব্ন কিনান।"

৫৮৬৯. ইব্ন যায়িদ (রা.) বর্ণিত, তিনি বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিটির নাম ছিল নামরূদ ইব্ন কিন্‌আন।"

৫৮৭০. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

৫৮৭১. যায়িদ ইব্ন আসলাম (র.) থেকেও অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

৫৮৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ঐ ব্যক্তিটির নাম ছিল নমরূদ"। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তিটি ছিল নমরূদ আর কথিত আছে যে, পৃথিবীতে নমরূদই প্রথম বাদশাহ ছিল।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ

اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থ ঃ যখন ইব্‌রাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন'। সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' ইব্‌রাহীম বলল, 'আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করো। তারপর যে কুফরী করেছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (২ঃ২৫৮)

অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। যখন ইব্‌রাহীম (আ.) তাকে বললেন, 'তিনিই আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। অর্থাৎ তিনিই আমার প্রতিপালক, যাঁর হাতে রয়েছে হায়াত এবং মওত। তিনি যাকে চান, তাকে জীবন দান করেন এবং যাকে চান, জীবনদানের পর মৃত্যু দেন।' সে তখন বলল, 'আমিও এরূপ করে থাকি, জীবন দান করে থাকি ও মৃত্যু ঘটাই। যাকে আমি হত্যা করার ইচ্ছা করেছি, তাকে হত্যা না করে জীবিত থাকতে দেই, এ হলো, আমার পক্ষ থেকে তার জন্যে জীবন দান করা। আর তাকেই আরবরা জীবন দান করা বলে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূরা মায়িদার ৩২নং আয়াতে বলেন, - وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا অর্থাৎ 'কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।' সে আরো বলল, 'অন্যদিকে আমি আরেক জনকে হত্যা করি, তাই এটা আমার পক্ষ থেকে তার মৃত্যু ঘটান হয়ে থাকে'। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন,

'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, আর তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে পশ্চিম দিক্ থেকে সূর্যকে উদয় কর। কেননা, তুমি তোমার দাবী অনুসারে মাবূদ বা প্রতিপালক।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তারপর যে কুফরী করেছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল অর্থাৎ তার যুক্তি ও দলীল বাতিল বলে গণ্য হলো। بُهِتَ শব্দটি ماضی مجهول -এর صيغه তাই ماضیمعروف -এ তার صيغه হবে بَهَتَ এবং مضارعمعروف -এ তার صيغه হবে يَبْهَتُ আর مصدر হবে بهتا ; কোন কোন আরবী ভাষাবিদ থেকে বর্ণিত, "তারা হতবুদ্ধি" অর্থে بهت শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যখন কেউ কারো উপর তার কথাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দেবে, তখন বলা হবে بهت الرجل بهتا وبهتانا وبهاتة -কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ থেকে এইরূপ পাঠ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যেমন فبهت الذى كفر "তারপর যে কুফরী করল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।" অর্থাৎ যে কুফরী করেছে, তাকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) হতবুদ্ধি করেছিলেন। উপরোক্ত তাফসীর বহু তাফসীরকারের কাছে গ্রহণীয় এবং তারা নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

৫৮৭৩. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيِ وَاُمِيْتُ -এর তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নমরূদ দু'জন লোককে ডেকে পাঠাল। তারা উপস্থিত হলে একজনকে সে হত্যা করল এবং অন্যজনকে ছেড়ে দিল। তারপর বলতে লাগল, 'আমি তাকে জীবন দান করলাম, অনুরূপভাবে আমি যাকে চাই তাকে জীবন দান করে থাকি এবং যাকে চাই তাকে হত্যা করে থাকি। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, তুমি পশ্চিম দিক থেকে তা উদয় করো। তারপর যে কুফরী করল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। মহান আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৫৮৭৪. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি قَالَ اَنَا اُحْيِ وَاُمِيْتُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সে বলল, 'আমি যাকে চাই তাকে হত্যা করি এবং যাকে চাই তাকে জীবিত রাখি। তিনি আরো বলেন, "দিগ্বিজয়ী সম্রাট হয়েছিলেন চার ব্যক্তি। তান্মধ্যে দু'জন মু'মিন ও দু'জন কাফির। দু'জন মু'মিন হলেন, (১) হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ.) এবং (২) যুলকারনাঈন। আর দু'জন কাফির হলো (১) বুখত্ নাসারা ও (২) নামরূদ ইব্‌ন কিন্‌আন। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ সারা পৃথিবীর মালিক হতে পারেনি।

৫৮৭৫. যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত, "পৃথিবীতে প্রথম জালিম রাজা ছিল নমরূদ। জনসাধারণ তার কাছে যেত এবং তার কাছ থেকে তারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করত। একদিন হযরত ইব্‌রাহীম(আ.) খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহকারিগণের সাথে তার কাছে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য আগমন করলেন। যখন লোকজন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে আসত, সে তখন জিজ্ঞেস করত তোমাদের প্রতিপালক কে? তারা বলত, 'আপনি।' তারপর হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন পৌঁছলেন, সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার প্রতিপালক কে? তিনি জবাবে বললেন, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।' নমরূদ বলল, 'আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, তুমি

তা পশ্চিম দিক্ থেকে উদয় কর। তারপর যে কুফরী করেছিল, সে (নমরূদ) হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। হযরত যায়িদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন, সে ইব্রাহীম (আ.)-কে খাদ্য প্রদান ব্যতীত ফেরত দিল। ইব্রাহীম (আ.) খালি হাতে স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গেলেন। তারপর তিনি ধূসর বর্ণের একটি বালির স্তূপের নিকট পৌঁছলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, আমি এ স্তূপ থেকে কিছু বালি বস্তায় করে স্বীয় পরিবারবর্গের নিকট নিয়ে যাব। তাহলে যখন আমি তাদের কাছে পৌঁছব, তখন তারা ভর্তি বস্তা দেখে খুশী হবে এবং মনে করবে আমি খাদ্য নিয়ে তাদের নিকট এসেছি। এ ভেবে তিনি কিছু বালি নিয়ে ঘরে ফিরলেন এবং মালপত্র রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী মালপত্রের কাছে গিয়ে বস্তা খুললেন এবং তাতে উৎকৃষ্ট খাদ্য দেখতে পেলেন। তিনি কিছু খাদ্য নিয়ে তা রান্না করে তার স্বামীর সামনে রাখলেন। সে সময় তাদের ঘরে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ খাদ্য কোথা থেকে এলো? স্ত্রী জবাব দিলেন, আপনি যে খাদ্য এনেছেন, তা থেকে এনেছি। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে রিযিক দান করেছেন। তারপর তিনি মহান আল্লাহ্র শোকর করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই জালিম রাজার নিকট ফেরেশতা পাঠালেন এমর্মে যে, যদি সে আমার প্রতি ঈমান আনে, তবে তার রাজত্ব বহাল থাকবে। নমরূদ ফেরেশতাকে বলল, "আমি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক আছে কি?" ফেরেশতা পুনরায় তার কাছে গমন করে পূর্বের ন্যায় তাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহবান করেন। সে এবারও তা প্রত্যাখ্যান করল। ফেরেশতা তৃতীয়বার এসে একই কথা বলল কিন্তু সে এবারও অস্বীকার করল। এবার ফেরেশতা তাকে বললেন, "তিন দিনের মধ্যে তোমার অধীনস্থ সৈন্য-সামন্তকে কোন এক জায়গায় সমবেত কর। জালিম রাজা তার সমুদয় সেনাবাহিনীকে এক জায়গায় একত্রিত করল। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাকে আদেশ করলেন, ফেরেশতা তখন মশার গৃহের একটি দরজা তাদের প্রতি খুলে দেন। সূর্য উদিত হলো, কিন্তু জনসাধারণ মশার সংখ্যার আধিক্যের জন্যে সূর্যকে দেখতে পেল না। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সৈন্য-সামন্তেরপ্রতি মশক দল পাঠালেন। মশক বাহিনী তাদের রক্ত-মাংস খেয়ে নেয়, শুধুমাত্র তাদের অস্থি অবশিষ্ট থেকে যায়। তবে জালিম রাজাকে মশার দল কোন কিছু করেনি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জালিম রাজার প্রতি শুধুমাত্র একটি মশা পাঠালেন। মশা গিয়ে তার নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করে এবং নাকের ভিতরে তথা মস্তিষ্কে উৎপাত শুরু করে দেয়। এরপর উক্ত জালিম রাজা চারশত বছর জীবিত ছিল, কিন্তু সব সময় সে তার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে থাকত। তার কাছে ঐ ব্যক্তিটি অধিকতর মেহেরবান ও প্রিয় ছিল, যে তার দু'হাত একত্র করে জালিম রাজার মাথায় মারতে পারত সে চারশত বছর রাজত্ব করেছে এবং চারশত বছরই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দিয়েছেন। তারপর তার মৃত্যু হয়। এ ব্যক্তিই আকাশচুম্বী প্রাসাদ তৈরি করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার এ প্রাসাদের মূলোৎপাটন করে দেন। এদিকে ইংগিত করে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ - فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের ইমারতসমূহের মূলোৎপাটন করেছেন। (১৬ ঃ ২৬)

৫৮৭৬. আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاۤجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ - -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিটি হচ্ছে নমরূদ। সে ছিল মুসিল রাজ্যের অধিপতি। জনসাধারণ তার কাছে যাতায়াত করত। তারা যখন তার

কাছে প্রবেশ করত, সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করত, "তোমাদের প্রতিপালক কে?" উত্তরে তারা বলত ঃ "আপনি"। সে তখন তার অনুচরদের বলত, 'তাদেরকে উত্তম খাদ্যদ্রব্য প্রদান কর। এমনকি ইব্‌রাহীম (আ.)–ও তার কাছে দু'বার গমন করেছিলেন। সে ইব্‌রাহীম (আ.)–কে জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রতিপালক কে?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার প্রতিপালক জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।" সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মারতে পারি। যদি আমি চাই তোমাকে হত্যা করতে, তাহলে আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, আর যদি চাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে, তাহলে আমি তোমাকে জীবন দান করতে পারি। তখন ইবরাহীম (আ.) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করো । এরপর যে কুফরী করেছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আর আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (২ ঃ ২৫৮)। তখন নমরূদ তার অনুচরদের বলল, "ইব্‌রাহীমকে আমার কাছ থেকে বের করে দাও, আর তাকে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য দিও না।" তারপর সব লোকই যার যার রেশন নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ইবরাহীম (আ.)–কে দুটো খালি বস্তা নিয়ে নিজ বাড়ী ফিরতে হলো। তিনি যখন তাঁর দু' পুত্র ইসমাঈল (আ.) ও ইসহাক (আ.)–এর পবিত্র ও মাসূম চেহারা স্মরণ করলেন, তখন তাঁকে অধিকতর পীড়া দিতে লাগল। তাই তিনি মনে মনে ভাবলেন, নাকি আমি আমার এ দু'টি বস্তা বাতহা (بطحاء) নামক পাহাড়ের মাটি দিয়ে ভর্তি করে বাড়ী ফিরব এবং নয়নের মণি দুটো সন্তানের কাছে তা নিয়ে যাব। আর যখন রাত ঘনিয়ে আসবে, তখনই তা বাইরে নিয়ে ঢেলে দেব। সত্যি সত্যি তিনি তার দুটো বস্তাই মাটিতে পরিপূর্ণ করলেন এবং এগুলোর মুখ ভাল করে সেলাই করে নিলেন। এরপর তিনি এগুলোকে বাড়ী নিয়ে এলেন। মাটিপূর্ণ দু'টি বস্তা দেখে খাদ্যে পরিপূর্ণ মনে করে দুটো সন্তানই অত্যধিক আনন্দিত হলেন। ইবরাহীম (আ.) নিজ স্ত্রী সারা (আ.)–এর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় ঘন্টা পর সারা (আ.) মনে মনে ভাবতে লাগলেন, 'ইবরাহীম (আ.) পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছেন, কাজেই তাঁকে জাগানো ঠিক হবে না, বরং আমি উঠে যাই এবং তাঁর জন্য খাবার তৈরি করে আনি, এ বলে তিনি একটি বালিশ তাঁর জায়গায় রেখে নিজে ধীরে বের হয়ে আসলেন যেন ইব্‌রাহীম (আ.) জেগে না যান। এরপর তিনি দু'টি বস্তার মধ্যে একটি খুললেন। এতে তিনি পরিষ্কার ও উত্তম গম দেখতে পেলেন। এরূপ পরিষ্কার ও উত্তম গম তিনি ইতিপূর্বে দেখেননি। তিনি বস্তা থেকে কিছু গম বের করলেন, পিষলেন, রুটির খামীর করলেন ও কয়েকটি রুটি তৈরি করলেন। এরপর খাবার নিয়ে ইব্‌রাহীম (আ.) –এর কাছে আসলেন। তখন তিনি জেগে উঠেছেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "এ খাবার কোথা থেকে এলো?" তিনি উত্তরে বললেন, "আপনার আনীত বস্তা থেকে গম নিয়ে এ খাবার তৈরি করেছি, এ ছাড়া আমাদের আর কোন খাবার নেই।" ইব্‌রাহীম (আ.) প্রথম বস্তাটির ন্যায় দ্বিতীয় বস্তাটির প্রতি একবার তাকালেন এবং এটাকেও প্রথমটির ন্যায় খাবারে পরিপূর্ণ দেখতে পান। তখন তিনি বুঝতে পারলেন খাবার কোথা থেকে এলো।

৫৮৭৭. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে নমরূদের প্রশ্নের উত্তরে ইবরাহীম (আ.) বললেন, 'আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান,' তখন নমরূদ বলল, 'আমিও জীবন দান করে থাকি এবং মারতে পারি।' এরপর সে দু'জন কয়েদীকে ডাকল। একজনকে হত্যা না করে জীবন দান করল এবং অন্যজনকে হত্যা করে তার মৃত্যু ঘটাল। তারপর বলতে লাগল, 'দেখ, আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। যাকে আমি চাই জীবন দান করি। ' তখন ইবরাহীম

(আ.) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করো।" তারপর যে কুফরী করেছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে সৎকাজে পরিচালিত করে না।

৫৮৭৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ - اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "যখন ইবরাহীম (আ.) অগ্নিকুন্ড থেকে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে আসলেন, রাজার অনুচররা তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। এর পূর্বে তিনি কখনও রাজ–দরবারে যাননি। রাজার সাথে তাঁর কথা হলো। রাজা তাঁকে বলল, "তোমার প্রতিপালক কে?" উত্তরে তিনি বললেন, "আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।" রাজা নমরূদ বলল, "আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। আমি চারজন লোককে একটি ঘরে বন্দী করে রাখব, তাদেরকে খাবার দেব না। যখন তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মৃত্যুর কাছাকাছি এসে যাবে, তখন আমি দু'জনকে খাবার দিয়ে বাঁচিয়ে তুলব; কিন্তু অন্য দু'জনকে ঐ ভাবেই রাখব যতক্ষণ না তারা ক্ষুধায় মরে যায়।" ইবৃরাহীম (আ.) বুঝতে পারলেন যে, তার রাজশক্তি আছে, সে এরূপ করতে পারবে। তখন তাকে ইবৃরাহীম (আ.) বললেন, "আমার প্রতিপালক পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন, তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে উদয় করো। এরপর যে কুফরী করেছিল হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, 'এ লোকটি পাগল, তাই তাকে এখান থেকে বের করে দাও। তোমরা কি দেখতে পাওনি তার পাগলামির কারণে সে তোমাদের দেব–দেবীর উপর চড়াও হয়েছিল এবং এগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেছিল। আর অগ্নিও তাকে খায়নি।" ইবৃরাহীম (আ.) আশংকা করলেন, নমরূদ হয়ত তাঁকে তার সম্প্রদায়ের কাছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে পারে। আর এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ (অর্থাৎ ঃ আর এটা আমার যুক্তি–প্রমাণ যা ইবরাহীম কে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়।) (৬ ঃ ৮৩) এরপর নমরূদ নিজেকে প্রতিপালক মনে করতে লাগল এবং ইবরাহীম (আ.)–কে বের করে দেয়ার জন্য আদেশ করল।

৫৮৭৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি " قَالَ اَنَا اُحْيِ وَاُمِيْتُ " আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আমি জীবিত থাকতে দেই, তাই হত্যা করি না এবং যাকে মেরে ফেলি তাকে হত্যা করি।' ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, "নমরূদ দু'জনকে উপস্থিত করার আদেশ দিল এবং একজনকে হত্যা করে অপরজনকে ছেড়ে দিল। আর বলতে লাগল, "আমি জীবন দান করি ও মেরে ফেলি। যাকে আমি হত্যা করি তাকে মেরে ফেলি আর যাকে জীবন দান করি, তাকে হত্যা করি না।"

৫৮৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে (আল্লাহ্ তা'আলা অধিকতর প্রজ্ঞাময়) যে, নমরূদ ইবৃরাহীম (আ.)–কে বলল, "তুমি যে প্রভুর ইবাদত কর এবং অন্যকেও তাঁর ইবাদত করার জন্যে বলছ, যার কুদরতের কথা স্মরণ কর এবং যাকে অন্যের চেয়ে অধিক শক্তিধর মনে কর, তিনি কে ? " তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে বললেন, "তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।" নমরূদ বলল, "আমিও জীবন দান করতে পারি এবং মৃত্যু ঘটাতে পারি। হযরত ইবৃরাহীম (আ.) তখন তাকে বললেন, তুমি কিভাবে জীবন

দান করতে পার ও মৃত্যু ঘটাতে পার? সে বলল, আমি দু'জন লোককে ধরিয়ে আনব; তাদেরকে হত্যা করার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে। পুনরায় আমি একজনকে হত্যা করব। আর অন্যজনকে মাফ করে দেবো ও তাকে ছেড়ে দেবো। এতে তো আমি তাকে জীবন দান করলাম।" তারপর ইব্রাহীম (আ.) বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বদিক থেকে সূর্য উদয় করেন। তুমি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয় করো, তাহলে বুঝতে পারবো তুমি যা বলছ তা তুমি সত্যি সত্যিই বলছ।" এরপর নমরূদ হতবুদ্ধি হয়ে গেল ও চুপ করে রইল। কেননা, সে জানে যে, সে এটা করতে পারবে না। সেই অবস্থার কথা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ অর্থাৎ যে কাফির ছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ– এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে এমন যুক্তি দান করেন না, যা দ্বারা তারা বিতর্কে ও ঝগড়ার সময় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গকে পরাজিত করতে পারে। কেননা, জালিম সম্প্রদায়ের দলীল অন্তসারশূন্য।

"এ কিতাবের অন্যত্র আমি জুলুমের ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছি, তার সংক্ষেপ সার হলো এই যে, জুলুমের আভিধানিক অর্থ, - وَضْعُ الشَّيْئِ فِىْ غَيْرِ مَوْضَعِهٖ (অর্থাৎ কোন বস্তুকে তার অনুপযুক্ত স্থানে রাখা)। আর কাফিরের স্বভাব হলো এই যে, যা তার অস্বীকার করা উচিত নয়, তা সে অস্বীকার করে। তাই সে এরূপ অকর্মের দ্বারা নিজের আত্মার উপর জুলুম করে। উপরোক্ত তাফসীরটি ইব্‌ন ইসহাক (র.)ও গ্রহণ করেছেন।

৫৮৮১. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ভ্রান্তপথে থাকার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে গ্রহণযোগ্য যুক্তির মাধ্যমে জয়যুক্ত করেন না।"

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٢٥٩) اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৫৯. "তুমি সেই ব্যক্তিকে কি দেখনি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ এটাকে জীবিত করবেন? তৎপর আল্লাহ্ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে?' সে বলল, 'একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি', তিনি বললেন, 'না না বরং

তুমি একশ' বছর অবস্থান করেছ।' তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, তা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গর্দভটি'র প্রতি লক্ষ্য কর; কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর কিভাবে সেগুলিকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো, তখন সে বলে উঠল, আমি জানি যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান্।"

"অত্র আয়াতাংশ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ এবং পূর্ববর্তী আয়াতাংশ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ -এর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, দুটো আয়াতাংশে দুটো আশ্চর্যজনক ঘটনার দিকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অন্তরদৃষ্টি দেয়ার জন্যে প্রশ্নবোধক বাক্যদ্বয়ের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমটিতে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও নমরূদ মরদূদের ঘটনা এবং দ্বিতীয়টিতে উযায়র (আ.)-এর ঘটনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পুনরায় أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ বাক্যাংশকে أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ - বাক্যাংশে উপর عطف করা হয়েছে। এ দুটো বাক্যাংশকে একটির সাথে অন্যটির عطف করার কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে এই যে, অর্থের দিক দিয়ে একটি বাক্যাংশ অপর বাক্যাংশের সাথে সম্পর্ক রাখে যদিও এগুলো শব্দের দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। দুটো বাক্যাংশের সাদৃশ্যপূর্ণ হবার বিশ্লেষণে বলা যায় যে, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ -এর অর্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ ! তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ, যে ইব্রাহীম (আ.)-সাথে প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? এরপর এটার উপর পরবর্তী আয়াতাংশকে عطف করা হয়েছে। কেননা, আরবদের নীতি হলো অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্যকে পূর্ববর্তী বাক্যাংশের উপর عطف করা। যদিও এগুলো শব্দের দিক্ দিয়ে একটি অপরটির সদৃশ নয়।

বসরার কোন কোন নাহু শাস্ত্রবিদ মনে করেনঃ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ বাক্যাংশে উল্লিখিত ك অক্ষরটি অতিরিক্ত। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে 'তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইব্রাহীম (আ.)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল অথবা যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল। ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, "এ কিতাবের অন্যত্র আমি বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কালামে পাকে এমন কোন শব্দ হতে পারে না, যার অর্থ নেই। এ বর্ণনাটি এখানে পুনরুক্তি করার প্রয়োজন অনুভূত নয়। আবার ব্যাখ্যাকারগণ ব্যক্তিটির নাম নিয়ে মতভেদ করেছেন। ঐ ব্যক্তিটি এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল, যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, "তিনি ছিলেন উযায়র (আ.)"।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৮৮২. নাজীয়া ইব্ন কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا -তে উল্লেখিত ব্যক্তি হচ্ছেন উযায়র (আ.)।

৫৮৮৩. সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَوْكَالَّذِى مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতাংশে উল্লিখিত সম্মানিত ব্যক্তি হলেন উযায়র (আ.)।

৫৮৮৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি ছিলেন উযায়র (আ.)।

৫৮৮৫. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৮৮৬. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে বর্ণনা এসেছে যে, (আল্লাহ্ অধিক প্রজ্ঞাময়) যে ব্যক্তি নগরটিতে উপনীত হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন উযায়র (আ.)।

৫৮৮৭. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অত্র আয়াতাংশ أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا –এ উল্লিখিত ব্যক্তি হচ্ছেন উযায়র (আ.)।

৫৮৮৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অত্র আয়াতাংশ أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ এ– উল্লিখিত ব্যক্তি হচ্ছেন উযায়র (আ.)।

৫৮৮৯. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "অত্র আয়াতাংশ أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا–এ উল্লিখিত ব্যক্তি উযায়র (আ.)।

৫৮৯০. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিটি হচ্ছেন উযায়র (আ.)।

আবার কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ব্যক্তি হচ্ছেন আরমিয়া ইব্ন হালকিয়া (আ.)। মুহাম্মাদ, ইব্ন ইসহাক (র.) মনে করেন আরমিয়া হচ্ছেন খিযির (আ.)।

৫৮৯১. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন। ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) মনে করেন, খিযির (আ.) ছিলেন বনী ইসরাঈলের একজন যোগ্য ব্যক্তি। তাঁর নাম ছিল আরমিয়া ইব্ন হালকিয়া। আর তিনি হারূন ইব্ন ইমরান (আ.)–এর বংশধর ছিলেন।

যাঁরা উপরোক্ত উক্তি সমর্থন করেনঃ

৫৮৯২. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং কিতাবপত্রগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়, তখন আরমিয়া (আ.) তথায় অবস্থিত পাহাড়ে দাঁড়িয়ে অবাক্ হয়ে বলেছিলেনঃ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (অর্থাৎ মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে জীবিত করবেন?)

৫৮৯৩. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ উল্লিখিত ব্যক্তিটি হচ্ছেন আরমিয়া (আ.)।

৫৮৯৪. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৮৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের أَوْكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তি ছিলেন একজন নবী। তাঁর নাম ছিল আরমিয়া (আ.)।

৫৮৯৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওবায়দ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৮৯৭. বকর ইব্ন মুযার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাফসীরকারগণ বলেছেন, (আল্লাহ্ অধিক প্রজ্ঞাময়) "অত্র আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি হচ্ছেন আরমিয়া (আ.)।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর (র.) বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে আমার নিকট এটাই সর্বাধিক সঠিক ব্যাখ্যা।

"আল্লাহ্ তা'আলা নবী (আ.)–এর বিস্মিত হবার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ পাকের একজন নবী (আ.) যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরকে দেখে আর্শ্চযান্বিত হয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাক কিভাবে ধ্বংসের পর এই শহরটিকে নতুন জীবন দান করবেন? একথা জানা সত্ত্বেও যে, প্রথমে আল্লাহ্ পাকই কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীত তা সৃষ্টি করেছেন। তবে কি আল্লাহ্ তা'আলার মহান কুদরতের ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না যে, তিনি একথা বললেন, কিভাবে আল্লাহ্ পাক ধ্বংসের পর শহরটিতে পুনর্জীবন দান করবেন? একথাটির বক্তার নাম সম্বন্ধে আমাদের হাতে কোনরূপ গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য–প্রমাণ নেই। কাজেই এ কথাটির প্রবক্তা উযায়র (আ.) হতে পারেন, অথবা তিনি আরমিয়া (আ.)–ও হতে পারেন। মূল কথা, বক্তার নাম সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। তাই নাম জানার বিশেষ প্রয়োজন এখানে নেই। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো সমস্ত আরব ও কুরায়শদের মধ্য থেকে যারা সৃষ্টি জীবের মৃত্যু ও ধ্বংস হয়ে যাবার পর পুনর্জীবনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও কুদরতের জ্ঞান দান করা এবং এটা প্রমাণ করে দেয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাতেই রয়েছে হায়াত ও মওত। অধিকন্তু বনী ইসরাঈলের যে সব ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবা কিরামের প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস করত, তাদের কাছে প্রমাণ করে দেয়া যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নবুওয়াতের ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই এবং ইয়াহুদীদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে কোন প্রকার ওযর–আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সম্প্রদায় ছিলেন উম্মী। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর কওম সম্বন্ধে ওহীর মাধ্যমে বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করেছিলেন, যা শুধুমাত্র কিতাবীরাই জানেন এবং আরববাসীরা উম্মী ছিলেন বিধায় এসব ওহী সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের যামানার ইয়াহুদীরা উপলব্ধি করতে পারল যে, এ সব সংবাদ জ্ঞানের মাধ্যমে মুসলমানগণ অর্জন করেননি বরং আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া ওহীর মাধ্যমেই তাঁরা অর্জন করেছেন। কাজেই ইয়াহুদীরা অস্বীকার করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পেশ করার মত তাদের কোন ওযর–আপত্তি কাজে আসবে না। অধিকন্তু এখানে আরো একটি উদ্দেশ্য হলো, যিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁর বিস্ময়কে জনসমক্ষে উপস্থাপন করা ও নিজ কুদরতের পরিব্যাপ্তি প্রকাশ করা। তবে তাফসীরকারগণ ঐ নগরটির নাম সম্বন্ধেও মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, "এ নগর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে।" এরূপ মতামত অবলম্বনকারীদের নিম্নে বর্ণিত কতিপয় হাদীস প্রণিধানযোগ্যঃ

৫৮৯৮. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরমিয়া (আ.) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে একটি বড় পাহাড়ের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া অবলোকন করেন, তখন বিস্মিত হয়ে বলে ফেললেন, 'মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে কিরূপ জীবিত করবেন?"

৫৮৯৯. হযরত ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত নগরটির নাম বায়তুল মুকাদ্দাস।

৫৯০০. ইব্‌ন ইসহাক ও ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (র.)–কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

৫৯০১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতে উল্লিখিত নগরটি বায়তুল মুকাদ্দাস । বাবেলের বুখ্‌ত্‌নাসারা বাদশাহ এ নগরটি ধ্বংস করার পর হযরত উযায়র (আ.)–সেখানে গমন করেছিলেন ও এ মন্তব্য করেছিলেন।"

৫৯০২. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ اَوْكَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "তিনি (হযরত উযায়র (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাস নামক শহরে গমন করেছিলেন।"

৫৯০৩. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ اَوْكَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ এ উল্লিখিত قَرْيَةٍ –এর দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। এ নগরটিকে নৃপতি বুখ্‌ত্‌নাসারা ধ্বংস করার পর হযরত উযায়র (আ.) সেখানে গমন করেছিলেন।"

৫৯০৪. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَوْكَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ - আয়াতাংশের পটভূমি সম্বন্ধে বলেন, "বুখ্‌ত্‌নাসারা বাদশাহ আয়াতে উল্লিখিত নগরটি ধ্বংস করার পর হযরত উযায়র (আ.) তথায় গমন করেছিলেন। আর সেই নগরটি হচ্ছে বায়তুল মুকাদ্দাস।

কেউ কেউ বলেন, আয়াতে উল্লিখিত قَرْيَةٍ শব্দটি দ্বারা এমন একটি আবাসভূমিকে বুঝানো হয়েছে, যেখান থেকে তার অধিবাসিগণ মৃত্যুর ভয়ে বের হয়ে পড়েছিল এবং তারা সংখ্যায় ছিল কয়েক হাযার। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে আদেশ করলেন مُوْتُوا (অর্থাৎ তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও)।

এমতের সমর্থনে বক্তব্য ঃ

৫৯০৫. ইব্‌ন যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ –এর তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত নগরটি ছিল এমন একটি নগর, যেখানে তাউন বা গলাফুলা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল।" এরপর ইব্‌ন যায়িদ (রা.) তাদের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর (র.) বলেন, আমি এ আয়াতের তাফসীরে যথাস্থানে তাদের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছি। শেষাংশে এও বর্ণনা করেছি যে, তারা যেখানে স্বীয় জীবন রক্ষার জন্যে গিয়েছিল, সেখানেই তাদের মৃত্যু সংঘটিত হবার জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা আদেশ দিলেন। তাই সেখানেই তারা মৃত্যুবরণ করল। এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। তারপর সেখানে একব্যক্তি গমন করলেন এবং দন্ডায়মান হয়ে নগরটিকে ধ্বংসস্তূপে অবলোকন করলেন ও বিস্ময়ে বলে উঠলেন? "মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্‌ তা'আলা এটিকে জীবিত করবেন? তৎপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে একশত বছর পর্যন্ত মৃতাবস্থায় রাখলেন এবং পরে তাঁকে জীবিত করলেন।"

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে শুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে, নগরটির নাম নির্ধারণের ব্যাপারে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করা যেরূপ আমরা বক্তার নাম নির্ধারণের ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছি। কেননা, এ দুটোর মধ্যে কোন বিশেষ ধরনের কিংবা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। অর্থাৎ উক্ত উক্তির প্রবক্তার নাম নির্ধারণ যেমন আয়াতের উদ্দেশ্য নয়, অনুরূপভাবে নগরের নাম নির্ধারণও আয়াতের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়। সুতরাং অত্র আয়াতাংশ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا – এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, নগরটি তার অধিবাসী ও বাশিন্দাশূন্য ছিল।

خاوية শব্দের ব্যাখ্যা ঃ এ শব্দ থেকে ماضى – এর صيغه তে বলা হয়ে থাকে خَوَتِ الدَّارُ অর্থাৎ ঘরটি খালি হয়েছিল। অনুরূপভাবে مصدر ও مضارع – এ صيغه র বলা হয়ে থাকে خَوَاءً تَخْوِي এবং خَوِيًّا। আবার কোন কোন সময় নগর সম্বন্ধে ماضى এর صيغه বলা হয়ে থাকে خَوِيَتِ الدَّارُ, তবে প্রথমটি (অর্থাৎ خَوَتِ الدَّارُ)–ই অধিকতর শুদ্ধ। যখন কোন স্ত্রীলোকের সন্তান প্রসবের পর রক্তস্রাব হয়, তখন বলা হয়ে থাকে ماضى – তে خوى ও خويت এবং مضارع – এ تخوى। এ শব্দটিকে اسم منقوص বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে শব্দের শেষ অক্ষর ي হয় ও তার পূর্বের অক্ষরে যের হয়। ইমাম তাবারী (র.) আরো বলেন, কোন কোন সময় এরূপও ব্যবহার হয়– যেমন ঃ خَوَتْ وَتَخْوِي الدَّارُ –। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে خَوِيَ الْجَوْفُ يَخْوِي خَوَاءً شَدِيدًا অর্থাৎ পেট একেবারেই খালি হয়ে গিয়েছিল। যদি ঘরের সম্পর্কে যেরূপ ব্যবহার করা হয়েছে, পেটের সম্পর্কেও এরূপ ব্যবহার করা হয় কিংবা পেটের সম্পর্কে যেরূপ ব্যবহার হয়েছে, ঘরের ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যবহার করা হয়, তাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে যে ব্যবহারটি আমি প্রথমে বর্ণনা করেছি, তা অধিক শুদ্ধ ও গ্রহণীয়।

"اَلْعُرُوشُ" শব্দটির অর্থ প্রাসাদ ও ঘরসমূহ। একবচনে عرش – এর جمع قلت হয় اعرش, তাই প্রত্যেকটি প্রাসাদকে বলা হয় عرش, ক্রিয়ার বিভিন্ন আকারে রূপান্তর করার কালে ماضى – তে বলা হয় عَرَشَ فُلَانٌ এবং مضارع معروف – এ বলা হয় يَعْرِشُ আর مضارع مجهول এ– বলা হয় يُعْرَشُ –এরপর باب تفعيل – এ ماضى – তে বলা হয়ে থাকে عَرَّشَ এবং مصدر – এ বলা হয় تَعْرِيشٌ –। অনুরূপ অর্থ বুঝাবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ অর্থাৎ যে সব প্রাসাদ তাঁরা নির্মাণ করেছিল। এর থেকে বলা হয়ে থাকে عريش অর্থাৎ মক্কার প্রাসাদ ও তাঁবুসমূহ।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯০৬. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) অত্র আয়াতে উল্লিখিত "خاوية" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেছেন, এর অর্থ 'ধ্বংসপ্রাপ্ত'। তিনি আরো বলেছেন, আমাদেরকে এও জানানো হয়েছে যে, একদিন হযরত উযায়র (আ.) নিজ ঘর থেকে বের হলেন ও বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন এবং দেখলেন যে, নৃপতি বুখ্‌তনাসারা এ ঘরকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, আমি তোমার পবিত্রতা, তোমার উপর সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ এবং তোমার অতীত প্রাচুর্য ও সম্পদের কথা স্মরণ করে বিস্মিত হচ্ছি। একথা বলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হলেন।

৫৯০৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا – এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস।

৫৯০৮. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উযায়র (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের পাশ দিয়ে গমন করেন এবং এ ঘরকে নৃপতি বুখ্তনাসারা যে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে, তার নমুনা তিনি লক্ষ্য করেন।

৫৯০৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا – এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে سَاقِطَةٌ عَلٰى سَقُفِهَا অর্থাৎ ছাদ ধসে পড়েছে।

قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ –এর ব্যাখ্যা ঃ

(অর্থ ঃ সে বলল, মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন? এরপর আল্লাহ্ একশ' বছর মৃত রাখলেন)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ঘোষণা করেন যে, একথাটি যিনি বলেছিলেন, তিনি যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করেন কিংবা এমন একটি স্থানে গমন করেন, যে স্থানটি ধ্বংস হয়ে যাবার পর একে পুনরায় আবাদ করার ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, মৃত্যুর পর একে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে জীবিত করবেন?

কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, জীবিত করার ঐশী শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেই তিনি একথাটি বলেছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দিয়েই একটি উদাহরণ তৈরি করে তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত সম্পর্কে অবগত করালেন। এভাবে তিনি ঐ স্থানটিকে পূর্বের চেয়ে অধিক আবাদযোগ্য করে স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন তাঁকে দেখালেন, যেহেতু তিনি এ কুদরতকে পূর্বে এতটুকু বুঝতে পারেন নি।

হযরত উযায়র (আ.) এ ধ্বংসযজ্ঞের পূর্বে সেই এলাকায় স্ত্রী–পুত্র নিয়ে সুখে বসবাস করেছিলেন। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখলেন। অধিকন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর পরিবারের সদস্যগণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে– কেউ হয়ত নিহত হয়েছে, আবার কেউ হয়ত কয়েদী হিসাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। মোট কথা, পরিবারের কেউ সেখানে বেঁচে নেই, ঘরবাড়ীগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, এগুলোর চিহ্ন শুধু দেখতে পাওয়া যায়। তাঁকে এগুলো পুরোপুরিভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবার অঙ্গীকারের পর যখন তিনি এরূপ হত্যাযজ্ঞের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, "কেমন করে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো ধ্বংসের পর জীবিত করবেন? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জীবিত করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করালেন। তাও আবার তাঁর পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য অক্ষয় রেখে তাঁকে ধ্বংস করে জীবিত করার মাধ্যমে। তাঁকে এবং অন্যকেও যে আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত করতে পারেন, সে শক্তি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিলেন। তিনি নিজের চোখে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত অবলোকন করতে পারলেন। যখন তিনি তা দেখলেন, তখন স্বীকার করে বললেন, "আমি এখন জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯১০. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ আল–ইয়ামানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আরমিয়া (আ.)–কে বনী ইসরাঈলের কাছে নবী রূপে প্রেরণ

করলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'হে আরমিয়া, তোমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আমি তোমাকে নির্বাচিত করেছি, তোমার মাতার গর্ভে তোমার চিত্র অংকনের পূর্বে আমি তোমাকে পবিত্র করেছি, তোমার জন্মের পূর্বেই। আমি তোমাকে পরিচ্ছন্ন করেছি, তুমি প্রাপ্তবয়স্ক হবার পূর্বে তোমাকে আমি নবী হবার শুভ সংবাদ প্রদান করেছি; তুমি যৌবনে পদার্পণ করার পূর্বে আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; একটি মহৎ কাজের জন্যেই আমি তোমাকে নিয়োগ করেছি।" ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ আল-ইয়ামানী (র.) আরো বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আরমিয়া (আ.)-কে বনী ইসরাঈলের একজন নৃপতির কাছে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য হলো নবী (আ.) তাকে সোজা রাস্তার সন্ধান দেবেন, তাকে সৎপথে চলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহায়তা করবেন এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা ও সৃষ্টি নৃপতির মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক বজায় থাকা উচিত, এ সম্পর্কে নবী (আ.) নৃপতির কাছে আল্লাহ্ তা'আলার মহান বাণী উপস্থাপন করবেন। কিছু দিন পর বনী ইসরাঈলের মাঝে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হলো তারা পাপের কাজ বিনা দ্বিধায় করতে লাগল, হারাম বস্তুগুলোকে বৈধ মনে করতে লাগল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে সানহারীব্ নামক শত্রু থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তাতে তাদের যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তা তারা দিব্যি ভুলে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আরমিয়া (আ.)-কে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন ও বললেন, বনী ইসরাঈলের অন্তর্গত তোমার সম্প্রদায়ের কাছে যাও, তাদের আমি যা আদেশ দিচ্ছি তা তাদের কাছে বর্ণনা কর, তাদের যে আমি অজস্র নিয়ামত দান করেছি, তা তাদের স্মরণ করিয়ে দাও এবং তাদের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাদেরকে উত্তমরূপে অভিহিত কর। এরপর ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) বনী ইসরাঈলের অন্তর্গত স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে আরমিয়া (আ.)-কে যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেছেন, সে ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আরমিয়া (আ.)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করে জানালেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলের ইয়াফিস সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেবেন। বাবেলের অধিবাসীদেরকে ইয়াফিস বলা হয়। কেননা, তারা ইয়াফিস ইব্‌ন নূহ্ (আ.)-এর বংশধর। যখন আরমিয়া (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার ওহী শ্রবণ করলেন, তখনকার প্রথা অনুযায়ী তিনি সজোরে চীৎকার দিয়ে উঠলেন, ক্রন্দন করলেন, স্বীয় বস্ত্র বিদীর্ণ করলেন এবং ভয়াবহ আসন্ন বিপদ সংকেত হিসাবে স্বীয় মস্তকে ছাই নিক্ষেপ করলেন ও বললেন, যেদিন আমি জন্ম নিয়েছি এবং তাওরাতপ্রাপ্ত হয়েছি, আমি অভিশপ্ত, আমার অশুভ দিনগুলোর মধ্যে আমার জন্ম দিবসটি উল্লেখযোগ্য; আমার দুর্ভাগ্যের জন্যই আমি বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হিসাবে মনোনীত হয়েছি। যদি আমার ভাগ্য ভাল হতো তাহলে আমি কোন দিনও বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হিসাবে নির্বাচিত হতাম না। আমার কারণেই তাদের উপর দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বসেছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা খিযির (আ.) তথা আরমিয়া (আ.)-এর অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি শুনলেন, তখন ঐশী বাণী এলো, হে, আরমিয়া ! আমি তোমার কাছে যে ওহী প্রেরণ করেছি, তার জন্য কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক, বনী ইসরাঈলে আমাকে তুমি প্রেরণ করে তাদেরকে তুমি ধ্বংস করে দিচ্ছ তা আমি মোটেই পসন্দ করতে পারি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার মহাসম্মানের শপথ। আমি বনী ইসরাঈল ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে কখনও ধ্বংস করব না যতক্ষণ না তোমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন আবেদন ও নিবেদন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণীতে আরমিয়া (আ.) অত্যন্ত খুশী হন এবং তিনি অন্তরে প্রশান্তি লাভ করেন এবং বলেন, "ঐ সত্তার শপথ, যিনি মূসা (আ.) ও অন্য নবীগণকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি বনী

ইসরাঈলকে ধ্বংস করার জন্যে কখনও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করব না।" এরপর তিনি বনী ইসরাঈলের রাজার কাছে গেলেন ও তাঁর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা যা ওহী প্রেরণ করেছেন, রাজাকে তা জানালেন। তাতে রাজা খুশী হলেন ও এটিকে একটি শুভ সংবাদ হিসাবে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শাস্তি দেন, তাহলে তা হবে আমাদের বহু পাপের প্রায়শ্চিত্তের কারণে যা আমরা আমাদের জন্যে ইতিমধ্যে অর্জন করেছি। আর যদি তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে তিনি তা স্বীয় ক্ষমতার বলে তা করবেন।

এ ওহী নাযিল হবার পর তারা তিন বছর যাবত নেককার বান্দারূপে পৃথিবীতে অবস্থান করল। এরপর তারা আবার অধিক মাত্রায় পাপ কাজ শুরু করে দিল। আর একের পর একটি খারাপ কাজে তারা মত্ত হতে লাগল। তাদের ধ্বংসের দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। ওহী নাযিলও খুবই কম হয়ে গেল। তারা এখন আর আখিরাতকে স্মরণ করছে না। যখন তাদের দুনিয়া ও দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী শান-শওকত গ্রাস করে নিল, তখন ওহী একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তাদের রাজা তখন তাদেরকে বলল, হে বনী ইসরাঈল ! তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র আযাব আসবার পূর্বে এবং তোমাদের প্রতি এমন শাসনকর্তা প্রেরণের পূর্বে যারা তোমাদের উপর মোটেই দয়া করবে না, তোমরা যে সব পাপের কাজ করছ, তা থেকে বিরত থাক। তোমাদের আল্লাহ্ অতি সহসা তোমাদের তাওবা কবুলকারী। দয়া প্রদর্শনের জন্য তাঁর কুদরতী দু'হাত সর্বদাই প্রসারিত। যে তার কাছে তাওবা করে তার প্রতি তিনি খুবই দয়ালু। কিন্তু রাজার এরূপ হৃদয়স্পর্শী আবেদন-নিবেদনের পরও তাঁরা যে সব অপকর্মে লিপ্ত ছিল, তা থেকে বিরত হতে তারা অস্বীকার করল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বুখ্‌তনাসারা ইব্‌ন নাবূ যারাওয়ানের (نبوذراوان) অন্তরে ইচ্ছার সঞ্চার করেন যে, তাকে বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে হবে এবং তার দাদা সান্‌হারীব যা করতে চেয়েছিলেন তাকে সেখানে তা করতে হবে। তারপর সে ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হয়। রওয়ানা হবার পর বনী ইসরাঈলের রাজার কাছে সংবাদ এলো যে, বুখ্‌তনাসারা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের পানে ধাবিত হচ্ছে। তখন তিনি আরমিয়া (আ.)-এর কাছে লোক প্রেরণ করে তাঁকে ডাকলেন। তিনি দরবারে আসলে রাজা বলেন, হে আরমিয়া (আ.), আপনি আমাদের বলেছিলেন যে, আমাদের প্রতিপালক আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীদেরকে আপনার তরফ থেকে কোন প্রকার অনুরোধ না পেয়ে ধ্বংস করবেন না। কিন্তু তা কোথায়, কেন এরূপ হলো? আরমিয়া (আ.) রাজাকে বললেন, "আমার প্রতিপালক কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আর এ ব্যাপারে আমি খুবই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।" যখন নির্দিষ্ট সময় অতি নিকটবর্তী হলো, তাদের রাজত্ব ধ্বংস হবার উপক্রম হলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দেবার মনস্থ করলেন, তখন তিনি আরমিয়া (আ.)-এর নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতাকে বললেন, তুমি আরমিয়া (আ.)-এর নিকট যাও এবং একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস কর। আর কি ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করবে তাও বলে দিলেন। ফেরেশতা আরমিয়া (আ.)-এর নিকট গমন করলেন এবং বনী ইসরাঈলের একজন মানুষের আকৃতিতে তিনি তথায় উপস্থিত হলেন। লোকটিকে আরমিয়া (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি উত্তরে বললেন, আমি বনী ইসরাঈলের একজন লোক। আমার একটি বিষয়ে আপনার কাছে আমি ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে চাই। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফেরেশতা বললেন, হে আল্লাহ্ পাকের নবী ! আমি আপনার কাছে আমার আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারে একটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্যে এসেছি। আমি তাদের সাথে আল্লাহ্

তা'আলার আদেশ অনুযায়ী সম্পর্ক বজায় রেখে আসছি। আমি সর্বদা তাদের উপকারই করে আসছি। আমি তাদের প্রতি যত বেশী দয়া প্রদর্শন করে আসছি, ততই তারা আমাকে অধিক কষ্ট দিচ্ছে। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র নবী (আ.)! আপনি তাদের সম্বন্ধে আমাকে একটি ফতোয়া দিন। নবী (আ.) তাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ও তোমার মধ্যে যে অধিকারের সম্পর্ক আছে, তাতে তুমি সদ্ব্যবহার করে যাও। আর আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে তোমাকে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সুসম্পর্ক বজায় রাখ এবং এরূপ কল্যাণজনক কাজে তুমি সন্তুষ্ট থাক। এরপর নবী (আ.)-এর দরবার থেকে ফেরেশতা চলে গেলেন। বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। একদিন আবার ফিরিশতা পূর্বেকার লোকটির আকৃতিতে নবীর কাছে হাযির হলেন এবং নবীর সামনে বসলেন। আরমিয়া (আ.) তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? ফেরেশতা উত্তরে বললেন, আমি ঐ ব্যক্তি, যে একবার আপনার কাছে তার পরিবার সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্যে এসেছিল। তখন আল্লাহ্‌র নবী (আ.) তাকে বললেন, "এখনও কি তোমার জন্য তাদের চরিত্র নির্মল হয়নি? এবং তাদের কাছ থেকে তুমি তোমার কাম্য ব্যবহার পাচ্ছ না?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী (আ.)! ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি এমন কোন ব্যক্তি নই, যে পরিবারের সদস্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে অনীহা প্রদর্শন করেছে, বরং সর্ব প্রকার কল্যাণই আমি তাদের সাথে প্রদর্শন করে থাকি, এমনকি এর থেকে উত্তম ব্যবহারও করেছি। তখন নবী (আ.) তাকে বললেন, তুমি তোমার পরিবারে ফেরত যাও এবং তাদের প্রতি ইহ্‌সান কর। আর যিনি তাঁর নেক বান্দাদেরকে সংস্কার করে থাকেন, সেই আল্লাহ্‌র কাছে আমি দু'আ করছি যেন তিনি তোমাদের মাঝে সম্প্রীতি সঞ্চার করেন। তোমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করতে নির্দেশ দেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকতে তাওফীক দেন। ফেরেশতা নবী (আ.)-এর দরবার থেকে বিদায় নিলেন। বেশ কিছু কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বুখ্‌ত্‌নাসারা পঙ্গপালের ন্যায় তার অসংখ্য লশকর নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসকে অবরোধ করে ফেলে। তাতে বনী ইসরাঈল অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বনী ইসরাঈলের রাজার কাছেও এটা একটি মহাবিপদ আকারে দেখা দিল। তিনি তখন আরমিয়া (আ.)-কে ডেকে পাঠালেন। নবী (আ.) তাশরীফ আনয়ন করলে রাজা বললেন, "হে আল্লাহ্‌র নবী (আ.)! আপনার সাথে কৃত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা কোথায় গেল?" তিনি উত্তরে বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের ওয়াদা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরপর ফেরেশতা আরমিয়া (আ.)-এর কাছে আগমন করলেন এবং দেখলেন যে, আরমিয়া (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের দেয়ালে হেলান দিয়ে স্বীয় প্রতিপালকের ওয়াদা অনুযায়ী প্রতিপালক থেকে সাহায্য ও সহায়তা আসার আশায় প্রফুল্লচিত্তে বসে আছেন। ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার নবী (আ.)-এর সামনে বসলেন। আরমিয়া (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? ফেরেশতা উত্তরে বললেন, আমি ঐ ব্যক্তি যে আরো দু'বার আপনার কাছে স্বীয় পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে ফতোয়া চাইবার জন্যে এসেছিল। নবী (আ.) তাঁকে বললেন, এখনও কি তাদের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হবার সময় আসেনি? ফেরেশতা বললেন, হে আল্লাহ্ তা'আলার নবী (আ.)! আজকের পূর্বে তারা যা কিছু করেছিল তা আমি সহ্য করেছি এবং ধারণা করেছি যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে কষ্ট দেয়া। কিন্তু আজ আমি তাদেরকে এমন একটি কাজে লিপ্ত দেখলাম, যা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করে না এবং আল্লাহ্‌ও এটাকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ্‌র নবী (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাদেরকে কি কাজে মত্ত থাকতে দেখেছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্ তা'আলার নবী (আ.)। আমি আজ তাদেরকে এমন একটি বড় কাজে

মত্ত দেখলাম, যে কাজে আল্লাহ্ তা'আলা খুবই অসন্তুষ্ট হন। যদি তারা পূর্বে যে কাজে মত্ত ছিল আজও একাজে মত্ত হতো আমার রাগ এত চরমে উঠত না, আমি ধৈর্য ধরতাম এবং তাদের সংশোধন হবার আশা পোষণ করতাম। কিন্তু আজ আমি আল্লাহ্ ও আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাদের উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছি। এজন্য আমি এব্যাপারে সংবাদ দেবার জন্যে আপনার কাছে আগমন করেছি এবং ঐ আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে আপনাকে অনুরোধ করছি, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন। আপনি কি তাদের জন্য বদ দু'আ করবেন না এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবেন না? তখন আল্লাহ্র নবী (আ.) বললেন, হে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর মালিক। যদি তারা সত্য ও সঠিক পথে থাকে তাদেরকে এ জগতে বাঁচতে দিন, আর যদি তারা আপনাকে অসন্তুষ্ট করে থাকে এবং এমন কাজ করে যা আপনি পসন্দ করেন না, তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। আরমিয়া (আ.) নবীর মুখ থেকে যখন এবাক্যটি বের হলো, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি বজ্র নিক্ষেপ করেন, তাতে জনগণের পাপমুক্তির জন্যে উৎসর্গ করার জায়গাটিতে আগুন ধরে যায় এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের সাতটি দ্বার ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। যখন আল্লাহ্র নবী আরমিয়া (আ.) তা দেখলেন, তখনকার সাধারণ প্রথা অনুযায়ী তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন, নিজের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন এবং স্বীয় মাথায় ছাই নিক্ষেপ করেন। এরপর বললেন, হে আকাশের মালিক এবং হে দাতাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক দাতা। আমার সাথে কৃত ওয়াদা আপনি কেন পূরণ করলেন না? আরমিয়া (আ.)-কে জানানো হলো, বনী ইসরাঈলের উপর যে মুসীবত নাযিল করা হয়েছে তা তোমার ফতোয়ার কারণেই। তুমি আমার দূতকে এরূপ ফতোয়া দিয়েছিলে। তখন নবী (আ.) দৃঢ়তার সাথে বুঝতে পারলেন যে, তিনি তিনবার লোকটির প্রশ্নের উত্তরে ফতোয়া দিয়েছিলেন। আর লোকটি ছিল তার প্রতিপালকের দূত। তখন আরমিয়া (আ.) পাহাড়ের জীবজন্তুর মাঝে হারিয়ে গেলেন। আর এদিক দিয়ে বুখ্ত্ নাসারা তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে সিরিয়াকে পদদলিত করে দেয়। বনী ইসরাঈলকে নির্বিবাদে হত্যা করে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে দেয়। এরপর সে তার সৈন্য সামন্তদেরকে আদেশ দেয়, প্রত্যেকে যেন একটি ঢাল মাটি পূর্ণ করে সে মাটি বায়তুল মুকাদ্দাসে ফেলে যায়। তারা আদেশ মুতাবিক মাটি ফেলে দেয় এবং বায়তুল মুকাদ্দাস একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ধ্বংসকান্ড পরিচালনার পর বুখ্ত্ ন্নাসারা বাবেল দেশে চলে যায় এবং বনী ইসরাঈলের কয়েদীদেরকে সাথে নিয়ে যায়। সে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার বনী ইসরাঈলের ছোট-বড় সমস্ত বাসিন্দাকে তার সামনে সমবেত হবার আদেশ দেয়। তারা হাযির হলে তাদের থেকে নব্বই হাজার শিশুকে সে বেছে নিল। তার সৈন্যরা যখন গনীমতের মাল একত্র করল এবং সে তাদের মধ্যে বন্টন করার মনস্থ করল, তখন তার সাথে যে সব শাসনকর্তা এসেছিল, তাঁরা বলল, হে সম্রাট! আপনাকে আমাদের অংশের সমস্ত গনীমতের সম্পদ দিয়ে দিলাম। এর পরিবর্তে আপনি বনী ইসরাঈল থেকে যে সব শিশুকে আপনার জন্যে বাছাই করেছেন, সেগুলো আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিন। সে তা করল, তাতে প্রত্যেকে নিজ অংশে চারজন গোলাম পেল। আর ঐ সব গোলামের মধ্যে ছিলেন দানিয়াল, আযারিয়া, মীশাইল এবং হানানিয়া। বনী ইসরাঈলকে বুখ্ত নাসারা তিনটি দলে বিভক্ত করে, এক-তৃতীয়াংশকে সিরিয়ায় থাকতে দেয়, আরেক তৃতীয়াংশকে কয়েদী করে নিয়ে যায় এবং অন্য তৃতীয়াংশকে হত্যা করে। সে বায়তুল মুকাদ্দাসের সমস্ত কয়েদী ও শিশু কয়েদীদেরকে বাবেলে নিয়ে যায়। এটাই ছিল প্রথম ঘটনা যার সম্বন্ধে এবং ঘটনায় জড়িত লোকদের অত্যাচার-অবিচার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা তার নবী (আ.)-কে অবহিত করেছিলেন।

বনী ইসরাঈলের কয়েদীদেরকে নিয়ে বুখ্‌ত্‌ নাসারা যখন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বাবেল চলে যায়, তখন আরমিয়া (আ.) এক বাটি আঙ্গুরের রস, এক বস্তা ডুমুর ফল নিয়ে একটি গাধায় চড়ে পাহাড় থেকে লোকালয়ে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে আসেন, তথায় থমকে দাঁড়ালেন এবং ধ্বংসলীলা অবলোকন করেন। তার মনে সন্দেহ জাগল এবং তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে এ শহরকে ধ্বংসের পর পুনরায় আবাদ করবেন? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন, তখন তাঁর পাশেই ছিল তাঁর গাধা, আঙ্গুরের রস এবং ডুমুরের বস্তা। তবে গাধাটিও মরে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখলেন। কেউ তাঁকে দেখতে পারল না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পুনরায় জীবিত করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতকাল অবস্থান করলে? তিনি বললেন, একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, না, না, বরং তুমি একশ' বছর অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর। কারণ আমি তোমাকে মানবজাতির জন্যে নিদর্শন স্বরূপ করব। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে আমি সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা এগুলোকে ঢেকে দেই। তিনি তাঁর গাধার প্রতি তাকালেন। গাধার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গেল। অথচ তার সাথে গাধার সবকিছু যথা রগ, মাংস, মাংসপেশী ইত্যাদি মরে গিয়াছিল। তারপর কেমন করে আল্লাহ্ তা'আলা অস্থিগুলো মাংস দ্বারা ঢেকে দিলেন, এমনকি গর্দভটি পূর্ণ অবয়ব ধারণ করল। তারপর তার মধ্যে প্রাণ এসে গেল এবং সেটি দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল। তিনি তাঁর খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়ের দিকে দৃষ্টি দেন এবং দেখতে পান যে, এগুলো পূর্বের ন্যায় রয়েছে, কোন পরিবর্তন হয়নি। মহান আল্লাহ্‌র নবী (আ.) যখন আল্লাহ্ পাকের কুদরত স্বচক্ষে দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তারপর আল্লাহ্ পাক হযরত আরমিয়া (আ.)–কে দীর্ঘ জীবন দান করেন এবং তিনি তখন পৃথিবী ও নগরসমূহের বিস্তীর্ণ এলাকা অবলোকন করতে লাগলেন।

৫৯১১. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আরমিয়া (আ.)–এর কাছে ওহী নাযিল করেন। তখন তিনি ছিলেন মিসরীর ভূখন্ডে। আদেশ হলো ঈলিয়া ভূখন্ডে (বায়তুল মুকাদ্দাস) তুমি গমন কর। মিসর তোমার অবস্থান করার জন্যে উপযুক্ত জায়গা নয়। তিনি একটি গাধায় চড়লেন এবং পথচলা শুরু করলেন। তাঁর সাথে ছিল এক বস্তা আঙ্গুর ও ডুমুর এবং স্বচ্ছ পানির একটি নতুন পাত্র। যখন বায়তুল মুকাদ্দাস এবং আশে–পাশের গ্রাম ও মসজিদগুলো তাঁর নজরে পড়ল, তখন তিনি অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা দেখতে পেলেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে একটি বড় পাহাড়ের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেখলেন এবং বলে উঠলেন, মৃত্যু ও ধ্বংসের পর আল্লাহ্ তা'আলা কেমন করে তা পুনর্জীবিত করবেন। তিনি আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি ঘর দেখতে পেলেন। তার সাথে একটি নতুন রশি দিয়ে গর্দভটিকে বাঁধলেন এবং পানির পাত্রটি লটকিয়ে রাখলেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিদ্রাভিভূত করে দিলেন। তিনি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন ও অচেতন হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা একশত বছরের জন্য তার রূহ কবয করলেন। একশত বছরের মধ্যে যখন সত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের কোন এক মহান রাজার কাছে ফেরেশতা পাঠালেন। তার নাম ছিল 'ইউসাক'। ফেরেশতা এসে রাজাকে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন, আপনি যেন আপনার সৈন্য সামন্ত নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ও তাঁর

আশে–পাশের জায়গাগুলোকে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে আবাদ করেন। একাজের জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও লোকজন সংগ্রহ করার লক্ষ্যে রাজা তিন দিনের সময় চাইলেন। রাজাকে তিন দিনের সময় দেয়া হলো। রাজা তিনশত বীর পুরুষকে সংগ্রহ করলেন এবং প্রত্যেক বীর পুরুষের অধীনে এক হাযার কারিগর নিযুক্ত করলেন। আর তাদেরকে কাজ সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার প্রদান করলেন। বীর পুরুষরা রওয়ানা হলেন এবং তাদের সাথে ছিল তিন লক্ষ দক্ষ কারিগর। যখন তারা ঐখানে পৌঁছে কাজ আরম্ভ করে দিলেন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আরমিয়া (আ.)–এর চোখে রূহ প্রদান করলেন, কিন্তু তার শরীর এখনও মৃত রয়ে গেল। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের আশে–পাশের গ্রাম, মসজিদ, নদী ও ক্ষেত–খামারের কর্মব্যস্ততা, উন্নয়নমূলক কর্মতৎপরতা ও নগরায়নের কাজ লক্ষ্য করতে লাগলেন। সবকিছুই পূর্বের আকার ধারণ করল এবং ত্রিশ বছর পেরিয়ে একশত বছরও পরিপূর্ণ হলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আরমিয়া (আ.)–কে পুনরায় জীবনদান করলেন। তিনি তাঁর খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেন, এগুলো এখনও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। তার গাধাটির দিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেন এ যেন ঐ দিনের ন্যায় দন্ডায়মান, যেদিন তিনি এটিকে রশি দিয়ে বেঁধেছিলেন এবং তখনও তিনি খাদ্য গ্রহণ করেননি ও পানীয় পান করেননি। তিনি গাধার গলায় পরিহিত গলাবস্তুটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেন, তা পূর্বের ন্যায় নতুন রয়েছে। তাতে কোনরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। অথচ তার মধ্যে একশত বছরের হাওয়া, গরম ও ঠান্ডা স্পর্শ করেছে, কিন্তু এগুলো তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। তার মধ্যে হ্রাস–বৃদ্ধি কিছুই সংঘটিত করতে পারেনি। তবে হযরত আরমিয়া (আ.)–এর শরীর কালের চক্রে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শরীরে নতুন গোশত গজিয়ে তোলেন এবং তা তাঁর হাড়ের সাথে যুক্ত হয়। তিনি সবকিছুই লক্ষ্য করছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর যা এখনও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বললেন, তুমি তোমার গাধার প্রতি নজর কর। কারণ, আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শন স্বরূপ করব। আর তুমি অস্থিগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ, কিভাবে আমি এগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। যখন তাঁর কাছে সবকিছু প্রকাশ পেল, তখন তিনি (আরমিয়া আ.) বললেন, আমি জানি যে, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে প্রতিটি বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯১২. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ فَقَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا এর তাফসীরে বলেন, যখন বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তার যাবতীয় কিতাবপত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন একদিন হযরত আরমিয়া (আ.) ধ্বংসস্তূপে পরিণত পাহাড়ের একপাশে দাঁড়িয়ে বলে উঠেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ পাক কিরূপে এটাকে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন এবং সত্তর বছরের মাথায় বনী ইসরাঈলের একজনকে পুনরায় জীবিত করলেন এবং তার দ্বারা ত্রিশ বছর যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসকে পুনঃনির্মাণ করালেন। যখন একশত বছর পরিপূর্ণ হলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আরমিয়া (আ.)–কে জীবিত করলেন এবং তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে পেলেন। হযরত আরমিয়া (আ.) অস্থিগুলোর দিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন যে, কিভাবে এগুলো একে অপরের সাথে মিশে গেল। তারপর তিনি আরো লক্ষ্য করতে লাগলেন, কিভাবে অস্থিগুলোর উপর গোশত ও রগ দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো। যখন তাঁর কাছে সবকিছুই

প্রকাশ পেয়ে গেল, তিনি বললেন, আমি জানি আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যা এখনও অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) বলেন, তাঁর খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় ছিল একটি ঝুড়ির মধ্যে কিছু ডুমুর ফল এবং এক মশক পানি।

৫৯১৩. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে اَوْكَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا -এর তাফসীরে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাটি এরূপঃ একদিন হযরত উযায়র (আ.) তাঁর একটি গাধায় চড়ে সিরিয়া থেকে রওয়ানা হলেন। তার সাথে ছিল ফলের রস, আঙ্গুর এবং ডুমুর। যখন তিনি একটি নগরে পৌঁছলেন, তার ধ্বংসলীলা দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং হাত উল্টো করে বলতে লাগলেন, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে তা পুনর্জীবিত করবেন? তবে এরূপ মন্তব্য তাঁর সন্দেহ বা মিথ্যাচার হিসাবে পরিগণিত নয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি নির্দিষ্টকালের জন্যে তাঁকে মৃত রাখলেন এবং তাঁর গাধাটিকেও মৃত অবস্থায় রাখলেন। তিনি ও তাঁর গাধা উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেল। এভাবে একশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)-কে জীবিত করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতকাল মৃত অবস্থায় ছিলে? তিনি বললেন, একদিন অথবা তার চেয়েও কম সময়ের জন্য নিদ্রিত ছিলাম। তাঁকে বলা হলো, না, না, বরং তুমি একশত বছর মৃত অবস্থায় অবস্থান করেছ। তোমার খাদ্যসামগ্রী ডুমুর ও আঙ্গুর ফলের প্রতি লক্ষ্য কর এবং তোমার পানীয়, ফলের রসের প্রতি লক্ষ্য কর– এগুলো এখনও বিকৃত হয়নি।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ ثُمَّ بَعَثَهٗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পর তাকে পুনরায় জীবিত করা হলো। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত بَعَثَ শব্দটির পূর্ণ ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে এ কিতারের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। তবে كَمْ لَبِثْتَ শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, كَمْ শব্দটি আরবী ভাষায় সংখ্যার পরিমাণ জিজ্ঞেস করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে এ শব্দটি لَبِثْتَ ক্রিয়ার কারণে حالت نصبى বা কর্মকারকে রয়েছে। তার ব্যাখ্যায় বলা যায়, আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ তোমাকে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত করার পূর্বে কত সময়ের জন্যে তুমি মৃত অবস্থায় অবস্থান করছিলে? যাকে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত করা হলো, সে বলল, তার মৃত্যুর পর সে মৃত অবস্থায় জীবিত করার পূর্ব পর্যন্ত একদিন মাত্র অবস্থান করছিল বরং একদিনেরও কম। কথিত আছে, যাকে জীবিত করা হয়েছে, তিনি ছিলেন হযরত আরমিয়া (আ.) অথবা হযরত উযায়র (আ.) কিংবা ঐ ব্যক্তি ছিলেন, যার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উত্তরদাতা একদিন বরং একদিনের চেয়ে কম অবস্থান করেছেন বলে প্রকাশ করেছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা দিনের প্রথমাংশে তাঁর রূহ হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশত বছর পর দিনের শেষাংশে তাঁর রূহকে ফেরত দিয়েছিলেন। কাজেই, যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কতকাল অবস্থান করেছিলে? তখন সে বলল, একদিন অবস্থান করেছি। কেননা, তখন সে লক্ষ্য করেছিল যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে। কাজেই তা তাঁর কাছে একদিনের সমান বলে মনে হচ্ছিল। যেহেতু তিনি মনে করেছিলেন যে, দিনের প্রথম ভাগে তার রূহ কবয করে নেয়া হয়েছে এবং দিনের শেষভাগে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তিনি কতকাল

অবস্থান করেছেন। আবার তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, সূর্যও ইতিমধ্যে অস্ত গিয়েছে। তাই তিনি বললেন, আমি একদিন অবস্থান করেছিলাম। তারপর তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন, সূর্য এখনও পুরোপুরি অস্ত যায়নি, তার কিছু অংশ যেন এখনও বাকী রয়েছে, তাই তিনি পুনরায় বললেন أَوْبَعْضَ يَوْمٍ অর্থাৎ বরং একদিনের চেয়ে কম। এখানে "أَوْ" অব্যয়টির অর্থ, 'বরং' (অথবা নয়)। আল্লাহ্ পাক অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ অর্থ ঃ তাকে আমি লক্ষ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। (৩৭ ঃ ১৪৭) এখানে "أَوْ" অব্যয়টির অর্থ 'অথবা' না হয়ে অর্থ হয়েছে 'বরং'। কাজেই প্রথমে একদিনের কথা বলে পরে একদিনের কম সময়ের অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯১৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কথিত আছে যে, অত্র আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তি দিবা ভাগের প্রথম দিকে ইনতিকাল করেন। পরে সূর্য অস্ত যাবার পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে জীবিত করা হয়। এজন্য তিনি প্রথমে বলেন, একদিন অবস্থান করেছিলেন, এরপর তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করেন ও সূর্যের কিছু অংশ দেখতে পান। তখন তিনি বলেন, أَوْبَعْضَ يَوْمٍ অর্থাৎ বরং একদিনেরও কম। এরই উত্তরে বলা হয়েছে, বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করছিলে।

৫৯১৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উযায়র (আ.) একদিন একটি নগরের কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন? তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দিবসের প্রথম দিকে মৃত করলেন এবং তিনিও মৃত অবস্থায় একশত বছর অবস্থান করেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দিনের শেষাংশে জীবিত করলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কতকাল তুমি অবস্থান করলে? তিনি উত্তরে বলেন, একদিন অবস্থান করেছিলাম অথবা একদিনের কম অবস্থান করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, বরং একশত বছর তুমি অবস্থানে করেছিলে।

৫৯১৬. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। এরপর তাঁকে জীবিত করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কতকাল অবস্থান করছিলে? উত্তরে তিনি বলেন, একদিন অথবা একদিনের কম। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, বরং একশত বছর তুমি অবস্থান করছিলে।

৫৯১৭. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন উযায়র (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছলেন, যা বুখ্‌তৃ নাসারা ধ্বংস করে দিয়েছিল, তিনি বিস্ময়ে বলে উঠলেন, أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا অর্থাৎ কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় এটাকে জীবিত করবেন যেরূপ তা প্রথমে ছিল? এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মৃত অবস্থায় রাখলেন। তিনি আরো বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি দিবসের প্রথম বেলায় ইনতিকাল করেন এবং একশত বছর পর সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁকে পুনর্জীবিত করা হয়। তাঁকে তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, কতকাল তুমি অবস্থান করলে? উত্তরে তিনি বলেন, একদিন। এরপর যখন তিনি সূর্য দেখতে পেলেন, তখন বলতে লাগলেন, না, না, বরং একদিনের কম।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, لَمْ يَتَسَنَّهْ –এর অর্থ হচ্ছে لَمْ يَتَغَيَّرْهُ السِّنُوْنَ الَّتِىْ اَتَتْ عَلَيْهِ অর্থাৎ বিগত যুগের বিবর্তনে এগুলো বিকৃত হয়নি। কারো কারো মতে, তাঁর খাদ্যসামগ্রী ছিল এক বস্তা ডুমুর ও আংগুর আর এক মশকভর্তি পানি। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর খাদ্য সামগ্রী ছিল এক বস্তা আংগুর ও এক বস্তা ডুমুর। আর পানীয় ছিল এক পাত্র পূর্ণ ফলের রস। আবার কেউ কেউ বলেন, তার খাদ্য সামগ্রী ছিল এক বস্তা ডুমুর এবং একপাত্র ছিল পানীয়।

৫৯১৮. হানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উছমান (রা.) ও যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা.)–এর মধ্যে দূতের কর্তব্য সম্পাদন করেছিলাম। একদিন যায়িদ (রা.) উছমান (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দটি কি لَمْ يَتَسَنَّنْ হবে, না لَمْ يَتَسَنَّهْ হবে? তখন উছমান (রা.) উত্তরে বলেন, এ শব্দে ه কে যোগ করে পড়তে হবে।

৫৯১৯. হানী আল-বারবারী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উছমান (রা.)-এর খিদমতে এমন সময় নিয়োজিত ছিলাম, যখন সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মাসহাফ প্রণয়নের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন উছমান (রা.) আমাকে একটি বকরীর সামনের রানের শুকনো হাড়সহ উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)–এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। এ হাড়টিতে লেখা ছিল فَامْهِلِ الْكَافِرِيْنَ এবং وَلَا تَبْدِيْلَ لِلْخَلْقِ لَمْ يَتَسَنَّ তখন উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) কলম হাতে নিলেন এবং لِلْخَلْقِ –এর মধ্যে দুইটি لام –এর একটিকে মুছে দিলেন ও লিখে দিলেন لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ –এরপর فَامْهِلْ –কে মিটিয়ে দিয়ে তিনি লিখলেন فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ –। পুনরায় তিনি لَمْ يَتَسَنَّنْ –এ ه যোগ করে লিখে দিলেন "لَمْ يَتَسَنَّهْ" –। বর্ণনাকারী বলেন, যদি এ শব্দটি لَمْ يَتَسَنَّى কিংবা لَمْ يَتَسَنَّنْ হতো, তাহলে উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) বিশিষ্ট সাহাবী ও কুরআন বিশেষজ্ঞ কখনও তাতে ه যোগ করতেন না। কেননা, "ه" এর এখানে কোন স্থান নেই এবং উছমান (রা.)–ও এ শব্দে ه যোগ করতেন না বা যোগ করার জন্যে আদেশ জারী করতেন না। বর্ণনাকারী আরো বলেন, এ সম্পর্কে উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)–এর ন্যায় যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দের ব্যাখ্যায়ও বিশ্লেষণকারিগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যা– সমর্থন দিয়েছেন অর্থাৎ لَمْ يَتَسَنَّهْ –এর অর্থ لَمْ يَتَغَيَّرْ অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন, তাঁদের বর্ণনা ঃ

৫৯২০. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। আয়াতে উল্লিখিত لَمْ يَتَسَنَّهْ –এর অর্থ لَمْ يَتَغَيَّرْ অর্থাৎ পরিবর্তিত বা বিকৃত হয়নি।

৫৯২১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দের অর্থ لَمْ يَتَغَيَّرْ অর্থাৎ বিকৃত হয়নি।

৫৯২২. কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

৫৯২৩. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ এখানে উল্লিখিত فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ –এর দ্বারা ডুমুর ও আঙ্গুর ফলকে বুঝানো হয়েছে এবং "شَرَابِكَ" এর দ্বারা ফলের রস বুঝানো হয়েছে। আর لَمْ يَتَسَنَّهْ এর দ্বারা 'বিকৃত হয়নি' বুঝানো হয়েছে। ফল ও ফলের রস বিকৃত হয়নি কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এগুলো পচে যাওয়া তো দূরের কথা, টক পর্যন্ত হয়নি বরং এগুলো ছিল তরুতাজা ও মিষ্টি– যেরূপ প্রথমে ছিল। অধিকন্তু এটা ঐ সময়কার ঘটনা, যখন হযরত উযায়র (আ.) সিরিয়া থেকে একটি গাধায় চড়ে আগমন করছিলেন। তাঁর সাথে ছিল পানীয়, আঙ্গুর ও ডুমুর ফল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর গাধাটিকে মৃত অবস্থায় রাখেন এবং তাদের এ অবস্থায় একশত বছর কেটে গেল।

৫৯২৪. হযরত উবায়দ ইব্নে সুলায়মান (র.) বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)–কে বলতে শুনেছি, তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দের অর্থ 'বিকৃত হয়নি' অথচ একশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

৫৯২৫. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৯২৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَمْ يَتَسَنَّهْ –এর অর্থ لَمْ يَتَغَيَّرْ অর্থাৎ 'বিকৃত হয়নি' বলেছেন।

৫৯২৭. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি لَمْ يَتَسَنَّهْ-এর অর্থ لَمْ يَتَغَيَّرْ অর্থাৎ 'বিকৃত হয়নি' বলেছেন।

৫৯২৮. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত لَمْ يَتَسَنَّهْ –এর অর্থ একশত বছরেও বিকৃত হয়নি।

৫৯২৯. বাকর ইব্ন মুযার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্ণনাকারিগণ উল্লেখ করেন যে, কোন কোন আসমানী কিতাবে এরূপ ঘটনা বর্ণিত রয়েছে ঃ যখন বুখ্ত্ নাসারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, তখন আরমিয়া (আ.) ঈলিয়া বা বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছিলেন। ধ্বংসযজ্ঞের পর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করে মিসরে চলে যান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করেন এবং সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করার জন্যে আদেশ দেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে এটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত দেখেন। তাই তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন, اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا অর্থাৎ এটাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন? তারা পর তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা একশত বছর মৃত অবস্থায় রাখেন। তারপর তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। তাঁর গাধাটিও জীবিত হয়ে উঠল এবং দন্ডায়মান অবস্থায় পাওয়া গেল। হযরত উযায়র (আ.)–এর খাদ্যসামগ্রী ছিল এক ঝুড়ি আঙ্গুর ও এক ঝুড়ি ডুমুর, যা অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় ছিল। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আমাকে সালিম আল–খাওয়াস (র.) বলেছেন যে, হযরত উযায়র (আ.)–এর খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় ছিল এক ঝুড়ি আঙ্গুর, এক ঝুড়ি ডুমুর এবং এক জগ ফলের রস।

কেউ কেউ لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দের অর্থ বলেছেন لَمْ يَتَنَتَّنْ অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৩০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দের অর্থ করেন। لَمْ يَنْتَنْ অর্থাৎ দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি।

৫৯৩১. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে এ আয়াতাংশে উল্লিখিত لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দটির একই রূপ অর্থ বর্ণিত রয়েছে।

৫৯৩২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত اِلٰى طَعَامِكَ সম্বন্ধে বলেন যে, তাঁর খাদ্য সামগ্রী ছিল এক ঝুড়ি ডুমুর এবং পানীয় ছিল একপাত্র শরবত যা দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি। বর্ণনাকারী ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, আমি ধারণা করছি যে, মুজাহিদ (র.), রবী' (র.) এবং যারা এদেরকে সমর্থন করেছেন, তাঁরা সকলে অভিমত দিয়েছেন যে, সূরা হিজরের ৩৩নং আয়াতে উল্লিখিত مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ এর مَسْنُوْنٍ শব্দটি যে মূল থেকে নির্গত হয়েছে এ আয়াতের يَتَسَنَّهْ শব্দটিও একই মূল থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু। যেমন বক্তা বলে থাকে تَسَنَّنْ -

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা এরূপ হতে পারে না। তদুপরি যদি কোন ধারণাকারী ধারণা করেন যে, لَمْ يَتَسَنَّهْ শব্দটি اَسِنَ থেকে নির্গত হয়েছে যেমন বক্তা বলে থাকে اَسِنَ هٰذَا الْمَاءُ يَاسَنُ اَسِنًا অর্থাৎ এ পানিটা ময়লাযুক্ত হয়ে পড়েছে। مضارع -এর صيغه বলা হয় يَاسَنُ এবং مصدر -এ বলা হয় اَسِنًا যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমের সূরা মুহাম্মাদের ১৫নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ অর্থাৎ তাতে আছে নির্মল পানির নহর। যদি ধারণাকারীর ধারণা গ্রহণ করা হয়, তাহলে বাক্য হতো এরূপ يَتَاَسَّنْ يَتَسَنَّهْ এবং فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَاَسَّنْ হতো না। যদি বলা হয় যে, -এর অনুরূপ শুধুমাত্র পার্থক্য হলো, يَتَسَنَّهْ -এর মধ্যে همزه -কে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তাহলে উত্তরে বলা হবে, শুধুমাত্র همزه -কে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে যদি ধরে নেয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে تشديد -এর উপর কোন نون -এর يَتَاَسَّنْ দেয়া হয়েছে কিন্তু تشديد -কে نون -তে يَتَسَنَّهْ নেই। এমনকি এতে تشديد দেয়া বৈধ নয় । পুনরায় যদি يَتَاَسَّنْ-এর همزه -কে বাদ দিয়ে পড়া হয়, তাহলে বলতে হবে يَتَسَنَّنْ এতে نون -কে تخفيف করে তার সাথে ه -কে না মিলিয়ে পড়তে হয়। তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, يتسنه -কে اَسِنٌ থেকে নির্গত বলে ধরে নেয়া কোনক্রমে বৈধ নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ -এর ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ ঃ وَانْظُرْ اِلٰى اِحْيَائِىْ حِمَارَكَ وَاِلٰى عِظَامِهٖ كَيْفَ اُنْشِزُهَا ثُمَّ اَكْسُوْهَا لَحْمًا অর্থাৎ তোমার গাধাটিকে আমার জীবিত করার ব্যাপার সম্বন্ধে লক্ষ্য কর। আর তার অস্থিগুলোর দিকে দৃষ্টি কর যে, আমি কিভাবে এগুলোকে মিলিত করছি, পুনরায় এগুলোকে গোশ্‌ত পরিধান করিয়ে দিয়েছি।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ পুনরায় একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)-এর পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টি করার পর তাঁর গাধাটিকে

জীবন দান করতে ইচ্ছা করেন, যাতে হযরত উযায়র (আ.)–এর কাছে পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরটি জীবিত করার রূপরেখা উপস্থাপন করতে পারেন। সুতরাং হযরত উযায়র (আ.) বিস্মিত হয়ে হঠাৎ বলে ফেলেন যে, এ নগরটিকে এরূপ শোচনীয় ভাবে ধ্বংস করার পর আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে পুনর্জীবিত করবেন !

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৩৩. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)–কে পুনর্জীবিত করেন এবং বলেন, كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ اِلٰى قَوْلِهٖ ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا অর্থাৎ তুমি কতকাল অবস্থান করেছিলে? তিনি বল্লেন, একদিন অথবা একদিনের কম ..... তারপর অস্থিগুলোকে গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উযায়র (আ.) তাঁর গাধাটির দিকে দৃষ্টি করলেন, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলছে, অথচ এর হাড়, মাংস ও মাংসপেশীসহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর অস্থিগুলোকে গোশত দ্বারা ঢেকে দেয়া হলো, জীবন দান করা হলো, তখন এটি দাঁড়িয়ে ডাকতে আরম্ভ করল। তিনি তাঁর পানীয়, ফলের রস ও খাদ্যসামগ্রীর দিকে দৃষ্টি করলেন। দেখলেন, এগুলো এদের পূর্বতন অবস্থায় রয়েছে, যখন তাদের রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তিনি যখন আল্লাহ্ তা'আলার এ মহান ক্ষমতা অবলোকন করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৩৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)-কে জীবিত করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, তুমি কতকাল অবস্থান করেছিলে? জবাবে তিনি আরয করেন, একদিন, একদিনের কম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, না, না, তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। তুমি তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় বস্তুগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, দেখবে, এগুলো বিকৃত হয়নি। তোমার গাধাটির দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখ, তা ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং তার অস্থিগুলো ভস্ম হয়ে গিয়েছে। পুনরায় দেখ, কিভাবে অস্থিগুলিকে একটির সাথে অন্যটিকে মিলিত করি। এরপর অস্থিগুলোকে গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি বায়ু প্রেরণ করেন, যা প্রতিটি উঁচুনীচু ভূমি থেকে গাধার অস্থিগুলোকে নিয়ে এলো এবং একটি জায়গায় এগুলোকে জড় করল, অথচ এগুলোকে পূর্বে পশু ও পাখী ভক্ষণ করে ফেলেছিল। অস্থিগুলোর একটি অপরটির সাথে মিলিত হলো অথচ সে সময় তিনি তা তাকিয়ে দেখছিলেন। অস্থিগুলোর সাহায্যে পূর্ণ একটি গাধার কাঠামো তৈরী হয়ে গেল, যার মধ্যে এখনও কোন প্রকার গোশত ও রক্ত মিশ্রিত করা হয়নি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা অস্থিগুলোকে গোশত পরিধান করালেন। তারপর রক্ত ও গোশতের গাধা তৈরী হলো, কিন্তু তারমধ্যে কোন জীবন ছিল না। কিছুক্ষণ পর একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হলেন এবং গাধাটির নাকের কাছে গেলেন ও তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন। তখন গাধাটি ডাকতে আরম্ভ করল। এরপর হযরত উযায়র (আ.) বললেন, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত বিশ্লেষণকারীর উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায় এরূপ ঃ হে উযায়র (আ.)! তোমার গাধাটিকে জীবিত করার রূপরেখার দিকে তুমি দৃষ্টিপাত কর আর তার অস্থিগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখবে যে কেমন করে

আমি এ অস্থিগুলোর একটিকে অপরটির সাথে মিলিত করছি এবং এগুলোতে গোশতের পোশাক পরিধান করিয়ে দিচ্ছি। আর তা এজন্য করা হচ্ছে যাতে তোমাকে আমি মানব জাতির জন্যে একটি নিদর্শন স্বরূপ পেশ করতে পারি।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ –এর মধ্যে اَحْيَائِىْ কথাটি উহ্য রয়েছে, যা বাক্যের উপস্থাপনার ভঙ্গিতে সহজে প্রতীয়মান হয়। কাজেই প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি।

আরো বলা যায় যে, وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ –এর মধ্যে اَلْعِظَامِ শব্দের الف ولام টি ه সর্বনাম পদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ اِلٰى عِظَامِهٖ অর্থাৎ عِظَامِ الْحِمَارِ বা গাধার অস্থিসমূহ।

আবার তাদের মধ্যে কোন কোন তাফসীরকার বলেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)–এর চোখে রূহ ফুঁকে দেবার পর বলেছিলেন "وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ الخ" –। তাঁরা আরো বলেন, চোখ ছিল হযরত উযায়র (আ.)–এর অংগসমূহের মধ্য থেকে প্রথম অংগ, যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রূহ ফুঁকে দেন। আর রূহ ফুঁকে দিবার ঘটনা ঘটেছিল তাঁর অবকাঠামোকে সুদৃঢ় করার পর এবং গাধাটিকে জীবিত করার পূর্ব মুহূর্তে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৩৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিটি ছিলেন ইসরাঈল গোত্রের, যার দু'চোখে আল্লাহ্ তা'আলা রূহ ফুঁকে দেন। তখন তিনি তাঁর শরীরের দিকে লক্ষ্য করছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জীবিত করছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর গাধার দিকেও লক্ষ্য করছিলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তা জীবিত করছিলেন।

৫৯৩৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর একটি সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৯৩৭. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা চক্ষুদ্বয় দিয়েই হযরত উযায়র (আ.)–এর সৃষ্টি শুরু করেন। তারপর এই দুই চোখে রূপ ফুঁকে দেন। তারপর তাঁর অস্থিগুলোকে সৃষ্টি করেন। এগুলোর একটিকে অন্যটির সাথে মিলিত করেন। তারপর এ অস্থিগুলোতে স্নায়ু, গ্রন্থি ও গোশত পরিধান করান। তারপর তিনি তাঁর গাধার প্রতি দৃষ্টি করলেন। তখন দেখলেন, তাঁর গাধাটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং তার অস্থিগুলো সাদা রং ধারণ করে এমন জায়গায় পড়ে রয়েছে, যেখানে তিনি গাধাটিকে এককালে বেঁধে রেখেছিলেন। তখন এ অস্থিগুলোর প্রতি আদেশ নাযিল হয় যে, হে অস্থিসমূহ ! তোমরা একত্র হয়ে যাও। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি রূহ অবতীর্ণ করবেন। তখন প্রতিটি অস্থি অন্যটির প্রতি দৌড়ে গেল। এভাবে অস্থিগুলো একে অন্যের সাথে মিলিত হয়ে গেল। তারপর স্নায়ু, গ্রন্থি, রগরেশা, গোশত, চামড়া, চুল ইত্যাদি স্বীয় অস্তিত্ব পেল। তাঁর গাধাটি ছিল অল্প বয়স্ক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বয়োবৃদ্ধ করে তৈরি করলেন। আর তাঁর খাদ্য সামগ্রী ছিল এক ঝুড়ি আঙ্গুর এবং পানীয় ছিল এক বোতল শরবত।

মুজাহিদ (র.) থেকে ইব্‌ন জুরাইজ (র.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)–এর

চক্ষুদ্বয়ে রূহ ফুঁকে দিলেন। তারপর হযরত উযায়র (আ.) চক্ষুদ্বয়ের সাহায্যে বিগলিত বস্তুগুলোর দিকে পুরোপুরি দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাঁর গাধাটির দিকেও দৃষ্টিপাত করলেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা গাধাটিকে জীবিত করছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)–এর মাথায় ও চোখে রূহ দান করেন, অথচ তাঁর শরীর ছিল মৃত। তখন তিনি গাধাকে এমন অবয়বে দাঁড়াতে দেখলেন যেমন সেখানে গাধাটিকে বাঁধার দিন ধারণ করছিল। আর তাঁর খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়কে এমন টাটকা অবস্থায় পেলেন যেমনটি ছিল ঐ ভূমিতে প্রবেশ করার দিন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেন, তুমি তোমার নিজ অস্থিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং দেখে নাও আমি কেমন করে এগুলোকে একটির সাথে অপরটি মিলিত করে দিচ্ছি।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৩৮. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আরমিয়া (আ.)–এর চোখে রূহ ফিরিয়ে দেন এবং তখনও শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলোকে মৃত অবস্থায় রাখেন। তিনি স্বীয় খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখেন, এগুলো তখনও বিকৃত হয়নি। তারপর তাঁর গাধাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখেন এটি বাঁধার দিনের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে, এখনও খাবার ও পানীয় খেয়ে শেষ করেনি। আর গাধাটির গলাবন্ধটিকে দেখেন এখনও তা নতুন রয়েছে অর্থাৎ তার নতুনত্ব এখনও বিবর্ণ হয়নি।

৫৯৩৯. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ (فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ) –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এরপর তিনি তাঁর গাধার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন ও দেখতে পেলেন যে, এটি তখনও দন্ডায়মান অথচ তা একশত বছর মৃত অবস্থায় ছিল। আর তাঁর খাদ্য সামগ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পান যে, এখনও তা অবিকৃত অথচ তার উপর একশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এরপর তিনি অত্র আয়াতাংশ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রথম যে বস্তুটি আল্লাহ্ তা'আলা পুনর্জীবিত করেন, তা ছিল হযরত উযায়র (আ.)–এর মাথা। তারপর তিনি তাঁর সমস্ত শরীর সৃষ্টি হবার সময় অবলোকন করতে থাকেন।

৫৯৪০. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তারপর হযরত উযায়র (আ.) স্বীয় গাধাটির দিকে দৃষ্টিপাত করে তাকে দন্ডায়মান দেখতে পান এবং তাঁর খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে এগুলোকে অবিকৃত পান। হযরত উযায়র (আ.)–এর সর্বপ্রথম যে বস্তুটি পুনর্জীবিত করা হয়েছিল, তা ছিল তাঁর মাথা। তারপর তিনি তাঁর দেহের প্রতিটি অংগের সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করছিলেন এবং একটি অন্যটির সাথে মিলিত হবার বিষয়টিও লক্ষ্য করছিলেন। যখন তাঁর কাছে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা প্রকাশ পেয়ে যায়, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠেন, আমি জানি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৪১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে এরূপ বর্ণনা পৌঁছেছে, হযরত উযায়র (আ.)–এর সর্বপ্রথম যে অংগটি সৃষ্টি করা

হয়েছিল, তা ছিল তাঁর মাথা। তারপর মাথায় চক্ষুদ্বয় সংযোজন করা হয়। পরে তাঁকে বলা হয়, তুমি লক্ষ্য কর, তখন তিনি লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর অস্থিগুলোর একটি অন্যটির সাথে মিলিত হতে লাগল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নবী হযরত উযায়র (আ.)–এর পূর্ণ অবয়ব সৃষ্টি করা হলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলার নবী হযরত উযায়র (আ.) বললেন, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলাসর্ববিষয়েসর্বশক্তিমান।

৫৯৪২. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর গাধাটিকে তাঁর কাছে পুনর্জীবিত করা হয়েছিল যেরূপ পূর্বে ছিল। তিনি وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে (আল্লাহ্ সবচেয়ে প্রজ্ঞাময়) হযরত উযায়র (আ.)–এর শরীরের যে অংগটি প্রথমে পুনর্জীবিত করা হয়েছিল, তা ছিল তাঁর চক্ষুদ্বয়। তারপর তাঁকে বলা হয়, দৃষ্টিপাত কর। তখন তিনি তাঁর অস্থিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং দেখতে পেলেন, একটি অস্থি অন্যটির সাথে মিলিত হচ্ছে। আর তিনি তা নিজ চোখে অবলোকন করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৪৩. হযরত ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, একশত বছর হতে সে তোমার কাছে দণ্ডায়মান। তিনি وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তুমি তোমার অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো, এগুলোকে আমি কিভাবে জীবিত করে দিচ্ছি। আর চেয়ে দেখ, কিভাবে আমি এ পৃথিবীকেও ধ্বংসের পর পুনর্জীবিত করি। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর চোখে ও জিহ্বায় রূহ দান করেন এবং বলেন, তুমি এখন জিহ্বা দ্বারা দু'আ করো, যে জিহ্বায় আল্লাহ্ তা'আলা রূহ দান করেছেন এবং তোমার চক্ষু দ্বারা তুমি লক্ষ্য করো। তখন তিনি তার মাথার খুলির দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি অস্থিকে পার্শ্ববর্তী অস্থির সাথে মিলিত হবার আদেশ দেন। তখন প্রত্যেক অস্থিই তার পার্শ্ববর্তী অস্থির সাথে মিলিত হলো। আর তিনি তা দেখছিলেন। এমনকি প্রত্যেকটি অস্থির টুকরো তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্থানে পৌঁছে গেল। এরূপে প্রত্যেকটি অস্থির সম্পর্ক খুলি পর্যন্ত স্থাপিত হলো। তিনি তা প্রত্যক্ষ করছিলেন। অস্থিগুলো একটি অপরটির সাথে মিলিত হবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে স্নায়ু ও গ্রন্থি দ্বারা মযবূত করলেন এবং এগুলোর উপর গোশত ও চামড়া জড়িয়ে দিলেন। এরপর তাতে রূহ ফুঁকে দিলেন। তারপর হযরত উযায়র (আ.)–কে বলা হলো, তুমি অস্থিসমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও, তাহলে দেখতে পাবে আমি কিরূপে এদের একটিকে অপরটির সাথে মিলিত করে দিচ্ছি এবং এরপর এগুলোতে গোশত জড়িয়ে দিচ্ছি। যখন আল্লাহ্ তা'আলার নবী হযরত উযায়র (আ.)–এর কাছে এসব প্রকাশ পেয়ে গেল, তিনি বললেন, আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

উক্ত বর্ণনাকারী আরো বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)–কে অস্থিগুলোর প্রতি আহবান জানাবার জন্যে আদেশ দিলেন। আদেশপ্রাপ্ত হয়ে হযরত উযায়র (আ.) যেসব অস্থি সম্পর্কে

বলেছিলেন, কিরূপে এগুলোকে মৃত করার পর আল্লাহ্ তা'আলা পুনর্জীবিত করবেন, সে গুলোকে এবং নিজের শরীরের অস্থিগুলোকে সম্বোধন করে কাছে ডাকলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যেমনিভাবে জীবিত করেছিলেন, অনুরূপভাবে অস্থিগুলোকে ও জীবিত করলেন।

৫৯৪৪. বাকর ইব্‌ন মুযার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐতিহাসিকগণ বলতেন যে,কোন কোন আসমানী কিতাবে ঘটনাটি এরূপ উল্লিখিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আরমিয়া (আ.)-কে একশত বছর মৃতাবস্থায় রাখলেন। এরপর তাঁকে পুনর্জীবিত করলেন। তখন তিনি তাঁর গাধাটিকে জীবিত ও বাঁধনের জায়গায় দন্ডায়মান দেখতে পান। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আরমিয়া (আ.)-কে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে পুনর্জীবিত করার ত্রিশ বছর পূর্বে তিনি তাঁর মধ্যে রূহ প্রদান করলেন। এরপর আরমিয়া (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি দৃষ্টি করেন এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্ত এলাকা কিরূপে আবাদযোগ্য করা হলো এতে আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তির পরিচয় পেলেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন যে, اَوْكَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ الخ " -এর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তবে তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতাংশের অর্থ এ নেয়া যেতে পারে যে, হে উযায়র (আ.)। তুমি তোমার গাধাটির দিকে তাকিয়ে দেখ, তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করব এবং তোমার অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর কিভাবে আমি তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর একটির সাথে অন্যটিকে মিলিত করছি, তারপর এগুলোকে গোশত দিয়ে ঢেকে দিয়েছি এবং তোমাকে জীবন দান করার সাথে সাথে তাদেরকেও জীবন দান করেছি। তারপর তুমি জানতে পারবে, কেমন করে আল্লাহ্ তা'আলা নগরসমূহ ও তাদের বাশিন্দাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত উক্তিসমূহের মধ্য থেকে নিম্ন বর্ণিত উক্তিটি আমার দৃষ্টিতে অধিক শুদ্ধ। তা হলো, মহান রাব্বুল আলামীন اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (অর্থাৎ কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা এ শহরকে ধ্বংসের পর জীবিত করবেন?) যিনি এ প্রশ্ন উত্থাপন করেন তাঁকেই মৃত্যু দিয়ে আবার জীবন দান করলেন। তারপর তিনি যে নগরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনর্জীবিত করলেন। তাঁর নিজের পুনর্জীবন এবং খাদ্য ফিরে পাওয়া ও গাধার অবস্থা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে, কিভাবে তিনি মৃতকে জীবন দান করবেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ও তাঁর গাধাকে জীবিত করার কথা উল্লেখ করে একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। কেননা, তিনি যে শহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তার পুনর্জীবনের ব্যাপারে তিনি সন্দেহ করেছিলেন। এ ঘটনার মাধ্যমে তথা তাঁর পানাহারের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাক তাঁর জন্য একটি উপদেশ রেখেছেন। শহরটিকে পুনর্জীবন দানের ব্যাপারে একটি প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আর এ ব্যাখ্যাই মুজাহিদ (র.) পেশ করেছেন। যা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। এমতকে আমরা উত্তম বলে মেনে নেয়ার কারণ হলো, আল্লাহ্ পাকের বাণী وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ (অর্থাৎ তুমি অস্থিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ)-এর দ্বারা ঐসব অস্থির প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্যে বলা হয়েছে, যেগুলোকে তিনি স্বচক্ষে দেখছিলেন যে, কিরূপে আমি এগুলোকে একটির সাথে অন্যটিকে মিলিত করছি। তারপর এদেরকে গোশত দ্বারা আবৃত করছি, অথচ তাঁর গাধাটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অনুরূপভাবে যাকে দৃষ্টিপাত করার আদেশ করা হয়েছিল, তার অস্থিগুলোর যে

একই দশা হয়েছিল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কাজেই, وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ দ্বারা শুধু তাঁর গাধার অস্থিগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে বলা হয়েছে এবং তার নিজের অস্থিগুলোর কথা বলা হয়নি, কিংবা শুধু তার নিজের অস্থিগুলোর কথা বলা হয়েছে এবং তাঁর গাধার অস্থিগুলোর কথা বলা হয়নি। –এরূপ অর্থ নেয়া সঙ্গত হতে পারে না। কেননা, তাঁর এবং গাধার অস্থি সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কাজেই যা কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তার প্রত্যেকটির প্রতিই দৃষ্টিপাত করার জন্যে বলা হয়েছিল– এ অভিমতটি সবচেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা, সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম ক্ষমতার নিদর্শন এবং সকলের জন্যে উপদেশ রেখেছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তোমাকে একশত বছর মৃত রেখেছি পুনরায় তোমাকে জীবিত করেছি যাতে আমি তোমাকে মানব জাতির জন্যে নিদর্শন স্বরূপ পেশ করতে পারি।

وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আয়াতাংশে لام এর সাথে واو –কে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এখানে لام –এর অর্থ "كى" অর্থাৎ যেহেতু। "كى" –এর ন্যায় অন্য অব্যয়গুলোর সাথেও যদি واو আসে তাহলে এটা বুঝায় যে, তা পরবর্তী ক্রিয়া বা فعل এর জন্যে شرط হিসাবে কাজ করছে, অর্থাৎ তোমাকে এরূপ এরূপ প্রতীক হিসাবে সুপরিচিত করাবার জন্যে আমি এরূপ করেছি। আর যদি لام –এর পূর্বে واو না থাকত, তাহলে لام –এর পূর্বে উল্লিখিত فعل বা ক্রিয়াটি পূর্ববর্তী فعل বা ক্রিয়ার জন্যে شرط হিসাবে গণ্য হতো। তখন আয়াতের অর্থ হতো এরূপ– এবং তুমি তোমার গাধাটির দিকে লক্ষ্য কর এজন্যে যে, তোমাকে আমি মানব জাতির জন্যে নিদর্শনস্বরূপ প্রমাণ করব। অথচ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে– "এবং যে আমার ক্ষমতাকে বুঝেনি এবং আমার মাহাত্ম্যে সন্দেহ পোষণ করেছে, তাদের জন্য তোমাকে নিদর্শন ও দলীল রূপে পেশ করব। কেননা, জীবন ও মরণ, ধ্বংস ও সৃজন, পুরস্কার প্রদান ও অপমানিত করা এবং ধনী ও দরিদ্র করা সবই আমার হাতে, আমি ব্যতীত কেউই এগুলোর মালিক নয় এবং আমি ব্যতীত কেউ এগুলোর পরিচালনা ক্ষমতাও রাখে না।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, হযরত উযায়র (আ.) ছিলেন সকল মানুষের কাছে আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন। কেননা, তিনি একশত বছর পর তাঁর সন্তান–সন্ততির নিকট ফিরে এসেছিলেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক আর তারা ছিল বৃদ্ধ।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৪৫. আ'মাশ থেকে বর্ণিত। তিনি وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি ছিলেন যুবক, আর তাঁর সন্তান-সন্ততিরা ছিল বৃদ্ধ। আবার কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি স্বীয় জনপদে আসলেন এবং দেখলেন, তাকে যে চিনত, সে মরে গেছে। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের যে সদস্যের কাছে আগমন করেছেন, তার কাছেই তিনি আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে গণ্য হয়েছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৪৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পুনর্জীবিত হবার পর হযরত উযায়র (আ.) নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং দেখতে পেলেন, তাঁর গৃহ ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে এবং পুনরায় তৈরি করা

হয়েছে। আর যাকে তিনি চিনতেন তারা পরলোক গমন করেছে। তখন গৃহে অবস্থানকারীদেরকে তিনি বললেন, তোমরা আমার গৃহ থেকে বের হয়ে যাও। তারা বলতে লাগল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি উযায়র (আ.)। তারা বলল, 'এত এত দিন পূর্বে কি উযায়র (আ.) হারিয়ে যাননি?' যখন তারা তাঁকে চিনতে পারল, তখন তারা ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল এবং তাঁকে গৃহটি দিয়ে দিল।

সুতরাং আয়াতটির উত্তম ব্যাখ্যা হলো এরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত উযায়র (আ.)–কে সংবাদ দিলেন, "এ আয়াতে মৃতকে জীবিত করার যে গুণ আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, তা মানব জাতির জন্যে একটি দলীল হিসাবে গণ্য। এরপর তাঁর যে সন্তান তাঁকে চিনেছে, তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অবগত হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছে এবং যাদের কাছে তাঁকে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের সকলের কাছে এটি একটি অকাট্য প্রমাণ ও দলীলরূপে গণ্য।"

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে যে অস্থিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করার কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, তাঁর নিজের ও তাঁর গাধাটির অস্থিসমূহ। আর এ সম্পর্কে উলামা কিরামের মতামত উল্লেখ করেছি। কাজেই প্রত্যেকের অভিমত পুনরায় উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে كَيْفَ نُنْشِزُهَا –এর পঠনরীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ পড়েছেন وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا অর্থাৎ نُنْشِزُهَا এর ن ও ز বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া। আর এটি কূফার সাধারণ অধিবাসীদের কিরাআত। অর্থ হবে ঃ তুমি লক্ষ্য কর, কেমন করে একটিকে অপরটির সাথে আমি মিলিত করি এবং এদেরকে শরীরের বিভিন্ন অংশে স্থানান্তর করছি। نَشَزَ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো উঁচু হওয়া। এর থেকে বলা হয়ে থাকে قَدْ نَشَزَ الْغُلَامُ অর্থাৎ ছেলেটি লম্বা হয়েছে এবং যুবক হয়েছে। এর থেকে আবার বলা হয়ে থাকে نُشُوْزُ الْمَرْاَةِ عَلٰى زَوْجِهَا –। আবার এর থেকে বলা হয়ে থাকে نَشَزَ وَنُشُزَةً وَنَشَازَةً –কাউকে উপরের দিকে উঠাতে হলে বলা হয়ে থাকে اَنْشَزْتُهُ اِنْشَازًا অর্থাৎ তাকে আমি বেশ উঁচুতে উত্তোলন করেছি। যখন কেউ উচ্চভূমিতে আরোহণ করে, তখন বলা হয় نَشَزَ هُوَ –। কাজেই এখন যারা ز সহকারে পড়ে তাদের মতে وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا–এর অর্থ হবে, তুমি অস্থিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং চিন্তা করে দেখ কিভাবে আমি তাদেরকে তাদের জায়গা থেকে উত্তোলন করছি এবং তাদেরকে শরীরের যথোপযুক্ত জায়গায় স্থাপন করছি। উল্লিখিত এ অভিমতটি তাফসীরকারদের একটি সম্প্রদায় গ্রহণ করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৪৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ "كَيْفَ نُنْشِزُهَا" সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে "كَيْفَ نُخْرِجُهَا" (অর্থাৎ কিরূপে আমি এগুলোকে বের করে আনছি)।

৫৯৪৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি كَيْفَ نُنْشِزُهَا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে كَيْفَ نُحَرِّكُهَا (অর্থাৎ কিরূপে আমি এদেরকে সতেজ ও এদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করছি।)

وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا আবার কেউ কেউ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا -কে পড়েছেন, অর্থাৎ তুমি অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কিরূপে আমি এগুলিকে জীবিত করি। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে اَنْشَرَ اللّٰهُ الْمَوْتٰى فَهُوَ يُنْشِرُهُمْ اِنْشَارًا (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি তাদেরকে জীবিত করে থাকেন।) তদনুযায়ী আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, তুমি অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, কিরূপে আমি আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে জীবিত করি, পুনরায় এদেরকে গোশত জড়িয়ে দেই। যে সব বিশ্লেষণকারী এ অভিমত সমর্থন করেন, তাঁরা তাদের অভিমতের দলীল হিসাবে নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলো উপস্থাপন করেন ঃ

৫৯৪৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি كَيْفَ نُنْشِزُهَا -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন অস্থিগুলোকে জীবিত করেন, তখন আল্লাহ্র নবী (আ.) এদের প্রতি লক্ষ্য করেন।

৫৯৫০. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৫৯৫১. কাতাদা (র.) থেকে ও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৯৫২. ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا প্রসঙ্গে বলেন, তুমি লক্ষ্য কর কিরূপে আমি এদেরকে জীবিত করি।

যে সব কিরাআত বিশেষজ্ঞ نُنْشِرُهَا পড়েছেন, তাদের কেউ কেউ এ কিরাআতকে শুদ্ধতম প্রমাণ করার জন্যে কুরআনে করীমের সূরা আবাসার ২২তম আয়াতটি উল্লেখ করেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ (অর্থ ঃ এরপর যখন ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা পুনর্জীবিত করবেন।) তাই তাঁরা তাদের উল্লিখিত কিরাআতকে শুদ্ধতম মনে করেন। এরপর بِهٖ কথাটি যুক্তকরেছেন এবং বলেছেন, বাক্যাংশ হবে এরূপ ঃ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا بِهٖ -পুনরায় কেউ কেউ পড়েছেন وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا অর্থাৎ نُنْشِرُ শব্দে প্রথম نون -কে যবর এবং ز বর্ণের পরিবর্তে ر সহকারে পড়েছেন। আর এ আয়াতাংশের অর্থ বলেছেন, যেমন আমরা বলে থাকি نَشَرَ الشَّيْءَ وَطِيَّةً (অর্থঃ তিনি এ বস্তুটির সুনির্দিষ্ট আকার দান করেন)। তবে কিরাআতটি তত প্রশংসার যোগ্য নয়, কেননা আরবরা মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কখনও বলে না, نَشَرَ الْمَوْتٰى বরং তারা বলে, اَنْشَرَ اللّٰهُ الْمَوْتٰى فَنَشَرُوْا (অর্থ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করেছেন সুতরাং তারা জীবিত হয়েছেন।) আর উপরোক্ত আয়াত ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ দ্বারাও এটাই বুঝা যায়। পুনরায় সূরা আম্বিয়ার ২১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, اَمِ اتَّخَذُوْا اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ (অর্থ ঃ তারা মৃত্তিকা হতে তৈরী যেসব দেবতা গ্রহণ করেছে সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম?) এতে বুঝা যায়, যখন মৃতকে জীবিত করা অথবা মৃত্যুর পর জীবিত থাকাকে বুঝায়, তখন আরবরা نشر শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। যেমন বনী ছা'লাবার আশা নামক একজন বিখ্যাত কবি বলেছেন ঃ

حَتّٰى يَقُوْلَ النَّاسُ مِمَّا رَاَوْا * يَا عَجَبًا لِلْمَيِّتِ النَّاشِرِ

(অর্থ ঃ যখন জনসাধারণ তাকে লক্ষ্য করল, তখন তারা বলতে লাগল, এ পুনর্জীবিত মৃত ব্যক্তিকে দেখে বিস্মিত হতে হয়।)

আরবদের কাছে এ ঘটনাটি সুপরিচিত। কথিত আছে, আশা নামক প্রসিদ্ধ কবি একবার পাঁচড়া রোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসার পর সে সুস্থ হয়ে ওঠে। তখন কবি তার নিজের সম্বন্ধে বললোঃ اَلْمَيِّتِ النَّاشِرِ (অর্থ ঃ মৃত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করে জীবিত হয়েছে।)

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (রা.) বলেন, আমার মতে اَلْاِنْشَارُ এবং اَلْاِنْشَارُ –এ দু'টি শব্দ প্রায় একই অর্থ বহন করে। কেননা, اَلْاِنْشَارُ –এর অর্থ মিলিত করা ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সুতরাং অস্থিগুলোকে একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা ও পুনরায় মিলিত করা নিঃসন্দেহে শরীরের মধ্যে একটি অংগকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে পৃথক করার পর পুনরায় মিলিত করা। কাজেই এ দুটো শব্দ যদিও কাঠামোর দিক দিয়ে বিভিন্ন, অর্থের দিক দিয়ে নিকটতর। মুসলিম উম্মাহ্ থেকে দুটো পঠন–রীতিই বর্ণিত রয়েছে। কাজেই এখানে কোন প্রকার ওযুর আপত্তি প্রদর্শন না করে এটি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। অন্য কথায়, যেভাবেই পড়া হোক না কেন, তা মেনে নেয়া আবশ্যক। একটিকে শুদ্ধ বলে অন্যটিকে অশুদ্ধ বলা যাবে না; কিংবা একটিকে গ্রহণ করে অপরটিকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না।

যদি কেউ ধারণা করেন যে, اِحْيَاءٌ বা জীবিত করার ক্ষেত্রে اِنْشَارٌ কথাটি অধিক বিশুদ্ধ। কেননা যাকে সদ্য জীবিত হবার পথে বিধায় অস্থিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে, তাকে এজন্য হুকুম দেয়া হয়েছে যেন তিনি " اَنّٰى يُحْيِىْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا " কথার মাধ্যমে যেই ক্ষমতাকে বুঝতে পারেনি বলে প্রকাশ ঘটেছে তা যেন সে স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারে।

এরূপ ধারণা এখানে শুদ্ধ হতে পারে না। কেননা, এখানে অস্থিগুলোর জীবিত অবস্থা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তবে اِحْيَاءٌ –এর দ্বারা দৃষ্ট দ্রব্যের শরীরের বিভিন্নাংশে অস্থিগুলোর সঠিকভাবে স্থান দখল করার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর সময় যেরূপ আত্মা দেহ থেকে বিদায় নিয়েছিল তার প্রত্যাবর্তনের কথা এখানে বলা হয়নি। কারণ পরবর্তী বাক্যাংশে বলা হয়েছে ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا (অর্থ ঃ আমি এগুলোতে গোশত জড়িয়ে দিয়েছি)। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, গোশত জড়িয়ে দেয়ার পর যে অস্থিগুলো দৃষ্ট হচ্ছে এগুলোকে পূর্বেই রূহ ফুৎকার করা হয়েছিল। সুতরাং যখন বিষয়টি এরূপ বলেই প্রমাণিত, তখন اِنْشَارٌ –এর অর্থ হবে অস্থিগুলো জোড় দেয়া এবং শরীরের বিভিন্ন সঠিক জায়গায় এগুলোকে স্থাপন করা। আর اِنْشَارٌ –এর অর্থও একই রূপ। সুতরাং দেখা যায় اِنْشَارٌ ও اِنْشَارٌ –এর অর্থ ভিন্ন রূপ নয়, বরং এ দুটির অর্থ অভিন্ন।

ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে আমার পূর্বেকার মন্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। তৃতীয় প্রকারের কিরাআতটি আমার কাছে বৈধ বলে প্রমাণিত হয়নি। আর তা হচ্ছে كَيْفَ نَنْشُرُهَا অর্থাৎ প্রথম نون –কে যবর দেয়া এবং ر সহকারে পাঠ করা। এ কিরাআতটি মুসলিম উম্মার কাছে বিরল (شاذ) বলে পরিচিত এবং আরবী ভাষাভাষীদের নিকট এটি শুদ্ধ কিরাআত সমূহের বহির্ভূত।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا –এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত " هَا " সর্বনামটি দ্বারা اَلْعِظَامَ –কে বুঝানো হয়েছে। আর نَكْسُوْهَا –এর অর্থ نُلْبِسُهَا وَنُوَارِيْهَا بِهِ অর্থাৎ তাকে পরিধান করাই। যেমন

বলা হয়ে থাকে كَمَا يُوَارِي جَسَدَ الْاِنْسَانِ كِسْوَتُهُ الَّتِى يَلْبَسُهَا অর্থঃ যেমন পরিধেয় বস্ত্র পরিধানকারীকে ঢেকে ফেলে। অনুরূপভাবে আরবরা যখন কোন বস্তুকে ঢেকে ফেলে এবং যে বস্তুটি অন্যটিকে ঢেকে ফেলেছে, তাকে অন্যটার জন্যে পোশাক হিসাবে গণ্য করে, যেমন النَّابِغَةُ الْجَعْدِى নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি বলেছেন ঃ

فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اِذْ لَمْ يَاتِنِيْ اَجَلِىْ * حَتّٰى اكْتَسَيْتُ مِنَ الْاِسْلَامِ سَرْبَالاً ـ

অর্থাৎ আমার ইসলামের পায়জামা বা পোশাক পরিধান করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যদি আল্লাহ্র আদেশে আমার কাছে আমার মৃত্যু না আসে, তাহলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করব, অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যই সংরক্ষিত। এ কবিতায় ইসলামকে তাঁর পোশাক হিসাবে কবি গণ্য করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (যখন তা তার নিকট সুস্পষ্ট হলো, তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি যে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।) –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী বলেন, স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি স্বচক্ষে তা দেখলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও মাহাত্ম্য তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি বলে উঠলেন, এবার আমি বুঝলাম যে, আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান।

পুনরায় কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতে উল্লিখিত اَعْلَمُ শব্দের পাঠ পদ্ধতি সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, اَعْلَمَ কথাটি اِعْلَمْ হবে অর্থাৎ واحد مذكر حاضر –এর صيغه হবে এবং امر –এর কারণে সর্বশেষ অক্ষর মীমকে جزم দিয়ে পাঠ করা হয়েছে। আর তা হলো সাধারণ কূফাবাসিগণের পাঠ পদ্ধতি। তাঁরা বলেন, তা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ বর্ণিত কিরাআত। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত اِعْلَمْ শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে জেনে নেয়ার জন্যে তাকে বলা হয়েছে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করতে হুকুম করলেন, যা তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। অনুরূপ ব্যাখ্যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণনা করা হয়েছে।

৫৯৫৩. হারূন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত اَعْلَمُ শব্দটি সম্বন্ধে বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত পাঠ পদ্ধতিতে اِعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ পড়া হয়েছে অর্থাৎ امر –এর صيغه হিসাবে اِعْلَمْ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫৯৫৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এ আয়াত তিনি এভাবে পড়েছেন, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اِعْلَمْ অর্থাৎ اِعْلَمْ শব্দটি صيغه امر হিসাবে তিনি পাঠ করেছেন।

৫৯৫৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে (আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জানেন) যে, হযরত উযায়র (আ.)–কে বলা হয়, লক্ষ্য কর। তখন তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন যে, অস্থিগুলো কেমন করে একটি অন্যটির সাথে মিলিত হতে চলেছে। আর তা তিনি দু'চোখেই লক্ষ্য

করছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো اِعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থ ঃ জেনে নাও যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ঃ যখন তাঁর কাছে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও শক্তি–সামর্থ্য প্রকাশিত হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বললেন, এখন জেনে নাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। পুনরায় এখানে সম্বোধনকারী ও সম্বোধনকৃত ব্যক্তি একই জন হতে পারে। যে ব্যক্তি সম্বন্ধে ঘটনাটি এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তার পক্ষ থেকেই নিজেকে বলা হয়েছে। এ হিসাবেও তা امر –এর صيغه হতে পারে। আর তা একটি যুক্তিযুক্ত কারণও বটে। যেমন কোন ব্যক্তি অন্যকে সম্বোধন করার ন্যায় আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার করে নিজেকে বলে, "জেনে রেখো যে, তা সম্পন্ন হয়ে গেছে।"

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে শব্দটি হচ্ছে اَعْلَمُ অর্থাৎ همزه –কে যবর এবং ميم –কে পেশ দিয়ে পড়া। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে, যখন তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার মহান শক্তি ও প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং তিনিও তা স্বচক্ষে অবলোকন করলেন। তিনি বললেন, আমি কি এখনও জানি না যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। মদীনা তায়্যিবার সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এবং ইরাকের কিছু কিরাআত বিশেষজ্ঞ এরূপভাবে পাঠ করেছেন। আর একদল খ্যাতনামা মুফাসসিরও এধরনের পাঠ পদ্ধতি ও ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৫৬. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত উযায়র (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার মহান কুদরত ও ক্ষমতা স্বচক্ষে অবলোকন করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি জানি যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৫৭. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তাঁর কাছে সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি বললেন, আমি জানি, আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৫৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার নবী (আ.) অস্থিগুলোর পুনরুত্থানকে অবলোকন করে বলেন। আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৫৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা যখন গাধাটিকে পুনর্জীবিত করলেন, হযরত উযায়র (আ.) তা অবলোকন করে বললেন, আমি জানি, আল্লাহ্ তা'আলা নিঃসন্দেহে সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৬০. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। মহান আল্লাহ্র নবী (আ.) প্রত্যেকটি বস্তুর দিকে লক্ষ্য করছিলেন। যখন এগুলো একটি অপরটির সাথে মিলিত হচ্ছিল। তারপর যখন তাঁর কাছে সব কিছু প্রকাশিত হয়ে পড়ল, তখন তিনি বললেন, আমি জানি, আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৫৯৬১. ইব্ন ওয়াহ্ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দুটো পাঠ পদ্ধতির মধ্যে অধিক শুদ্ধ হলো। ঐসব বিশ্লেষণকারী যারা اِعْلَمْ –কে صيغه امر হিসাবে পাঠ করেছেন অর্থাৎ همزه

وصل এবং ميم –এ جزم দিয়ে পাঠ করেছেন। এতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে আদেশ দিচ্ছেন, যাকে মৃত্যুদানের পর জীবিত করেছেন, সে যেন একথা জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ শক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থে তাকে এবং তার গাধাকে একশত বছর মৃত রাখার পর পুনর্জীবিত করেছেন। আর বিচ্ছিন্ন বস্তুগুলোকে জীবন দান করেছেন। ফলে সেগুলো আবার পূর্বের ন্যায় রূপ ধারণ করেছে। যিনি তার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়কে একশত বছর পর পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছেন, এগুলোকে পূর্বের ন্যায় অবিকৃত রেখেছেন, তিনি প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ পুনর্জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন। তাফসীরকার আরো বলেন, আমি এ পাঠ পদ্ধতি নির্বাচন করেছি এবং এটিই শুদ্ধতম বলে ঘোষণা করেছি ও অন্যটিকে শুদ্ধ বলিনি। কারণ, এর পূর্বের বাক্যটিতে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ উল্লিখিত হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর জীবিত করলেন। তাঁকে উদ্দেশ করে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন, তুমি তোমার অবিকৃত খাদ্য সামগ্রী ও পানীয়ের প্রতি এবং তোমার গাধা ও অস্থিসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর কেমন করে এদেরকে গোশত দ্বারা ঢেকে দিচ্ছি। মৃত্যুর পর এগুলোকে কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত করবেন? প্রশ্নের উত্তর হিসাবে যখন সব কিছু প্রকাশ পেয়ে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বললেন, তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দেখা সব বস্তু পুনর্জীবিত করেন। তা তুমি যা দেখেছ, তার ন্যায় অন্যান্য বিষয়েও সর্বশক্তিমান। যেমন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রশ্ন রেখেছিলেন, رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ (অর্থ ঃ হে প্রতিপালক । আপনি আমাকে দেখান, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন।) মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর প্রশ্নের উত্তরে ইরশাদ করেন وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (অর্থ ঃ তুমি জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়)। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আদেশ দিলেন, তিনি যেন মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি অবগত হয়ে এ ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

(٢٦٠) وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

২৬০. যখন ইব্রাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক ! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও, তিনি বললেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস করনি? সে বলল, কেন করব না, তবে তা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। তিনি বললেন, তবে চারটে পাখী নাও এবং এদেরকে তোমার পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। তারপর এদেরকে ডাক দাও, এরা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট চলে আসবে। জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেনঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى – এর মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর প্রশ্নের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)। আপনি কি জানেন, যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) প্রশ্ন করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে দেখাও । আর وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ আয়াতাংশ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ এবং اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ এর উপর عطف করা হয়েছে। কেননা, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ الخ – এর মাধ্যমে চামড়ার চক্ষু দ্বারা লক্ষ্য করার কথা বলা হয়নি, বরং তার অর্থ, তুমি কি তোমার অন্তরের চক্ষু দ্বারা অবলোকন করনি? অন্য কথায় বলা হয়েছে, তুমি কি জান? সুতরাং দেখা যায় رؤية শব্দ দ্বারা এখানে علم অর্থ নেয়া হয়েছে। এজন্যই এটিকে কোন কোন সময় অর্থের সাথে সম্পৃক্ত বাক্য আবার কোন কোন সময় শব্দের সাথে সম্পৃক্ত বাক্যের উপর عطف করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের দরবারে আরযী পেশ করেছিলেন যে, কিভাবে তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তাঁর এ প্রশ্নের কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাঁর প্রতিপালককে প্রশ্নটি এজন্য করেছেন যে, একদিন তিনি একটি বস্তুকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, এটাকে অন্যান্য হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা ভাগাভাগি করে খেয়ে নিয়েছে। এজন্য তিনি তাঁর প্রতিপালককে এটা কিভাবে জীবিত করবেন, তা দেখাবার জন্য আরয করলেন। কেননা, এটির গোশত বিভিন্ন জন্তু–জানোয়ার এবং পাখীদের উদরে চলে গেছে, যাতে তিনি তা স্বচক্ষে দেখতে পারেন। আর এতে তাঁর বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ভান্ডার সম্বন্ধেও তাঁর কিছুটা অবগতি লাভ হয়। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিজ কুদরতের নমুনা দেখিয়েছিলেন। যে সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে উক্ত আদেশ দিয়েছিলেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৫৯৬২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى এ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন আল্লাহ্ তা'আলার খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ.) একটি জন্তুর কাছ দিয়ে গমন করার সময় অবলোকন করলেন অন্যান্য মাংসভোজী জন্তু–জানোয়ার এটিকে খেয়ে নিয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করে থাক? এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তুমি কি এতে বিশ্বাস স্থাপন কর না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে এটা শুধু আমার চিত্তের প্রশান্তি লাভ করার জন্যে।

৫৯৬৩. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى – এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) একদিন একটি জন্তুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। জন্তুটি ছিল মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর অস্থিগুলো বাতাস ও মাংসভোজী জন্তুগুলো খেয়ে নিয়েছে। এরূপ দৃশ্য দেখে হযরত ইব্রাহীম (আ.) থমকে দাঁড়ান এবং বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ্ ! কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলা এটিকে পুনর্জীবিত করবেন। অথচ তিনি জানেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা একাজটি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আর এ ঘটনাটিই আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতাংশে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى অর্থাৎ

ইব্রাহীম(আ.) ঐ জন্তুটি দেখে অবাক হয়ে আরয করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কেমন করে মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও।

৫৯৬৪. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এ ঘটনাটি এরূপ পৌছেছে যে, একদিন হযরত ইব্রাহীম (আ.) রাস্তা দিয়ে পথ চলছিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি একটি গাধার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পেলেন, যার মাংস মাংসভোজী জন্তু–জানোয়ার ও পাখী ভক্ষণ করে নিয়েছিল ও সেটির অস্থিগুলো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছিল। হযরত ইব্রাহীম (আ.) পাহাড়ে ও জংগলে পাখী ও মাংসভোজী জন্তু–জানোয়ারের প্রস্থান অবলোকন করে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি জানি, তুমি এগুলোকে জন্তু–জানোয়ার এবং পাখীদের পেট থেকে পুনরায় বের করে নিয়ে আসবে। তবে তুমি কিভাবে এ মৃতকে জীবিত করবে এদৃশ্যটি আমাকে দেখাও। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? উত্তরে ইব্রাহীম (আ.) বললেন, হ্যাঁ, তবে খবর জানা আর চোখে দেখা এক নয়।

৫৯৬৫. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত ইব্রাহীম (আ.)একটি বিরাট মৎস্যের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মৎস্যটির অর্ধেক অংশ স্থলভাগে এবং বাকী অংশ পানিতে ছিল। যে অংশ পানিতে ছিল, তা থেকে সাগরের প্রাণীসমূহ ভক্ষণ করছিল। আর যে অংশ স্থলভাগে ছিল, তা থেকে স্থলভাগের জন্তু-জানোয়ার ও পাখীসমূহ ভক্ষণ করছিল। শয়তান তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলল, হে ইব্রাহীম, তুমি কি ধারণা করতে পার যে, কখন আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে বিভিন্ন জন্তু–জানোয়ারের পেট থেকে বের করে একত্রিত করবেন? তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন, আমাকে এ দৃশ্যটি একটু দেখান। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি, তবে আমার চিত্তের প্রশান্তির জন্যই আমি এরূপ আরয করছি।

আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) ও নমরূদের মধ্যে যখন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এরূপ প্রশ্ন উথাপন করেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৬৬. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। যার বর্ণনা কুরআনুল করীমের সূরা আম্বিয়ায় উল্লেখ রয়েছে এবং ইব্রাহীম (আ.)–এর সম্প্রদায় যখন তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করছিল এবং তিনি যে আল্লাহ্র দিকে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, সে সম্পর্কে তারা নমরূদকে অবহিত করল, তখন নমরূদ হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে বলল, তুমি কি বলতে পার ঐ উপাস্যটি কে, যার ইবাদত তুমি করছ এবং অন্যকেও তাঁর ইবাদত করার জন্যে দাওয়াত দিচ্ছ? তদুপরি অন্যের ক্ষমতার চেয়ে তাঁর ক্ষমতার বেশী গুণগান কর ও তাকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে কর? হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাকে বললেন, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি অন্যকে জীবন ও মৃত্যু দান করেন। নমরূদ বলতে লাগল, আমিও জীবন এবং মৃত্যু দান করতে পারি। ইব্রাহীম (আ.) তাকে বললেন, তুমি কিভাবে জীবন এবং মৃত্যু দান কর? এরপর বর্ণনাকারী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইব্রাহীম (আ.) ও নমরূদের মধ্যকার বিতর্কের বিশেষ

ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বলেন, হে আমার প্রতিপালক, তুমি কেমন করে মৃতকে জীবিত কর তা আমাকে একটু দেখাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বলেন, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি। আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্যে আমি এরূপ অনুরোধ করছি, যাতে আমার প্রতিপালকের শক্তি সম্পর্কে আমার অন্তরে ইলমে ইয়াকীনী হাসিল হয় ও অন্তরে পুরোপুরি প্রশান্তি লাভ করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাই অর্থের দিক দিয়ে বেশ কাছাকাছি। কেননা, এ উভয় ক্ষেত্র প্রকাশ করে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত ও শক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের পর প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্যেই তিনি মৃতকে জীবিত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে নিজ একান্ত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলেন, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন করেছিলেন। যাতে তিনি অতিসহসা তাঁকে কোন একটি নমুনা দেখান। ফলে তিনি যে তাঁকে নিজের খাঁটি বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তার নমুনা দেখে অন্তরে প্রশন্তি লাভ করবেন এবং তা তাঁর ইয়াকীন অর্জনে অধিকতর সাহায্যকারী হবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৬৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেন, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈল (আ.) নিজ প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেন যেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে এ সুসংবাদ প্রদান করার জন্যে তাকে সুযোগ দেয়া হয়। মৃত্যুর ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর কাছে আগমন করেন। কিন্তু তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না। মৃত্যুর ফেরেশতা ইব্‌রাহীম (আ.)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। ইব্‌রাহীম (আ.) সবচেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন লোক ছিলেন বিধায় তিনি ঘর থেকে বের হবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেন। যখন তিনি বাড়ী এসে ঘরে অন্য লোককে দেখতে পেলেন তাঁকে ধরার জন্য তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, তোমাকে আমার ঘরে প্রবেশ করার জন্য কে অনুমতি দিয়েছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, এই ঘরের প্রকৃত প্রতিপালক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আমাকে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। ইবরাহীম (আ.) বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলেছ।' এই বলে ইব্‌রাহীম (আ.) মৃত্যুর ফেরেশতাকে মৃত্যুর ফেরেশতা বলে শনাক্ত করলেন। তবু তিনি আরো প্রত্যয়ের জন্য জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ও কি জন্য এসেছ? তিনি বললেন, আমি মৃত্যুর ফেরেশতা । আমি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিতে এখানে এসেছি। আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে খলীল হিসাবে মনোনীত করেছেন। তখন ইব্‌রাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা, আপনি যে মূর্তিতে কাফিরদের রূহ হরণ করে থাকেন আমাকে সেই অবস্থা একটু দেখান। মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, আপনি এরূপ অবস্থা অবলোকন করে স্থির থাকতে সক্ষম হবেন না। তিনি বললেন, না, আমি তা পারব। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর ফেরেশতা একটু মোড় ফিরে দাঁড়ালেন

এবং ইবৃরাহীম (আ.)–ও অনুরূপ একটু মোড় ফিরে দাঁড়ালেন। এরপর ইবৃরাহীম (আ.) মৃত্যুর ফেরেশতা দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তখন তিনি তাঁকে একটি কৃষ্ণকায় লোকের কুৎসিত একটি বিরাট অবয়বে দেখতে পেলেন, যার মাথা যেন আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে। তাঁর মুখের ভিতর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে, তার শরীরের প্রতিটি লোমই যেন কৃষ্ণকায় কুৎসিত লোকের আকার ধারণ করেছে, যাদের মুখ থেকে ও শিরা–উপশিরা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। এরূপ দেখে ইবৃরাহীম (আ.) চেতনা হারিয়ে ফেলেন। যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন এবং মৃত্যুর ফেরেশতাকে পূর্বের ন্যায় অবয়বে দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! যদি কোন কাফির ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অন্য কোন প্রকার বালা–মুসীবত ও পেরেশানিতে পতিত নাও হয়, তাহলে তার দুঃখকষ্ট ও অস্থির অবস্থার জন্যে তোমার বিশালকায় অবয়বই যথেষ্ট। সুতরাং তুমি আমাকে দেখাও কিভাবে তুমি মু'মিন বান্দাদের রূহ কবয কর। বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলে ফেরেশতার অন্যদিকে মোড় নেয়ার সাথে সাথে ইবৃরাহীম (আ.)–ও একটু মোড় নিলেন। এরপর তিনি পুনরায় ফেরেশতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তিনি তাঁকে একজন সুদর্শন যুবক এবং সুগন্ধিযুক্ত সাদা পোশাক পরিহিত মনোরম পরিবেশে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা, যদি কোন মু'মিন বান্দার জন্যে তাঁর প্রতিপালকের কাছে কোন প্রকার মর্যাদা ও নয়ন জুড়ানো কোন বস্তুও না থাকে। তাহলে শুধুমাত্র তোমার এ সুদর্শন চেহারাই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা চলে গেলেন। তারপর ইবৃরাহীম (আ.) তাঁর প্রতিপালকের কাছে অনুরোধ জানালেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনি কিরূপে মৃতকে জীবিত করেন আমাকে একটু নমুনা দেখান, যাতে আমি জানতে পারি যে, আমি আপনার খলীল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, আমি আপনার খলীল। আমি আল্লাহ্ যা বলব তা আপনি কায়মনচিত্তে বিশ্বাস করবেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি, তবে আমি চাই যেন আমার অন্তর আপনার নিবিড় বন্ধুত্বে প্রশান্তি লাভ করে।

৫৯৬৮. হযরত সাঈদ ইবৃন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ বন্ধুত্ব সম্পর্কে অন্তরের প্রশান্তি অর্জন করা।

আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবৃরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এরূপ আরয করেছেন, কারণ তিনি মৃতদের জীবিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৬৯. আয়্যূব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ সম্বন্ধে বলেন, হযরত ইবৃন আব্বাস (রা.) বলেছেন, আমার কাছে কুরআনুল করীমের মধ্যে এ আয়াত থেকে অধিকতর আশাব্যঞ্জক অন্য কোন আয়াত পরিদৃষ্ট হয়নি।

৫৯৭০. সাঈদ ইবৃন মুসায়্যিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক সময় একব্যক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলেন, আপনি কি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবৃন আব্বাস (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবৃন আমর (রা.)–কে উল্লিখিত বিষয়ে অভিন্ন মতামতের অধিকারী মনে করেন? সাঈদ ইবৃন মুসায়্যিব (রা.) বলেন, আমি তখন যুবক। তাদের দু'জনের একজন তাঁর সাথীকে বললেন, কুরআনুল করীমের মধ্যে কোন্ আয়াতটি মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে অত্যধিক আশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবৃন আমর (রা.) বললেন, কুরআনুল করীমের সূরা যুমারের ৫৩নং আয়াত অত্যধিক আশাব্যঞ্জক। আয়াত – قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ

أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (অর্থাৎ হে রাসূল ! আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ– আল্লাহ্র অনুগ্রহ হতে নিরাশ হবে না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, যদি তুমি এটাকে আশাব্যঞ্জক বলে মনে করে থাক, তাহলে স্মরণ রাখ যে, মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে এর চেয়ে অধিক আশাব্যঞ্জক হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর উক্তি। আর তা হলো رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ (অর্থ : হে আমার প্রতিপালক ! কিরূপে আপনি মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে দেখান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না? উত্তরে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আরয করলেন, হ্যাঁ, তবে তা শুধু আমার চিত্তের প্রশান্তি লাভ করার জন্যে।)

৫৯৭১. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে আতা' ইব্ন আবী রাবাহ্ (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)–এর অন্তরে যখন ঐ বস্তুটি প্রবেশ করল, যা সাধারণত মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে থাকে (সন্দেহ), তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কিরূপে মৃতক জীবিত করেন, তা আমাকে দেখান। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি কি তা বিশ্বাস করনা? জবাবে হযরত ইব্রাহীম (আ.) আরয করলেন, হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেন, চারটে পাখী নাও। তাহলে তা দেখা যাবে।

৫৯৭২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, আমরা হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে অধিক সন্দেহ পোষণ করার হকদার। (অর্থাৎ যদি তিনি সন্দেহ পোষণ করে থাকতেন) তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন আমাকে দেখান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তুমি বিশ্বাস করোনি? ইব্রাহীম (আ.) বললেন, হ্যাঁ, তবে তাতে আমার অন্তরের প্রশান্তি বৃদ্ধি পাবে।

৫৯৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, তারপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে উল্লিখিত বিভিন্ন মতামতের মধ্য থেকে ঐ অভিমতটি উত্তম, যেখানে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য শুদ্ধরূপে বর্ণিত হয়েছে। আর এ সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য হলো, আমরা সন্দেহ পোষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে অধিক হকদার। তিনি আরয করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক ! মৃতকে কিরূপে আপনি জীবিত করবেন আমাকে দেখান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তুমি কি তা বিশ্বাস কর না?

হযরত ইব্রাহীম (আ.) মৃতকে জীবিত করার জন্যে স্বীয় প্রতিপালককে যে অনুরোধ করেছিলেন, তার কারণ ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে একটি সন্দেহ হযরত ইব্রাহীম (আ.)–এর অন্তরে উদয় হয়েছিল। এ সন্দেহের কথা ইব্ন যায়দ (রা.)–এর বর্ণনায় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো, হযরত

ইব্‌রাহীম (আ.) যখন একটি মাছের অর্ধাংশ স্থলভাগে এবং অপর অর্ধাংশ পানিতে দেখতে পেলেন। আর ঐ মাছকে স্থলভাগ ও পানির জন্তু-জানোয়ার এবং আকাশের পাখীকুল গ্রাস করছে দেখতে পেলেন। তখন শয়তান তাঁর অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করল যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ মাছকে এসব জন্তু-জানোয়ার ও পাখীকুলের উদর থেকে বের করে নিয়ে এসে একত্রিত করবেন? তখনই তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট আরয করলেন, যেন তিনি তাঁকে দেখান যে, কিরূপে মৃতকে জীবিত করা হয়। আর তিনি তা নিজ চক্ষে অবলোকন করতে পারেন। তারপর আর শয়তান তাঁর অন্তরে ঐরূপ সন্দেহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না, যেরূপ সন্দেহ মাছ দেখার সময় তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করেছিল। কাজেই, বিশ্বপালক আল্লাহ্ পাক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, أَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ তুমি কি বিশ্বাস কর না (হে ইব্‌রাহীম !) যে, আমি তা করতে শক্তিমান? জবাবে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) বলেন, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক ! তবে তা দেখাবার জন্যে আমি যে অনুরোধ করেছি, তা শুধু আমার মনের প্রশান্তির জন্যে। যাতে শয়তান আমার অন্তরে ঐরূপ সন্দেহ সৃষ্টি করতে না পারে, যেরূপ মাছ দেখার সময় আমার অন্তরে শয়তান সৃষ্টি করেছিল।

উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

৫৯৭৪. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, لِيَسْكُنَ قَلْبِي অর্থাৎ আমার অন্তর যেন প্রশান্তি লাভ করে এবং যে ইয়াকীন বা দৃঢ়তা অর্জন করতে চায়, তা সে অর্জন করতে পারে।

আমার উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি ঐসব মনীষীর ব্যাখ্যার ন্যায়, যাঁরা এ আয়াতে উল্লিখিত لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي -এর ব্যাখ্যাকে কুরআনুল করীমের অন্যত্র উল্লিখিত لِيَزْدَادَ إِيمَانًا অর্থাৎ তাহলে সে তার ঈমানকে সুদৃঢ় করতে পারবে এবং أَنَّهُ لِيُوقِنَ অর্থাৎ সে যেন ইয়াকীন বা দৃঢ়তা অর্জন করতে পারে, ইত্যাদির সাথে সমন্বিত করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৭৫. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِيَطْمَئِنَّ আয়াতাংশের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ لِيُوقِنَ অর্থাৎ সে যেন ইয়াকীন বা দৃঢ়তা অর্জন করতে পারে।

৫৯৭৬. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যেন আমার ইয়াকীন দৃঢ় হয়।

৫৯৭৭. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যেন ইয়াকীন সুদৃঢ় হয়।

৫৯৭৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) তা এজন্য ইচ্ছা করেছিলেন, যাতে তাঁর ইয়াকীন আরো সুদৃঢ় হয়।

৫৯৭৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার অর্থ ঃ যেন ইয়াকীন বৃদ্ধি পায়।

৫৯৮০. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي সম্পর্কে বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) ইচ্ছা করেছিলেন যেন এটা তাঁর ইয়াকীন বৃদ্ধি করে।

৫৯৮১. সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা আমার ইয়াকীনকে বৃদ্ধি করবে।

৫৯৮২. অন্য এক সূত্রে সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي প্রসঙ্গে বলেন, তা আমার ইয়াকীন বৃদ্ধি করবে।

৫৯৮৩. মুজাহিদ (র.) এবং ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي সম্বন্ধে বলেন, তাহলে এটা আমার ঈমানকে বৃদ্ধি করবে।

৫৯৮৪. সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাহলে তা আমার ঈমানকে বৃদ্ধি করবে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করেছি, যাঁরা বলেছেন এ আয়াতাংশের অর্থ– যেন আমার মন নিশ্চিত হয় এ বিষয়ে যে, আমি তোমার খলীল।

কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي –এর অর্থ ঃ নিশ্চিতভাবে আমি জানি, আপনি আমার ডাকে সাড়া দিবেন, আর যদি আমি কিছু চাই, তাহলে আপনি আমাকে দান করবেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৮৫. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নিশ্চিতভাবে আমি জানি, আমি যখন আপনাকে ডাকব, তখন আপনি আমার ডাকে সাড়া দেবেন এবং আমি যখন আপনার কাছে কিছু চাইব, তখন আপনি তা আমাকে দান করবেন। তিনি আরো বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত অংশ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ –এর অর্থ, তিনি ইরশাদ করেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না?

৫৯৮৬–৮৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। আহমদ ইবন ইসহাক (র.)এবং সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়েই অত্র আয়াতাংশ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করনা যে, আমি তোমার খলীল?

৫৯৮৮. ইবন যায়দ (রা.) বলেছেন, اَوَلَمْ تُؤْمِنْ –এর অর্থ তুমি কি বিশ্বাস কর না?

আল্লাহ্ পাকের বাণী قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে আদেশ করেন, চারটি পাখি নাও। কারো কারো মতে এ চারটি পাখি হলো, মোরগ, ময়ূর, কাক ও কবুতর।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৫৯৮৯. মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন কোন বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন যে, আগেকার আহলি কিতাব উল্লেখ করেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) একটি ময়ূর, একটি মোরগ, একটি কাক ও একটি কবুতর নিয়েছিলেন।

৫৯৯০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, চারটি পাখী হলো, মোরগ, ময়ূর, কাক ও কবুতর।

৫৯৯১. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে চারটি পাখী নেয়া হয়েছিল, বিশেষজ্ঞগণের মতে সেগুলো ছিল ঃ মোরগ, ময়ূর, কাক ও কবুতর।

৫৯৯২. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–কে চারটি পাখী নেয়ার আদেশ দিলেন, তখন তিনি যে চারটি পাখী নিয়েছিলেন, সেগুলো ছিল ঃ ময়ূর, কবুতর, কাক ও মোরগ। এগুলো ছিল বিভিন্ন জাতের ও রংয়ের।

আল্লাহ্ পাকের বাণী فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর ব্যাখ্য ঃ

কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ فَصُرْهُنَّ শব্দের পাঠ পদ্ধতিতে একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। মদীনা, হিজায ও বসরার সাধারণ কারীগণের কিরাআত হলো صُرْهُنَّ অর্থাৎ ص –কে পেশ দিয়ে পড়া হয়ে থাকে। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, صُرْتُ هٰذَا الْاَمْرَ অর্থাৎ আমি এ বিষয়টির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছি। فعل مضارع معروف –এর واحد متكلم –এর صيغه হবে اَصُوْرُ এবং مصدر হবে صَوْرًا –। আবার বলা হয়ে থাকে اِنِّىْ اِلَيْكُمْ لَاَصُوْرُ অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত। কবি বলেছেন,

اَللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّا فِىْ تَلَفُّتِنَا * يَوْمَ الْفِرَاقِ اِلَى اَحْبَابِنَا صُوْرُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন, বিচ্ছেদের দিন আমরা আমাদের দৃষ্টিতে আমাদের বন্ধু–বান্ধবদের প্রতি আসক্ত ছিলাম। অর্থাৎ বিদায়ের দিনও আমরা আমাদের বন্ধু–বান্ধবদের প্রতি আসক্ত ছিলাম, আর তা আমাদের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট হয়েছিল। এ কবিতায় উল্লিখিত صُوْرٌ শব্দটি বহুবচন। একবচনে হবে اَصْوَرُ যেমন سُوْدٌ শব্দটি اَسْوَدُ শব্দের বহুবচন। অনুরূপভাবে صَوْرَاءُ স্ত্রীলিংগ শব্দের বহুবচন আসে صُوْرٌ যেমন سَوْدَاءُ –এর বহুবচন আসে سُوْدٌ অন্য একজন কবি, আত–তিরমাহ বলেছেন ঃ

عَفَائِفُ اِلَّا ذٰلِكَ اَوْ اَنْ يَصُوْرَهَا * هَوًى وَالْهَوٰى لِلْعَاشِقِيْنَ صَرُوْعُ

অর্থ ঃ তরুণীদের যৌবন প্রারম্ভ এমন একটি যুগ সন্ধিক্ষণ যাদেরকে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাকাংক্ষা হাতছানি দিয়ে ডাকে আর ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাকাংক্ষা প্রেমিকদের জন্য রণক্ষেত্র স্বরূপ। উপরোক্ত কবিতায় উল্লিখিত يَصُوْرُهَا এর অর্থ হচ্ছে يُمِيْلُهَا অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগাকাংক্ষা তরুণীদেরকে আকর্ষণ করে থাকে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর অর্থ হচ্ছে তুমি এদেরকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর, এদেরকে তোমার দিকে ফিরাও যেমন বলা হয়ে থাকে صُرْ وَجْهَكَ اِلَىَّ অর্থাৎ আমার দিকে তোমার মুখমন্ডল ফিরাও। যাঁরা আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর ব্যাখ্যায় উপরোক্ত ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের কাছে এ আয়াতাংশে কিছু শব্দ উহ্য রয়েছে, যেহেতু বাক্যের প্রকাশভঙ্গিতে বাহ্যত এটাই বোঝা যায় এবং তাঁদের ব্যাখ্যা মতে সম্পূর্ণ আয়াতের অর্থ হবে ঃ তুমি চারটি পাখী নাও, তাদেরকে তোমার পোষ মানাও। পরে তাদেরকে টুকরা টুকরা কর। এরপর তাদের প্রতিটি অংগ বিভিন্ন পাহাড়–পর্বতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দাও।

আবার কোন কোন সময় ص বর্ণে পেশ দিয়ে পড়লে আসক্তি, বশীভূত অর্থ বোঝানো সত্ত্বেও টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেলার অর্থও বোঝায়। যেমন বিখ্যাত কবি তাওবাহ ইব্‌ন হামীর বলেন ঃ

فَلَمَّا جَذَبْتُ الْحَبْلَ اَطَتْ نُسُوْعُهُ * بِاَطْرَافِ عِيْدَانٍ شَدِيْدُ اَسُوْرُهَا

فَاَدْنَتْ لِى الْاَسْبَابُ حَتَّى بَلَغْتُهَا * بِنَهْضِى وَقَدْ كَادَ ارْتِقَائِىْ يَصُوْرُهَا -

অর্থ ঃ কবি বলেন, তারপর যখন আমি রশিটি (প্রেমিকা)–কে আকর্ষণ করলাম বা নিজের দিকে টেনে নিলাম, তখন রশিটির অবয়ব বা অস্তিত্ব যেন আমাকে জড়িয়ে ধরল, তাও আবার শক্ত কাঠ (মূল্যবান ধাতু) দ্বারা নির্মিত চুড়িসমূহের পার্শ্বস্থ কাটাগুলো সহকারে। তবে এতে করে আমার সুযোগই নিকটবর্তী হয়ে গেল এবং আমার গাত্রোত্তোলনের সাথে সাথে আমি তার সান্নিধ্যে এসে গেলাম। কিন্তু আমার এ উত্তোলন যেন তাকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। অর্থাৎ সে আমার শক্ত হাতের স্পর্শ অনুভব করল। এ কবিতায় উল্লিখিত يَصُوْرُهَا –এর অর্থ يُقَطِّعُهَا অর্থাৎ আমার উত্তোলন যেন তাকে টুকরো টুকরো করে দেবে। তবে صور শব্দটির অর্থ যদি টুকরো হয়ে যাওয়া নেয়া হয়, তাহলে এ আয়াতাংশ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর মধ্যে تَقْدِيْمُ এবং تَاخِيْرُ সংঘটিত হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে অর্থাৎ বাক্যের সামনের অংশ পিছনে এবং পিছনের অংশ সামনে উল্লিখিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। তখন এ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপ ঃ তুমি চারটে পাখীকে নিজের দিকে ধাবিত কর। তারপর এগুলোকে টুকরা টুকরা কর। এমতাবস্থায় اِلَيْكَ শব্দটি خُذْ নামক فعلَ টির صله হবে অর্থাৎ اِلَيْكَ শব্দটি فَصُرْهُنَّ –এর সাথে সম্পৃক্ত হবে না। কূফার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ এভাবে পাঠ করেছেন। পুনরায় فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ মধ্যস্থিত ص –এর মধ্যে যের দিয়ে পাঠ করলেও তার অর্থ হবে এগুলো টুকরো টুকরো কর। তবে কূফার অন্য একদল ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ কিংবা فَصِرْهُنَّ اِلَيْكَ অর্থাৎ ص – তে পেশ কিংবা যের দিয়ে পড়া আরবী ভাষায় সুপরিচিত নয়। আবার তাঁরা মনে করেন, যদিও কেউ কেউ তা ব্যবহার করেন এরপরও অর্থাৎ ص – এ পেশ অথবা যের দিয়ে পড়লে উভয় ক্ষেত্রেই একই অর্থ বুঝা যায়। আর এ উভয় প্রকার পঠনের অর্থ হবে اَلْاِمَالَةُ অর্থাৎ ঝুঁকানো। তারা আরো বলেন, ص – এর মধ্যে যের দিয়ে পাঠ করা হুযায়ল ও সুলায়ম গোত্রের পঠন রীতিতে পাওয়া যায়। বনূ সুলায়মের কোন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে তার কবিতাটি উল্লেখ করা যায়। যেমন কবি বলেছেন ঃ

وَفَرْعٍ يَصِيْرُ الْجِيْدَ وَحْفٍ كَاَنَّهُ * عَلَى اللَّيْثِ قِنْوَانُ الْكُرُوْمِ الدَّوَالِحِ

অর্থাৎ সম্ভবত কবি তার গোত্রের লোকজনকে বৃক্ষের শাখা এবং নিজেকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছেন। আবার নিজেকে চিড়িয়াখানার সিংহ এবং গোত্রের লোকজনকে আংগুরের ঘন ও ভারী লতার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, লক্ষ্য করলে বহু শাখা দেখা যায়, এগুলো এমন যে তাদের মাথা বাতাসে দোলায় এবং আংগুরের ভারী ও ঘন লতা যেমন সিংহমূর্তিকে ঘিরে থাকে, তারাও যেন আমাকে এভাবে ঘিরে আছে। অত্র কবিতায় "يَصِيْرُ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে يَمِيْلُ অর্থাৎ দোলায় বা ঝুঁকায়। আর এ গোত্রের লোকেরা বলে থাকে صَارَهُ - وَهُوَ يَصِيْرُهُ صَيْرًا - صِرْ وَجْهَكَ اِلَىَّ অর্থাৎ সে তাকে ঝুঁকায়েছে, সে তাকে একবার ঝুঁকাবে, আমার প্রতি তোমার মুখমন্ডল ঝুঁকাও বা ঘুরাও। অনুরূপ তারা امر –এর صيغه –তে বলে থাকে صِرْهُ অর্থাৎ তুমি তাকে ঝুঁকাও। আবার কূফাবাসীদের কোন কোন ব্যাকরণবিদ মনে করেন যে, فَصُرْهُنَّ কিরাআতটি তত মশহূর নয় এবং তারা فَصُرْهُنَّ কিংবা

فَصِرْهُنَّ পড়ুয়াদের জন্যও এটাকে টুকরা টুকরা করার অর্থে ব্যবহার করার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে যারা فَصِرْهُنَّ কে যের দিয়ে পড়েছেন, তারা এটাকে مقلوب বলে ধরে নিচ্ছেন, অর্থাৎ পূর্বের অক্ষর পরে এবং পরের অক্ষর পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুমান করছেন। অর্থাৎ এখানে لام كلمه -কে عين كلمه -এর স্থলে, তদ্রূপ عين كلمه -কে لام كلمه -এর স্থলে ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে এ শব্দটি صَرَى يَصْرِى صَرْيًا শব্দ সমষ্টি থেকে গৃহীত হয়েছে বলে মনে করতে হবে। অন্য কথায়, صرى কে صير পড়া হয়ে থাকে। একবার পানি পান করার পর পান করা বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় পানি পান করলে আরবরা বলে থাকেন "بَاتَ يَصْرِىْ فِىْ حَوْضِه" অর্থাৎ সে তার প্রস্রবণে বিরতির পর পানি পান করে থাকে। এরূপ প্রচলিত পঠনের উপর ভিত্তি করে জনৈক কবি বলেছেন ঃ

صَرَتْ نَظْرَةً ، لَوْ صَادَفَتْ جَوْزَ دَارِعٍ - غَدَا وَالْعَوَاصِىْ مِنْ دَمِ الْجَوْفِ تَنْعَرُ

এমনিভাবে অন্য এক কবিতায় রয়েছেঃ

يَقُوْلُوْنَ اِنَّ الشَّامَ يَقْتُلُ اَهْلَهُ * فَمَنْ لِىْ اِذَا لَمْ آتِه بِخُلُوْدٍ !!

تَعَرَّبَ اَبَائِى فَهَلاَّ صَرَاهُمْ * مِنَ الْمَوْتِ اَنْ لَمْ يَذْهَبُوا وَجُدُوْدِىْ !!

এ কবিতায় صَرَاهُمْ -এর অর্থ (قَطَّعَهُمْ) অর্থাৎ তাদেরকে টুকরা টুকরা করা করা। বসরার ব্যাকরণবিদগণ বলেন, فَصُرْهُنَّ কিংবা فَصِرْهُنَّ অর্থাৎ ص -কে পেশ কিংবা যের দিয়ে পড়া হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে টুক্‌রা টুক্‌রা করা। তারা আরো বলেন, "এখানে দুটো পাঠ পদ্ধতিই প্রচলিত রয়েছে। একটি صَارَ يَصُوْرُ এবং অন্যটি صَارَ يَصِيْرُ -তাদের এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হিসাবে তাওবাহ ইবন হামীরের উপরোল্লিখিত কবিতাটি পেশ করেছেন। আর নিচেও মুআল্লা ইবন জাম্মাল আবদী নামক কবির কবিতা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَاءَتْ خَلِعَةٌ دُهْسٌ صَفَايَا * يَصُوْرُ عُنُوْقَهَا اَحْوَى زَنِيْمُ -

এ কবিতায় উল্লিখিত يَصُوْرُ -এর অর্থ يُفَرِّقُ অর্থাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা আবার خنساء নামক মহিলা কবির একটি কবিতাও উল্লেখ করে থাকে। যেমন, لَظَلَّتِ الشُّمُّ مِنْهَا وَهْىَ تَنْصَارُ এ কবিতায় لشم দ্বারা এমন সব পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে, যেগুলো ফেটে যায় ও অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পুনরায় আবু যুওয়ায়বের কবিতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। فَانْصَرْنَ مِنْ فَزَعٍ وَسَدَّ فُرُوْجَه * غُبْرٌ ضَوَارٍ وَافِيَانِ وَاَجْدَعُ তারা আরো বলেন, যদি কোন ব্যক্তি صُرْتُ الشَّيْ -এর ন্যায় বাক্যটি ব্যবহার করে, তাহলে তার দু'টি অর্থ হতে পারে। ১. আমি এ বস্তুটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছি অথবা, ২. আমি এ বস্তুটিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করেছি।

অধিকন্তু তারা আরবদের থেকে শুনে বলেন, صُرْنَا بِهِ الْحُكْمَ বাক্যটির অর্থ হবে فَصَّلْنَا بِهِ الْحُكْمَ অর্থাৎ আমরা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ সম্পর্কে আমরা বসরাবাসীদের অভিমত পেশ করেছি। তারা বলেছেন যে, অত্র বাক্যাংশে উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ শব্দে অবস্থিত ص অক্ষরটিকে পেশ ও

যের দিয়ে পড়লে উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ একই হবে। আর এদুটো যদিও স্বতন্ত্র পরিভাষা হিসাবে গণ্য। কিন্তু এখানে এদুটো পরিভাষায়ই অর্থ হবে فَقَطِّعْهُنَّ অর্থাৎ এরপর তুমি এগুলোকে খন্ড–বিখন্ড করে দাও। অধিকন্তু إِلَيْكَ শব্দটিকে فَصُرْهُنَّ –এর পূর্বে অবস্থিত বলে ধরে নিতে হবে। কেননা إِلَيْكَ শব্দটি فَخُذْ শব্দটির صلة হিসাবে গণ্য। উপরোক্ত অভিমতটি কূফাবাসী ব্যাকরণবিদদের অভিমত থেকে উত্তম বলে প্রমাণিত। কেননা, তারা এখানে صُرْ শব্দের অর্থ 'কেটে ফেল' নেয়ার ব্যাপারে কোনরূপ যুক্তি আছে বলে স্বীকার করেন না। হ্যাঁ, যদি এটাকে مقلوب বলে ধরা হয়, তাহলে তার এরূপ অর্থ হতে পারে। এব্যাপারে আমরা পূর্বেও বিশদ বর্ণনা করেছি এবং প্রমাণ করেছি যে, ব্যাখ্যাকারীরা এতে অভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, صُرْهُنَّ –কে পেশ দিয়ে পড়া হোক অথবা যের দিয়ে পড়া হোক কোন অবস্থায়ই صُرْهُنَّ শব্দটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা অথবা একটাকে অন্যটার সাথে মিলিত করা– এ দুটো অর্থের কোন একটির বহির্ভূত নয়। সুতরাং صُرْهُنَّ –এর মধ্যে পেশ দিয়ে পড়া কিংবা যের দিয়ে পড়ার কোন একটির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ না করা এবং এ দুটো পাঠরীতির মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে কোনরূপ বিভিন্নতার পক্ষে রায় না দেয়ার এ ব্যাপারে বসরার ব্যাকরণবিদদের অভিমত অধিক শুদ্ধ এবং কূফাবাসীদের অভিমত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। কূফাবাসী ব্যাকরণবিদরা যদি صُرْهُنَّ শব্দটির অর্থ قَطِّعْهُنَّ –এর অর্থে ব্যাখ্যা করত, এ নীতির উপর যে, প্রকৃতপক্ষে কথাটি ছিল فَاصْرِهِنَّ –এরপর قلب বা পরিবর্তন করার নীতি অনুসরণ করে বলা হয়েছে فَصِرْهُنَّ অর্থাৎ ص –কে যের দেয়া হয়েছে কেননা فَاصْرِهِنَّ –এর ر অক্ষরকে ى –এর স্থলে এবং ى–কে ر –এর স্থলে পরিবর্তন করা হয়েছে, তাহলে তাঁরা তাদের পরিভাষা সম্পর্কে পরিপক্ক পরিচয় লাভ ও তাদের পরিভাষার বাক্যগুলো ব্যবহার করার রীতিনীতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনকারী সত্ত্বেও তারা এদুটো পাঠরীতির অর্থের বিভিন্নতায় আশ্রয় নেয়াটা ও যে কোন একটির আশ্রয় না নেয়া নিঃসন্দেহে সমীচীন মনে করত। আর এ দুটো পঠন পদ্ধতি হচ্ছে ص –কে যের দিয়ে পাঠ করা কিংবা ص –কে পেশ দিয়ে পাঠ করা। সমীচীন মনে না করার কারণ হচ্ছে, যারা فَاصْرِهِنَّ কে فَصُرْهُنَّ –এ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করে, তারা فَصُرْهُنَّ–এর ص –কে পেশ দিয়ে পড়া কখনও সঙ্গত বলে মনে করতে পারে না। অথচ তারা তাদের পাঠরীতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে কোন পঠন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে একই অর্থ ধরে নিয়েছেন।

উপরোক্ত বর্ণনাটি নিম্নবর্ণিত অভিমতটি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করার জন্যে প্রকৃষ্টতর মাধ্যম। অভিমতটি হচ্ছে صِرْهُنَّ –কে যের দিয়ে পড়া হয়েছে এবং তার অর্থ নেয়া হয়েছে খন্ড–বিখন্ড করা। কেননা, এ শব্দকে مقلوب মনে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ছিল صَرَى يَصْرِى এটাকে مقلوب বা পরিবর্তনের নীতির আশ্রয় নিয়ে করা হয়েছে صَارَ يَصِيْرُ –। অধিকন্তু উপরোক্ত বর্ণনাটি নিম্নবর্ণিত অভিমতটির সমর্থনকারীদেরও অজ্ঞতা প্রমাণ করছে। অভিমতটি হচ্ছে صَارَ يَصُوْرُ এবং صَارَ يَصِيْرُ আরবী ভাষায় খন্ড–বিখন্ড করার অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সুপরিচিত নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত শব্দ فَصُرْهُنَّ –এর অর্থ فَقَطِّعْهُنَّ (অর্থাৎ এরপর তুমি এদেরকে খন্ড–বিখন্ড কর) বলে যেসব মনীষী অভিমত পেশ করেছেন, তাদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

৫৯৯৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ শব্দটি নাবাতিয়া ভাষার অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ হচ্ছে, فَشَقِّقْهُنَّ (অর্থাৎ এরপর এদেরকে টুক্‌রা টুক্‌রা করো)।

৫৯৯৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটির তাফসীর হচ্ছেঃ যেমন আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে লক্ষ্য করে বলে থাকে, এগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা কর। তারপর এগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ কর এবং একে চার অংশ করে এখানে–সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত কর। এরপর এদেরকে কাছে আহবান কর, এগুলো তোমার কাছে জীবিত হয়ে ছুটে চলে আসবে।

৫৯৯৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, قَطِّعْهُنَّ (অর্থাৎ তুমি এদেরকে টুক্‌রা টুক্‌রা কর)।

৫৯৯৬. আবূ মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে এদেরকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে কাট।

৫৯৯৭. আবূ মালিক (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫৯৯৮. সাঈদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, একটি পাখীর মাথা, অন্যটির পাখা এবং অপর একটি পাখীর পাখা অন্যটির মাথার সাথে সংমিশ্রণ কর।

৫৯৯৯. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ শব্দটি নাবাতিয়া ভাষার অন্তর্গত। এর অর্থ হচ্ছে, পাখীগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা কর।

৬০০০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, قطعهن (অর্থাৎ এগুলোকে টুক্‌রা টুকরা কর)।

৬০০১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এদের পশম ও গোশত আলাদা করে ফেল। তারপর পুনরায় এদের গোশত পশমের সাথে একত্রিত কর।

৬০০২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এদের গোশত ও পশম ছিন্নভিন্ন করে ফেল।

৬০০৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে আদেশ দিয়েছেন চারটি পাখী ধরার জন্যে। এরপর এদেরকে যবেহ করে এদের গোশতের সাথে পশম ও রক্তকে একত্রিত করার জন্যে।

৬০০৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে এদেরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেল। তিনি এরপর আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (আ.)–কে আদেশ দিলেন, তিনি যেন একটির রক্তের সাথে অন্যটির রক্ত এবং একটির পাখার সাথে অন্যটির পাখা সংমিশ্রণ করেন। তারপর প্রত্যেকটির অংশ একেকটি পাহাড়ে রেখে দেন।

৬০০৫. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, فَشَقِّقْهُنَّ (অর্থাৎ তারপর এগুলোকে ছিন্নভিন্ন কর। তিনি আরো বলেন, এটা নাবাতিয়া ভাষা অন্তর্ভুক্ত এবং صرى মূল শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হচ্ছে ছিন্নভিন্ন করা।

৬০০৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর অর্থ হচ্ছে قَطِّعْهُنَّ (অর্থাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা কর)।

৬০০৭. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, এগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা ও ছিন্নভিন্ন কর।

৬০০৮. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে قَطِّعْهُنَّ (অর্থাৎ এদেরকে টুক্‌রা টুক্‌রা কর।) আরবী ভাষায় صور শব্দটি কর্তন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশের তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা যে সব উক্তি পেশ করলাম, এতে فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর অর্থ যে فَقَطِّعْهُنَّ اِلَيْكَ – অর্থাৎ এগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ফেল। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং যাঁরা এ অর্থের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের অভিমতও ভ্রান্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে। এ সত্যটি উদ্ভাসিত হবার পর আমরা বল্‌তে পারি যে, فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর মধ্যে ص অক্ষরকে পেশ কিংবা যের দিয়ে পড়ার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নেই। এ দু'টি প্রসিদ্ধ পাঠ পদ্ধতির অর্থ একই রূপ দাঁড়ায়। তবে আমাদের কাছে ص অক্ষরকে পেশ দিয়ে পড়ার পাঠরীতি অধিকতর গ্রহণীয়। কেননা, এই পদ্ধতি আরবদের কাছে অধিক প্রসিদ্ধ ও অধিক ব্যবহৃত, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাকারীর কাছে فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে "اَوْثِقْهُنَّ اِلَيْكَ" (অর্থাৎ তুমি এগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে ধর)। যাঁরা এরূপ অভিমত পেশ করেছেন, তাঁদের দলীল নিম্নরূপ ঃ

৬০০৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ আয়াতাংশে উল্লিখিত صُرْهُنَّ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে اَوْثِقْهُنَّ (অর্থাৎ এগুলোকে তুমি শক্তভাবে ধারণ কর)।

৬০১০. আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে উল্লিখিত فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে اُضْمُمْهُنَّ اِلَيْكَ (অর্থাৎ এগুলোকে তোমার কাছে মিলিয়ে নিয়ে নাও)।

৬০১১. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ –এর অর্থ হচ্ছে اِجْمَعْهُنَّ (অর্থাৎ এগুলোকে তোমার কাছে একত্রিত করে নাও)।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا (অর্থ ঃ তৎপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। এরপর এদেরকে ডাক দাও, এরা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট চলে আসবে)।

এর ব্যাখ্যা ঃ

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীর প্রতিটি চতুর্থাংশে পাখীগুলোর এক একটি অংশ স্থাপন কর।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০১২. আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, পৃথিবীকে চার অংশে বিভক্ত করে প্রতিটি অংশে পাখীগুলোর এক-চতুর্থাংশ রেখে দাও। এরপর সবগুলো অংশকে নিজের কাছে আহবান কর, তাতে এরা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে।

৬০১৩. আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যখন তিনি এগুলোকে বশীভূত করলেন ও যবেহ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (আ.)-কে আদেশ দিলেন, তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে দাও।

৬০১৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁর নবী (আ.)-কে আদেশ করা হলো তিনি যেন চারটে পাখী বেছে নেন। এরপর এদেরকে যবেহ করেন, তারপর এদের গোশত, পশম ও রক্তকে মিশ্রিত করেন, এরপর চারটে পাহাড়ে এদের অংশগুলোকে রেখে দেন। পুনরায় আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এদের পাখার কাছে দাঁড়িয়ে এদের মাথাগুলো হস্তে ধারণ করেন, তখন একটি হাড়ের টুক্রা অন্যটি হাড়ের টুক্রার কাছে যেতে লাগল। অনুরূপভাবে একটি পশম অন্যটি পশমের কাছে মিশে গেল। এমনকি প্রতিটি অংশ অন্য অংশের প্রতি ধাবমান হলো। আর এ ঘটনাটি ঘটেছিল খোদ ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ.)-এর একেবারে চোখের সামনে। এরপর তিনি এদেরকে কাছে আহ্বান করলেন, তখন এরা নিজ নিজ পায়ের উপর ভর করে তাঁর দিকে ছুটি চলল। প্রত্যেকটি পাখী স্বীয় মাথার সাথে মিলিত হতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি উপমা। ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এটা দান করে বলেছিলেন, এ পাখীগুলোকে যেভাবে এ চারটে পাহাড় থেকে এনে একত্রিত করে জীবিত করা হয়েছে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সারা পৃথিবী থেকে কিয়ামতের দিন মানব জাতিকে একত্রিত করবেন।

৬০১৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) পাখীগুলোকে যবেহ করলেন, এদেরকে টুকরা টুকরা করলেন, এরপর এদের গোশত, পশম ইত্যাদিকে একত্রিত করলেন। তৎপর এগুলোকে চার অংশে বিভক্ত করলেন এবং প্রত্যেকটি পাহাড়ে এক একটি টুকরা রেখে দেন। এরপর প্রতিটি হাড়, পশম ও টুকরা যথাক্রমে অন্য হাড়, পশম ও টুকরার সাথে মিলিত হতে লাগল। আর এ ঘটনাটি খলীলুল্লাহ্ ইব্রাহীম (আ.)-এর চোখের সামনে ঘটতে লাগল।

তারপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) এদেরকে স্বীয় দিকে আহবান করলেন অমনি এরা দ্রুত পদে তাঁর প্রতি অগ্রসর হলো। তিনি আরো বলেন, এমনকি এরা পায়ের উপর ভর দিয়ে দ্রুতগতিতে এসেছিল। আর এটা ছিল একটা দৃষ্টান্ত। ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা তা দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, যেমনিভাবে আমি এ চারটে পাখীকে জীবিত করেছি, ঠিক এভাবেই আমি মানব জাতিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এনে একত্রিত করে জীবিত করব।

৬০১৬. ইবৃন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ থেকে বর্ণনা করেন। আহ্‌লি কিতাবরা নিম্নরূপ বর্ণনা করে থাকেন যে, একদিন হযরত ইবৃরাহীম (আ.) চারটি পাখী হস্তে ধারণ করেন। তারপর তিনি প্রত্যেকটি পাখীকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। চারটি পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হন এবং প্রত্যেকটি পাহাড়ে প্রত্যেকটি পাখীর অংশ রাখেন। তাতে প্রত্যেকটি পাহাড়ে ময়ূরের এক-চতুর্থাংশ, মোরগের এক-চতুর্থাংশ, কাকের এক-চতুর্থাংশ ও কবুতরের এক-চতুর্থাংশ রাখা হলো। এরপর তিনি এদেরকে বললেন, তোমরা পূর্বে যেরূপ ছিলে আল্লাহ্‌র হুকুমে অনুরূপ হয়ে যাও। ফলে প্রত্যেকটি এক-চতুর্থাংশ অন্য এক চতুর্থাংশের দিকে অগ্রসর হতে লাগল এবং এসবগুলোই একত্রিত হয়ে গেল। প্রত্যেকটি পাখীই টুকরা করার পূর্বের ন্যায় আকার ধারণ করল। এরপর এরা দ্রুতপদে তাঁর দিকে ধাবিত হলো। এ ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'আলা এখানে উল্লেখ করেছেন। তখন ইবরাহীম (আ.)-কে বলা হলো, হে ইবৃরাহীম (আ.) ! এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কোন্ থেকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে এনে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের জন্যে মৃতদেরকে জীবিত করবেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে মৃতদেরকে জীবিত করার নমুনা হযরত ইবৃরাহীম (আ.)-কে দেখালেন। নমরূদের মিথ্যা ও অসত্য বাণীর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ইবৃরাহীম (আ.)-এর মধ্যে প্রতিভাত হয়নি।

৬০১৭. ইবৃন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইবৃরাহীম (আ.) একটি ময়ূর, একটি কবুতর একটি কাক ও একটি মোরগ হাতে নিলেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন, এদেরকে আলাদা কর। প্রত্যেকটির মাথা অন্যটির মাথা, প্রত্যেকটির পাখা অন্যটির পাখা এবং প্রত্যেকটির পা অন্যটির পায়ের সাথে সংমিশ্রণ কর। এরপর এগুলোকে টুকরা টুকরা কর এবং পাহাড়ের উপর এগুলোকে এক-চতুর্থাংশ করে ছড়িয়ে দাও। এরপর ইবৃরাহীম (আ.) এদেরকে নিজের দিকে আহবান করলেন। তাৎক্ষণিকভাবে এদের সব কয়টিই ইবৃরাহীম (আ.)-এর খিদমতে আগমন করল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইবৃরাহীম (আ.)-কে বললেন, যেমন করে তুমি এদেরকে আহবান করেছ, এরা তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং যেমন করে এরা জীবিত হয়েছে, এরপর তুমি এদেরকে একত্রিত করেছ, তেমনি করেই আমি সব মৃতকে একত্রিত ও জীবিত করব।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে ইবৃরাহীম (আ.) যে সব পাহাড়ে পাখী ও হিংস্র পশুগুলোকে মৃত জানোয়ারের গোশত খেতে দেখলেন, এদের প্রত্যেকটিতে পাখীগুলোর টুকরা টুকরা অংশ রেখে দিতে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেন। তখন ইবৃরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলাকে বললেন, তিনি যেন এ মৃত পাখীগুলো এবং অন্যান্য মৃতদেরকে কেমন করে জীবিত করবেন, তা প্রত্যক্ষভাবে ইবৃরাহীম (আ.)-কে দেখান। তারা আরো বলেন, তথায় পাহাড়ের সংখ্যা ছিল সাতটি মাত্র।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬০১৮. ইবৃন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবৃরাহীম (আ.) বিভিন্ন হিংস্র পশু-পাখী কর্তৃক মৃত জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ করতে দেখে যা কিছু বলার ছিল বললেন এবং তার নিকটবর্তী হলেন ও যা কিছু প্রশ্ন করার ছিল তাঁর প্রতিপালককে প্রশ্ন করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা

বললেন, তুমি চারটি পাখী গ্রহণ কর। ইব্ন জুরাইজ (র.) আরো বলেন, তারপর ইব্রাহীম (আ.) এদেরকে যবেহ করলেন ও এগুলোর রক্ত, গোশত এবং পশম একত্রিত করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিলেন, পাহাড়ের যে সব জায়গায় তুমি হিংস্র পাখী ও জন্তুদের চলে যেতে দেখেছ, তথায় যবেহকৃত পাখীগুলোর প্রত্যেকটি টুকরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দাও। ইব্ন জুরাইজ (র.) আরো বলেন, ইব্রাহীম(আ.) পাখীদের সাতটি করে টুকরা করলেন এবং এদের মাথা নিজের কাছে সংরক্ষণ করলেন। এরপর এদেরকে আল্লাহ্র আদেশের কথা শ্রবণ করিয়ে কাছে আহবান করলেন এবং লক্ষ্য করতে লাগলেন, কেমন করে রক্তের প্রতিটি ফোঁটা অন্য ফোঁটার সাথে বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়া থেকে এসে মিলিত হচ্ছিল, প্রতিটি পশম অন্য পশমের সাথে মিলিত হচ্ছিল। অনুরূপভাবে প্রতিটি টুকরা ও হাড় কেমন করে অন্য টুকরা ও হাড়ের সাথে মিলিত হতে ছিল। এমনকি এদের শরীরের প্রতিটি অংশ অন্য অংশের সাথে কেমন করে শূন্যে মিলিত হচ্ছিল। এরপর এগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছিল এবং এগুলোকে এসে এদের মাথার সাথে মিলে যেতেও তিনি দেখলেন।

৬০১৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ الخ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, তুমি চারটি পাখী গ্রহণ কর, এদেরকে বশীভূত কর, এরপর এদেরকে সাতটি পাহাড়ে ছড়িয়ে দাও। এরপর এদের মধ্য থেকে প্রতিটি অংশ প্রতিটি পাহাড়ে রাখ। পরে তাদেরকে নিজের দিকে আহবান কর, দেখতে পাবে যে, এরা দ্রুতপদে তোমার কাছে এগিয়ে আসছে। এরপর ইব্রাহীম (আ.) চারটি পাখী নিলেন, এদের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করলেন, এমনকি কোন একটি অঙ্গকে অন্য অঙ্গের সাথে জড়িত রাখলেন না। এরপর একটির মাথা অন্যটির পায়ের সাথে, একটির বুক অন্যটির পাখার সাথে রাখেন। পুনরায় এদেরকে সাতটি পাহাড়ে বন্টন করে রেখে দেন। এরপর এদেরকে নিজের দিকে ডাকলেন। ফলে, এদের প্রত্যেকটি অংগ অন্য একটি অংগের দিকে উড়ে গেল। তারপর সবগুলো অংগই তাঁর দিকে উড়ে এলো।

কেউ কেউ বলেন, বরং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে আদেশ প্রদান করেছিলেন, তিনি যেন এগুলোকে প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দেন। এ মতের সমর্থনে বর্ণনা ঃ

৬০২০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারপর আপনি এগুলোকে প্রত্যেকটি পাহাড়ের উপর বিক্ষিপ্তভাবে রেখে দিন। এগুলো আপনার দিকে ধেয়ে আসবে। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদের জীবিত করবেন।

৬০২১. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারপর এদেরকে টুকরা টুকরা করে প্রতিটি টুকরা পাহাড়ে রেখে দাও। পরে এদেরকে নিজের দিকে আহবান কর, এরা তোমার আহবানে তোমার দিকে ধেয়ে আসবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদের জীবিত করবেন। একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ.)–কে দেখিয়ে দেন।

৬০২২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারপর আপনি এগুলোকে টুকরা টুকরা করে প্রতিটি পাহাড়ের উপর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিন। তারপর এদেরকে নিজের কাছে ডাকুন এবং বলুন, আল্লাহ্র হুকুমে তোমরা চলে এসো। এমনিভাবেই

আল্লাহ্ তা'আলা মৃতদেরকে জীবিত করবেন। এ ঘটনাটি একটি দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–কে দেখিয়ে দেন।

৬০২৩. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–কে আদেশ করলেন, তিনি যেন এদের পা, মাথা ও পাখার মধ্যে সংমিশ্রণ করেন, তারপর প্রত্যেক পাহাড়ে যেন এদের মাত্র একটি করে টুকরা রেখে দেন।

২০২৪. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথমত হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) এদের পা ও পাখার সংমিশ্রণ ঘটালেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, প্রত্যেক পাহাড়ে এদের একটি করে টুক্‌রা রেখে দাও।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে যে সব তাফসীর পেশ করা হলো, এগুলোর মধ্যে মুজাহিদ (র.) কর্তৃক প্রদত্ত তাফসীরটিই উত্তম। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–কে চারটি পাখী যবেহ করে এগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে প্রত্যেকটি টুক্‌রা ঐ সময়ে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–এর কাছে অবস্থিত প্রত্যেকটি পাহাড়ের উপর ছড়িয়ে দেবার আদেশ দেন। পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا প্রত্যেকটি পাহাড়ের উপর এদের প্রতিটি টুক্‌রা রেখে দিন। এ আয়াতে উল্লিখিত كُلِّ جَبَلٍ দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম –এর নিকটবর্তী সবগুলো পাহাড় বুঝানো হয়েছে। যদিও শব্দটি একবচন, কিন্তু তা বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, كُلّ শব্দটি এমন একটি অব্যয়, যার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত পদের সমুদয় অংশকেই বুঝায়। প্রকাশ্য শব্দের দিক দিয়ে যদিও শব্দটি একবচন, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে তা বহুবচন। كُلّ শব্দটি যেহেতু তার পরবর্তী اسم এর সমুদয় অংশকেই অন্তর্ভুক্ত করে, সেহেতু এখানে كُلّ –এর পরবর্তী اسم –এ جَبَلٌ শব্দটি আসায় যে সব পাহাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–কে চারটি পাখী টুকরা টুকরা করে বিক্ষিপ্ত করার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন, তার দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হলো, كُلّ শব্দ দ্বারা কিছু সংখ্যক অথবা সমস্ত পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। যদি কয়েকটি হয়, তাহলে এ কয়েকটি দ্বারা শুধুমাত্র ঐ কয়েকটি পাহাড়কেই বুঝাবে, যেগুলোতে চারটি পাখী যবেহ করে বিক্ষিপ্ত করার জন্যে বলা হয়েছিল। আর যদি সমষ্টিকে বুঝায়, তাহলেও ঐসব পাহাড়কেই বুঝাবে। অথচ মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–কে প্রত্যেকটি পাহাড়ের উপর যবেহকৃত পাখীগুলোকে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে দিতে আদেশ করেছেন। তবে এখানে প্রত্যেকটি পাহাড়ের দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–এর সুপরিচিত সুনির্দিষ্ট সন্নিকটস্থ পাহাড়গুলোকেই বুঝানো হয়েছে। কিংবা পৃথিবীতে যত পাহাড় রয়েছে সবগুলোকেই বুঝানো হয়েছে– দু'টিরই সম্ভাবনা রয়েছে। তবে যারা এখানে উল্লিখিত পাহাড় দ্বারা চারটি অথবা সাতটি পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের এ উক্তির সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–কে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা পাখীসমূহের অংশ বিশেষকে প্রত্যেক পাহাড় থেকে এনে জমা করে এদেরকে জীবিত করার যে অপরিসীম ক্ষমতা তাঁর রয়েছে, তা হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-কে প্রত্যক্ষভাবে দেখানোর

লক্ষ্যেই বলা হয়েছে, হে ইব্‌রাহীম (আ.) ! তুমি চারটি পাখী যবেহ করে এদেরকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে বিভিন্ন পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দাও। তারপর এগুলোকে মহান আল্লাহ্‌র নামে কাছে ডাক, দেখবে এগুলো যবেহ করার এবং বিভিন্ন পাহাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেয়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল এখনও পূর্বানুরূপ আকার ধারণ করে জীবিত অবস্থায় উড়তে আরম্ভ করবে। এতে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)–এর অন্তর প্রশান্তি লাভ করবে এবং তিনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন মৃতদের হাড়–গোশত একত্র করবেন, নষ্ট হয়ে যাবার পর এগুলোকে পুনরায় জীবিত করবেন, প্রত্যেকটি অংগ–প্রতাংগকে পুনরায় যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) جُزْءٌ শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, جُزْءٌ প্রতিটি পূর্ণ বস্তুর অংশকে বলা হয়। سَهْمٌ কথাটি অংশ অর্থে ব্যবহৃত হলেও جُزْءٌ শব্দ থেকে ভিন্ন অর্থ পোষণ করে। কেননা, سَهْمٌ প্রতিটি বস্তুর অংশকে বলা হয়। এজন্যই মীরাছ বন্টনের সময় জনসাধারণ তাদের উত্তরাধিকারের অংশকে বুঝাবার জন্যে سَهْمٌ বা سِهَامٌ কথাটি অধিক ব্যবহার করে থাকেন। তারা جُزْءٌ বা اَجْزَاءٌ কথাটি খুবই কম ব্যবহার করে থাকেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য উল্লিখিত ثُمَّ ادْعُهُنَّ আয়াতাংশের অর্থ মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, প্রতিটি পাহাড়–পর্বতে চারটি পাখীর সমুদয় অংগ–প্রত্যংগ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দেবার পর আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে এগুলোকে ডাকা।

তিনি আরো বলেন, এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পাখীসমূহের হাড়–মাংসকে ইবৃরাহীম (আ.) জীবিত হয়ে ছুটে আসার যখন ডাক দিয়েছিলেন, তখন কি এ অংগ–প্রত্যংগগুলো মৃত অবস্থায় ছিল? না এগুলোকে জীবিত করার পর এরূপ ডাকা হয়েছিল? পুনরায় যদি অংগ–প্রত্যংগগুলোকে প্রাণবিহীন মৃত অবস্থায় ডাকা হয়ে থাকে, তাহলে যার প্রাণ নেই, তাকে ছুটে আসার জন্যে ডাকার কারণ কি? আবার যদি এগুলোকে জীবিত করার পর ছুটে আসার জন্যে ডাকার আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে এদেরকে ডাকার পিছনে ইবৃরাহীম (আ.)–এর কিইবা প্রয়োজন থাকতে পারে? কেননা, তিনি ইতিপূর্বেই এগুলোকে বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়ায় জীবিত হয়ে বিচরণ করতে দেখেছেন। উত্তরে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ.)-কে এরূপ অংগপ্রত্যংগগুলোর প্রতি ছুটে আসার জন্যে ডাক দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। যেগুলো ছিন্নভিন্ন অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে রয়েছে। এ আদেশটিকে আদেশে তাকভীনী বা অস্তিত্ব লাভের আদেশ বলা হয়, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের এক সম্প্রদায়কে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বানরে পরিণত করার জন্যে বলেছিলেন كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ অর্থাৎ তোমরা লাঞ্ছিত বানরের আকৃতি ধারণ কর। এ আদেশটি কর্তব্য সম্পাদনীয় আদেশ নয়। আর যদি এ আদেশটি কর্তব্য সম্পাদনীয় আদেশ হতো তাহলে আদেশকৃত সম্পাদনীয় কর্তব্যটির পূর্বাহ্নে অস্তিত্ব ধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়ত।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।) –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে ইবরাহীম, তুমি জেনে রেখ, যে সত্তা এ পাখীগুলোকে বিভিন্ন পাহাড়ে টুকরা টুকরা রূপে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর হাড়-মাংস ও অংগ-প্রত্যংগগুলোকে একত্রিত করেছেন, এরপর এগুলোকে পুনরায় প্রাণ দিয়েছেন, ফলে এগুলো বিনষ্ট হবার পর পূর্বাবস্থা ফিরে পেয়েছে, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী। যখন তিনি কাউকে পাকড়াও করেন, তখন অন্য সব পরাক্রমশালী, অহংকারী ও প্রভাবশালী থেকে প্রবলতর পাকড়াও করেন। যারা আল্লাহ্‌র আদেশের বিরোধিতা করেছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নবীদের অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যকে উপাস্য হিসাবে মান্য করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিরোধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণেও অধিক পরাক্রমশালী। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬০২৬. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তুমি জেনে রেখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রতিশোধ গ্রহণ ও শাস্তি প্রদানে পরাক্রমশালী এবং আদেশ নির্বাচনে প্রজ্ঞাময়।

৬০২৭. রবী' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তুমি যেনে রেখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলাহ্ স্বীয় প্রতিশোধ গ্রহণ ও শাস্তি প্রদানে এবং আদেশ নির্বাচনে প্রজ্ঞাময়।

(٢٦١) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬১. যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্য দানা থাকে এবং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ দিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য একটি আয়াত হচ্ছেঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

অর্থঃ কে সেই ব্যক্তি? যে আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? ফলে তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর নিকটই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে (২ঃ২৪৫)।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে তালূত ও জালূতের সাথে বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর পরের ঘটনাবলীও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে যে ব্যক্তি (নমরূদ) বিতর্কে লিপ্ত ছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ হয়েছে। যে জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল, তার পাশ দিয়ে আগমনকারী (উযায়র আ.)-এর ঘটনা এবং তার প্রতিপালকের সমীপে তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন তার বিবরণও আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর প্রশ্নোত্তরের বিষয়টি বনী ইসরাঈলের সাথে ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনার পূর্বে হয়েছিল।

এসব ঘটনা বর্ণনার কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। (১) এসবের কিয়দংশ দিয়ে ঐ সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা, যারা মৃত্যুর পর পুনরায় উথান ও কিয়ামতের কথা অস্বীকার করে। (২) এর মাধ্যমে

মুসলমানকে আল্লাহ্র রাহে জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা, জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। এতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে নিশ্চয়তা বিধান করেছেন যে, তিনি তাদেরকে যুদ্ধে সাহায্য করবেন। যদিও তারা সংখ্যায় কম হয় এবং শত্রুদল সংখ্যা বেশী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা দুশমনের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন যে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের ন্যায় বর্তমানেও সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানকে অবহিত করেছেন। যারা ছিল মুসলমানদের দুশমন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা লাঞ্ছিত করেছেন, তাদের দলকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন, তাদের ষড়যন্ত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা নস্যাৎ করে দিয়েছেন। (৩) এতদ্ব্যতীত রাসূল (সা.)–এর সাথে ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতাকে প্রতিহত করাও এর উদ্দেশ্য। যাঁরা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)–এর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিল, তাদের মাঝেই দূরাত্মা ইয়াহুদীরা বাস করত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের গোপন ষড়যন্ত্র, তাদের পূর্ব পুরুষদের গোপনীয় কথা ও তথ্য যেগুলো তারা ব্যতীত অন্যরা জানত না, ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর রাসূল (সা.)–কে অবহিত করেছেন; যাতে তারা জানতে পারে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে অবতীর্ণ। এগুলো আনুমানিক বস্তুও নয় এবং এগুলো হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) (–এর খোদ সৃষ্টিও নয়। (৪) এগুলোর কিছু অংশ দ্বারা মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে। যাতে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দেয়া শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পায় এবং প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তারা তাদের যাবতীয় সন্দেহ থেকে বিরত থাকে। কেননা, তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিও অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল। তারা এমন একটি জনপদের অধিবাসী ছিল, যা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল এবং পরিণামে তা একটি বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাহে দানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পুনরায় ঘোষণা করেছেন مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الخ যে আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম করয দান করে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তার জন্যে কারযে হাসানার প্রতিদানে কি পুরস্কার রয়েছে তাও আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন ঃ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الآية (অর্থাৎ যারা নিজেদের ধন–সম্পদ ও নিজেদের জীবন আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত–গম, যব অথবা ভূমি থেকে উৎপন্ন অন্য কোন শস্য বীজের ন্যায়, যা মাটিতে বপন করার পর একটি অংকুর বের হয় তারপর তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়। তারপর প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হয় একশত শস্যদানা অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ্র রাহে নিজের সম্পদ ব্যয়কারী ব্যক্তির জন্যেও রয়েছে প্রতিটি দানের বদলে সাত শতগুণ ছওয়াব। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রণিধানযোগ্য ঃ

৬০২৮. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "তা ঐ ব্যক্তির জন্যে একটি দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহ্র রাহে ধন–সম্পদ ব্যয় করে, তার জন্যে ছওয়াব রয়েছে সাতশত গুণ।

৬০২৯. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ - -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা এমন একজন লোকের দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহ্‌র রাহে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্‌র রাহে গৃহ ত্যাগ করে।

৬০৩০. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে হিজরতের জন্য বায়আত করল, মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত রইল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুমতি ব্যতীত কারো সাথে মুকাবিলা করেনি, তার জন্যে রয়েছে সাতশত গুণ ছওয়াব। আর যে ব্যক্তি ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য বায়আত করল, তার জন্যে রয়েছে প্রত্যেক নেক আমলে দশগুণ ছওয়াব।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে যে, তুমি কি এরূপ শীষ দেখেছ, যার মধ্যে রয়েছে একশত শস্যদানা অথবা তোমার কাছে কি এ ধরনের কোন সংবাদ পৌঁছেছে যে, একটি শীষে একশতটি শস্যদানা রয়েছে বা হতে পারে, তাহলে তা দিয়ে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয়কারীর একটি উপমা দেয়া যেত। উত্তরে বলা যায় যে, যদি এরূপ শীষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত, যার মধ্যে একশত শস্যদানা রয়েছে, তাহলে এতে কোন কিছু আসে-যায় না। আর যদি এরূপ শীষের অস্তিত্ব খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলেও আয়াতাংশের অর্থ এরূপ হবে যে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি শীষ যা সাতটি শীষের জন্ম দেবে। আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ একটি শীষে একশত শস্যদানা উৎপাদিত হবার ক্ষমতা দান করেন, তাহলে প্রত্যেকটি শীষে হবে একশতটি শস্যদানা।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, আয়াতের অর্থ এরূপ হবারও সম্ভাবনা আছে যে, প্রতিটি শীষে একশত করে শস্যদানা হবে। অর্থাৎ যখন একটি শীষ বপন করা হবে, তখন তা থেকে শতটি শস্যদানা জন্ম নেবে। কাজেই একটি বীজ থেকে শেষ পর্যন্ত যে একশতটি শস্যদানা উৎপাদিত হলো এগুলোকে বীজটির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, তা থেকেই এগুলো এসেছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এ মত সমর্থন করেনঃ

৬০৩১. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ -

-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "আয়াতে উল্লিখিত 'প্রত্যেকটি শীষ একশতটি শস্যদানা উৎপন্ন করে' কথাটি একটি দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন, আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ (অর্থাৎ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন।) -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, 'এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের থেকে যাকে চান আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করার জন্যে পুণ্য একগুণ হতে

সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেন। তবে যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের রাহে বা অন্যের সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করে থাকে, তার জন্যে পুণ্য একগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার অঙ্গীকার করা হয়নি। উল্লিখিত অভিমতের প্রবক্তাগণ স্বীয় যুক্তির পক্ষে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি পেশ করেন ঃ

৬০৩২. দাহ্হাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা সাতশত গুণ বৃদ্ধি করে দেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। যে আল্লাহ্ তা'আলা অসীম প্রাচুর্যের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলার রাহে ব্যয় করে না তার সম্বন্ধেও আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

আবার কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র রাহে ব্যয়কারীদের মধ্য থেকে যাকে চান আল্লাহ্ তা'আলা তা সাতশত থেকে কয়েক হাজার গুণে বৃদ্ধি করে দেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, কথিত আছে যে, উল্লিখিত অভিমতটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আমি তার কোন গ্রহণযোগ্য সনদ পাইনি। তাই আমি তা উল্লেখ করিনি। তবে আমার মতে আয়াতাংশ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ -এর অধিক গ্রহণযোগ্য তাফসীর হচ্ছে, যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাকে সাত শতের অধিক যতগুণ ইচ্ছা পুণ্য দিয়ে থাকেন। এখানে পুণ্য বা পুরস্কারের কোন উল্লেখ নেই এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথ ব্যতীত অন্য পথে ব্যয় করে, তাদের জন্যেও কোন বৃদ্ধির কথা বলা হয়নি। সুতরাং অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ্ যে বৃদ্ধির কথা বলেছেন, তার দ্বারা আমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় না করার আমলের চেয়ে এ আমলের জন্য কয়েক গুণ বৃদ্ধি ধরে নিতে পারি।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সবশ্রোতা সর্বজ্ঞ)। –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পথে ব্যয়কারী সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে চান তাকে তার আমলের সাতশত গুণ থেকে আরও অধিক বৃদ্ধি করে দেয়ার ক্ষেত্রে অসীম প্রাচুর্যের অধিকারী। আর এ বৃদ্ধি পাবার কে উপযুক্ত এ ব্যাপারও তিনি অবগত।

এ অভিমতের সপক্ষে দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

৬০৩৩. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রাচুর্যকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে অসীম প্রাচুর্যের অধিকারী এবং কাকে বৃদ্ধি করে দেবেন সে সম্বন্ধেও তিনি জানেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব প্রবৃদ্ধির জন্যে প্রাচুর্যের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলার পথে কে ব্যয় করে, সে সম্বন্ধেও তিনি অবহিত।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(٢٦٢) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৬২. যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না। তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে; তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পথে ও আল্লাহ্ তা'আলার দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী মুজাহিদদের সাহায্যার্থে যারা ব্যয় করে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারীদের জন্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদেরকে বাহন দিয়ে এবং তাদের সাহায্যার্থে অন্যান্যভাবেও ব্যয় করে সাহায্য করে থাকে এবং যা ব্যয় করে সে সম্পর্কে বলে বেড়ায় না এবং তাদেরকে ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। বলে বেড়াবার বিষয়টি হলো এরূপ যে, সে তাদের কাছে মুখে বা কাজে প্রকাশ করে যে, সে তাদেরকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করেছে, সে দুশমনের বিরুদ্ধে তাদেরকে দান করে যুদ্ধ করার জন্যে তাদেরকে শক্তিশালী করেছে, এ কথাটিও তাদের কাছে প্রচার ও ব্যক্ত করে থাকে। ক্লেশ দেবার বিষয়টি হলো, সে তাদেরকে দান করে এবং আল্লাহ্র পথে তাদের জন্যে ব্যয় করে তাদেরকে শক্তিশালী করার পর তারা জিহাদে বা অন্যান্য কর্তব্য কাজে তাদের কর্তব্য পুরাপুরি আদায় করেনি বলে অভিযোগ করে। এরূপে তারা মুজাহিদদেরকে ক্লেশ দিয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার পথে যাদের জন্যে ব্যয় করেছে, তাদের সম্বন্ধে বলে বেড়ানো ও তাদেরকে ক্লেশ না দেবার শর্তে পুরস্কার ঘোষণার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় যা কিছু ব্যয় করা হয়েছে, তা শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে, কিংবা তাঁর কাছে যে পুরস্কার রয়েছে, তা অর্জনের জন্যে নিবেদিত হওয়া উচিত। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করার বিষয়টি যদি এরূপই হয় যা আমি উল্লেখ করেছি, তাহলে যার জন্যে ব্যয় করা হয়েছে তার সম্বন্ধে বলে বেড়াবার কোন হেতু থাকতে পারে না। কেননা, দানের দ্বারা সে তাদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে কোন দয়া দেখায়নি এবং এমন ধরনের কোন কাজই করেনি যার প্রতিদান না পেলে সে তা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে, কিংবা যাদেরকে দান করেছে তাদেরকে কষ্ট দিতে পারে। কেননা, সে তাদের জন্যে যা কিছু করেছে বা যা কিছু দান করেছে, তার সবই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পুরস্কার পাবার জন্যে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে প্রতিদান দেবেন। যাকে দান করা হয়েছে, সে প্রতিদান দেবার জন্যে বাধ্য নয়। উপরোক্ত তাফসীরটি একদল প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারী সমর্থন করেছেন এবং তাঁরা তাঁদের দলীল হিসাবে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

৬০৩৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতঃ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلاَ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ - এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, কিছু সংখ্যক লোক দান-খয়রাত করার পর তা বলে বেড়ায়। এরূপ বলে বেড়ানোকে অপসন্দ করেন বিধায় আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পর পরই ইরশাদ করেনঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ -

যে দানের পর ক্লেশ দেয়া হয়, তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল (২ ঃ ২৬৩)।

৬০৩৫. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত سَبِيلِ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা اخرين সম্পর্কে বলেছেন। اخرين -এর অর্থ ঐসব মুসলমান, যারা দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে ঘর থেকে বের হতে পারছে না। তারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করে। ব্যয়ের পর তা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না। তবে তাদের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু যে যুদ্ধের জন্যে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, তার ক্ষেত্রে ঐসব শর্ত আরোপ করা হয়নি, সে কম ব্যয় করুক অথবা বেশী ব্যয় করুক এতে কিছু আসে-যায় না। আর এখানে ঘর থেকে বের হবার দ্বারা যুদ্ধের জন্যে বের হবার কথাই বলা হয়েছে। তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اللّٰه অর্থাৎ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে উৎপাদিত হয় একশত শস্যদানা। ইব্‌ন যায়দ (রা.) আরো বলেন, আমার পিতা যায়দ (রা.) বলতেন, "যদি তোমাকে এ বস্তুটি থেকে কাউকে দান করতে কিংবা আল্লাহ্‌র পথে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ব্যয় করতে অনুমতি দেয়া হয় এবং তুমি কাউকে আল্লাহ্‌র পথে শক্তিশালী করার জন্যে ব্যয় করলে, তারপর তুমি ধারণা করলে যে, যাকে তুমি দান করেছ, তাকে যদি তুমি সালাম কর, তাহলে সে দানের কথা স্মরণ কর লজ্জিত হবে, তাহলে তুমি তাকে সালাম দেয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এ সালাম দেয়া থেকে বিরত থাকাটা সালাম দেয়া থেকে উত্তম বলে বিবেচিত।" ইবন যায়দ (রা.) আরো বলেন, একদিন একজন মহিলা আমার পিতা যায়দ (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, 'হে উসামার পিতা, আমাকে এমন একটি লোকের সন্ধান দাও, যে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে বের হয়। কেননা, তাদের মধ্যে অনেকেই শুধুমাত্র ফলফলাদি ভক্ষণ করার জন্যে যুদ্ধে বের হয়ে থাকে। আমার কাছে ফলভর্তি একটি ঝুড়ি আছে। এসো, আমি তোমাদেরকে তা থেকে ফল দান করছি। তাঁকে যায়দ (রা.) উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তোমার ঝুড়িতে এবং তোমার দানে তোমাকে বরকত দান না করেন। কেননা, তুমি তাদেরকে দান করার পূর্বেই ক্লেশ দিচ্ছ। ইব্‌ন যায়দ (রা.) আরো বলেন, তখনকার দিনে কোন একব্যক্তি ছিল, যে মুজাহিদদেরকে বলত, যাও যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে যাও এবং ফলফলাদিও খাও।

৬০৩৬. দাহ্‌হাক (র.) বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "এর মর্ম হচ্ছে, দান করার পর বলে বেড়ানো এবং ক্লেশ দেয়ার চেয়ে কোন ব্যক্তির কিছু দান না করাটা উত্তম।" তিনি আরো বলেন, "অত্র আয়াতাংশ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -এ উল্লিখিত لَهُمْ -এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় সম্পদ দান করেন। কেননা, هُمْ সর্বনামটির مرجع হিসাবে الَّذِيْنَ الخ কথাটিই প্রযোজ্য।" তিনি আরো বলেন, لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -এর অর্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ্‌র পথে দান করে পরে তা বলে বেড়ায় না বা যাকে দান করা হয়ে থাকে তাকে ক্লেশ দেয় না। তাদের ব্যয়ের দরুনই তাদের জন্যে রয়েছে ছওয়াব ও পুরস্কার। وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -এর তাফসীর সম্পর্কে তিনি বলেন, "যারা শর্ত সাপেক্ষে তাদের ধন-সম্পদ দান করে থাকেন, তারা তাদের ছওয়াব ও পুরস্কার পাবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাযির হবার কালে, দুনিয়া পরিত্যাগের সময়, কিংবা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায়ও তাদের

কোন ভয় থাকবে না। অন্য কথায়, কিয়ামতের সময় তাদের কোন ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবার কিংবা তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি স্পর্শ করারও কোন প্রকার ভয় থাকবে না। আর তারা পিছনে অর্থাৎ পৃথিবীতে যা ফেলে এসেছে, তা নিয়েও চিন্তিত হবে না।"

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

(٢٦٣) قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ○

২৬৩. যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

–এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয়, অর্থাৎ যাকে দান করা হয়ে থাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার মনে কষ্ট দেয়া হয়, তা অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট শ্রেয় হয়, হচ্ছে তার সাথে ভাল কথা বলা, উত্তম ব্যবহার করা, এক মুসলিম ভাই অন্য মুসলিম ভাইদের জন্য দু'আ করা, একে অন্যের বিপর্যয় ও দৈন্যকে গোপন রাখা ইত্যাদি।

উল্লিখিত অভিমতের সপক্ষে দলীল হিসাবে কতিপয় হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৬০৩৭. আল–মুছান্না (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি অত্র আয়াতাংশ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, যে দানের পর তা বলে বেড়ানো হয় এবং দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়া হয়, তা অপেক্ষা সম্পদ দান করা থেকে বিরত থাকা শ্রেয়।" পুনরায় অত্র আয়াতাংশে غَنِيٌّ حَلِيْمٌ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, তারা যা সাদকা বা দান–খয়রাত করে, তা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা অভাবমুক্ত। আর যারা দান করে গ্রহীতার নিকট অথবা অন্যের নিকট তা বলে বেড়ায় এবং এ দানের ব্যাপারে কষ্ট দেয়, তাদেরকে শীঘ্র শাস্তি না দিয়ে তাওবার সময় দানে আল্লাহ্ তা'আলা পরম সহনশীল। এমর্মে আল–মুছান্না (র.)–এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৬০৩৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, "অত্র আয়াতে উল্লিখিত اَلْغَنِيُّ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি পরিপূর্ণ ভাবে অভাবমুক্ত। আয়াতে উল্লিখিত اَلْحَلِيْمُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যিনি পরম সহনশীল।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٢٦٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬৪. হে মু'মিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল কর না, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও আখিরাতের

প্রতি বিশ্বাস করে না। তার দৃষ্টান্ত সেই পরিচ্ছন্ন পাথরের ন্যায় যার উপর থাকে কিছু মাটি, তারপর তার উপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা কিছু উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না এবং আল্লাহ্ পাক কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ –আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের দানকে নিষ্ফল কর না। অর্থাৎ দানের কথা প্রচার করে ও ক্লেশ দেয়ার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের দানকে ব্যর্থ কর না। যেমন ব্যর্থ করেছে ঐ ব্যক্তি, যে লোক দেখানোর জন্যে সম্পদ দান করে থাকে। সে নিজ আমলকে লোকজনের কাছে তুলে ধরে। অন্য কথায়, সে এমনভাবে নিজের সম্পদকে ব্যয় করে যাতে মানুষ দেখতে পায় যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করেছে, তাতে তারা তার প্রশংসা করে। অথচ সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায় না ও আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে ছওয়াব অন্বেষণ করে না। সে শুধু এজন্য ব্যয় করছে যাতে মানুষ তার প্রশংসা করে এবং বলে যে, তিনি একজন দানশীল ব্যক্তি এবং তিনি একজন সৎলোক। এজন্য তারা তার প্রশংসা করতে থাকবে। অথচ তারা জানে না যে, সে ব্যয় করার সময় তার কি নিয়ত ছিল এবং সে আল্লাহ্ ও পরকাল সম্বন্ধে যে মিথ্যারোপের আশ্রয় নিয়েছে এ সম্বন্ধেও তারা অবগত নয়। তিনি وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও প্রতিপালন সম্পর্কে সে বিশ্বাস করে না এবং তাকে যে মৃত্যুর পর পুনরায় উঠানো হবে, তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে এ সম্পর্কেও সে বিশ্বাস রাখে না, অন্যথায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে 'আমল করত, আল্লাহ্র তরফ থেকে ছওয়াব অন্বেষণ করত এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যা কিছু ছওয়াব পাওয়া যায়, তাও সে অন্বেষণ করত। আর এটা মুনাফিকের একটি আলামত। তাকে এজন্য মুনাফিক বলা হয়েছে যে, প্রকাশ্য কাফির ও মুশরিকরা কোন আমলই লোক দেখানোর জন্যে করে না। যারা লোক দেখানোর জন্যে আমল করে থাকে, তারা যদিও প্রকাশ্যে তাদের কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এ আমলের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যেন তাদের প্রশংসা করে। পক্ষান্তরে কাফির তার কোন কাজই অন্যের সন্তুষ্টির জন্যে করে না। কেননা তার সব কাজই হচ্ছে শয়তানের জন্যে। যখন সে প্রকাশ্যে কুফরীর ঘোষণা দেয়, তখন সে কোন কাজই আল্লাহ্র জন্যে করে না। আর যার অভ্যাস এরূপ হবে, সে কোন দিনও লোক দেখানোর জন্য তার কোন কাজ করবে না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০৩৯. আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি এরূপও ছিল, যে যুদ্ধ করত, চুরি করত না, যিনা করত না, গনীমতের মালও চুরি করত না, আর মিতব্যয়ী জীবন যাপন থেকে প্রত্যাবর্তনও করত না। বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, কেন সে এরূপ করে থাকে তুমি কি জান? উত্তরে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তিটি এমনও ছিল যে, সে যুদ্ধের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়ত। যদি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এ যুদ্ধে তার প্রতি বালা–মুসীবত তথা পরাজয় নেমে আসত, সে তার

সেনাপতিকে গালি দিত, অভিশাপ দিত এমনকি যুদ্ধের দিনক্ষণকেও সে অভিসম্পাত করত, আর বলত, "এরূপ সেনাপতির নেতৃত্বে আর কোন দিনও যুদ্ধে অবতরণ করব না" বর্ণনাকারী বলেন, "এ ধরনের আচরণ তার জন্যে ক্ষতিকারক, হিতকারী নয় এবং তার এ আচরণ ঐ ব্যক্তির ব্যয়ের ন্যায়, যে দানের পর সেই বিষয়ে বলে বেড়ায় এবং ঐদানের জন্য ক্লেশও দেয়। এরূপ দান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى الخ অর্থাৎ "হে ঈমানদার বান্দাগণ, তোমরা বলে বেড়ায়ে এবং ক্লেশ দিয়ে নিজেদের সাদকা–খয়রাত নিষ্ফল করনা।"

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ –এর ব্যখ্যা ঃ

আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, এটিই হচ্ছে ঐ ব্যক্তির জন্য দৃষ্টান্ত, যে লোক দেখানোর জন্যে সম্পদ ব্যয় করে অথচ সে আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত فَمَثَلُهُ শব্দে বর্ণিত ه সর্বনামটির مرجع হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে লোক দেখানোর জন্যে সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে। এরপর তার উপর পতিত প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে যায়। যা তারা উপার্জন করেছে, তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত صَفْوَانٌ শব্দটি একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যারা এটিকে বহুবচন হিসাবে গণ্য করেছেন, তারা বলছেন যে, এর একবচন হবে صَفْوَانَةٌ যেমন تَمَرٌ বহুবচন শব্দটির একবচন হচ্ছে تَمَرَةٌ (খেজুর)। অনুরূপভাবে نَخْلٌ বহুবচন শব্দটির একবচন হচ্ছে نَخْلَةٌ (খেজুর গাছ)। আর যারা একবচন গণ্য করেছেন তারা বলেছেন, এর বহুবচনও صَفْوَانٌ এবং صَفًى ব্যবহার হয়ে থাকে। صَفًى কথাটি ব্যবহারের উদাহরণ হচ্ছে যেমন কোন একজন কবি বলেছেন, مَوَاقِعُ الطَّيْرِ عَلَى الصَّفٰى অর্থাৎ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন পাথরের উপর পাখীর অবতরণ স্থল। এখানে صَفًى এর অর্থ হচ্ছে صَفْوَانٌ বা মসৃণ পাথর। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত عَلَيْهِتُرَابٌ –এর অর্থ হচ্ছে, عَلَىالصَّفْوَانِتُرَابٌ অর্থাৎ মসৃণ পাথরের উপর কিছু মাটি পরিলক্ষিত হয়। আর মসৃণ পাথরে পড়ে وَابِلٌ অর্থাৎ মুষলধারে বৃষ্টি। যেমন ইমরুল কায়স বলেন ঃ

سَاعَةً ثُمَّ انْتَحَاهَا وَابِلٌ * سَاقِطُ الْاَكْنَافِ وَاهٍ مُنْهَمِرٌ

অর্থাৎ এ রূপে এক ঘন্টা প্রেমিকার সান্নিধ্যে অতিবাহিত হবার পর এমন প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হলো যা নদীনালার কূল ভেঙ্গে যায় এবং বহুল পরিমাণে পানি জমায়।

وَابِلٌ শব্দটি اسم فاعل -এর صيغه -এর ماضى واحد مونث غائب থেকে صيغه -এর বানাতে হলে বলতে হয় وَبَلَتِ السَّمَاءَ অর্থাৎ আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরেছে, مضارع واحد مونث غائب -এর صيغه -এ বলা হয় تَبِلُ এবং مصدر -এ বলা হয় وَبْلاً । পুনরায় ماضى واحد مونث غائب -এর صيغه বলা যায় قَدْ وَبَلَتِ الْاَرْضُ এবং مضارع واحد مونث غائب -এ বলা যায় " تُوْبِلُ "

فَتَرَكَهُ صَلْدًا -এর অর্থ হচ্ছে, فَتَرَكَ الْوَابِلُ الصَّفْوَانَ صَلْدًا অর্থাৎ বৃষ্টির পানি পাথরটিকে পরিষ্কার ও মসৃণ করে রেখে দিয়ে গেছে। আর صلد শব্দটির দ্বারা এমন শক্ত পাথরকে বুঝায়, যার উপর কোন প্রকার ঘাস–লতা জন্মায়নি। সুতরাং যমীনের ক্ষেত্রেও এর দ্বারা এমন যমীনকে বুঝানো হয়ে থাকে, যার মধ্যে কোন প্রকার তৃণলতা জন্মে না। অনুরূপভাবে যে মাথায় চুল নেই, সেই মাথাকেও صلد বলা হয়। যেমন রাউবানামী কবি বলেছেন ঃ

لَمَّا رَأَتْنِي خَلَقَ الْمُمَوَّهِ * بَرَّاقِ اَصْلاَدِ الْجَبِيْنِ الْاَجْلَهِ ـ

অর্থাৎ পাথরের ন্যায় মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন বড় কপালধারী বুরাক যখন আমাকে দেখল এমতাবস্থায় যে আমি ছিলাম বিভিন্ন উপাদানে মিশ্রিত একটি সৃষ্ট জীব। আর এজন্যই যে ডেগ্‌ছি খুব ধীরে ধীরে উতরায় ও গরম হতে বেশি সময় নেয়, তাকেও বলা হয় قِدْرٌ صَلُوْدٌ (অর্থাৎ খুব ধীরে উতরানো ডেগ্‌ছি)। আবার এরূপও বলা হয়ে থাকে যেমন وَقَدْ صَلَدَتْ (অর্থাৎ ডেগছিটি ধীরে গরম হয়েছে)। পুনরায় تَصْلُدُ صُلُوْدًا ও বলা হয়ে থাকে। আরও যেমন "তাআববতা শাররান" নামক কবির কবিতায় উল্লেখ রয়েছে ঃ وَلَسْتُ بِجِلْبِ جِلْبِ رَعْدٍ وَقِرَّةٍ + وَلاَ بِصَفًا صَلْدٍ عَنِ الْخَيْرِ اَعْزَلِ

অর্থাৎ "আমি রাতের ন্যায় অন্ধকার ও ঠাণ্ডাকে আঁকড়িয়ে ধরি না এবং এমন এক মসৃণ শক্ত পাথরের মত নই, যা উপকারী নয়।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাবীর তাবারী (র.) আরো বলেন, এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের অপকর্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাদের কার্যকলাপের একটি উপমা বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, তাদের ক্রিয়াকলাপের উপমা হচ্ছে এমন একটি পাথর, যার উপর মাটি ছিল, তারপর এর উপর মুষলধারে বৃষ্টি নামে, তাতে পাথরটি মাটিশূন্য হয়ে পড়ে। এমনকি তার উপর কোন কিছুই আর পরিলক্ষিত হয় না। মুসলমানগণ প্রকাশ্যত লক্ষ্য করছেন যে, মুনাফিকদের রয়েছে বাহ্যত সৎ ক্রিয়াকলাপ। যেমন তারা লক্ষ্য করছেন যে, মসৃণ পাথরের উপর রয়েছিল মাটি এবং পরে তা মুষলধারে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে–মুছে গিয়েছে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন মুনাফিকদের ঐসব ক্রিয়াকলাপের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থাপন করার মত তাদের কিছুই থাকবে না কেননা, তারা এসব 'আমল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে করেনি। তাই তাদের কোন কাজই প্রতিদান পাবার যোগ্য থাকবে না। যেমন মসৃণ পাথরের উপর মুষলধারী বৃষ্টির দরুন মাটি কিংবা অন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর এ তথ্যটি আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে উল্লিখিত لاَيَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْئٍ বাক্যের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যের সন্তুষ্টির জন্যে, অন্য কথায় লোক দেখানোর জন্যে নিজের সম্পদ ব্যয় করে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করে না, সর্বশেষ বিচারের দিবস সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং

ঐ দিনের পাথেয় সংগ্রহ করে না, তারা দুনিয়াতে যা ব্যয় করেছিল, তার কোন প্রতিদান সর্বশেষ বিচারের দিবস প্রাপ্ত হবে না। কেননা, তারা ঐদিনে প্রতিদান পাবার জন্যে ব্যয় করেনি এবং আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত পুরস্কার লাভ করার আশায়ও তারা ব্যয় করেনি। বরং তারা লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করেছে এবং মানুষের ভুয়া প্রশংসা কুড়াবার জন্যে তারা ব্যয় করেছে। কাজেই তারা যে কাজ ও উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় করেছে, সে কাজ ও উদ্দেশ্যই লাভ করবে। এরপর আল্লাহ্ পাক বলেন, তিনি এমন কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত নসীব করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করার ব্যাপারে তিনি তাদেরকে তাওফীক দান করেন না এবং তারা বাতিলের মুকাবিলায় সৎকার্যসমূহকে অধিক পসন্দ করত। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের গোমরাহীতে নিমজ্জিত অবস্থায় ছেড়ে দেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করেন তোমরা মুনাফিকদের ন্যায় হয়ো না, যাদের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তোমরাও সাদকা, দান-খয়রাত করার পর বলে বেড়ানো, লোক দেখানো এবং কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট কর না। যেমন মুনাফিকরা লোক দেখানোর দ্বারা নিজেদের সম্পদ ব্যয় করার প্রতিদানকে ব্যর্থ করে দিয়েছে আর তারা আল্লাহ্ তা'আলার ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০৪০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এটি একটি দৃষ্টান্ত। শেষ বিচারের দিন কাফিরদের ক্রিয়াকলাপের এরূপ দশা হবে। তারা দুনিয়াতে যা উপার্জন করেছিল ও ব্যয় করেছিল তার কোন প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে পাবে না। কেননা, কিছুরই অস্তিত্ব সেখানে থাকবে না, যেমন শক্ত পরিচ্ছন্ন পাথরের উপর মুষলধারে বৃষ্টি নামলে পাথরের উপর কোন কিছুই থাকে না। পাথরটি হয়ে যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।"

৬০৪১. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى .... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কাফিরদের কৃতকর্মের পরিণতির একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তারা কিয়ামতের দিন কিছুই পাবে না। যেমন বৃষ্টির পর মাটিযুক্ত পাথরে কিছুই থাকে না।

৬০৪২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত الصَّفْوَانُ এমন পাথরকে বলা হয়, যার উপরে কিছু মাটি থাকে, কিন্তু তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে দেয়। অনুরূপ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে, তার এ ব্যয় তার দানকে বিনষ্ট করে দেয়। যেমন মুষলধারে বৃষ্টি পাথরকে পরিচ্ছন্ন করে দেয়। সুতরাং লোক দেখানো উদ্দেশ্যে দান করলে শেষ বিচারের দিন দাতা কিছুই পাবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে বলেছেন, "হে মু'মিনগণ, দানের কথা বলে বেড়ানো এবং কষ্ট দিয়ে দানকে বিনষ্ট কর না। যেমন লোক দেখানোর জন্য দান করা হলে তা ব্যর্থ হয়, দানের কথা বলে বেড়ানো অথবা দান করে কষ্ট দিলে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬০৪৩. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "কোন ব্যক্তির নিজ সম্পদ ব্যয় করার পর বলে বেড়ানো ও গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়ার চেয়ে ব্যয় না করাই উত্তম।" অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ দানের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ও বলেন, "এমন দানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে

একটি কাফিরের ব্যয়, যে আল্লাহ্ তা'আলা ও শেষ বিচারের দিবস সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না।" এরপর আল্লাহ্ পাক দুই জনের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে ইরশাদ করেন– এদের দুই জনের ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি পরিচ্ছন্ন পাথর, যার উপর কিছু মাটি থাকে। মুষলধারে বৃষ্টির কারণে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। এটিই হলো ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে ব্যয় করে বলে বেড়ায় ও গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়।

৬০৪৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এমনিভাবে মুনাফিক কিয়ামতের দিন তার অর্জিত কিছুই কাজে লাগাতে পারবে না।"

৬০৪৫. জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। অত্র আয়াতে ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি "যে ব্যক্তি দান করে তা বলে বেড়ায় এবং দান গ্রহীতাকে ক্লেশ দেয়, সে তার দানকে বিনষ্ট করে দেয়।"

৬০৪৬. হযরত ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى .... لاَيَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا

এবং বলেন, "মুষলধারে বৃষ্টিপাতে ধূলিবালি থেকে পাথরকে পরিচ্ছন্ন দেখেছ কি? এমনিভাবে তুমি দান করার পর তা বলে বেড়ালে এবং গ্রহীতাকে দুঃখ দিলে দানের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।" এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতখানি তিলাওয়াত করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى .... لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا

তিনি আরো তিলাওয়াত করেন ঃ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ (٢/٢٧٢)

অর্থাৎ "যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করে থাক। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না" (২ ঃ ২৭২)

ইতিপূর্বে আমরা صَفْوَانٌ শব্দটির পুরাপুরি ব্যাখ্যা প্রদান করেছি, তাই যথেষ্ট।

যাঁরা আমাদের অভিমত সমর্থন করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬০৪৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ -এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ, كَمَثَلِ الصَّفَاةِ অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন পাথরের ন্যায়।

৬০৪৮. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত كَمَثَلِ صَفْوَانٍ -এর অর্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে صَفْوَانٌ -এর অর্থ বলেছেন اَلصَّفَا অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন পাথর।

৬০৪৯. হযরত রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬০৫০. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, صَفْوَانٌ কে صَفَاةٌ বলে। صَفَاةٌ মানে পিচ্ছিল প্রস্তর খন্ড।

৬০৫১. হযরত কাতাদা (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬০৫২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত "صفوان" শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ পাথর।

মহান আল্লাহ্র বাণী– "وَفَاَصَابَهٗ وَابِلٌ"–এর ব্যাখ্যা ঃ

আমরা ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা করেছি। যাঁরা আমাদের সাথে একমত, তাদের আলোচনা ঃ

৬০৫৩. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতে উল্লিখিত وَابِلٌ –এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ مَطَرٌ شَدِيْدٌ অর্থাৎ মুযলধারে বৃষ্টিপাত।

৬০৫৪. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ –এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, وَابِلٌ –এর অর্থ اَلْمَطَرُ الشَّدِيْدُ অর্থাৎ মুযলধারে বৃষ্টিপাত।

৬০৫৫. হযরত কাতাদা (র.) থেকেও উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ একই রূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬০৫৬. হযরত রবী' (র.) থেকেও উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ একইরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا –এর ব্যখ্যা ঃ

আমরা ইতিপূর্বে এর পুরাপুরি বর্ণনা দিয়েছি।

যাঁরা আমাদের সাথে একমত ঃ

৬০৫৭. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا –এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে যায়।

৬০৫৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا –এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ এটাকে এমনভাবে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রেখে যায়, যার মধ্যে কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

৬০৫৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا –এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ তার উপর আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

৫০৬০. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াাতাংশে উল্লিখিত صَلْدًا শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ فَتَرَكَهٗ جُرُدًا অর্থাৎ এটাকে চুলশূন্য বা কোন কিছু শূন্য রেখে দেয়।

৫০৬১. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا –এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এটাকে এমন পরিষ্কার রেখে দেয়, যার মধ্যে কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

৫০৬২. হযরত ইব্ন আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا –এর অর্থ বলেন, তাকে এমন পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ রেখে যায়, যার মধ্যে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٢٦٥) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৬৫. যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত কোন উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ফলে তার ফলমূল

দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি না-ও হয়, তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যারা তাদের ধন–সম্পদ আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করে, আল্লাহ্র পথের মুজাহিদকে যানবাহন সরবরাহ করে, অভাবগ্রস্ত মুজাহিদগণের ব্যয় বহন করে ও তাদের সাহায্য করে, আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন বান্দাদের সহায়তা করে, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে থাকে। এক কথায় আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়। যেমন আরবী ভাষায় কথিত আছে, ثَبَّتَّ فُلاَنًا فِىْ هٰذَا الْاَمْرِ অর্থাৎ তুমি অমুকের ইচ্ছা এব্যাপারে সুদৃঢ় করেছ; তার ইচ্ছাকে এ ব্যাপারে তুমি শক্তিশালী করেছ এবং তুমি তাকে মনের মত বলিষ্ঠ করেছ। যেমন কবি ইব্ন রাওয়াহা বলেছেন, فَثَبَّتَ اللّٰهُ مَا اٰتَاكَ مِنْ حَسَنٍ * تَثْبِيْتَ مُوْسٰى وَنَصْرًا كَالَّذِىْ نُصِرُوْا অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সৌন্দর্য দান করেছেন তা তিনি কায়েম রাখুন। যেমন তিনি সুদৃঢ় করেছেন মূসা (আ.)–কে। আর তারা যাকে সাহায্য করেছে তার ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করে তোমাকে সুদৃঢ় করুন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ তথ্যটির দিকে ইংগিত করেছেন যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিল বিধায়। তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হয়ে কাউকে দান করে মানুষের নিকট বলে বেড়ায় না এবং গ্রহীতাকে কষ্টও দেয় না। আল্লাহ্র পথে দান করেছে তাই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য সম্পদ ব্যয় করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মনোবল দান করেছেন, তাদের ঈমানী শক্তিকে বৃদ্ধি করেছেন, তাদের ইয়াকীন দান করেছেন। এজন্যই প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকারগণ تَثْبِيْتًا –এর অনুবাদ تَصْدِيْقًا করেছেন অর্থাৎ তাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করা।

কেউ কেউ বলেন, ব্যাখ্যাকারীরা تَثْبِيْتًا –এর অর্থ يَقِيْنًا নিয়েছেন। কেননা যারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধন–সম্পদ ব্যয় করে, তারা তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করে। আর তা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের পরই সম্ভব হতে পারে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০৬৩. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ –এর অর্থ হলো تَصْدِيْقًا وَيَقِيْنًا অর্থাৎ অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করা।

৬০৬৪. শা'বী (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে উল্লিখিত وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ –এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে وَتَصْدِيْقًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ তাদের পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা এবং বিশ্বাসে সুদৃঢ় থাকা। আবার ثَبَاتٌ শব্দের অর্থ অন্তরের দৃঢ়তা অর্জন ও সাহায্য লাভ করা।

৬০৬৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, يَقِيْنًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ تَثْبِيْتً এর অর্থ ইয়াকীন, অন্য কথায় তাদের মনের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

৬০৬৬. আবূ সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -এর অর্থ হচ্ছে يَقِيْنًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ (অর্থাৎ তাদের অন্তরে সুদৃঢ় বিশ্বাস)।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -এর অর্থ হচ্ছে, সাদ্‌কা প্রদানের স্থান সুনির্দিষ্টকরণ।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ এর অর্থ হচ্ছে, তারা সুনিশ্চিত হতেন যে, তারা কোথায় তাদের সাদ্‌কা প্রদান করবেন।

৬০৬৮. অন্য সূত্রেও মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬০৬৯. মুজাহিদ (র.) থেকে আরেক সূত্রে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তারা সুনিশ্চিত হতেন যে, তারা কোথায় দান-খয়রাত করবেন।

৬০৭০. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তারা সুনিশ্চিত হতেন যে, কোথায় তারা তাদের যাকাত প্রদান করবেন।

৬০৭১. আলী ইবন আলী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (র.) থেকে শুনেছি। তিনি অত্র আয়াতাংশ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সাদ্‌কা করতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা অর্জন করতেন। যদি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে হতো তাহলে তিনি তা করতেন। আর যদি কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হতো তখন তা থেকে তিনি বিরত থাকতেন।

৬০৭২. আল্লামা ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যাটি প্রকাশ্য তিলাওয়াত অনুসারে গ্রহণযোগ্য অর্থ বলে মনে করা কঠিন। কেননা, তারা অত্র আয়াতংশ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -এ উল্লিখিত تَثْبِيْتًا শব্দটির অর্থ تَثْبِيْتًا বলে ধরে নিয়েছেন। আর তারা মনে করেন, এরূপ ব্যাখ্যাই এখানে প্রযোজ্য। কারণ, জনসাধারণ নিশ্চিত হতেন যে, তারা তাদের সম্পদ কোথায় ব্যয় করছেন।

আল্লামা ইবন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, যদি এরূপ ব্যাখ্যাই সঠিক হতো তাহলে وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ -এর পরিবর্তে হবে وَتَثَبُّتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ ; কেননা باب تفعل থেকে যদি واحد مذكر حاضر -এর সাথে মাসদার ব্যবহার করা হয়, তবে সাধারণত বলা হয়ে থাকে যেমন "تَكَرَّمْتَ تَكَرُّمًا" কিংবা "تَكَلَّمْتَ تَكَلُّمًا" -অন্য একটি উদাহরণ হচ্ছে যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নাহলের ৪৭নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ط فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (অর্থাৎ ঃ অথবা এদেরকে তিনি

ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করবেন না? তোমাদের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।” আরবী ভাষাবিদগণ বলেন, কেউ বলে থাকে تَخَوَّفَ فُلَانٌ هٰذَا الْاَمْرَ تَخَوُّفًا অর্থাৎ فعل –এর সামঞ্জস্য রেখেই مصدر –এর অবতারণা। অনুরূপভাবে যদি আমরা باب تفعل –এর মাসদার মনে করে অর্থ ধরে নেই যে, জনসাধারণ তাদের সাদ্‌কা প্রদানের সময় তারা সুনিশ্চিত হয়ে যায় তাহলে وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ আয়াতাংশে উল্লিখিত وَتَثْبِيْتًا –এর স্থলে تَثَبُّتًا হওয়ার দরকার ছিল। অথচ আয়াতের অর্থ এটাই প্রযোজ্য, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ তা‘আলার ওয়াদা–অঙ্গীকারের প্রতি তাদের ইয়াকীন অর্জিত হওয়ায় ও তাদের সুদৃঢ় সদিচ্ছা পরিশুদ্ধ হওয়ায় তাদের অন্তর বলিষ্ঠ হবার লক্ষ্যে তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, অত্র আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয়াত সূরা মুয্‌যাম্মিলে উল্লেখ রয়েছে وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا (একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও।) অর্থাৎ পূর্ববর্তী فعل –এর সাথে সামঞ্জস্য না রেখে পরবর্তীতে মাসদার উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বলা উচিত ছিল "تَبَتُّلًا" –উত্তরে বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াত ও সূরা মুয্‌যাম্মিলের আয়াতের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا –এর মধ্যে تَبْتِيْلًا বলা হয়েছে, تَبَتُّلًا বলা হয়নি। تَبَتَّلْ নামক فعل টির মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে। প্রকৃত আয়াতটি ছিল এরূপ, "وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ فَيُبَتِّلَكَ اللّٰهُ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا" আরবগণ এরূপে বাক্য ছেড়ে দেয় এবং পূর্বেকার فعل –এর সাথে সামঞ্জস্য না রেখে উহ্য বাক্যের فعل অনুসারে পরে مصدر উল্লেখ করে থাকে। তবে যদি পূর্বে এরূপ কোন فعل উল্লেখ করা না হয়, তখন অসামঞ্জস্যপূর্ণ مصدر ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অন্য একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে (৭১ ঃ ১৭)। আল্লাহ্ পাক আরো ইরশাদ করেন, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا তারপর তার প্রতিপালক তাকে সাগ্রহে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন–পালন করলেন। نَبَاتٌ শব্দটি نَبَتَ নামক فعل –এর মাসদার। আর এখানে نبات কথাটি উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে انبت فعل টি উল্লেখ করার কারণে। কেননা, এ فعل টির দরুন বুঝা যায় যে, এখানে একটি فعل –কে উহ্য রাখা হয়েছে, যার থেকে نبات শব্দটি নির্গত। পূর্ণ আয়াতটি হবে এরূপ ঃ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ فَنَبَتُّمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমরা ভূমি থেকে উদ্ভূত হলে। কিন্তু وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ –এর মধ্যে এরূপ কিছুই নেই। কেননা, এখানে বলা যায় না যে تَثْبِيْتًا শব্দটি ثَبَتَ থেকে নির্গত না হয়ে تَثَبَّتَ থেকে নির্গত ধরা হয়েছে, তাহলে পূর্ণ বাক্যটি এরূপ হতো وَيَتَثَبَّتُوْنَ فِىْ وَضْعِ الصَّدَقَاتِ مَوْضِعَهَا অন্য কথায় পূর্ববর্তী এমন বাক্য নেই, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে একটি কালাম উহ্য রয়েছে এবং তা থেকে تَثْبِيْتًا –কে নির্গত বলে ধরা হয়েছে। কাজেই تَثْبِيْتًا –কে تَثَبُّتًا পড়া শুদ্ধ হবে না এবং তাকে تَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ও অনুরূপ বাক্যগুলোর পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ –এর অর্থ হচ্ছে اِحْتِسَابًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ তাদের আত্মাকে গভীরভাবে বিবেচনা করার জন্যে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০৭৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত وَتَثْبِيتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ –এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে اِحْتِسَابًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ এধরনের উক্তি تَثْبِيْتً –এর অর্থকে প্রকাশ করে না। কেননা–আরবী ভাষাভাষীদের নিকট تَثْبِيْتً –এর অর্থ اِحْتِسَابً বলে সুপরিচিত নয়। তবে যদি এ, আয়াতের তাফসীরকার এরূপ অর্থ নেয়ার ইচ্ছা করে থাকেন এ কথার ভিত্তিতে যে, দানকারীদের আত্মাসমূহ দানকারীদের কর্তৃক পরিচালিত প্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যদি এরূপ অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে তাফসীরকারগণের বাক্যটির অর্থ হতো। এরূপ নয় বিধায় বাক্যটির অর্থ اِحْتِسَابً বলে পরিগণিত নয়।

আলোচ্য আয়াতাংশ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যারা নিজেদের ধন–সম্পদ ব্যয় করে, সাদ্‌কা–খয়রাত করে, যাদের উপর সাদ্‌কা করা হয়েছে তাদের কাছে বা অন্যদের কাছে তা বলে বেড়ায় না, তাদেরকে এ দানের পরিপ্রেক্ষিতে কষ্টও দেয় না, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিজ্ঞার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আল্লাহ্‌র পথে তারা ব্যয় করে। তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি জান্নাত (جَنَّةٌ)। এখানে উল্লিখিত جَنَّةٌ –এর অর্থ হচ্ছে বাগান। পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে কিতাবের অন্য জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছি, যার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত رَبْوَةٌ, শব্দটির অর্থ হচ্ছে উচ্চভূমি, যা প্লাবনসীমার উচে অবস্থিত থাকে। এখানে বাগানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা رَبْوَةٌ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেননা, যে ভূমি প্লাবনসীমা ও উপত্যকা থেকে উচে অবস্থিত, তাতে বাগান দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর উচ্চভূমির দীর্ঘস্থায়ী বাগানই অধিক উত্তম, (সুদৃশ্য) উত্তম ফলদান করে। চারা রোপণ ও জমি প্রস্তুত করার সুউত্তম ব্যবস্থাপনায় অতুলনীয় অবদান রাখে। আর এজন্য বনী ছা'লাবার একজন বিখ্যাত কবি আ'শা তার বাগানের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

مَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَزَنِ مُعْشِبَةٌ * خَضْرَاءُ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلٌ ـ

অর্থাৎ উচ্চভূমিতে অবস্থিত বাগানসমূহের চেয়ে উত্তম কোন বাগান নেই যা সবুজ ঘাসে পরিপূর্ণ এবং যাকে অবিরাম বৃষ্টিপাত সব সময় দয়া করে থাকে। কবি তাঁর বাগানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এ বাগানটি উচ্চভূমিতে অবস্থিত বাগানসমূহের অন্যতম। আর উচ্চভূমির বাগানগুলো উন্নতমানের হয়ে থাকে। কেননা, এসব বাগানের চারাগাছ ও ঘাসগুলো উপত্যক ও সুউচ্চ টিলায় অবস্থিত বাগানসমূহের চারা গাছ, ঘাস ও ফল–ফলাদির গাছ থেকে উত্তম ও অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। رَبْوَةٌ শব্দটিতে তিনটি পঠনরীতি রয়েছে। প্রত্যেকটি রীতিই একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করেছেন। প্রথমত "ر" –কে পেশ দিয়ে পড়া অর্থাৎ رُبْوَةٌ পাঠ করা। এটা হচ্ছে মদীনা, হিজায ও ইরাকের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের পাঠরীতি। আর দ্বিতীয় কিরাআতে "ر" –কে যবর দিয়ে পড়া হয় অর্থাৎ رَبْوَةٌ পাঠ করা হয়ে থাকে। সিরিয়া ও কূফার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞ এরূপ পাঠ করা পসন্দ করেছেন। আর এটা বনী তামীমের পাঠরীতি বলেও জনশ্রুতি রয়েছে। তৃতীয় কিরাআতে "ر" –কে যের দিয়ে পড়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ رِبْوَةٌ পড়া হয়ে থাকে। এরূপ কিরাআত নাকি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে বলে শুনা যায়।

আল্লামা ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, শুধুমাত্র দু'টি কিরাআতের যে কোন একটি ব্যতীত অন্য কোন কিরাআত আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। তন্মধ্যে একটি যবর দিয়ে এবং অন্যটি পেশ দিয়ে পড়া। কেনন, বিভিন্ন দেশে এদু'টির যে কোন একটি পাঠরীতিই জনসাধারণ গ্রহণ করে থাকে, আবার আমার কাছে যবর দেয়ার চেয়ে পেশ দিয়ে পড়াটাই অধিক প্রিয়। কেননা, এই রীতিই আরবদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়। "ر" অক্ষরে যের দিয়ে পড়াটা বর্জিত হওয়াই এ কিরাআতের অবৈধতার প্রকাশ্য ও প্রকৃষ্টতর প্রমাণহিসাবেবিবেচ্য।

পুনরায় উচ্চভূমিকে "رَبْوَةٌ" বলার পিছনে কারণ এই যে, এ ভূমিটি অতি যত্নসহকারে প্রতিপালিত হয়েছে ও শুষ্কতা অর্জন করেছে এবং উঁচুভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কোন বস্তু আরবদের কাছে ফুলে উঠে বৃহদাকার ধারণ করলে বলা হয় رَبَا هٰذَا الشَّيْئُ وَيَرْبُوْ (অর্থাৎ এ বস্তুটি বেড়েছে ও জনপ্রিয় হয়েছে বা এ বস্তুটি বেড়ে উঠবে)।

উপরোক্ত তাফসীরটি প্রখ্যাত তাফসীরকারগণ সমর্থন করেন এবং দলীল হিসাবে কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০৭৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ربوه এমন একটি প্রকাশ্য উঁচু স্থানকে বলা হয় যা সমতল।

৬০৭৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত بِرَبْوَةٍ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সুউচ্চ সমতল ভূমি।

৬০৭৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সুউচ্চ ভূমি।

৬০৭৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, رَبْوَةٌ বলা হয় এমন একটি সুউচ্চ স্থানকে,যার মধ্য দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয়নি। আর যার মধ্যে রয়েছে সারি সারি উদ্যানসমূহ।

৬০৭৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত رَبْوَةٌ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সুউচ্চ ভূমি।

৬০৭৯. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, رَبْوَةٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে সুউচ্চ ভূমি।

৬০৮০. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ –এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, رَبْوَةٌ এমন একটি সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয়, যার মধ্য দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয়নি।

আবার কেউ কেউ বলেন, رَبْوَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সমতল ভূমি'। যেসব তাফসীরকার উপরোক্ত তাফসীরটি সমর্থন করেছেন, তাঁরা তাঁদের দলীল হিসাবে নিম্নে বর্ণিত কতিপয় হাদীস উপস্থাপন করেন ঃ

৬০৮১. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, رَبْوَة –এর অর্থ এমন একটি সমতল ভূমি, যা জলসীমার সুউচ্চে অবস্থিত। তিনি আরো বলেন, أَصَابَهَا وَابِلٌ –এর মর্মার্থ হচ্ছে, সুউচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বাগানটিতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ –এর অর্থ হচ্ছে, যখন উদ্যানটিতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, তখন উদ্যানটি দ্বিগুণ ফল প্রদান করে। أُكُلٌ (الف ও كاف –এ পেশ সহকারে) শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভক্ষণযোগ্য দ্রব্য। আর এটা ভয়, ধীরগতি ও এগুলোর ন্যায় অন্য সব বিশেষ্য যা ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। أَكْلٌ (الف –এ যবর ও كاف –এ জযম) শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভক্ষণ করা। এর থেকে বলা হয়ে থাকে أَكَلْتُ أَكْلًا এবং أَكَلْتُ أَكْلَةً وَاحِدَةً অর্থাৎ আমি খাবার খেয়েছিলাম এবং আমি একবার খেয়েছিলাম। যেমন কোন প্রখ্যাত কবি বলেছেন ঃ

وَمَا أَكْلَةٌ إِنْ نِلْتُهَا بِغَنِيمَةٍ * وَلَاجُوعَةٌ إِنْ جُعْتُهَا بِغَرَامٍ -

অর্থাৎ আমি যদি কোন খাবার খেয়ে থাকি, তাহলে এটা গনীমত নয়, আর যদি কোন সময় অভুক্ত থেকে থাকি, তাহলে এটাও জরিমানার ব্যাপার নয়। অর্থাৎ দুটো অবস্থাই স্বাভাবিক।

এ কবিতায় "أَكْلَةٌ" –এর الف –এ যদি যবর দিয়ে পড়া হয়, তবে তার অর্থ ভক্ষণকারীর কর্ম বিশেষ। পুনরায় أُكْلَة –এর الف –কে যদি পেশ দিয়ে পড়া হয়, তাহলে এর অর্থ হবে খাদ্য যা ভক্ষণকারী খেয়েছে। তখন এটার অর্থ হবে, আমি বা তুমি যা কিছু খেয়েছ বা খেয়েছি তা গনীমত নয়। পরবর্তী আয়াতাংশ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ –এ উল্লিখিত طَلٌّ –এর অর্থ হচ্ছে লঘু বৃষ্টিপাত। এরূপ তাফসীর সমর্থনকারীদের উপস্থাপিত নিম্ন বর্ণিত কতিপয় হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৬০৮২. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلطَّلُّ –এর অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে লঘু বৃষ্টিপাত।

৬০৮৩. ইমাম আস–সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلطَّلُّ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে লঘু বৃষ্টিপাত।

৬০৮৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত طَلٌّ –এর অর্থ طَشٌّ বা লঘু বৃষ্টিপাত।

৬০৮৫. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত طَلٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে লঘু বৃষ্টিপাত বা বৃষ্টিপাতের ছিটাফোঁটা।

৬০৮৬. রাবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত طَلٌّ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে লঘু বৃষ্টি বা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

প্রখ্যাত তাফসীরকার ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি উপমা পেশ করেছেন। বর্ণিত উদ্যানে যখন প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তখন সে উদ্যানে ফলমূল দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর যদি বৃষ্টিপাত প্রচুর নাও হয় তবে লঘু বৃষ্টিপাতই যথেষ্ট। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজের আত্মাকে বলিষ্ঠ করার জন্যে যে দানশীল ব্যক্তি তার ধনসম্পদ কম হোক কিংবা বেশী হোক দান করে,

দানের পর বলে বেড়ায় না, কিংবা দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয় না, আল্লাহ্ তা'আলা তার সাদ্কাকে দ্বিগুণ করে দেন, তার সাদ্কাকে বিনষ্ট করে দেয়া হয় না অথবা তার সাদ্কাকে ফেরত দেয়া হয় না। যেমন করে বর্ণিত উদ্যানটির ফলমূল দ্বিগুণ করে দেয়া হয়, ঐ উদ্যানে বৃষ্টি কম হোক কিংবা বেশী হোক তাতে সেই উদ্যানের কোন অনিষ্ট হয় না, কিংবা অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। তদ্রূপ দানও কম হোক কিংবা বেশী হোক, এটাকে বিনষ্ট করা হয় না কিংবা ফেরত দেয়া হয় না।

উপরোক্ত তাফসীরটি একদল বিখ্যাত তাফসীরকার সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬০৮৭. ইমাম আস সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর মর্মার্থ হচ্ছে, উদ্যানের ফলমূল যেভাবে দ্বিগুণ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে এ দানকারীর দানে প্রতিফলও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

৬০৮৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এটা একটি উপমা। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দার আমল সম্পর্কে উদাহরণটি পেশ করেছেন। এ উদ্যানটি যেমন অধিক বৃষ্টিপাত কিংবা কম বৃষ্টিপাত যে কোন অবস্থায়ই মানুষের উপকার করে থাকে, উপকার থেকে বিরত হয় না, অনুরূপভাবে মু'মিন বান্দার দান তার উপকার থেকে বাদ যায় না।

৬০৮৯. হযরত দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান করে, তার একটি উপমা এখানে পেশ করা হয়েছে।

৬০৯০. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা একটি দৃষ্টান্ত, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দার জন্যে বর্ণনা করেছেন।

যদি এখানে কেউ প্রশ্ন করেন যে, এখানে কেমন করে বলা হলো فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ অর্থাৎ যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত না হয়, তবে লঘু বৃষ্টিই যথেষ্ট। এখানে طَلٌّ শব্দটি خبر হিসাবে ব্যবহার হয়েছে, তার مبتدا কি? জবাব হলো, এখানে একটি كان উহ্য রয়েছে অর্থাৎ مبتدا উহ্য বলে ধরে নেয়া হয়েছে। কাজেই পুরা আয়াতাংশের অর্থ হবে এরূপ ঃ ঐ উদ্যানের ফলমূল দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর যদি বাগানে প্রচুর বৃষ্টিপাত না হয় এবং সেখানে লঘু বৃষ্টিপাত হয় .... । অনুরূপভাবে আরবগণ ব্যবহার করে থাকেন - حَبَسْتُ فَرَسَيْنِ فَاِنْ لَمْ اَحْبِسْ اِثْنَيْنِ فَوَاحِدًا بِقِيْمَتِهٖ অর্থাৎ আমি দুইটি ঘোড়া আবদ্ধ করেছি, যদি আমি দুইটি আবদ্ধ করতে না পারি, তাহলে তা ছিল একটা যাকে তার মূল্য দিয়ে আবদ্ধ করেছি। এ বাক্যে فَاِنْ لَمْ اَحْبِسْ এরপর একটি كان উহ্য রয়েছে আর পরবর্তী বাক্যাংশ كان এর خبر হিসাবে বিবেচ্য। এরূপ ব্যবহার কবিদের কবিতায়ও পাওয়া যায়। যেমন একজন প্রসিদ্ধ কবি বলেন ঃ

اِذَا مَا انْتَسَبْنَا لَمْ تَلِدْنِي لَئِيْمَةٌ ٭ وَلَمْ تَجِدِيْ مِنْ اَنْ تُقِرِّي بِهَا بُدًّا -

অর্থাৎ যদি আমরা আমাদের বংশ পরিচিতি তোমাদের কাছে তুলে ধরি, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে, আমাকে কোন অশ্লীল রমণী জন্ম দেয়নি। এ সম্পর্কে অশ্লীল রমণীকে স্বীকৃতি পেশ করার জন্যে বাধ্য করা হলে সে এ স্বীকৃতি ব্যতীত অন্য কিছু বলার অবকাশ পাবে না।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, হে মানব জাতি ! তোমরা দানের মাধ্যমে যে আমল করছ, তা তিনি দেখছেন। তোমাদের এ কাজ কিংবা অন্যান্য কাজের কিছুই তাঁর কাছে অস্পষ্ট নয়। তিনি সব দেখেন এবং জানেন যে, কে নিঃস্বার্থভাবে কিংবা লোক দেখানো ও ক্লেশ দেয়া ব্যতীত দান করছে, আর কে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং নিজের আত্মাকে বলিষ্ঠ করার জন্যে দান করছে। তোমাদের এসব কিছুর সবটার হিসাব তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি তোমাদের সব আমল বা কাজের প্রতিদান প্রদান করবেন। যদি ভাল কাজ কর, ভাল প্রতিদান দেয়া হবে। আর খারাপ কাজ করলে তার প্রতিদানও খারাপই পেতে হবে। এ ঘোষণা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেছেন যে, দান কিংবা অন্যান্য আমলেও আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে যে নিষিদ্ধ কাজ করবে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম বহির্ভূত কাজ করবে, তাদের জন্য রয়েছে শাস্তি। শাস্তি এড়াবার কোন অবকাশ নেই। কেননা, সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা দেখেন, শুনেন, জানেন। তাদের সব কিছুরই তাঁর কাছে হিসাব রয়েছে। সর্বদাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বন্দাদের প্রতি সচেতন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٢٦٦) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২৬৬. তোমাদের কেউ কি পসন্দ করে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয় এবং তাতে সর্ব প্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান—সন্ততি থাকে দুর্বল, তারপর এমন অবস্থায় সে বাগানে আসে একটি ঘূর্ণিঝড় যাতে থাকে আগুন এবং যা বাগানকে জ্বালিয়ে দেয়? এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এরূপ ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِيَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ الْاٰيَةَ ـ

এ আয়াতে উল্লিখিত اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ –এর অর্থ اَيُحِبُّ অর্থাৎ তোমাদের কেউ কি পসন্দ করে। এ আয়াতে উল্লিখিত اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ –এর অর্থ, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আবার তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত,

وَلَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ এর অর্থ, যাতে সর্ব প্রকার ফলমূল আছে। তিনি আরো বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত لَهُ –এর ه সর্বনামটির مرجع হলো اَحَدُكُمْ আর فِيهَا –এর هَا সর্বনামটির مرجع হলো جَنَّةٌ এবং اَصَابَهُ –এর ه সর্বনামটির مرجع হলো اَحَدُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কেউ বার্ধক্যে উপনীত হয় ও তার সন্তান–সন্ততি থাকে দুর্বল। তিনি আরো বলেন, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য খেজুর ও আংগুরের বাগান তৈরী রেখেছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি পসন্দ করে যে, তার জন্য মুনাফিকের ব্যয়ের ন্যায় একটি উপমা হোক? মুনাফিক মানুষকে দেখানোর জন্যে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে নয়। সে চায় তার দান ও খয়রাত যেন মানুষের কাছে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় এবং মানুষ তার প্রকাশ্য আমলের জন্যে তার জীবদ্দশায় তার প্রশংসা ও তারীফ করে, যেমন মানুষ বাগানের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা সর্তক করেছেন যে, মুনাফিকের আমলের উপমা এমন একটি খেজুর ও আংগুরের বাগান, যাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যাবতীয় ফলমূল। কেননা, মুনাফিকের সম্পূর্ণ আমল ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জন্যে নিবেদিত। আর এ দুনিয়ার সুখ–শান্তি অর্জনের জন্যে সে তার জান–মাল, বুকের রক্ত ও বংশধর বিসর্জনের মাধ্যমে জোর প্রচেষ্টা চালায়। আর তার এ প্রচেষ্টা প্রশংসা অর্জন করে, জনগণের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে, দুনিয়ার সম্পদে তার যোগ্য অংশ সে অর্জন করে নেয়। এরূপে বহু সম্পদ ও প্রশংসা সে অর্জন করে থাকে, যার কোন ইয়ত্তা নেই। তার অর্জিত সমস্ত পার্থিব সুখ–শান্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বাগানের সাথে তুলনা করেছেন, যাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যাবতীয় ফল–ফলাদি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, এ মুনাফিক বার্ধক্যে উপনীত হয় ও তার থাকে দুর্বল সন্তান–সন্ততি। অর্থাৎ বাগানের মালিক বার্ধক্যে উপনীত হয় ও তার থাকে ছোট ছোট দুর্বল সন্তান–সন্ততি। তারপর ঐ বাগানের উপর একটি অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও তা জ্বলে যায়। অন্য কথায়, তার প্রয়োজনের সময় অগ্নিমিশ্রিত ঘূর্ণিঝড় তার বাগানকে জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। অথচ এসময় বাগানের ফল তার নিতান্ত প্রয়োজন। সে বৃদ্ধ তাই সে এ বাগান পুনরায় সংস্কার করতেও অক্ষম, তার সন্তান–সন্ততিরাও ছোট ছোট, কর্মক্ষম নয়। তারা বাগানের খোঁজ–খবর নিতে অক্ষম। তার ও তার সন্তানদের জন্যে এ ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ নেই। তারা সকলে বাগানের ফল–ফলাদির প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী। অথচ অগ্নিমিশ্রিত ঘূর্ণিঝড় সবকিছুই নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে। অনুরূপভাবে লোক দেখানোর জন্যে যে ব্যয় করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দানের দীপশিখা নিভিয়ে দেন, তার আমল বিনষ্ট করে দেন।, তার পুরস্কার পন্ড করে দেন। সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গমন করবে কিন্তু খালী হাতে। তার কোন আশ্রয়ের স্থান থাকবে না। তার পাপের ক্ষমা নেই। তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়। তার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন তার বাগানকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বাগানের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহ্ তা'আলাবর্ণনা করেছেন। এ সময় সে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে এবং সন্তান–সন্ততিরা দুর্বল বিধায় সে উক্ত বাগানের প্রতি যারপরনেই মুখাপেক্ষী। এ সময়ই বাগানের যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা তার থেকে হরণ করে নেয়া হয়েছে। যারা লোক দেখানোর জন্যে সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্যে দৃষ্টান্তটি এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এ দৃষ্টান্তটির ন্যায় অন্য একটি উপমাও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَيَقْدِرُوْنَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا –এর ব্যাখ্যায়ও তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বর্ণনার দৃষ্টিভঙ্গি যদিও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, কিন্তু সারমর্ম একই, যা উপরে আমরা বর্ণনা করেছি। তাঁদের সকলের বর্ণনার সারমর্ম ও বিশুদ্ধতার প্রতীক সুদ্দী (র.)–এরবর্ণনা।

৬০৯১. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তা লোক দেখানো ব্যয়ের অন্য একটি উপমা। সে মানুষকে দেখানোর জন্যে সম্পদ ব্যয় করে। অন্য কথায়, লোক দেখানোর জন্যে তার সমস্ত সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ ব্যয়ের জন্যে কিয়ামতের দিন কোন পারিশ্রমিক দেবেন না। উক্ত দিবসে যখন সে তার ব্যয়ের প্রতিদানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে, তখন সে দেখবে, লোক দেখানো ক্রিয়াটি তার ব্যয়কে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাই তার ব্যয় নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। যেমন– কোন এক ব্যক্তি একটি বাগানের জন্যে বিপুল সম্পদ ব্যয় করে। তারপর যখন সে বৃদ্ধাবস্থায় পরিণত হয়, সন্তান–সন্ততি সংখ্যায় অধিক হয়, সে বাগানটির প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তখনই অগ্নিমিশ্রিত ঘূর্ণিঝড় এসে তা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। সে বাগানের আর কিছু পায় না। বস্তুত অনুরূপ অবস্থা ঐ ব্যক্তির, যে লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে থাকে।

৬০৯২. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ–এর তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, এটি একটি উপমা ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং তার মৃত্যুও এ অবস্থায়ই হয়ে থাকে। তোমাদের কেউ কি পসন্দ করে যে, তার পার্থিব সম্পদ হবে কিন্তু সে তা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে ব্যয় করবে না। সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার আছে এমন সব উদ্যান যেগুলোর পাদদেশে নদী–নালা প্রবাহিত, যাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের যাবতীয় ফল–ফলাদি, সে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তার থাকে দুর্বল সন্তান–সন্ততি, তারপর এর উপর একটি অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও তা জ্বলে–পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তার উপমা হবে– ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার বাগান পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সে বার্ধক্যে উপনীত হয়, এ বাগান থেকে সে উপকৃত হয় না, তার সন্তান–সন্ততি অপ্রাপ্ত বয়সের, তারাও তার কোন উপকার করতে পারে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে বাড়াবাড়ি করার ফল হবে মৃত্যুর পর দুঃখ ও যাতনা।

৬০৯৩. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬০৯৪. হযরত আতা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা.) জনগণকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন কিন্তু কারো থেকে সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁর পিছন থেকে বলে উঠলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ আয়াত সম্পর্কে আমার মনে কিছুটা ধারণার উদ্রেক হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা.) তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তাহলে তা এখানেই বর্ণনা কর, নিজেকে তুচ্ছ মনে কর না। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, "এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে একটি দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে সারা জীবন জান্নাতবাসী ও সৌভাগ্যবানদের ন্যায় আমল করবে? আর যখন সে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে এবং মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে উপনীত হয় এবং তার আমল সুচারুরূপে সম্পন্ন হবার প্রয়োজনীয়তাও সে তীব্রভাবে অনুভব করে, তখনই সে তার কর্মজীবন দুর্ভাগা ও হতভাগাদের ন্যায় বদ আমল দ্বারা সমাপ্ত করে। অন্য কথায়, তার যাবতীয় নেক আমলকে সে তখন বিনষ্ট করে দেয় এবং এ সময়ে তার যে কাজটি অতীব প্রয়োজনীয় তা সে জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে ছাই করে দেয়?"

৬০৯৫. ইব্ন আবূ মুলাইকা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত উমর (রা.) এ আয়াত أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, "এটি একটি দৃষ্টান্ত। তা এমন লোকের জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে, যে সারাজীবন নেক আমল করে। তবে যখন সে শেষ জীবনে পৌঁছে এবং নেক আমল করার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক অনুভব করে, তখনই সে বদ আমল করে ফেলে।"

৬০৯৬. হযরত উবায়দ ইব্ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,"একদিন হযরত উমর (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবা কিরামকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা এ আয়াত কার সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মনে কর? এ আয়াত أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّأَعْنَابٍ- তখন তারা জবাবে বলেন, اَللّٰهُ أَعْلَمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ভাল জানেন। হযরত উমর (রা.) অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, পরিষ্কার করে বলুন, 'আমরা জানি অথবা জানি না'। তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। এ আয়াত সম্পর্কে আমার অন্তরে একটি ধারণার উদ্রেক হয়েছে। হযরত উমর (রা.) বললেন, ভাতিজা! নিজকে এত খাটো মনে কর না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে আমলের একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। হযরত উমর (রা.) বললেন, তা কোন্ ধরনের আমল? তিনি বললেন, যে কোন ধরনেরই আমল হতে পারে। তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, যে কোন ব্যক্তি নেক আমল করে তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরীক্ষার জন্যে শয়তান পাঠান। শয়তানের প্ররোচনায় সে পাপের কাজে লিপ্ত হয়। এমনকি সে তার পূর্বেকার সম্পূর্ণ নেক আমল ধ্বংস করে বসে।"

৬০৯৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত উমর (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সাহাবা কিরামকে জিজ্ঞেস করেন-তারপর বর্ণনাকারী পূর্বের বর্ণনার ন্যায় সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এখানে তিনি এতদূর বর্ধিত করেন যে, হযরত উমর (রা.) বলেছেন, "কোন এক ব্যক্তি নেক আমল করে তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে শয়তান পাঠান। তখন লোকটি পাপ করতে শুরু করে।"

৬০৯৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে আমলের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। কেউ জীবনের প্রারম্ভে নেক আমল করলে, তা হবে এমন একটি আংগুর ও খেজুরের উদ্যানের ন্যায়, যার নীচ দিয়ে বয়ে গেছে নহরসমূহ। আর তাতে রয়েছে যাবতীয় রকমের ফলমূল। তারপর সে তার শেষ জীবনে মন্দ কাজ করে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে মন্দ কাজ করতেই থাকে। শেষোক্ত পর্যায়ের কাজটির দৃষ্টান্ত হবে এমন একটি ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় যার মধ্যে রয়েছে অগ্নি, যা উদ্যানটিকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এটিই হচ্ছে মন্দ কাজের দৃষ্টান্ত, যে অবস্থায় তার মৃত্যু হলো। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) আরো বলেন, এখানে বাগান দ্বারা আমলকারী ও তার সন্তান-সন্ততির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, বাগানটি বিনষ্ট হয়ে যায়। আমলকারী তার বার্ধক্যের জন্য এবং তার সন্তান-সন্ততি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হবার কারণে তারাও এ বাগানটিকে বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত বাগানটি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। তিনি বলেন, এটি একটি দৃষ্টান্ত এখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তার জন্যে যে পুরস্কার ও প্রতিদান থাকার কথা তার প্রতি আমলকারী যখন অত্যধিক মুখাপেক্ষী, তখন সে আল্লাহ্র কাছে তার কোন কিছুই পাবে

না। সে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন শাস্তি থেকে নিজকে রক্ষা করতেও পারবে না। নিজের বার্ধক্য ও সন্তান–সন্ততির অপ্রাপ্ত বয়স্কতার জন্যে যেমন তারা বাগানটির পরিচর্যা করতে পারেনি, তদ্রূপ এখানেও মৃত্যুর পর সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যাবার সময়ে তাদের কোন তওবা করার সুযোগ থাকবে না। ইব্ন আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত যারা আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, তাদের জন্যে এটি হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। এ পর্যায়ে মুজাহিদ (র) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে? যে পসন্দ করে তার দুনিয়ার জীবনে সে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য স্বীকার করে, কোন আমল করেনি এর দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার আছে একটি উদ্যান মৃত্যুর পর তার অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তিটির ন্যায় যার একটি উদ্যান ছিল কিন্তু তা জ্বলে–পুড়ে ছাই হয়ে যায়, অথচ সে তার বৃদ্ধাবস্থার কারণে বাগানের কোন যত্ন নিতে পারছে না। আর তার সন্তান–সন্ততিরাও নিজেদের স্বল্প বয়স্কতার জন্যে বাগানের পরিচর্যায় অপারগ। ঠিক এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে ক্রটিবিচ্যুতির আশ্রয় গ্রহণকারীর সামনে মৃত্যুর পর সবকিছুই হবে আফসোসের বিষয়।

৬০৯৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الْآيَةَ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ উদ্যানটিকে এমন ঘূর্ণিঝড় স্পর্শ করল যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড গরম ও উত্তাপ। এরূপে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তাঁর নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন যেনো তোমরা চিন্তা ও গবেষণা কর। তিনি আরো বলেন, এটি হচ্ছে একটি দৃষ্টান্ত। কাজেই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য উপলব্ধি কর। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ অর্থাৎ মানুষের জন্য আমি এসব দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। তিনি আরো বলেন, "এ ব্যক্তির বয়স হয়েছে অধিক, হাড়গুলো হয়ে পড়েছে দুর্বল, আর তার সন্তান–সন্ততিও সংখ্যায় অধিক। এরপর তার উদ্যানটি তার জীবনের বাকী অংশ অতিবাহিত করার কালে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ এখন সে তার ও তার পরিবারের ভরণ–পোষণ নির্বাহের জন্য উদ্যানটির প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী।" তিনি আরো বলেন, "তাহলে এখন এটির অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি পসন্দ করে যে, কিয়ামতের দিন যখন সে তার আমলের ফল ভোগ করার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী হবে, তখন তার আমল তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে?"

৬১০০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ الْآيَةَ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটির অর্থ হচ্ছে, তার উদ্যানটি এমন সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, যখন সে তার উন্নতির প্রতি নিজ পরিবার ও তার নিজের ভরণ–পোষণের জন্যে অত্যধিক মুখাপেক্ষী। কেননা, এমন সময় সে বার্ধক্যে পরিণত হয়েছে অন্য পন্থায় আয়–উন্নতির ক্ষেত্রে সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার তার রয়েছে অসহায় সন্তান–সন্ততি, যারা তার কোন উপকার করতে পারে না। কাতাদা (র.) আরো বলেন, ইমাম হাসান (র.) فَاحْتَرَقَتْ শব্দটি প্রসঙ্গে বলতেন, এর অর্থ হচ্ছে এমন সময় তার উদ্যানটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়, যখন সে এর আয়–উন্নতির প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী। আর أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ - কথার দ্বারা এটি বুঝানো হচ্ছে যে, তোমাদের মধ্যে কি কেউ পসন্দ করে যে, তার আমল এমন সময় ধ্বংস হয়ে যাক, যখন সে এর ফল ভোগ করার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী হবে।

৬১০১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত - ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا সম্পর্কে বলেন, এটির অর্থ হচ্ছে مَثَلًا حَسَنًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ পাকের বর্ণিত প্রতিটি দৃষ্টান্তই সুন্দর। আইউব (র.) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ .... فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, বৃদ্ধ লোকটি তার যৌবনকালে উদ্যানটি তৈরী করে। এরপর সে বার্ধ্যক্যে উপনীত হয়, আবার তার এ বৃদ্ধ বয়সে বেশ কয়েকটি দুর্বল ও অসহায় সন্তান–সন্ততির সে পিতা। এরপর উক্ত উদ্যানে অগ্নিমিশ্রিত ঘূর্ণিঝড়ের আক্রমণ চলে, তাতে তার এ ফলফুলে সুশোভিত স্বাদের একমাত্র সম্বল উদ্যানটি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায়। তখন তার এমন শক্তিও থাকে না যে, সে অনুরূপ একটি উদ্যান গড়তে পারে। অধিকন্তু তার বংশধরদের মধ্যেও এমন ব্যক্তিবর্গ নেই, যারা নিজেই এবৃদ্ধ লোকটি ব্যতিরেকে উদ্যানটি পুনরায় আবাদ করতে পারে। অনুরূপ কোন কাফির ব্যক্তি যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাযির হবে, তখন তার এমন কোন কল্যাণ অবশিষ্ট ও বর্তমান থাকবে না, যা সে আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে পেশ করে অন্য পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারবে। যেমন উদ্যানের মালিকের এমন কোন শক্তি নেই, যা দ্বারা সে তার উদ্যানে চারাগাছ রোপণ করতে পারে। অন্য কথায়, সেখানে তার কোন শক্তি–সুযোগ থাকবে না যা দ্বারা সে কোন পুণ্যের কাজ সেখানে আঞ্জাম দিতে পারে। অথবা এমন কোন পাথেয়ও পাবে না, যা নেক আমল হিসাবে সে ইতিপূর্বে পাঠিয়েছে। যার প্রতিদান লাভের জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে আরযি পেশ করতে পারে। তার সন্তান–সন্ততিরাও এ ব্যাপারে কোন সাহায্য–সহায়তা করতে পারছে না। সে তার প্রতিদান অর্জন থেকে এমন সময় বঞ্চিত হবে, যখন সে এর প্রতিদান লাভের জন্য অত্যধিক মুখাপেক্ষী। যেমন যে ব্যক্তির উদ্যানটি বিনষ্ট হয়ে গেছে তার অতিশয় প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ তার বার্ধক্যের সময় যখন তার সন্তান–সন্ততিরা অসহায় ও দুর্বল, তখন সে এ উদ্যানের যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এটি একটি দৃষ্টান্ত। মহান আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা পেশ করেছেন। উভয়কেই আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে এ পৃথিবীতে সম্পদ দান করেছেন। মু'মিনকে তার সম্পদ পরকালে রক্ষা করবে এবং তথায় তাকে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত ও মর্যাদা দান করা হবে যেমন দুনিয়ায়ও তাকে প্রচুর সম্পদ দান করা হয়েছিল। তবে কাফিরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে সম্পদ দুনিয়ায় দান করেছিলেন পরকালে সে এ সম্পদের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে এবং এ সম্পদের অপব্যবহারের জন্যে অকল্যাণ তার সঙ্গী হবে, যা কোন দিনও তার থেকে বিদায় নেবে না। অন্য কথায়, সে অগ্নিকুন্ডে সদা সর্বদা অবস্থান করবে। কেননা, দুনিয়ায় সে এ সম্পদের মাধ্যমে তার সঙ্গীদের কাছে গর্ব করত এবং এগুলো তার চির সঙ্গী থাকবে বলে মনে করত। আর কোন দিন এসম্পদের হিসাব দেবার জন্যে যে আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে হাযির হতে হবে, এ কথা সে বিশ্বাস করত না।"

৬১০২. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ الخ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটি একটি দৃষ্টান্ত, আল্লাহ্ পাক বান্দাদের জন্যে বর্ণনা করেছেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যার আঙ্গুর ও খেজুর তথা যাবতীয় ফল–ফলাদি সম্বলিত একটি উদ্যান হবে বলে কামনা করে, আর যখন ঐ ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌঁছবে, দুর্বল হয়ে যাবে, আবার তার এমন কয়েকটি সন্তান–সন্ততি থাকবে, যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক ও সহায়হীন। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তার

উদ্যান সম্বন্ধে তাকে বিপদগ্রস্ত করেন, ঐ উদ্যানে অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করেন। ফলে উদ্যানটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। অন্যদিকে মালিক বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং দুর্বল ও অসহায় সন্তান-সন্ততির পিতা হওয়া বিধায় সেও তার উদ্যানটি রক্ষা করতে সমর্থ নয়। অধিকন্তু তার অসহায় সন্তান-সন্ততিও উদ্যান রক্ষার কাজে তার কোন উপকারে আস না। কাজেই এমন সময় তার উদ্যানটি হাতছাড়া হয়ে যায়, যখন সে এটির ফল ভোগের প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি পসন্দ করে যে, সে পথভ্রষ্টতা ও পাপ কার্যে রত থাকবে, এরপর তার যখন মৃত্যু আসবে ও কিয়ামত হবে, তখন তার সব আমল অর্থহীন হয়ে পড়বে, অথচ তখন সে তার আমলের প্রতিদান লাভ করার প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী হবে। আদম সন্তান তখন বলবে, 'আমি আজ যে কল্যাণের প্রতি অত্যধিক মুখাপেক্ষী, তা আমাকে দান করুন, যেমন দুনিয়াতে দান করেছেন।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "তুমি যা পরকালের জন্যে অগ্রিম প্রেরণ করেছ এমন সামগ্রী কোথায় আমি যার প্রতিদান আজ তোমাকে প্রদান করতে পারি।"

৬১০৩. ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى - এরপর তিনি বলেন, এই আয়াতে অন্তর্নিহিত মর্মের দৃষ্টান্ত হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ فَاَصَابَهٗ ... اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ - তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, এ বাগানের পাদদেশে রয়েছে প্রবাহিত নদীনালা এবং ফল-ফলাদিতে পরিপূর্ণ। অধিকন্তু এর মালিকের রয়েছে ছোট ছোট দুর্বল সন্তান-সন্ততি। ঠিক এমনি সময় ঐ উদ্যানে অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় এসে উদ্যানের সবকিছু পুড়িয়ে দিয়ে যায়। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এরূপ পরিস্থিতি কামনা করে? যদি তাই না হয়, তাহলে তোমাদেরকে কি বস্তুটি অনুপ্রাণিত করছে যে, তোমাদের কেউ দান-খয়রাত করবে, ব্যয় করবে এমনকি যখন এ দানের সওয়াব আমার (আল্লাহর) কাছে একটি উদ্যানের সমতুল্য হবে, যার পাদদেশে নদীনালা প্রবাহিত হয়। উদ্যানটি ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত হয় আর এ উদ্যানটির মালিকের সন্তান-সন্ততিরাও উত্তরাধিকার সূত্রে এটির মালিক হয়। তখন সে উদ্যানে অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় এসে তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে যায়।"

৬১০৪. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি একটি উদ্যানের ভিত্তি স্থাপন করে, তাতে যাবতীয় ফুল-ফলাদির সমাহার পরিলক্ষিত হয়, সে বার্ধক্যে উপনীত হয়, আর তার রয়েছে দুর্বল সন্তান-সন্ততি। এমনি সময় অগ্নিমিশ্রিত ঘূর্ণিঝড় উদ্যানে আপতিত হয় ও সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। বার্ধক্য হেতু সে তার উদ্যানটিকে যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করত সমর্থ নয়। এমনকি তার সন্তান-সন্ততিরাও নিজেদের অক্ষমতার কারণে উদ্যানের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হতে পারে না। ফলে তার ও তার পরিবারের সদস্যদের জীবন যাপনের একমাত্র উপকরণ হিসাবে গণ্য উদ্যানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এটি একটি দৃষ্টান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের জীবনের প্রতিচ্ছবি উল্লেখপূর্বক বলেন, "কাফির কিয়ামতের দিন আমার বিচারালয়ে হাযির হবে আর সে কল্যাণের প্রতি অতিশয় মুখাপেক্ষী হবার কালেও আমার কাছে সে কোনরূপ কল্যাণ পাবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে তাকে রক্ষা করার মত কোন ব্যক্তিও সেখানে বর্তমান থাকবে না।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে যে-সব তাফসীর বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্যে আমরা যে তাফসীরটি বর্ণনা করেছি তা উত্তম বলে আমরা ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছি। কেননা, মহান আল্লাহ্ এ আয়াতের পূর্বে মু'মিন বান্দাদেরকে তাদের সাদ্কা-খায়রাতের কথা বলে বেড়ানো ও দানকৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। এরপর যে বলে বেড়াবার ও কষ্ট দেবার জন্যে দান-খয়রাত করে থাকে, তার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এভাবে তিনি লোক দেখানোর জন্যে আমলকারী মুনাফিকদেরকে ঐ সব ব্যয়কারীদের সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যারা লোক দেখানোর জন্যে ব্যয় করে থাকে বর্তমান আয়াত ও তার পূর্ববর্তী আয়াতের বর্ণনা ঐ দৃষ্টান্তটির ন্যায়, যা পূর্বে তাদের জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই উক্ত দৃষ্টান্তের পর সাদৃশ্যপূর্ণ এ আয়াতটি আনয়ন করা অসাদৃশ্যপূর্ণ বা অনুল্লিখিত দৃষ্টান্তের পরে আনয়ন করার চেয়ে অধিক উত্তম।

ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ -এর পর وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ কথাটি কেমন করে উল্লেখ করা সমীচীন হলো أَصَابَهُ الْكِبَرُ কথায় ماضى -এর صيغه ব্যবহার করা হয়েছে অথচ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ কথায় مضارع -এর صيغه ব্যবহার করা হয়েছে। তাই مضارع -এর উপর ماضى -কে কেন অবৈধভাবে عطف করা হলো।

উত্তরে বলা যায় যে, এরূপ عطف করা এখানে বৈধ। কেননা, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُوْنَ الخ কথায় উল্লিখিত ان -কে لو -এর অর্থে ব্যবহার করা সঙ্গত। أَنْ এব لو একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দু'টিই ভবিষ্যত কাল বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্যে আরবী ভাষাভাষিগণ কোন فعل ماضى -এর পূর্বে ان ব্যবহার করে তা দ্বারা ভবিষ্যতের অর্থ গ্রহণ করে থাকে। তাই এখানেও فاصابها -এরমাধ্যমে مضارع -এর অর্থ বুঝানো হয়েছে। তাদের কাছে এখানে উল্লিখিত ان টি لو -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং فَأَصَابَهَا কে لو -এর جزاء হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অনুরূপ তার لو -কে ان -এর স্থলে ব্যবহার করে থাকে। এখানে যেন বলা হয়েছে أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَتْ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ তিনি আরো বলেন, যদি আবার কেউ এখানে প্রশ্ন রাখেন যে, এখানে কেমন করে বলা হলো وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ- অথচ সূরা নিসার ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا- অর্থাৎ এখানে ضعيف -এর جمع নেয়া হয়েছে ضُعَفَاء আর সূরা নিসার ৯নং আয়াতে ضعيف -এর جمع নেয়া হয়েছে ضعاف। উত্তরে বলা যায় যে, فعيل -এর جمع দু' প্রকারে হয়ে থাকে فعلاء ও فعال -। তাই বলা হয়ে থাকে رَجُلٌ ظَرِيْفٌ مِنْ قَوْمٍ ظُرَفَاءٍ وَظِرَافٍ অর্থাৎ ظريف -এর جمع - ظُرَفَاءُ এবং ظِرَافٌ -দুটোই আসে।

তিনি আরো বলেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত الْإِعْصَارُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রচন্ড বায়ু, যা যমীন থেকে স্তম্ভের ন্যায় আকাশের দিকে জোরে ধাবিত ও প্রবাহিত হয়। এটির جمع আসে أَعَاصِيْرُ যেমন প্রসিদ্ধ কবি ইয়াযীদ ইব্ন মাফরাগ আল-হিমইয়ারী বলেন, أُنَاسٌ أَجَارُوْنَا فَكَانَ جِوَارُهُمْ + أَعَاصِيْرَ مِنْ فَسْوِ الْعِرَاقِ الْمُبَذَّرِ -

অর্থাৎ "কিছু সংখ্যক লোক আমাদেরকে ভয়াবহ ইরাকের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন। তারপর তাদের আশ্রয়স্থল ঘূর্ণিঝড়ের ন্যায় প্রমাণিত হয়েছিল। অন্য কথায়, তাদের নিরাপত্তা প্রদান আমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য ও শান্তিময় ছিল না।"

পুনরায় তাফসীরকারগণ إِعْصَارٌ শব্দটির অর্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, "এর অর্থ হচ্ছে প্রচন্ড গরম ও উত্তাপময় বাতাস।"

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১০৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِعْصَارٌ শব্দটি প্রসঙ্গে বলেন, এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন একটি বাতাস, যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড গরম।"

৬১০৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِعْصَارٌ শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এটির অর্থ হচ্ছে এমন একটি বাতাস, যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড গরম। আর এ বাতাস দ্বারা জিন জাতিকে তৈরি করা হয়েছে। আবার এ জিন জাতিকে অগ্নিতে পোড়ানো হবে।"

৬১০৭. ইব্‌ন আববাস (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, إِعْصَارٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড গরম বাতাস। এমন গরম বাতাস যা কাউকে অবশিষ্ট রাখবে না।

৬১০৮. ইব্‌ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এটির অর্থ হচ্ছে, এমন বাতাস যার মধ্যে রয়েছে গরম আর এ গরম ধ্বংসকারী।"

৬১০৯. ইব্‌ন আববাস (রা.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত إِعْصَارٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, এমন বাতাস, যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড গরম। আর এ বাতাস থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি গরমের দিক দিয়ে দোযখের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র।"

৬১১০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এটি এমন একটি বাতাস, যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড গরম।"

৬১১১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত ঃ তিনি অত্র আয়াতাংশ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ –এর তাফসীর প্রসেঙ্গ বলেন, "এটির অর্থ হচ্ছে প্রচন্ড গরম বাতাস।"

৬১১২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ –এর তাফসীর-প্রসঙ্গে বলেন, "এটির অর্থ হচ্ছে এমন বাতাস যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড গরম।"

৬১১৩. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬১১৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلْاِعْصَارُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে বাতাস। আর النار শব্দটির অর্থ হচ্ছে গরম বাতাস।"

৬১১৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এটির অর্থ হচ্ছে, এমন বাতাস যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড গরম।"

আবার কেউ কেউ إِعْصَارٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলেন, "এটির অর্থ হচ্ছে এমন বাতাস, যার মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।"

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬১১৬. মা'মার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল-হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতাংশ اعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, اِعْصَارٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন বাতাস, যার মধ্যে রয়েছে প্রচন্ড ঠাণ্ডা ও বিকট শব্দ।"

৬১১৭. দাহ্হাক (র.) বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, اِعْصَارٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এখন বাতাস যার মধ্যে রয়েছে ঠাণ্ডা।"

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ (অর্থাৎ "এভাবে আল্লাহ্ তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। ২ ঃ ২৬৬)-এর ব্যাখ্যা ঃ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মহান প্রতিপালক তাঁর রাহে কিভাবে ব্যয় করতে হবে, কতটুকু করতে হবে, এতে তোমাদের জন্য কি আছে আর কি নেই ইত্যাদি যেভাবে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অনুরূপভাবে এ নিদর্শন ছাড়া অন্য নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধেও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের কাছে অন্য নিদর্শনাদির হালাল, হারাম, যাবতীয় আহকাম ও দলীলাদি তোমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। আর এসব নিদর্শন আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের কাছে তাঁর দান ও মেহেরবানী হিসাবে গণ্য। এ সকল বর্ণনার সম্ভবত লক্ষ্য হচ্ছে যাতে তোমরা তোমাদের বিবেকের সাহায্যে চিন্তা করতে পারো এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারো। আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এসব নিদর্শনে যেসব আদেশ-নিষেধ রয়েছে তা 'আমল করবে। তাতে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

৬১১৮. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, تَتَفَكَّرُوْنَ -এর অর্থ تُطِيْعُوْنَ (অর্থাৎ তোমরা তার আনুগত্য স্বীকার করবে)।"

৬১১৯. ইব্ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, যাতে তোমরা এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী ও চিরস্থায়ী আখিরাতের ব্যাপারে অনুধাবন করতে পার।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٢٦٧) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

২৬৭. "হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا -এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ, যারা আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রাসূল এবং তাঁর কিতাবের আয়াত "তোমরা ব্যয় কর"-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমরা যাকাত ও সাদ্কা আদায় কর।"

উপরোক্ত তাফসীর যে সব মনীষী সমর্থন করেছেন, তারা নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

৬১২০. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এখানে উল্লিখিত اَنْفِقُوْا -এর অর্থ হচ্ছে تَصَدَّقُوْا (অর্থাৎ তোমরা সাদ্কা কর)।"

তিনি আরো বলেন, "অত্র আয়াতাংশ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ -এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের মাধ্যমে যা কিছু সোনা-রূপা হালাল পথে অর্জন কর, তা থেকে দান কর। তোমাদের অর্জিত সম্পদ থেকে যা উত্তম, তা যাকাতরূপে দান কর, কোন প্রকার মন্দ বস্তু যাকাত হিসাবে প্রদান করনা।"

উপরোক্ত তাফসীর যেসব মনীষী সমর্থন করেছেন, তারা দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেন ঃ

৬১২১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ -এর অর্থ হচ্ছে مِنَ التِّجَارَةِ অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য।"

৬১২২. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা রয়েছে।

৬১২৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ আরও একটি বর্ণনা রয়েছে।

৬১২৪. মুজাহিদ (র.) থেকে আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এটার অর্থ হচ্ছে হালাল ব্যবসা-বাণিজ্য।"

৬১২৫. আবদুল্লাহ্ ইবন মা'কাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "মু'মিনের সম্পদে কোন অপবিত্রতা নেই।" তবে لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ -এর অর্থ হচ্ছে, "তোমরা তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করবেনা।"

৬১২৬. ওবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আলোচ্য আয়াতাংশ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমি আলী ইবন আবী তালিব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ সম্পর্কে বলেন, "এর অর্থ হলো স্বর্ণ ও রৌপ্য"

৬১২৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য।"

৬১২৮. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৬১২৯. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে مِنْ أَطْيَبِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفَسِهِ (অর্থাৎ তোমাদের উৎকৃষ্ট ও অতি মূল্যবান সম্পদ থেকে তোমরা ব্যয় কর)।"

৬১৩০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এটির অর্থ হচ্ছে, "স্বর্ণ–রোপ্য"।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ –এর ব্যাখ্যাঃ

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে আমি যা উৎপন্ন করি তা থেকেও সাদ্‌কা আদায় কর। সুতরাং খেজুর, আঙ্গুর, গম, যব এবং ভূমি হতে উৎপাদিত যাবতীয় দ্রব্যের উপর যাকাত আদায় করা ফরয করা হলো।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৩১. উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আলোচ্য আয়াতাংশ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে আলী (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে শস্যকণা ও ফল এবং সেইসব বস্তু যার উপর যাকাত রয়েছে।"

৬১৩২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে খেজুর গাছ।"

৬১৩৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, "এটির অর্থ হচ্ছে খেজুর।"

৬১৩৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে ব্যবসা–বাণিজ্য।" আর আয়াতাংশ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে ফল ফলাদি।

৬১৩৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে খেজুর ও শস্যদানা।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা নিকৃষ্ট বস্তু দানের ইচ্ছা কর না এবং নিকৃষ্ট বস্তু দান করার মনস্থ করনা।"

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আয়াতাংশে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.)–এর পঠন রীতিতে বর্ণিত হয়েছে " وَلَاتَؤُمُّوا " –এর صيغه ماضى হবে أَمَمْتُ ; আর আয়াতে সচরাচর উল্লিখিত وَلَاتَيَمَّمُوا কথাটির ماضى –এর صيغه হবে تَيَمَّمْتُ –। তবে এ দু'টি বিবরণের অর্থ একই, যদিও শব্দের গরমিল রয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে تَامَمْتُ فُلَانًا وَتَيَمَّمْتُهُ وَأَمَمْتُهُ অর্থ

قَصَدْتُهُ وَتَعَمَّدْتُهُ অর্থাৎ তুমি তার ইচ্ছা বা সংকল্প করেছ। এরূপ ব্যবহার আরবী ভাষায় বহুল পরিচিত। যেমন মাইমুন ইব্ন কায়স আল–আশা নামক প্রসিদ্ধ কবি বলেছেনঃ

تَيَمَّمَتْ قَيْسًا وَكَمْ دُوْنَهُ * مِنَ الْاَرْضِ مِنْ مَهْمَهٍ ذِىْ شَزَنَ

অর্থাৎ "আমার উটনী (আমার পিতা) কায়সের (ঘরের) প্রতি (প্রত্যাবর্তনের) ইচ্ছা করে থাকে। অথচ তিনি ব্যতীত এ ধরায় কতই না শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ মানুষ রয়ে গেছে।"

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৩৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ –এর অর্থ হচ্ছে وَلَاتَعَمَّدُوْا (অর্থাৎ তোমরা সংকল্প করনা।")

৬১৩৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ –এর ব্যখ্যায় বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে وَلَا تَعَمَّدُوْا অর্থাৎ তোমরা সংকল্প করনা।"

৬১৩৮. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ এ– উল্লিখিত اَلْخَبِيْثَ শব্দটির দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা নিকৃষ্ট বস্তু উদ্দেশ্য করেছেন এবং মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "তোমরা তোমাদের সাদ্কা আদায়ের সময় খারাপ সম্পদের ইচ্ছা করবে না কিংবা খারাপ ও নিকৃষ্ট সম্পদ সাদ্কা হিসাবে দান করবে না। বরং উৎকৃষ্ট ও উত্তম সম্পদ দান করবে।

উপরোক্ত তাফসীরের প্রেক্ষাপট হচ্ছে, এ আয়াতটি আনসারদের এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তিনি একটি শুকনো ও নিকৃষ্ট খেজুরের কাঁদি এমন স্থানে ঝুলিয়ে দেন, যেখানে মুসলমানগণ তাদের ফল–ফলাদির সাদ্কা হিসাবে খেজুরের কাঁদিসমূহ মসজিদের দুই স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে দিতেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৩৯. বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ..... اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ –এর শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলেন, আলোচ্য আয়াতটি আনসারদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। যখন খেজুর কাটার সময় হতো তখন আনসারগণ তাদের বাগান থেকে অপক্ব খেজুরের কাঁদিসমূহ কেটে আনতেন এবং মসজিদে নববীর দুই স্তম্ভের মধ্যখানে একটি রশিতে লটকিয়ে দিতেন। তা থেকে মুহাজির ফকীরগণ খেজুর ভক্ষণ করতেন। এরপর আনসারদের মধ্য থেকে কোন এক ব্যক্তি শুক্না ও নিকৃষ্ট ধরনের খেজুরের কাঁদি এসব ভাল খেজুরের কাঁদির সাথে ঝুলিয়ে দেয়। আর ভাল খেজুরের কাঁদির সাথে অপক্ব ও নিকৃষ্ট খেজুরের কাঁদি ঝুলিয়ে দেয়াটা সে সঙ্গত মনে করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ করেন এবং আদেশ দেন যে, তোমরা নিকৃষ্ট খেজুরের সংকল্প করবে না, যখন তোমরা তা ব্যয় করছ।

৬১৪০. বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে অন্য সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি আরো বলেছেন যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইচ্ছা করে শুকনা ও খারাপ খেজুর ভাল ও অপক্ক খেজুরের সাথে মিশিয়ে দিত ও ভাল–মন্দ কাঁদি একত্রে ঝুলিয়ে দিত এবং তা সঙ্গত মনে করত। যারা এরূপ করত, তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয় ও নির্দেশ দেয়া হয় যে, তোমরা খারাপ ও নিকৃষ্ট খেজুরের কাঁদি ভাল খেজুরের কাঁদির সাথে মিশ্রিত করে দিও না। অথচ যদি তোমাদেরকে এরূপ খেজুর হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করা হয়, তাহলে তোমরা তা গ্রহণ করবে না।

৬১৪১. বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারগণ তাদের নিকৃষ্ট খাবার ও খেজুর সাদ্‌কা হিসাবে দান করত। তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ الخ

৬১৪২. উবায়দা আস-সালমানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আলী (রা.)–কে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম। আলী (রা.) বললেন, এ আয়াতটি ফরয যাকাত সম্পর্কে নাযিল হয়। ঘটনা এরূপ ঘটেছিল যে, কোন কোন ব্যক্তি খেজুর কাটতে যেতেন এবং উৎকৃষ্ট খেজুর এক পার্শ্বে রেখে দিতেন। আর যখন তহসীলদার আসতেন, তখন তাকে এরূপ খারাপ খেজুর থেকে দান করা হতো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, "তোমরা যাকাত দেয়ার সময় তোমাদের নিকৃষ্ট সম্পদের প্রতি ইচ্ছা করবে না।"

৬১৪৩. আবূ আমামাহ্ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হানীফ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত اَلْخَبِيْثَ–এর অর্থ হচ্ছে اَلْجعرور অর্থাৎ নিকৃষ্ট খেজুর, যার রং পানিফলের ন্যায়। এটি দিয়ে যাকাত আদায় করতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিষেধ করেছেন।

৬১৪৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আনসারগণ খারাপ ও শুকনা খেজুর দ্বারা যাকাত আদায় করতেন। তাদেরকে একাজ থেকে বারণ করা হয়েছে এবং উৎকৃষ্ট সম্পদ দ্বারা যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬১৪৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ...... وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে এরূপ বর্ণনাও রয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যুগে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যার ছিল দু'টি উদ্যান– একটি উৎকৃষ্ট ও অপরটি নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট উদ্যানটির খেজুর সে সাদ্‌কা করত। আবার উৎকৃষ্ট খেজুরের সাথে নিকৃষ্ট খেজুর মিশ্রিত করেও সাদ্‌কা করত। আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করাকে দূষণীয় বলে আখ্যায়িত করে এরূপ কাজ করতে তাদেরকে নিষেধ করলেন।

৬১৪৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিকৃষ্ট সম্পদ দ্বারা সাদ্‌কা আদায় করার সংকল্প করবে না। অথচ

তোমাদেরকে যদি এরূপ নিকৃষ্ট সম্পদ বিনিময় কালে দেয়া হয়, তাহলে তোমরা চোখ বন্ধ করা ব্যতীত এটা গ্রহণ কর না।

৬১৪৭. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কোন এক ব্যক্তি তার নিকৃষ্ট সম্পদ দ্বারা সাদকা আদায় করলে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ وَلَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের সম্পদের নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করবে না।

৬১৪৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতটি খেজুরের কাঁদি সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলোকে গরীব মুহাজিরদের জন্য মসজিদে ঝুলিয়ে দেয়া হতো এবং হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা এগুলোতে নিকৃষ্ট খেজুর দেখতে পেয়েছিলেন। হাজ্জাজ (র.) নামক একজন বর্ণনাকারী অন্য একজন বর্ণনাকারী ইব্‌ন জুরাইজ (র.)–কে প্রশ্ন করলেন, এ সম্বন্ধে কি বিস্তারিত জানাবেন? ব্যাপারটি কি? তখন ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, আমি আমার উস্তাদ আতা (র.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কোন এক ব্যক্তি মদীনার মসজিদে গরীব মুহাজিরদের জন্য সংরক্ষিত ঝুলিয়ে রাখা খেজুরের কাঁদির সাথে একটি নিকৃষ্ট খেজুরের কাঁদি ঝুলিয়ে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এটা কি? এ ব্যক্তি খুবই খারাপ খেজুর ঝুলিয়েছে। এরপর অত্র আয়াতাংশ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারী বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, হারাম সম্পদের নিকৃষ্ট বস্তুকে ব্যয় করার জন্যে তোমরা সংকল্প করবে না। অন্যদিকে তোমাদেরকে হালাল সম্পদের উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার জন্যে আহ্‌বান জানানো হচ্ছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬১৪৯. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁকে وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বলেন, অত্র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, হারাম সম্পদের মধ্য থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করবে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তা গ্রহণ করেন না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন ঃ সাহাবা কিরাম (রা.) থেকে আমি এ আয়াতাংশের যে তাফসীর উত্থাপন করেছি এবং যে তাফসীর সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারী ঐকমত্যে পৌছেছেন, এটা গ্রহণীয় তাফসীর। ইব্‌ন যায়দ (রা.)–এর প্রদত্ত তাফসীর তত গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এ সত্যটির প্রতি ইংগিত করেছেন যে, তোমরা বিনিময়কালে এসব নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ কর না। আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত بِاٰخِذِيْهِ শব্দের মধ্যে "ه" সর্বনামটির مرجع হচ্ছে الْخَبِيْثَ শব্দটি। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ–এর অর্থ হচ্ছে اِلَّا اَنْ تَتَجَافَوْا فِىْ اَخْذِكُمْ اِيَّاهُ অর্থাৎ তোমরা বিনিময়ের সময় এরূপ বস্তু গ্রহণ করা হতে বিরত থাক এবং নিজেকে এগুলো থেকে দূরে রাখ। আরবী পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে اَغْمَضَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ فَهُوَ يُغْمِضُ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির কিছু অধিকার উপেক্ষা করল বা ক্ষমা করল। অতীত কালের পরিবর্তে বর্তমান কালে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হবে সে উপেক্ষা করে বা ক্ষমা করে।

আত-তারিম্মাহ ইবন হাকীম নামক একজন কবি বলেনঃ لَمْ يَفُتْنَا بِالْوِتْرِ قَوْمٌ وَلِلضَّيْمِ رِجَالٌ يَرْضَوْنَ بِالْاَغْمَاضِ অর্থাৎ জাতিকে হত্যার শিকার হতে হয়নি। আর তাদের মধ্যে বহু লোকই অন্যায় ও জুলুমকে উপেক্ষা করতে রাযী হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের খাতকদের থেকে তোমাদের কোন প্রকার অধিকার আদায়ের কালে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ কর না, হ্যাঁ, যদি তোমরা তাদের কোন অধিকার উপেক্ষা কর বা ক্ষমা করে দাও।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬১৫০. উবায়দা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমি আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু তোমাদের কেউ গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না সে তার অধিকার উপেক্ষা করে।

৬১৫১. বারা ইবন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ কারোর কাছে কোন বস্তু পাওনা থাকে এবং সে তা তাকে দেয়ার সময় এমন নিকৃষ্ট বস্তু ফেরত প্রদান করে যে, সে যখন তা গ্রহণ করবে, তখন তাকে মেনে নিতে হবে যে, সে তার অধিকার পুরাপুরি ফেরত পায়নি।

৬১৫২. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ يُغْمِضُوْا فِيْهِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যদি তোমাদের কেউ কারো কাছে কোন বস্তু পাওনা থাকে, আর সে তা পুরাপুরি ফেরত না দিয়ে কিছু কম ফেরত দান করে, তাহলে সে পুরাপুরি অধিকারপ্রাপ্ত না হয়ে ঘাটতি অধিকার ফেরত পাবে। এদিকেই অত্র আয়াতাংশ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا -এর মাধ্যমে ইংগিত করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা যা নিজেদের জন্যে পসন্দ কর না তা আমার জন্যে কেমন করে পসন্দ কর। কাজেই তোমাদের উত্তম সম্পদ দ্বারা আমার হক আদায় করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না।

৬১৫৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের খাতক থেকে কিংবা কেনা-বেচার মধ্যে বিপরীত পক্ষ থেকে পরিমাণে একটু অতিরিক্ত কিংবা একটু উন্নত দ্রব্য ব্যতীত গ্রহণ কর না।

৬১৫৪. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, কিছু সংখ্যক লোক খেজুরের মাধ্যমে তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করত। তারা যাকাতের মাল নিকৃষ্ট খেজুর দ্বারা আদায় করত। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের

একজন অন্যজনকে পাওনা আদায়ের সময় এরূপ বস্তু প্রদান করে, তাহলে সে তা গ্রহণ করে না। তবে গ্রহণ করার সময় এটা মনে করে যে, তার হককে পুরাপুরি আদায় করা হয়নি।

৬১৫৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি তুমি কারো থেকে কিছু পাওনা থাক এবং সে তোমা থেকে প্রাপ্ত বস্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা তা আদায় করে, তাহলে তুমি কি তার থেকে তা গ্রহণ করবে? না, গ্রহণ করবে না। তবে তুমি তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করবে।

৬১৫৬. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ..... اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ- –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবা কিরামকে যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিলেন, তখন মুনাফিকদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট খেজুর বা অন্য কোন খাবার নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে হাযির হলো। মুনাফিকের এ কাজটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অপসন্দনীয় ছিল তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন এবং বলেন যে, তোমরা তোমাদের অর্জিত সম্পদ ও উৎপাদিত ফসল থেকে উত্তম বস্তুটি দান কর। দাহ্হাক (র.) অত্র আয়াতাংশ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অন্য কারোর কাছে কিছু পাওনা থাক এবং সে তোমার পাওনা কম পরিশোধ করে, তাহলে তুমি তা গ্রহণ কর না। হ্যাঁ, যদি তুমি জান যে, সে কম দিচ্ছে তবে তা তুমি মেনে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সুতরাং যা তোমাদের নিজের জন্যে তোমরা পসন্দ কর না, আমার জন্যেও তা পসন্দ করবে না।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা বেচাকেনা, কর তখন তোমরা এ নিকৃষ্ট সম্পদটি উত্তম মূল্য দিয়ে কোন দিনও গ্রহণ করবে না। তবে হ্যাঁ, যদি তার মূল্যে কিছু কম করা হয়, তাহলে তোমরা হয়ত তা গ্রহণ করবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬১৫৭. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু সাদকা করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন, যদি তোমরা এটাকে বাজারে বিক্রি হতে দেখতে পাও, তাহলে তা তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তার মূল্য কিছু হ্রাস করা না হয়, তা কিনবে না।

৬১৫৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা এ নিকৃষ্ট বস্তুটি উচ্চমূল্যে খরিদ করবে না যতক্ষণ না তোমাদের জন্য তার মূল্য হ্রাস করা হয়।

কেউ কেউ মনে করেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তোমাদেরকে যদি এ নিকৃষ্ট বস্তুটি হাদিয়া দেয়া হয়, তাহলে তোমরা তা চোখ বন্ধ করা ব্যতীত গ্রহণ করবে না অর্থাৎ তোমরা এটিকে লজ্জার খাতিরে হাদিয়াদাতা থেকে গ্রহণ করবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৫৯. বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যদি তোমাদের কাউকে এরূপ নিকৃষ্ট বস্তু হাদিয়া স্বরূপ দেয়া হয়, তাহলে তোমরা শুধু হাদিয়া দানকারী থেকে লজ্জার খাতিরে তা গ্রহণ করবে। এতে হাদিয়া প্রদানকারীর অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না।

৬১৬০. বারা থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন, عَلٰى اِسْتِحْيَاءٍ مِّنْ صَاحِبِهِ অর্থাৎ হাদিয়া দানকারীর লজ্জার খাতিরে তুমি তা গ্রহণ করছ। আর তার ক্রোধ থেকে পরিত্রাণের খাতিরে তা কবুল করছ। কেননা, সে এমন একটি হাদিয়া প্রেরণ করেছে, যার পিছনে তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

আবার কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের পাওনা গ্রহণ করবে না কিন্তু তার মধ্যে কিছু উপেক্ষা করবে অর্থাৎ তোমাদের কিছু অংশ মাফ করে দিয়ে বাকীটা গ্রহণ করবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৬১. ইব্‌ন মা'কাল (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি-لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ–এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের পাওনা কিছুটা হ্রাস করা ব্যতীত গ্রহণ করবে না। যেমন বলা হয়ে থাকে, اغمض لك من حقى (অর্থাৎ আমি আমার পাওনা থেকে কিছু অংশ তোমার জন্যে মাফ ও ক্ষমা করে দিলাম)।

আবার কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের অবৈধ মাল গ্রহণের মধ্যে কি পাপ রয়েছে, সে সম্বন্ধে উপেক্ষা করা ব্যতীত তোমরা হারাম সম্পদকে গ্রহণ করবে না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৬২. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁকে لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তুমি অবৈধ সম্পদে কি পাপ তা উপেক্ষা না করে সেই অবৈধ সম্পদ গ্রহণ করবে না। তিনি আরো বলেন, আরবী ভাষাবিদগণ এরূপ বাক্য ঐ সময় ব্যবহার করে, যখন কেউ তার সম্পদ গ্রহণ করে ও তাতে কি রয়েছে তা সম্বন্ধে উপেক্ষা করে অর্থাৎ সে জানে যে, এটা অবৈধ সম্পদ।

ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরে উল্লিখিত তাফসীরসমূহের মধ্যে এ আয়াতাংশের আমাদের কাছে গ্রহণীয় তাফসীর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে বান্দাদের সাদ্‌কা প্রদান করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তাদের সম্পদের যাকাত আদায় করতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর তাদের সম্পদের যাকাত দেয়া ফরয করেছেন। সুতরাং যে পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসাবে তাদের উপর আদায় করা ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাতে যাকাত গ্রহণকারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ সাদ্‌কা হিসাবে প্রদান করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, সাদ্‌কা ওয়াজিব হবার পর সাদ্‌কা গ্রহণকারীরা সাদকার পরিমাণ সম্পদের মাধ্যমে যাকাত দানকারীদের সম্পদে অংশীদার সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর এ কথাটিতেও সন্দেহ নেই যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পদে এখন দু'জন অংশীদার

পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে প্রত্যেক অংশীদারের নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। একজন অন্য জনকে তার অধিকার থেকে বিচ্যুত করার কোন আইনত বিধান নেই। কাজেই এক অংশীদার অন্য অংশীদারকে নিকৃষ্ট সম্পদ প্রদান করে তাকে তার মালিকানা স্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করতে আইনত সক্ষম নয়। অনুরূপভাবে মালের যাকাত প্রদানকারীর উপর আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে তিনি তার মালের মধ্য থেকে অন্যান্য অংশীদারকে উৎকৃষ্ট সম্পদ প্রদানের মাধ্যমে তার মালের মধ্যে তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন। কেননা, এ মালের মধ্যে তারা তার অংশীদার। কাজেই তাদেরকে নিকৃষ্ট সম্পদ অর্পণ করে উৎকৃষ্ট মালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তাদের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা তার জন্যে বৈধ নয়। অনুরূপভাবে যদি সব সম্পদই নিকৃষ্ট মাল হয়ে থাকে, তাহলে যাকাতের প্রাপ্য অংশীদারগণ এ নিকৃষ্ট মালে অংশীদার হবেন এবং তাদেরকে উৎকৃষ্ট সম্পদ যাকাত হিসাবে প্রদান করা মালিকের উপর ফরয হবে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদের মালিকদেরকে লক্ষ্য করে আদেশ দেন যে, তোমরা তোমাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে যাকাত আদায় কর এবং অংশীদারদেরকে প্রদান করার জন্যে নিকৃষ্ট সম্পদের প্রতি সংকল্প কর না। আর তাদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশের উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত কর না। অথচ তোমরা তোমাদের এ অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হবার পূর্বে মওজুদ উৎকৃষ্ট মালের পরিবর্তে নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ কর না। তবে তোমরা ঐসময় গ্রহণ কর, যখন তোমরা তার গুণগত দিকটি উপেক্ষা কর, কিংবা তোমাদেরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় কিংবা তোমরা তোমাদের অসন্তুষ্টি সহকারে তা গ্রহণ করে থাক। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, যারা তোমাদের মালে অংশীদার হয়েছে, তাদের সাথে তাদের অধিকার অর্পণের বেলায় তোমরা এমন ব্যবহার কর না, যে ব্যবহার তোমাদের আবশ্যকীয় অধিকার সমর্পণ করার ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে অন্য কেউ করুক তা তোমরা পসন্দ কর না।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ফরয যাকাত ব্যতীত নফল দান-খয়রাত যারা করে থাকেন, তাদের বেলায়ও তারা শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট সম্পদই দান করবে, অন্যটা দান করা আমি খারাপ মনে করি। কেননা, উৎকৃষ্ট সম্পদের ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা অত্যধিক প্রয়োজন বলে স্বীকৃত ও সমাদৃত। সাদ্কার মাধ্যমে মু'মিন বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করে। তবে উৎকৃষ্ট নয় এমন সম্পদ দ্বারা নফল যাকাত আদায় করাকে আমি হারাম মনে করি না। কেননা, উৎকৃষ্ট নয় এমন বস্তু পরিমাণে অধিক হওয়ায় এবং তাতে বিপদ-আপদ প্রকট হওয়ায় তার উপকার জনসাধারণের জন্যে ব্যাপক ও সার্বিক এবং মিসকীনদের কাছে সহজলভ্য ও সুনিশ্চিত। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্য যে উৎকৃষ্ট সম্পদ দান করা হয়, তা পরিমাণে সামান্য হওয়ায় এবং তাতে বিপদ-আপদ প্রকট না হওয়ায় তার উপকারিতাও সীমাবদ্ধ। আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে একদল প্রখ্যাত তাফসীরকার সমর্থন করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অত্র আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ -এর তাফসীর সম্পর্কে উবায়দা (র.)-কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, অত্র আয়াতটি যাকাত সম্বন্ধে নাযিল হয়। প্রচলিত মুদ্রা আমার কাছে খেজুর থেকে অধিক প্রিয়। অর্থাৎ খেজুর দ্বারা যাকাত আদায় না করে প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমে সম্পদের যাকাত আদায় করা বেশী পসন্দনীয়।

৬১৬৪. মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উবায়দা (র.)-কে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, এ আয়াতটি যাকাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। আর প্রচলিত মুদ্রা আমার কাছে খেজুর থেকে অধিক প্রিয়।

৬১৬৫. ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ-এর তাফসীর সম্পর্কে উবায়দা (র.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ফরয যাকাত সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। তবে নফল যাকাতে খেজুর দ্বারা যাকাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই। অথচ খেজুর থেকে প্রচলিত মুদ্রাই যাকাত আদায়ের বেলা শ্রেয়।

৬১৬৬. মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটি ফরয যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। তবে নফল যাকাতে কোন দোষ নেই। কোন এক ব্যক্তি প্রচলিত মুদ্রাও খয়রাত করতে পারে। তবে প্রচলিত মুদ্রা খেজুর ও অন্যান্য বস্তু থেকে উত্তম।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণ করেন, হে মানব জাতি ! তোমরা জেনে রেখ, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাদ্কা ও অন্যান্য দান-খয়রাত থেকে অভাবমুক্ত। তবে তোমাদেরকে যাকাত আদায় সম্বন্ধে আদেশ দিয়েছেন এবং সম্পদে যাকাত আদায় ফরয করেছেন। তাঁর সব কিছুই তোমাদের জন্যে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত ও দয়া স্বরূপ যা দ্বারা তিনি তোমাদের ফকীরকে ধনী করেন, দুর্বলকে সবল করেন এবং আখিরাতেও তোমাদেরকে এর জন্য পরিপূর্ণ প্রতিদান অর্পণ করবেন। তোমাদের যাকাতের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তা আদায় করতে নির্দেশ দেননি। পরবর্তী শব্দ حَمِيْدٌ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি বান্দাদেরকে অগণিত নিয়ামত প্রদান ও তাদের প্রতি অফুরন্ত দয়া প্রদর্শনের কারণে তাদের কাছে প্রশংসিত। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস খুবই উল্লেখ যোগ্য।

৬১৬৭. বারা ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ-এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাদকাসমূহ থেকে মুক্ত ও প্রশংসিত।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(٢٦٨) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অবগতির জন্যে ইরশাদ করেন, হে মানব জাতি, তোমাদেরকে শয়তান বলে যে, তোমরা সাদ্কা-খয়রাত করলে এবং ফরয যাকাত আদায় করলে দরিদ্র হয়ে যাবে। তাই সে তোমাদেরকে কার্পণ্য করার নির্দেশ দান করে। তদুপরি সে তোমাদেরকে পাপের কাজ

করতে ও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ–নিষেধ অমান্য করতে নির্দেশ প্রদান করে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তোমাদের অশ্লীলতাকে গোপন রাখবেন, অশ্লীলতার নির্ধারিত শাস্তিও প্রদান করবেন না এবং তোমাদের কৃত দান–খয়রাতের কারণে তিনি তোমাদের পাপসমূহ মাফ করে দেবেন। আরো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তোমাদের সাদ্কার তিনি প্রতিদান এ দুনিয়ায়ও দান করবেন। তোমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের নিয়ামত দান করবেন এবং তোমাদের রিযিক বৃদ্ধি করে দেবেন।

৬১৬৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন,আয়াতে উল্লিখিত দু'টি বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এবং অন্য দু'টি বস্তু শয়তানের তরফ থেকে এসে থাকে। প্রথমত, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং বলে, সম্পদ ব্যয় কর না, বরং এটা তোমার কাছে জমা রেখ। কারণ তুমি একদিন এটার মুখাপেক্ষী হবেই। দ্বিতীয়ত শয়তান তোমাদের অশ্লীলতা অবলম্বন করার আদেশ প্রদান করে থাকে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের পাপের প্রতি তাঁর ক্ষমা প্রদর্শন এবং রিযিক পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

৬১৬৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত مَغْفِرَةً–এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কার্পণ্যকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করবেন। আর فَضْلاً – এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের অভাব দূর করার জন্যে তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন।

৬১৭০. আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, শয়তান মানব সন্তানকে একবার স্পর্শ করে এবং ফেরেশতাও একবার স্পর্শ করে। শয়তানের স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, শয়তান তাকে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে ফেরেশতার স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতা তাকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং সত্যকে বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে। যদি তোমাদের কেউ ভাল কাজ করার ইংগিত পায়, তাহলে তাকে অনুধাবন করতে হবে যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে এবং সেজন্য তাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করতে হবে। আর যে ব্যক্তি অন্যটি অনুভব করবে, তাকে শয়তান থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। এরপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ -

৬১৭১. আবদুল্লাহ্(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানব জাতির জন্যে শয়তানের একটি স্পর্শ আছে এবং ফেরেশতারও একটি স্পর্শ আছে। ফেরেশতার স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, কল্যাণের দিকে ধাবিত করা এবং সত্যকে বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত করা। অন্যদিকে শয়তানের স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, অকল্যাণের দিকে ধাবিত করা এবং সত্যকে অবিশ্বাস করতে কুমন্ত্রণা দেয়া। এরপর আবদুল্লাহ্ (রা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন : اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً - আমর নামক একজন বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসের প্রসঙ্গে আমরা শুনেছি যে, বলা হতো, যদি তোমাদের কেউ ফেরেশতার স্পর্শ অনুভব করে, তাহলে সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ কামনা করে। আর যদি তোমাদের কেউ শয়তানের স্পর্শ অনুভব করে, তাহলে যেন সে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং শয়তান থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

৬১৭২. আবদুল্লাহ্(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সাবধান থেকো যে, ফেরেশতার একটি স্পর্শ মানব সন্তানের জন্য রয়েছে, অনুরূপভাবে শয়তানেরও একটি স্পর্শ রয়েছে। ফেরেশতার স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দান এবং সত্যকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করার প্রতি উৎসাহ প্রদান। পক্ষান্তরে শয়তানের স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, অকল্যাণের প্রতি ধাবিত করা এবং সত্যকে অবিশ্বাস করার উস্কানি দেয়া। আর এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদেরকে কার্পণ্যের নির্দেশ দান করে। অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অভাবমুক্ত সর্বজ্ঞ।

এরূপ যদি তোমাদের কেউ অনুভব কর তোমরা যেন আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা কর। আর তোমাদের মধ্যে যারা অন্যরূপে অনুভব কর, তোমরা যেন শয়তান থেকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

৬১৭৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ-এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, ফেরেশতার একটি স্পর্শ আছে। অনুরূপভাবে শয়তানেরও একটি স্পর্শ আছে। ফেরেশতার স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি এবং সত্যকে স্বীকার করার উৎসাহ দান। যে ব্যক্তি এরূপ অনুভূতি লাভ করবে তার আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা উচিত। আর শয়তানের স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, অকল্যাণের প্রতি ধাবিত করা এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রেরণা দেয়া। যে ব্যক্তি এরূপ অনুভূতি লাভ করবে তার উচিত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করা।

৬১৭৪. মুররাহ আল-হামদানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) অত্র আয়াতাংশ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ- -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আদম সন্তানের প্রতি ফেরেশতার যেমন একটি স্পর্শ আছে, তেমনিভাবে শয়তানেরও একটি স্পর্শ রয়েছে। ফেরেশতার স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান। আর শয়তানের স্পর্শের অর্থ হচ্ছে অকল্যাণের প্রতি আকর্ষণ ও সত্যের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনের কুমন্ত্রণা প্রদান। কোন ব্যক্তি যদি ফেরেশতার কোন স্পর্শ অনুভব করে, তাহলে তার উচিত হবে এর জন্যে আল্লাহ্ তা 'আলা শোকর আদায় করা। আর যে ব্যক্তি শয়তানের কোন স্পর্শ অনুভব করে, তার উচিত হবে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلاً وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ-

অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৬১৭৫. অন্য এক সূত্রেও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬১৭৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। আদম সন্তানের প্রতি শয়তানের একটি স্পর্শ রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, সত্যের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপনের কুমন্ত্রণা এবং অকল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদান। আর ফেরেশতার স্পর্শের অর্থ হচ্ছে, কল্যাণের

প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উৎসাহ প্রদান। কোন ব্যক্তি যদি ফেরেশতার স্পর্শ অনুভব করে, তাহলে তাকে জানতে হবে যে, এটি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সমাগত এবং এর জন্যে তাকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করতে হবে। তাঁর শোকরগুজার হতে হবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয়টি অনুভব করে, তার উচিত আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শয়তানের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় নেয়া। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেনঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً - অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

আল্লামা আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার মত তাঁর সম্পদ রয়েছে। তিনি প্রাচুর্যময়। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, দান-খয়রাতে কর সব কিছু সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত, তিনি সর্বজ্ঞ। তোমাদের সমস্ত আমলের হিসাব তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি আখিরাতে তোমাদের সমস্ত দান-খয়রাতের ছওয়াব প্রদান করবেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٢٦٩) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا -এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান, তাকে কথা ও কাজে সঠিকতা দান করেন। আর তাদের মধ্যে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা কথা ও কাজে সঠিকতা দান করেন, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেন। তত্ত্বজ্ঞানিগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাদের কেউ কেউ বলেন, এস্থানে যে হিকমতের কথা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন তা হচ্ছে, কুরআন ও কুরআন সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন। এ অভিমত সমর্থনকারী তাফসীরকারগণের উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণের কিছু অংশ নিম্নে বর্ণনা হলো ঃ

৬১৭৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا -এর তাফসীর প্রসেঙ্গ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত নাসিখ, মানসূখ, মুহকাম, মুতাশাবিহ, মুকাদ্দাম, মুয়াখখার, হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। পবিত্র কুরআনে কিছু সংখ্যক আয়াত অন্য আয়াতের হুকুমকে রহিত করে দিয়েছে। হুকুম রহিতকারী আয়াতগুলোকে নাসিখ বলা হয় এবং যে আয়াতের হুকুম রহিত হলো, তাকে মানসূখ বলা হয়। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত কিছু সংখ্যক আয়াতের মর্ম খুবই স্পষ্ট, যার অন্যরূপ অর্থ নেয়া সম্ভব নয়। এগুলোকে মুহকাম বলা হয়।

পক্ষান্তরে কিছু আয়াতের মর্ম তত স্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এগুলোর মর্ম সুস্পষ্ট ছিল। এগুলোকে মুতাশাবিহ বলা হয়। মুকাদ্দাম অর্থ পরে উল্লেখ্য আয়াতকে বিশেষ কারণবশতঃ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুয়াখখার অর্থ, পূর্বে উল্লেখ্য আয়াতকে বিশেষ কারণবশত পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬১৭৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ও সঠিক জ্ঞান লাভ করা।

৬১৭৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, الحكمة শব্দটির অর্থ হচ্ছে কুরআন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

৬১৮০. আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত কিতাব এবং এ কিতাব সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জন।

৬১৮১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ اَلْاٰيَةَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةَ শব্দের অর্থ নবূওয়াত নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে, কুরআন এবং ইলমে ফিকাহ্।

৬১৮২. আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ الاية -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةَ শব্দের অর্থ হচ্ছে, কুরআন মজীদ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আবার কেউ কেউ এ আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةَ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে কথা ও কাজে সঠিকতা। এরূপ অভিমত সমর্থনকারীদের উপস্থাপিত দলীলাদি নিম্নরূপ ঃ

৬১৮৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "اَلْاِصَابَةَ" বা সঠিক জ্ঞান।

৬১৮৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, يُؤْتِى الْاِصَابَةَ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান সঠিকতা দান করেন।

৬১৮৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে اَلْكِتَابُ يُؤْتِى اِصَابَتَهُ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ কুরআন মজীদ। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাকে কুরআন মজীদের সঠিক জ্ঞান দান করেন।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةَ শব্দটির অর্থ হচ্ছে اَلْعِلْمُ بِالدِّيْنِ অর্থাৎ দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। যারা এরূপ অভিমত সমর্থন করেন, তাদের দলীলাদি নিম্নরূপ ঃ

৬১৮৬. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةُ শব্দের অর্থ হচ্ছে العقل في الدين অর্থাৎ দীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। এরপর তিনি আয়াতাংশটি পাঠ করেন وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا -

৬১৮৭. ইউনুস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি অন্য এক সূত্রে ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "العقل" অর্থাৎ বিবেক।

৬১৮৮. ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,মালিক (র.)–কে اَلْحِكْمَةُ শব্দের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উত্তরে তিনি বলেন, اَلْحِكْمَةُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, দীন ইসলাম সম্পর্কে معرفة হাসিল করা, দীনকে উত্তমরূপে বুঝা এবং তার অনুসরণ করা।

আবার কেউ কেউ বলেন, "اَلْحِكْمَةُ" –এর অর্থ হচ্ছে الفهم অর্থাৎ সত্যের উপলব্ধি। যারা এ অভিমত সমর্থন করেন, তাদের উপস্থাপিত দলীল হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

৬১৯০. ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "اَلْحِكْمَةُ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে الفهم অর্থাৎ সত্যের উপলব্ধি অর্জন করা।

আবার কেউ কেউ বলেন, "اَلْحِكْمَةُ" –এর অর্থ হচ্ছে الخشية অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভীতি। যারা এরূপ অভিমত পোষণ করেন, তারা তাদের দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন ঃ

৬১৯১. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত "يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ" –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে "اَلْخَشْيَةُ" অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভীতি। কেননা, প্রত্যেক বস্তুর মূলে আল্লাহ্‌ভীতি বিরাজ করছে। এরপর তিনি সূরা ফাতিরের ২৮ নং আয়াতটির অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করেন اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে।

আবার কেউ কেউ বলেন, "الحكمة" শব্দটির অর্থ হচ্ছে النبوة –নবূওয়াত।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬১৯২. ইমাম সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ الخ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত اَلْحِكْمَةُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে النبوة –নবূওয়াত।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, اَلْحِكْمَةُ শব্দটির বিভিন্ন অর্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ শব্দটি حَكَمَ শব্দ থেকে নির্গত। অর্থাৎ বিচার করা। সুতরাং حكمة –এর অর্থ হবে اصابة (সত্যের উপলব্ধি)। আর এ অর্থের অনুকূলে বিভিন্ন দলীল পেশ করা হয়েছে, যেগুলোর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। এ অর্থটি গ্রহণের যৌক্তিকতা হলো এই যে, বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারিগণ যেসব অর্থ পেশ করেছেন এবং আমরাও যা উপরে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এসব আমাদের বর্তমান উল্লিখিত অর্থের সাথে সম্পৃক্ত।

কেননা, কোন কাজের সঠিক পর্যায়ে পৌছা তখনই সম্ভব হয়, যখন তাকে বুঝা যায়, তার সঠিক পরিচিতি পাওয়া যায়, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা হয়। সুতরাং কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান অর্জনকারী ঐ বিষয়টি সম্পকীয় কার্য সম্পাদনে সঠিক পর্যায়ে পৌছতে পারে। বিষয়টি সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধি করা, আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং ঐ ব্যক্তির ফকীহ ও বিদ্বান হওয়া ইত্যাদি সবই সম্পৃক্ত। আর নবূওয়াতও সত্য উপলব্ধি এবং বিশুদ্ধতার একটি অংশ হিসাবে গণ্য। কেননা, নবীগণ সঠিক পথের পথিক, হৃদয়ঙ্গমকারী এবং তারা বিষয়ের সঠিকতায় পৌছার ক্ষেত্রে সফলকামও বটে। সুতরাং দেখা যায়, নবূওয়াত হচ্ছে حكمة –এর বিভিন্ন তাৎপর্যের অংশ বিশেষ। তাই সর্বশেষে কথাটির অর্থ দাঁড়াবে يُؤْتِى اللّٰهُ اَصَابَةَ الصَّوَابِ فِى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّؤْتِهِ اللّٰهِ ذٰلِكَ فَقَدْ اٰتَاهُ خَيْرًا كَثِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তার কথা ও কাজে সত্য উপলব্ধি করার তাওফীক দান করেন। আর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তা দান করেন, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ – এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যারা সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকে ও অন্যদেরকে উপরোল্লিখিত আয়াত ও অন্য আয়াত দ্বারা তাদের প্রভু যে নসীহত করেছেন এবং স্বীয় ওয়াদা ও শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন এসব নসীহত, ওয়াদা ও শাস্তিকে স্মরণ করে; আল্লাহ্ পাক যে সব কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তা থেকে বিরত থাকে এবং তাঁর আদেশসমূহ পালন করে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিরাই–যারা বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন। তারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধকে পুরাপুরি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্ পাকের যাবতীয় নসীহত শুধুমাত্র বিবেকবান ও সবর অবলম্বনকারীদের জন্যই উপকারী। আর নসীহত শুধুমাত্র বিচার–বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকেই যাবতীয় পাপের কাজ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে।

(২৭০) وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ০

২৭০. যা কিছু তোমরা দান কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন। জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ –এর মাধ্যমে ইরশাদ করেন, তোমরা যা সাদ্কা কর কিংবা মানত মান তথা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কল্যাণকর কাজ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন। অন্য কথায়, এসব কিছু আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের আওতায় সংঘটিত হয়। কোন কিছু তার কাছে অবর্তমান নয় এবং কম হোক কিংবা অধিক হোক, কোন বস্তুই তাঁর কাছে গোপন থাকে না বরং তিনি তার বিশদ বিবরণ সংরক্ষিত রাখেন। হে মানব জাতি, তোমাদের সকলকে তিনি তোমাদের সকল আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার ব্যয়, সাদ্কা–খয়রাত এবং মানত আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্টি অর্জন ও স্বীয় আত্মা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কয়েকগুণ অধিক প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যার ব্যয়, দান, খয়রাত লোক দেখানো এবং মানত শয়তানের সন্তুষ্টির জন্যে হয় তাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শাস্তি ও বেদনাদায়ক আযাব, প্রতিদান হিসাবেপ্রদানকরবেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬১৯৩. তিনি মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত يعلمه এর অর্থ হচ্ছে يحصيه অর্থাৎ তিনি তার বিশদ বিবরণ সংরক্ষণ করেন।

৬১৯৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ আ'আলা ঐ ব্যক্তির শাস্তির বিধান বর্ণনা করেছেন, যার ব্যয় ও সাদ্কা লোক দেখানোর জন্যে নিবেদিত এবং যার মানত শয়তানের অনুসরণের উদ্দেশ্যে করা হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ অর্থাৎ যে লোক দেখানোর জন্যে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতায় নিজ সম্পদ ব্যয় করে আর তার মানত শয়তানের জন্যে এবং শয়তানের অনুসরণের উদ্দেশ্যে করে তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। أَنْصَارٌ শব্দটি نصير শব্দের বহুবচন যেমন اشراف শব্দটি شريف শব্দের বহুবচন– হিসাবে ব্যবহৃত।

আয়াতে উল্লিখিত من انصار –এর অর্থ হচ্ছে, ঐ ব্যক্তি যে তাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সাহায্য করবেন এবং ফিদইয়ার মাধ্যমে নয় বরং শক্তির মাধ্যমে ঐদিন তাদের থেকে আল্লাহ্র আযাবকে প্রতিরোধ করবেন।

ইমাম তাবারী (রা.) বলেন, আমরা ইতিপূর্বে দলীল সহকারে বর্ণনা করেছি যে, জালিম শব্দ দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি কোন বস্তুকে তার অযোগ্য জায়গায় স্থাপন করে। যেমন লোক দেখানোর জন্যে দান করা। আর আল্লাহ্ পাক জালিম বলে আখ্যায়িত করেছেন এই জন্য যে, দানকারীও সম্পদকে অযোগ্য স্থানে দান করে এবং মানতকারীও সম্পদ অনুপযুক্ত স্থলে মানত করে। কাজেই এরূপ কাজ 'জুলুম' হিসাবে বিবেচ্য।

যদি এখানে কোন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন যে, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ কেন বলা হলো? অর্থাৎ يَعْلَمُ –এর মধ্যে "ه" একবচন নেয়া হলো বরং দু'টি বস্তু হিসাবে هما সর্বনামটি ব্যবহার করা হয়নি। অথচ এ সর্বনামের পূর্বে ব্যয় ও মানত দু'টি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এখানে উল্লিখিত فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ –এর অর্থ হচ্ছে فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا أَنْفَقْتُمْ أَوْ نَذَرْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যা দান কর বা মানত কর আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন। এজন্যই واحد –এর ضمير নেয়া হয়েছে।

(٢٧١) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে তা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরো ভাল এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সম্যক অবহিত।

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, যদি তোমরা প্রকাশ্যে সাদ্কা কর এবং যাদেরকে দান করার তাদেরকেই দান কর, তাহলে এটি ভাল। এখানে نِعِمَّا هِيَ –কে বলা হয় نعم الشىء هى অর্থাৎ বস্তুটি কতই না ভাল। আর যদি গোপনে দান কর, প্রকাশ না কর এবং ফকীরদেরকে দান কর, তাহলে এ গোপনে তোমাদের দান করা প্রকাশ্যে দান করা থেকে উত্তম। আর তা হচ্ছে নফল সাদ্কার ব্যাপারে।

৬১৯৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নিয়ত সহীহ্ হলে প্রতিটি আমল কবুল হয়। আর গোপনের সাদ্কা শ্রেয়। তিনি বলেন, এটাও আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাদ্কা পাপ–রাশিকে মোচন করে দেয়, যেমন পানি অগ্নিকে নির্বাপণ করে দেয়।

৬১৯৬. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যখন নিয়ত সঠিক হয়, তখন প্রতিটি আমল কবুল করা হয়। আর গোপনে সাদ্কা করা অতি উত্তম। আবার তিনি এরূপও বলতেন, নিঃসন্দেহে সাদ্কা পাপরাশিকে মোচন করে দেয়, যেমন পানি অগ্নিকে নির্বাপিত করে দেয়।

৬১৯৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রকাশ্যে নফল সাদ্কা করার চেয়ে গোপনে কৃত সাদ্কাকে আল্লাহ্ তা'আলা সত্তরগুণ অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। আর প্রকাশ্যে ফরয সাদ্কা করাকে গোপনে করার চেয়ে পঁচিশগুণ বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। এরূপে সমস্ত ফরয ও নফল ইবাদতের মর্যাদা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করেছেন।

৬১৯৮. সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সাদকার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেছেন যে, এ আয়াতে কিতাবী তথা ইয়াহুদী–খৃষ্টানদের উপর সাদ্কা করার ফযীলত সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি কিতাবী ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে সাদ্কা কর, তাহলে এটা ভাল। আর যদি তা গোপনে কর এবং তাদের ফকীরদের দান কর, তাহলে তা উত্তম। তারা আরো বলেন, যদি মুসলিম ফকীরদের যাকাত ও নফল সাদ্কা গোপনে দান করা হয়, তাহলে এটা প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে অধিক উত্তম।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬১৯৯. ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাদ্কা প্রদান করা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়।

৬২০০. ইব্ন লুহায়আহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব (র.) গোপনে যাকাত বন্টন করার আদেশ দিতেন। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, যাকাত প্রাকশ্যে প্রদান করা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতাংশ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ –এর মাধ্যমে বিশেষ কোন সাদ্‌কা ও সম্প্রদায়কে বিশেষিত করেননি। বরং এটা সর্বসাধারণের জন্যেই প্রযোজ্য। তবে ফরয যাকাতের ব্যাপারটি ভিন্ন। কেননা, উলামা কিরাম ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, ফরয যাকাত ও আমল প্রকাশ্যে প্রদান ও সম্পাদন করাই অধিক শ্রেয়। আর নফল যাকাত সম্বন্ধে উলামা কিরামের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ে আস্‌ছে। এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে পেশ করেছি– দ্বিরুক্তির প্রয়োজন মনে করি না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ –এর কিরাআতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি وَتُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ –এর স্থলে وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ পড়েছেন। অর্থাৎ ياء –এর স্থলে তিনি تاء পড়েছেন। পঠনরীতি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে– সাদ্‌কাসমূহ তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করে থাকে। আবার কেউ কেউ يكفر পড়েছেন। তাহলে বাক্যটির অর্থ হবে নিম্নরূপ ঃ وَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْكُمْ بِصَدَقَاتِكُمْ عَلَى مَا ذُكِرَ فِى الْاٰيَةِ (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাদ্‌কার সাহায্যে তোমাদের থেকে উল্লিখিত পাপরাশি মোচন করে দেবেন। মদীনা, কূফা ও বসরার সাধারণ কারীগণ পাঠ করেছেন وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ نُكَفِّرْ অর্থাৎ "نون" সহকারে এবং "ر" –তে جزم অর্থাৎ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ –অর্থাৎ যদি তা তোমরা গোপন কর এবং ফকীরদের দান কর তোমাদের থেকে পাপরাশি আমরা মোচন করে দেবো। অন্য কথায়, গোপনীয় সাদ্‌কার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলারপ্রতিদান হলো কিছু পাপ মোচন করে দেয়া।

ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের নিকট শুদ্ধতম কিরাত হচ্ছে نون সহকারে "ر" তে جزم দিয়ে পাঠ করা। তাতে অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নফল সাদ্‌কাকারীর প্রতিদান তার পাপ মোচনের মাধ্যমে নিজেই প্রদান করবেন। এরূপ পঠনরীতি প্রসঙ্গে বলা যায় যে, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ –এ উল্লিখিত فاء –এর স্থলে হওয়ায় نكفر –এর "ر" তে جزم দেয়া হয়েছে। কেননা, এখানে "فاء" কে جواب شرط –এর স্থলে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করে যে, এখানে جواب الشرط -এ جزم দেয়া হয়েছে অথচ বসরার নাহ শাস্ত্রবিদদের মতে رفع দেয়াটাই হলো শ্রেয়। যেমন فهو خير لكم বলে جواب الشرط -কে حالت رفعی তে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং جواب الشرط এ– رفع হওয়াটাই عمل على النسق বা উত্তম পন্থায় আমল করা কিন্তু نكفر –কে نون সহকারে ر -তে جزم দিয়ে পাঠ করলে উত্তম নিয়মের বিপরীত হয়। جزم দেয়াটা যদিও সঙ্গত তবে শ্রেয় পন্থা ছেড়ে جائز বা সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করার কি কারণ থাকতে পারে? উত্তরে বলা যায় যে, এখানে نكفر –এর মধ্যে جزم দেয়া হয়েছে এ সত্যটির দিকে ইংগিত করার জন্যে যে, সাদ্‌কাকারীর পাপের কিছু অংশ মাফ করা অনিবার্যভাবে ঐসব নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত, যা সাদ্‌কাকারীকে তার সাদ্‌কার প্রতিদান হিসাবে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আর তা পুরাপুরি বুঝা যাবে শুধু نكفر –কে جزم দিয়ে পাঠ করলে। কেননা, যদি رفع দিয়ে পাঠ করা হয়, তাহলে

এটা সাদ্‌কার প্রতিদানের মধ্যেও শামিল হতে পারে। আবার এটিকে خبر مستانف হিসাবে ধরে নেয়াও শুদ্ধ হতে পারে। তখন এটির অর্থ হবে মু'মিন বান্দাদেরকে তাদের সাদ্‌কার প্রতিদান ব্যতীতও পাপ মোচনের প্রতিদান দেয়া হবে। কেননা فاء –এর পরবর্তী বাক্য অর্থাৎ نكفر جواب الشرط –হিসাবে গণ্য, তবে এটা আবার خبرمستانف হিসাবেও গণ্য হতে পারে বিধায় এ معطوف টি معطوف عليه –এর আওতাভুক্ত নয়। আর তা পূর্বেকার جواب الشرط –এর সাথে সম্পৃক্ত নাও হতে পারে। এজন্যেই نكفر –কে جزم দিয়ে فهوخيرلكم –এর– فاء –এর উপর عطف করা হয়েছে এবং نِ–এর সাথে পড়া হয়েছে।

আবার যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, نكفرعنكم من سيئاتكم –এ– من –কে কেন নেয়া হয়েছে? উত্তরে বলা যায় যে, مِن এ কথা বুঝাবার জন্যে নেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণ পাপ মাফ করে দেবেন। সম্পূর্ণ পাপের কথা বলা হয়নি। যাতে মানুষ সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভীত–সন্ত্রস্ত থাকে এবং গোপনে কৃত সাদ্‌কার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত প্রতিদানের উপর নির্ভর করে না থাকে। আর তাতে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে ফেলত এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীতে মানুষ মশগুল হয়ে যেত। বসরার কোন কোন নাহু শাস্ত্রবিদ বলেছেন, এখানে مِن এর কোন অর্থ নেয়া হয়নি। এখানে এটা অতিরিক্ত হিসাবে নেয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে যেন বলা হয়েছে نكفرعنكم سيئاتكم –।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে অবগত করান যে, হে মু'মিন বান্দারা, তোমরা তোমাদের সাদ্‌কা গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে প্রদান কর অথবা অন্য কোন আমল তোমরা প্রকাশ্যে সম্পাদন কর কিংবা গোপনে আঞ্জাম দাও আল্লাহ্ তা'আলা তা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তাঁর কাছে কোন বস্তুই গোপন থাকে না। তিনি এসবের বিবরণ রাখেন, এসব তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। আর তিনি তাদেরকে এগুলোর ছওয়াব দান করবেন অথবা শাস্তি দেবেন। প্রতিদানের বেলায় আমল কম হোক কিংবা বেশী হোক, তাতে কোন পার্থক্য নেই।

(২৭২) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭২. তাদের সৎপথ গ্রহণের দায় তোমার নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভার্থেই ব্যয় করে থাক। যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.), মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের দায়–দায়িত্ব আপনার উপর বর্তায় না। কাজেই মুশরিকদেরকে নফল সাদ্‌কা না দিয়ে অভাবের তাড়না দিয়ে ইসলামে তাদেরকে প্রবেশ করবার ব্যবস্থা নেয়ার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহ্

তা'আলা নিজের মাখলুকাতের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে তাওফীক দেন। সুতরাং আপনি তাদেরকে সাদ্‌কা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২০১. শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ –এর শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুশরিকদেরকে সাদ্‌কার মাল প্রদান থেকে বিরত থাকতেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ (অর্থাৎ এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ব্যয় কর। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সাদ্‌কার মাল প্রদান করলেন।

৬২০২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ –এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন। মুসলমানগণ মুশরিকদেরকে তাদের আত্মীয়–স্বজন হওয়া সত্ত্বেও সাদ্‌কার মাল সামান্য কিছুও প্রদান করতেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ الاية (অর্থাৎ তাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয় বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।

৬২০৩. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ –এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, মুসলমানগণ মুশরিকদেরকে আত্মীয়–স্বজন হওয়া সত্ত্বেও সামান্যতম সাদ্‌কার মাল প্রদানে বিরত থাকতেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ الخ (অর্থাৎ তাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব আপনার নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।)

৬২০৪. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ –এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, মুসলমানগণ আত্মীয়–স্বজন হওয়া সত্ত্বেও মুশরিক মিসকীনদেরকে সামান্যতম সাদ্‌কার মালও প্রদান করতেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ –। এরপর মুসলমানদেরকে এরূপ সাদ্‌কা প্রদান করার অনুমতি দেয়া হলো।

৬২০৫. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ الاية –এর শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কিছু সংখ্যক আনসারের বনূ কুরায়যা এবং বনূ নযীরে কিছু সংখ্যক মিসকীন আত্মীয়–স্বজন ছিল। কিন্তু তারা এ মিসকীনদের সাদকার মাল দেয়া থেকে বিরত থাকতেন এবং তারা আশা পোষণ করতেন যেন তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ (অর্থাৎ তাদের সৎপথে পরিচালিত করা তোমার দায়িত্ব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন।)

৬২০৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্(সা.)–এর নিকট তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবা (রা.) আরয করলেন, যারা আমাদের ধর্মে দীক্ষিত

হয়নি, তাদেরকে কি আমরা আমাদের সাদকার মাল প্রদান করতে পারি? এ সম্পর্কে তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেন ঃ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ الخ

৬২০৭. রবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ – এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, একজন মুসলমান একজন মুশরিকের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও মিসকীন মুশরিককে ধনী মুসলমান সাদ্কা প্রদান করতেন না এবং তিনি বলতেন, এ মুশরিকটি আমার ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেন ঃ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ الاية

৬২০৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ الخ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আলোচ্য আয়াতংশ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ – এর মাধ্যমে মুশরিকদের কথা বলা হয়েছে আর وَمَا تُنْفِقُوْا – এর দ্বারা সাদ্কার হকদারদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৬২০৯. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা সাদ্কা করতেন।

৬২১০. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তুমি যা ব্যয় করছ, তা তোমাকে পরকালে ফেরত দেয়া হবে। সুতরাং তোমার এটা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হবার কোন সংগত কারণ নেই। তুমি সাদ্কাকৃত ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়া বা এ সাদ্কা সম্বন্ধে বলে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। তুমি যা ব্যয় করছ, তা নিজের জন্যেই করছ এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে তা করছ। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এর পরিবর্তে পুরস্কার দেবেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(٢٧٣) لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২৭৩. এটা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না। যাচঞা না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না। যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَايَسْئَالُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পথে ব্যয় করার খাত ও ব্যয়ের লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ণনা করেন এবং বলেন, তোমরা যা কিছু ব্যয় করছ তা নিজের জন্যেই করছ। আর তোমরা এমন অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য ব্যয় করছ, যারা আল্লাহ্র পথে ব্যাপৃত।

للفقراء –এ অবস্থিত "لام" –এর – فلانفسكم এর "لام" –এর مرجع হচ্ছে –এর ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যেন বলেছেন, وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْنِىْ بِهِ وَمَا تَتَصَدَّقُوا بِهِ مِنْ مَالٍ فَلِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করছ, তা এমন অভাবগ্রস্তদের জন্য, যারা আল্লাহ্র পথে ব্যাপৃত। এরপর আয়াতে যখন فَلِاَنْفُسِكُمْ –কে লওয়া হয়েছে, তখন جواب الشرط হিসাবে এর মধ্যে فاء যোগ করা হয়েছে এবং للفقراء –এর পূর্বে আর পুনরায় وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ আয়াতাংশের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, তা বাক্যের গঠন দ্বারাই বুঝা যায় যে, সেখানে এ বাক্যাংশটি রয়েছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬২১১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের কথা বলেছেন এবং وَمَا تُنْفِقُوْا –এর মাধ্যমে النفقة অর্থাৎ ব্যয়ের কথা উল্লেখ করে ব্যয়ের প্রাপ্য ব্যক্তিবর্গের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত অভাব গ্রস্তদের কথা এখানে বলা হয়নি।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬২১২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে কুরায়শ বংশের মুহাজিরদের কথা বলা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে মদীনায় অবস্থান করছিলেন। তাদেরকে সাদ্কা দেবার আদেশ দেয়া হয়েছিল।

৬২১৩. আবূ জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত। তনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত "الفقراء" –এর অর্থ হচ্ছে মুহাজির ফকীর বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে মদীনায় অবস্থান করছিলেন।

৬২১৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এখানে উল্লিখিত "الفقراء" শব্দটির দ্বারা মুহাজিরদের মধ্য হতে অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ঐসব লোকের কথা বলেছেন, যাঁরা দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তৈরীতে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছেন। সুতরাং তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য কোন কাজকর্ম করতে পারছে না। পূর্বেও আমরা احصار –এর অর্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সংক্ষিপ্তভাবে احصار –এর অর্থ হলো, মানুষ রোগের কারণে অথবা দুশমনের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে কিংবা অন্য কোন কারণে একই অবস্থায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখে এবং জীবন ধারণের সামগ্রী অর্জনের চেষ্টা থেকেও নিজেকে বিরত রাখে। তাফসীরকারগণ احصار –এর অর্থ বর্ণনায় মতভেদ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ আমাদের উপরোক্ত মতামতকে সমর্থন করেছেন এবং দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেন ঃ

৬২১৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَلَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার জন্যে তাঁরা নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছেন।

৬২১৬. ইব্‌ন যায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,তৎকালে পৃথিবীর সর্বত্রই কুফরী বিরাজ করত। কেউ আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযিক অন্বেষণে বের হতে পরত না। যদি কেউ বের হতো তাহলে কুফরীর ছত্রছায়ায় বের হতে হতো। অর্থাৎ হালাল উপায়ে রিযিক অন্বেষণ অসম্ভব ছিল। আবার কেউ কেউ বলেন, পৃথিবীর সর্বত্রই এই শহরের বাশিন্দাদের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্র সদৃশ ছিল। এ শহরের বাশিন্দারা যেখানেই বের হতো সেখানেই তাদেরকে শত্রুর মুকাবিলা করতে হতো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা সাদ্‌কার মাল ঐ ব্যক্তিদের জন্যে ঘোষণা করলেন, যাঁরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যাপৃত রেখেছেন। আর এখানে মুহাজিরগণ নিজেদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যাপৃত রেখেছেন।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, যাদেরকে মুশরিকরা ঘেরাও করে রেখেছে এবং তাদেরকে উপজীবিকা অর্জন থেকে বিরত রেখেছে। এ অভিমত সমর্থনকারীরা দলীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন ঃ

৬২১৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যাদেরকে মুশরিকরা মদীনায় ঘেরাও করে রেখেছিল।

ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, ইব্‌ন যায়দ (রা.) অত্র আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যদি আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা এটা হতো তাহলে এখানে ঐ ব্যক্তিদের সাদ্‌কা দেয়ার জন্যে বলা হতো যাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যাপৃত রাখা হয়েছে। কিন্তু এখানে ঐ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তাহলে স্পষ্টরূপে বুঝা গেল যে, দুশমনের ভয়ই মুহাজির ফকীরদেরকে এমন অবস্থায় উপনীত করেছে, যেখানে তাদেরকে তারা নিজেরাই আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যাপৃত রেখেছেন। দুশমন তাদেরকে ব্যাপৃত রাখেনি। যাকে দুশমন আটক করে রেখেছে, বলা হয় দুশমন তাকে ব্যাপৃত রেখেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি দুশমনের ভয়ে ব্যাপৃত থাকে, বলা হয় যে, তাকে দুশমনের ভয় ব্যাপৃত রেখেছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ এর ব্যাখ্যা ঃ

এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং বলেন, তারা আল্লাহ্‌র যমীনে ঘুরাফিরা করতে পারে না এবং রিযিক ও উপজীবিকার খোঁজে তারা শহরের কোথাও যেতে পারে না। স্বাধীনভাবে রিযিক অন্বেষণের জন্যে যদি কোথাও যেতে পারত, তাহলে তারা সাদ্‌কার মুখাপেক্ষী হতো না। তারা সর্বদাই দুশমনের পক্ষ থেকে প্রাণভয়ে জীবন যাপন করছে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২১৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ظَرْبًا فِي الْأَرْضِ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধের জন্য তৈরীতে ব্যাপৃত রেখেছেন। কাজেই তারা কোন প্রকার ব্যবসা–বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার সামর্থ রাখে না।

৬২১৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ – এ উল্লিখিত ضَرْبًا শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ব্যবসা–বাণিজ্য।

৬২২০. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাদের কেউ উপজীবিকা অর্জনের জন্যে বের হতে পারত না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (অর্থ ঃ যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।) –এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে অবগত করান যে, অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ অভাব–অনটন ও খাদ্যের অপ্রতুলতা ভোগ করা সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করত। মানুষের হাতে যে ধনসম্পদ রয়েছে, তার জন্যে তাদের কাছে কোন প্রকার হাত বাড়াত না বা তাদের গতিপথ রোধ করত না। ফলে তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যারা অবগত ছিল না, তারা তাদের সম্পদের প্রতি অনীহা লক্ষ্য করে তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করত। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত হাদীসখানি প্রণিধানযোগ্য।

৬২২১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ– এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "অত্র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে যাচ্ঞা না করার জন্যে অনেক লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে।" "তিনি আরো বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مِنَ التَّعَفُّفِ বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, কারোর কাছে কোন কিছুর জন্যে হাত বাড়ায় না। এ শব্দটি باب تفعل– এর مصدر এবং ماده হচ্ছে عفة। – العفة عن الشئ –এর অর্থ হচ্ছে তা বর্জন করা। যেমন রাউবাহ নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি বলেছেন, فَعَفَّ عَنْ أَسْرَارِهَا بَعْدَ الْعَسَقِ "(অর্থাৎ "রাতের প্রথমাংশে অন্ধকারের পর সে তার রহস্যাদি উদঘাটন থেকে বিরত হলো।) এখানে عفّ– এর অর্থ بَرِئ وَتَجَنَّبَ (অর্থাৎ বিরত হলো ও দূরে সরে গেল)।

পরবর্তী আয়াতাংশ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ–এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ (সা.), তুমি তাদেরকে তাদের আলামত ও লক্ষণের দ্বারা চিনতে পারবে। سِيمَا শব্দটি আলামত ও লক্ষণের অর্থে সূরা আল–ফাতহের ২৯নং আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ – অর্থাৎ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে। এটা কুরায়শী উচ্চারণ পদ্ধতি (لغة)। আরবের কোন কোন সম্প্রদায় বলে بسيمائهم অর্থাৎ همزه –কে দীর্ঘস্বরে পড়া হয়ে থাকে। ছাকীফ ও আসাদ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক بسيميائهم পড়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে কোন একজন বিখ্যাত কবি বলেন– غُلَامٌ رَمَاهُ اللهُ بِالْحُسْنِ يَافِعًا + لَهُ سِيمِيَاءُ لَا تَشُقُّ عَلَى الْبَصَرِ۔ (অর্থাৎ যৌবনের প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'আলা এ বালকটিকে এত সৌন্দর্য দান করেছেন যে, তার সুস্পষ্ট লক্ষণাদি রয়েছে, যা দেখতে ও লক্ষ্য করতে কোন প্রকার কষ্ট অনুভূত হয় না। এখানে سيمياء –কে চিহ্ন ও লক্ষণ বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, তাফসীরকারগণ سيما শব্দের অর্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে একাধিক মত পোষণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, এরূপ অভাবগ্রস্তদের سيما রয়েছে এবং سيما হচ্ছে তাদের একটি বিশেষ গুণ। আর তারা এগুণে পরিচিত। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, "سيم –এর অর্থ হচ্ছে التخشع এবং التواضع (সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন)। এরূপ অভিমত সমর্থনকারিগণ নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেন ঃ

৬২২২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, " سيما -এর অর্থ হচ্ছে বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করার গুণ।"

৬২২৩. অন্য এক সনদেও মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬২২৪. লাইছ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুজাহিদ (র.) বলতেন যে, سِيْمَا শব্দটির অর্থ হচ্ছে التخشع অর্থাৎ সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করা।"

আবার কেউ কেউ বলেন, تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ–এর অর্থ হচ্ছে দৈন্য ও অভাব–অনটনের ছাপ দ্বারা তাদেরকে চিনতে পারো।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২২৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ بِسِيْمَاهُمْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে তাদের উপর দরিদ্রতার ছাপ বিদ্যমান।"

৬২২৬. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ বাক্যাংশের অর্থ হচ্ছে, "তাদের চেহারায় তুমি অভাব–অনটনের ছাপ দেখতে পাবে।"

আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, "তুমি তাদেরকে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রের দ্বারা চিনতে পারবে।" তারা বলছেন যে, ক্ষুধা একটি অদৃশ্য বস্তু। এরূপ অভিমত সমর্থনকারিগণ নিম্নবর্ণিত হাদীসটি উপস্থাপন করেন।

৬২২৭. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, سِيْمَاهُمْ এর অর্থ হচ্ছে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র। ক্ষুধা মানুষের কাছে একটি অদৃশ্য বস্তু। তবে যদি জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরে কাউকে বাইরে যেতে হয়, তাহলে তার শোচনীয় অবস্থা মানুষের কাছে অদৃশ্য বা গোপনীয় থাকে না।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, "এ প্রসঙ্গে আমার কাছে শুদ্ধতম অভিমত হচ্ছে এই যে, নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবী (সা.)–কে সংবাদ দেন যে, তিনি তাদেরকে তাদের চিহ্ন এবং অভাব–অনটন ও দীনতা দেখে চিনতে পারবেন। বস্তুত হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের প্রতি অবলোকন করার পর তাদের মধ্যে ঐসব চিহ্ন ও নমুনা দেখতে পেতেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ তাদেরকে চিনতে পারতেন। যেমন রুগ্ন ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝা ও জানা যায় যে, লোকটি পীড়িত। তবে বিভিন্ন সময়ে তাদের মধ্যে এ চিহ্নগুলো বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পেত। কোন কোন সময় তাদের বিনয় ও নম্রতার মাধ্যমে এসব প্রকাশ পেত। আবার কোন সময় দৈন্য ও অভাব–অনটনের চিহ্নগুলো প্রকাশ পেত। আবার কোন সময় জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রের মাধ্যমে তাদের দৈন্য প্রকাশ পেত। কখনো সবগুলো চিহ্নই একত্রে প্রকাশ পেত। তবে মানুষ তাদের চিহ্নগুলো সহজে ধরতে পারত না। হ্যাঁ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মানুষের মধ্যে অভাব–অনটন ও দীনতার চিহ্নসমূহ প্রকাশ পায়। তবে এগুলো তাদের বিশেষণ হিসাবে প্রকাশ পাবার দরকার করে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রুগ্ন ব্যক্তির মধ্যেও দরিদ্র ব্যক্তিদের চিহ্নগুলোর ন্যায় চিহ্ন প্রকাশ পেতে পারে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেমন দরিদ্র লোকের মধ্যে উপবাস ও দীনতার চিহ্ন

দেখতে পাওয়া যায়, অনুরূপভাবে কোন কোন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যে রোগের যাবতীয় চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। আবার এরূপও দেখা যায়, বহু কাপড়–চোপড়ের অধিকারী কোন কোন ধনী ব্যক্তি কোন সময় জীর্ণ–শীর্ণ কাপড় পরিধান করে এবং দরিদ্র লোকদের ভূষণে ভূষিত হয়। কাজেই জীর্ণ কাপড়–চোপড় এমন কোন বিশেষণ নয় যে, বিশেষিত লোকটির উপবাস বা দৈন্য তাকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে এবং তার চেহারা পর্যবেক্ষণ করলে সবকিছু ধরা পড়ে। অনুরূপভাবে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করলে তার রোগের সবকিছুই বোঝা যায়। রোগটি তার বিশেষণ হিসাবে প্রকাশ পাবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না।”

আল্লাহর বাণীঃ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا এর ব্যখ্যা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু চাইতে গিয়ে নাছোড় হয়ে যাচঞা করে, তখন বলা হয় قَدْ اَلْحَفَ السَّائِلُ فِيْ مَسْئَلَتِهِ اِلْحَافًا অর্থাৎ ভিক্ষুকটি তার যাচ্ঞায় নাছোড় পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা জনগণের কাছে নাছোড় না হয়ে যাচঞা করতেন। কিন্তু তারা তো যাচ্ঞা করতেন না। উত্তরে বলা যায় যে, এ কথা বলা অসঙ্গত যে, তারা নাছোড় হয়ে কিংবা নাছোড় না হয়ে জনগণের কাছে যাচ্ঞা করতেন। তবে এ আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এগুণটি বর্ণনা করেছেন যে, তারা নিঃসন্দেহে اهل التعفف ছিলেন। অর্থাৎ তারা কারোর কাছে যাচঞা করতেন না। আর নিঃসন্দেহে তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনা যেত। যদি যাচ্ঞা করাটা তাদের প্রকৃতি হতো তাহলে যাচঞা না করাটা তাদের বিশেষ গুণ হিসাবে বর্ণনা করা হতোনা এবং দলীল ও আলামতের মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক তাদের চেনারও প্রয়োজন হতো না। তাদের প্রকাশ্য যাচঞাই তাদের অবস্থা ও বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিত।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬২২৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “একবার আমরা খুবই অভাব–অনটনে উপনীত হয়েছিলাম। তখন আমাকে বলা হলো, 'আমি যেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে গিয়ে কিছু যাচঞা করে নিয়ে আসি। আমি এ ব্যাপারে রাযী ছিলাম না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর দরবারে যেতে হলো। পৌছার পর সর্বপ্রথম যে উপদেশ বাণীটি দরবার থেকে আমার কানে আসে, তা হলো - مَنِ اسْتَعَفَّ اَعَفَّهُ اللّٰهُ وَمَنِ اسْتَغْنٰى اَغْنَاهُ اللّٰهُ وَمَنْ سَاَلَنَا لَمْ نَدَّخِرْ عَنْهُ شَيْئًا نَجِدُهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারোর কাছে যাচ্ঞা করে না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা যাচ্ঞা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। আর যে ব্যক্তি কারো মুখাপেক্ষী হয় না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পর মুখাপেক্ষী করান না। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে কোন বস্তু চান, তাহলে লভ্য দ্রব্য তাকে না দান করে জমা রাখতে আমাদেরকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, তখন আমি আমার নিজের প্রতি লক্ষ্য করে বলতে লাগলাম, আমি কেন যাচঞা করা থেকে বিরত থাকব না? তাহলে আল্লাহ্ তা'আলাও আমাকে বিরত থাকার তাওফীক দান করবেন। এ বলে আমি ফেরত আসলাম। এরপর থেকে আমি আমার কোন প্রয়োজন সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে প্রশ্ন উথাপন করিনি। এরপর দুনিয়া আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং আমাদের অনেককে করায়ত্ত করে ফেলল। তবে যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিফাযত করেছেন।”

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কোন ব্যক্তির মধ্যে التعفف বা 'যাচঞা না করার' গুণটি তাকে যাচঞা করা হতে বিরত রাখে। তাই যে ব্যক্তি التعفف বা যাচঞা না করার গুণটির সাথে ভূষিত, সে নাছোড় হয়ে অথবা নাছোড় না হয়ে যাচঞার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

যদি আবার কেউ প্রশ্ন করে যে, ব্যাপারটি যদি উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে হয়ে থাকে, তাহলে لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافًا বলার কি অর্থ থাকতে পারে? কেননা, তারা الحافا কিংবা غير الحاف কোন প্রকারেই যাচঞাকারীদের অন্তর্ভুক্ত নন। উত্তরে বলা যায় যে, এর কারণ হচ্ছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা التعفف অর্থাৎ "যাচঞা করে না" বলে তাদের গুণ বর্ণনা করেছেন এবং অত্র আয়াতাংশ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ –এর মাধ্যমে তারা যাচঞার সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে তাদের পরিচিতি দিয়েছেন এবং লক্ষণাদির দ্বারা তাদেরকে চেনা যায় বলে আখ্যায়িত করে তাদের ব্যাপারটি সকলের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হবার জন্য এবং নাছোড় হয়ে যাচ্ঞাকারীদের মধ্যে যে দোষত্রুটি রয়েছে তার থেকেও তাদেরকে উর্ধ্বে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, নাছোড় হয়ে যাচঞাকারীদের ত্রুটির সাথে তারা মোটেই সম্পক্ত নয়।

আবার কেউ কেউ বলেন, "উপরোক্ত বর্ণনার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন কেউ বলে থাকে قَلَّمَا رَاَيْتُ مِثْلَ فُلَانٍ অর্থাৎ আমি অমুকের ন্যায় খুব কম ব্যক্তিকেই সম্ভবত দেখেছি অর্থাৎ সে তার ন্যায় নাকি কাউকেও দেখেনি কিংবা তার সমকক্ষকেও সে দেখেনি।"

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২২৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, তারা যাচঞায় নাছোড়বান্দা হয় না।"

৬২৩০. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এখানে উল্লিখিত الحاف শব্দের অর্থ হলো যে ব্যক্তি নাছোড়বান্দা হয়ে সওয়াল করো না।

৬২৩১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْحَلِيْمَ الْغَنِىَّ الْمُتَعَفِّفَ وَيُبْغِضُ الْغَنِىَّ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ –নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যশীল, সম্পদশালী, যারা মানুষের কাছে হাত পাতে না, তাদেরকে ভালবাসেন। আর সম্পদশালী সীমালংঘনকারী অশ্লীলভাষী ও নাছোড়বান্দা হয়ে সওয়ালকারীকে ভালবাসেন না।

কাতাদা (র.) আরো বলেন, আমাদের কাছে আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে তিনটি বস্তু অপসন্দ করেন–অযথা তর্কে লিপ্ত হওয়া, সম্পদের অপচয় করা ও নাছোড়বান্দা হয়ে আবেদন–নিবেদন করা। এরপর কাতাদা (র.) বলেন, আজ তোমরা লক্ষ্য করলে এমন মানুষকেও দেখবে যে, সে অযথা তর্ক-বিতর্কে এতই মগ্ন যে, দিন অতিক্রান্ত হবার পর রাতও শেষ হবার পথে, তার বিছানায় যেন কোন মৃতদেহ রেখে দেয়া হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ভাগ্যে যেন রাত ও দিনের কোন অংশই যথোপযুক্ত কাজে লাগাবার তাওফীক দেননি। আর তুমি লক্ষ্য

করলে এমন সম্পদশালী দেখবে, যে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করে, আনন্দ–উল্লাস করে, হাসি–তামাশায় মত্ত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে আছে। তাকেই বলা হয় সম্পদের অপচয়। আবার কাউকে তুমি দেখবে দু'হস্ত প্রসারিত করে মানুষের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে সওয়াল করছে। যদি কেউ তাকে দান করে, তাহলে সে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর যদি দান না করে, তাহলে তার দুর্নাম রটাতে মাত্রাতিরিক্ত তৎপর হয়ে ওঠে।

(٢٧٤) اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ بِالَّيۡلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمۡ اَجۡرُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ ○

২৭৪. যারা নিজেদের ধনসম্পদ রাতদিন গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, তাদের ছওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস প্রনিধানযোগ্য ঃ

৬২৩২. গাফিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই একবার আবূদ দারদা (রা.) উন্নতমানের ও নিম্নমানের ঘোড়াসমূহের আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়াগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন, এই ঘোড়াসমূহের প্রদানকারীরাই ঐসব ব্যক্তি যারা নিজের ধনসম্পদ রাত দিন, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে। তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট ছওয়াব, তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা দুঃখিতও হবে না।"

আবার কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে ঐসব লোককে উদ্দেশ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র রাহে পরিমাণ মত (কমও নয় এবং বেশীও নয়) সম্পদ দান করে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২৩৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতের اَلَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ بِالَّيۡلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً اِلٰى قَوۡلِهٖ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُوۡنَ তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাঁরা হলেন জান্নাতবাসী। তিনি আরো বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, যারা অপচয় করে, তারা জাহান্নামের নিম্নস্তরবাসী হবে। সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ্ ! কোন ব্যক্তি ব্যতীত? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যারা অপচয় করে, তারা জাহান্নামের নিম্নস্তরবাসী। সাহাবা কিরাম (রা.) আবার আরয করেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ্ (সা.) কোন ব্যক্তি ব্যতীত? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যারা অপচয়কারী, তারা জাহান্নামের নিম্নস্তরবাসী। সাহাবা কিরাম (রা.) আরয করেন, "ইয়া নাবীয়াল্লাহ্ (সা.) কোন্ ব্যক্তি ব্যতীত?" এরপর তাঁরা এ আশংকায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, এভাবে হয়তো রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেই থাকবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বলে যাচ্ছেন, যারা অপচয় করে, তারা জাহান্নামের নিম্নস্তরবাসী। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, কিন্তু যে সম্পদ ব্যয় করে। এরূপ তার ডান দিকে, এরূপ তার বামদিকে, এরূপ তার সামনে এবং এরূপ তার পিছনে। তবে তাদের মধ্যে খুবই কম সংখ্যক সম্প্রদায় রয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করে, যা ব্যয় করা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন এবং যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পসছন্দনীয়। তবে তা অতিরিক্তও নয়, কমও নয়, যা অপব্যয়ও নয় কিংবা অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও নয়। আরো বর্ণিত আছে ঃ

আলোচ্য আয়াতসমূহ ঃ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ থেকে وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ পর্যন্ত সূরা বারাআতে যাকাতের বিস্তারিত বর্ণনা অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এরপর যখন সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয়, তখন এসব আয়াত অনুযায়ী খুবই কম আমল করা হয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২৩৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ আয়াত থেকে শুরু করে وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ পর্যন্ত আয়াতগুলো সম্বন্ধে বলেছেন যে, সূরা বারাআত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এসব আয়াতের উপর আমল করা হতো। এরপর যখন সূরা বারাআতে সাদ্কার যাবতীয় নিয়ম ও তথ্য নাযিল হয়, তখন অত্র আয়াতসমূহে উল্লিখিত সাদ্কার আয়াতগুলোর উপর আমল সীমিত হয়ে যায়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(২৭৫) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭৫. যারা সূদ গ্রহণ করে তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় কিয়ামতের দিন দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে, এ শাস্তি এজন্য যে, তারা বলে বেচাকেনা তো সূদের ন্যায়ই অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে আর সে উক্ত উপদেশ অনুযায়ী (সূদ থেকে) বিরত থাকে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় সূদ গ্রহণ করবে তারা হবে দোযখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "যারা সূদ খায়"। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত الربا ও الارباء -এর অর্থ হচ্ছে, কোন বস্তু অতিরিক্ত হওয়া। বলা হয়ে থাকে اربى فلان على فلان অর্থাৎ অমুক অমুককে অতিরিক্ত দিয়েছে। এর থেকে مضارع এর صيغه হবে يربى এবং مصدر হবে ارباء আবার বলা হয়ে থাকে, অতিরিক্তই الربا -কোন বস্তু পূর্বাবস্থা থেকে বেড়ে গেলে বলা হয় ربا الشى অর্থাৎ عَظُمَ এবং مضارع -এর صيغه -তে বলা হয় يربو আর مصدر এ- বলা হয় ربوا পুনরায় উচ্চভূমিকেও الرابية বলা হয়। কেননা, পার্শ্ববর্তী ভূমি থেকে এটা পরিমাণে বৃহৎ ও পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে এটা উঁচুতে অবস্থিত। বলা হয়ে থাকে ربا يربو আর এ থেকে বলা হয়ে থাকে فلان فى رباقومه অর্থাৎ সে তার সম্প্রদায়ে উচ্চ মর্যাদা ও পদের অধিকারী। সুতরাং ربا -এর মূল

হচ্ছে الانافة والزيادة অর্থাৎ অতিরিক্ত ও বেশী হওয়া। আবার বলা হয়ে থাকে اربى فلان অর্থাৎ اناف صيره زائدا অর্থাৎ সে তার নিজকে বেশী মর্যাদাবান করেছে। সূদ গ্রহীতাকে رب বলা হয়। কেননা সুদের দ্বারা সুদখোর তার সম্পদকে খাতকের কাছে দেয়া সম্পদ থেকে বর্তমানে কয়েকগুণ বেশী করে নেয় কিংবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে বর্ধিত সময়ের অজুহাতে সে তার সম্পদকে পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ অধিক বৃদ্ধি করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না (৩ ঃ ১৩০)। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার আমাদের উপরোক্ত তাফসীর গ্রহণ করেছেন।

আর যাঁরা এমত পোষণ করেন তারা হলেন ঃ

৬২৩৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ সূদ সম্বন্ধে বলেন, অন্ধকার যুগে এক ব্যক্তির কাছে যদি অন্য ব্যক্তির করয থাকত এবং সময়মত পরিশোধ করতে না পারতে, খাতক বলত, তোমাকে আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময় বর্ধিত করার জন্যে অতিরিক্ত প্রদান করব। তখন তাকে ঋণ পরিশোধ করার সময় বর্ধিত করে দেয়া হত।

৬২৩৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬২৩৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অন্ধকার যুগে সূদ প্রদানের নিয়ম ছিল, কোন ব্যক্তি কোন বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য প্রদানের শর্তে বিক্রি করত। যদি ক্রেতা ঐসময়ের মধ্যে মূল্য আদায় করতে ব্যর্থ হতো তাকে সময় বর্ধিত করে দেয়া হতো এবং এজন্য তাকে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হতো।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যারা পৃথিবীতে সূদ খায়, তারা আখিরাতের দিন তাদের কবর থেকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়। অর্থাৎ স্পর্শ দ্বারা তাকে শয়তান দুনিয়ায় মোহাভিভূত করে দেয়। অন্য কথায়, শয়তানের স্পর্শে সে পাগল হয়ে যায়।

যারা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২৩৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, যারা পৃথিবীতে সূদ খায় কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা হবে এরূপ।

৬২৩৯. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬২৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তার মধ্যে এরূপ অবস্থা স্বীয় কবর থেকে উঠার সময় কিয়ামতের দিন পরিলক্ষিত হবে।

৬২৪১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামতের দিন সূদখোরকে অস্ত্র ধারণ করার জন্যে বলা হবে। এরপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এবং বলেন, সূদখোরকে যখন কবর থেকে উঠানো হবে, তখন তার মধ্যে এরূপ বিভীষিকাময় অবস্থা পরিদৃষ্ট হবে।

৬২৪২. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটিই কিয়ামতের দিন সূদ-খোরদের চিহ্ন হবে। তাদেরকে এরূপ শয়তান দ্বারা মোহাভিভূত অবস্থায় উঠানো হবে।

৬২৪৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত التخبط –এর অর্থ হচ্ছে التخبل যাকে শয়তানে স্বীয় স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়।

৬৪৪৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, সূদখোরদেরকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠানো হবে যেন তারা শয়তানের স্পর্শের দরুন মোহাভিভূত হয়ে পড়েছে। আলোচ্য আয়াতটি অন্য এক কিরাআত অনুযায়ী এরূপও পঠিত হয়েছে "لَا يَقُوْمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" –।

৬২৪৬. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, যে সূদখোর মরে যায়, তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠানো হবে যেন শয়তানের স্পর্শে সে পাগল।

৬২৪৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন "এখানে من المس –এর দ্বারা من الجنون অর্থ নেয়া হয়েছে অর্থাৎ পাগল।

৬২৪৮. ইব্‌ন যায়দ থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, কিয়ামতের দিনে সংঘটিত অবস্থাসমূহের মধ্যে তাদের একটি উপমা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, সূদখোরদেরকে অন্য লোকদের সাথে কিয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় উঠানো হবে যেন তারা পাগল। তিনি আরো বলেন, অত্র আয়াতাংশ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ –এর অর্থ হতে يتخبله من مسه اياه অর্থাৎ তাকে স্পর্শ দ্বারা মাতাল করে দেয়। এরূপ পরিভাষা থেকে বলা হয়ে থাকে قَدْ مُسَّ الرَّجُلُ وَأُلِقَ অর্থাৎ লোকটিকে স্পর্শ করা হয়েছে এবং তাকে কিছু ধরেছে فَهُوَ مَمْسُوْسٌ وَمَا لُوْقٌ সুতরাং সে স্পর্শকৃত ও ধৃত। এরূপ বলা হয় সাধারণত যখন কারোর উপর কোন কিছুর আছর হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا (অর্থাৎ যারা তাকওয়ার অধিকারী হয়, তাদেরকে যখন শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয়।) (৭ ঃ ২০১)

অনুরূপভাবে প্রসিদ্ধ কবি الاعشى –এর কথাও এখানে উল্লেখ করা যায় ঃ

وَتُصْبِحُ عَنْ غِبِّ السُّرٰى وَكَاَنَّمَا + اَلَمَّ بِهَا مِنْ طَائِفِ الْجِنِّ اَوْ لَقُ

(অর্থাৎ রাত্রি ভ্রমণ অবসানের পর প্রেমিকা ভোরে জাগ্রত হয় এবং মনে হয় যেন জিনদের বিমোহিত কোন স্পর্শ তার উপর উপনীত হয়েছে।)

এখানে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, যদি কেউ নিষিদ্ধ সূদের ব্যবসা করে এবং তা ভক্ষণ না করে, তবেও কি সে এরূপ শাস্তির পাত্র হবে? উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ। কেননা, এ আয়াতে সূদ দ্বারা শুধু সূদ ভক্ষণ করাটাকে অর্থ নেয়া হয়নি। বরং এটার অর্থ হবে সূদের ব্যবহার ও উপভোগ। তবে বিষয়টি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এ আয়াত দ্বারা যখন সূদ হারাম করা হয় তখন তাদের প্রধান খাদ্যই ছিল সূদ থেকে প্রাপ্ত। তাই সূদের বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেবার জন্যে এবং সূদ খোরের বিভীষিকাময় ঘৃণ্য অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করার জন্যেই সূদকে খাদ্য হিসাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ الاية -

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ। (২ ঃ ২৭৮–২৭৯) সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সূদকে প্রতিটি অর্থে হারাম করা হয়েছে। অন্য কথায়, সূদ দেয়া, নেয়া, খাওয়া ও যাবতীয় সূদী কাজ–কারবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হাদীস মুবারকে হারাম করা হয়েছে।

৬২৪৯. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, لَعَنَ اللّٰهُ اٰكِلَ الرِّبٰوا مُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ اِذَا عَلِمُوْا بِهِ - অর্থাৎ সূদখোর, সূদদাতা, সূদী কারবারের লেখক, সাক্ষী ও সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অভিসম্পাত।

আল্লাহ্র বাণী ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সূদখোরকে কিয়ামতের দিন কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠান হবে যেমন কোন ব্যক্তি শয়তান দ্বারা বিমোহিত হয়ে মাতাল অবস্থায় পরিণত হয়। আর এরূপ শোচনীয় অবস্থা ধারণ করার এবং কবর থেকে এরূপ বিভীষিকাময় অবস্থায় উত্থিত হবার কারণ সম্পর্কে বলেন যে, তারা দুনিয়ায় মিথ্যা বলত, অন্যকে ভিত্তিহীন দোষারোপ করত এবং তারা বলত যে, বেচাকেনাকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন তারই ন্যায় হচ্ছে সূদী কাজ–কারবার। বস্তুত অন্ধকার যুগে যারা সূদ খেত তাদের কারোর কাছে যদি কোন অর্থ পাওনা হতো এবং সময় মত আদায় করতে অক্ষম হতো, তখন খাতক বলত যে, সময়ের মধ্যে একটু বর্ধিত করে দাও এবং তার জন্য আমি অতিরিক্ত সম্পদ প্রদান করব। এরপর তাদের দু'জনকে বলা হলো যে, যদি এরূপ করা হয়, তাহলে এটা হবে সূদ যা হালাল নয়। তারা বলল যে, বেচাকেনার প্রথমে আমরা সময় বর্ধিত করি কিংবা পরে মূল্য আদায়ের কালে বর্ধিত করি দুটো অবস্থা একইরূপ। তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের এ কথায় মিথ্যুক বলে ঘোষণা দিলেন এবং বেচাকেনাকে হালাল করলেন ও সূদকে হারাম করলেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ - এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ক্রয়–বিক্রয় ও ব্যবসা–বাণিজ্যে অর্জিত মুনাফা হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। সূদের দ্বারা ঐ সম্পদকে বুঝানো হয়েছে, যা খাতক সময় বর্ধিত করার বিনিময়ে হকদারকে অতিরিক্ত আদায় করে এবং হকদারও সময় বর্ধিত করে দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, সময় বর্ধিত করার কারণে সম্পদ আদায়ের কালে সম্পদে যে অতিরিক্ত পরিমাণ আদায় করা হয়, আর ক্রয়–বিক্রয়ের মাধ্যমে যে অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যায় তা এক রকম নয়। কেননা, আমি এক প্রকার অতিরিক্তকে হারাম করেছি যা সময় বর্ধিত করার কারণে সম্পদ আদায়কালে বর্ধিত হারে আদায় করতে হয় এবং অন্যটি আমি হালাল করেছি যা ক্রয়–বিক্রয়ের সময় ক্রেতা–বিক্রেতাকে তার ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য প্রদান করে থাকে। আর এভাবে সে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ক্রয়–বিক্রয়ের কালে যে অতিরিক্ত সম্পদ পাওয়া যায়, তা সূদের সমতুল্য নয়। কেননা, ক্রয়–বিক্রয়ের কালে অতিরিক্ত অর্জিত সম্পদকে আমি হালাল ঘোষণা করেছি এবং সূদকে আমি হারাম ঘোষণা করেছি। আর আমার ঘোষণাই চূড়ান্ত ঘোষণা। মানুষ আমার বান্দা, তাদের মাঝে আমার ইচ্ছানুযায়ী কানূন জারী করব এবং তাদেরকে তাদের কোন কাজ থেকে স্বীয় ইচ্ছা মুতাবিক দূরে রাখব। আমার এ সিদ্ধান্তে কেউ কোন আপত্তি করার ক্ষমতা রাখে না। আমার হুকুম অমান্য করারও শক্তি–সমর্থ রাখে না। তাদের উপর ফরয হচ্ছে আমার বাধ্যগত থাকা এবং আমার হুকুমের সামনে মাথা নত করা। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "যার কাছে তাঁর প্রতিপালক থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে তা থেকে বিরত রয়েছে।"

ইবন জারীর তারাবী (র.) বলেন, مَوْعِظَةٌ শব্দটি দ্বারা এখানে নসীহত ও ভীতি প্রদর্শন বুঝানো হয়েছে যা কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহে বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আর ঐসব ওয়াদাকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সূদ ভক্ষণ করার জন্যে শাস্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, যার কাছে এরূপ নসীহত আসার পর সূদ ভক্ষণ থেকে বিরত রয়েছে, কৃত আমল পরিত্যাগ করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা না করার সংকল্প করেছে, তার জন্যে বৈধ হবে যা সে নসীহত আসার পূর্বে ও আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে হারাম ঘোষিত হবার পূর্বে সূদ খেয়েছে, নিয়েছে ও উপভোগ করেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে নসীহত আসার মাধ্যমে সূদ হারাম হবার প্রেক্ষিতে তা ভক্ষণ থেকে বান্দার বিরত হবার পর ভবিষ্যতে সূদ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকার তাওফীক প্রদান প্রসঙ্গটি আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাকে ভবিষ্যতে এরূপ ঘৃণ্য কাজ থেকে বিরত রাখবেন এবং এ কাজে তাকে দৃঢ়তা প্রদান করবেন। আর যদি চান তাকে এ ব্যাপারে অপমানিত করবেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَمَنْ عَادَ –এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি সূদ হারাম হবার পর পুনরায় সূদ ভক্ষণ করে এবং সূদ হারাম হবার আদেশপ্রাপ্তির পূর্বে তারা যা বলত পরেও তা–ই বলে যেমন ক্রয়–বিক্রয়ও সূদের মত, তারা জাহান্নামের অধিবাসী এবং তারা সেখানে সর্বদা থাকবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬২৫০. সূদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, উক্ত আয়াতাংশে উল্লিখিত مَوْعِظَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কুরআনুল করীম। আর فله ما سلف – এর অর্থ হচ্ছে সূদের মাল যা সে খেয়েছে।

(٢٧٦) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ؕ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○

২৭৬. আল্লাহ্ পাক সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভাল বাসেন না।

ইমাম. ইব্ন জারীর তাবারী (র.) অত্র আয়াত يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبٰو وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ–এর তাফসীর সম্বন্ধে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত يمحق الله الربوا এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা সূদকে হ্রাস করে দেন, তাই তা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেন ঃ

৬২৫১. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبٰوا–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত يمحق শব্দের অর্থ হচ্ছে ينقص অর্থাৎ হ্রাস করে দেয়।

৬২৫২. অনুরূপ বর্ণনা আবুদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন, সূদ যদিও বাহ্যত বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হয়, কিন্তু তা পরিণামে হ্রাস পেয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন, অত্র আয়াতাংশ ويربوا الصدقات–এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাদ্কা দানকারীকে তার সাদ্কার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন এবং তাকে অধিক সাদ্কা করার তাওফীক দান করেন।

তিনি আরো বলেন, আমরা الربوا শব্দের অর্থ নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং তার মূল উৎস নিয়েও আলোচনা করেছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এখানে প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কি ভাবে সাদ্কাকে বৃদ্ধি করে দেন? উত্তরে বলা যায় যে, সাদ্কাকারীকে তার প্রতিদান বৃদ্ধি করে দেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ - অর্থাৎ যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত একটি শস্যবীজ যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা।" (২ ঃ ২৬১) অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا

অর্থাৎ কে সে, যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। (২ ঃ ২৪৫)

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৬২৫৩. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ সাদ্কা কবুল করেন, তা তিনি স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন। তিনি এটাকে তোমাদের কারোর জন্যে প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ স্বীয় অশ্বশাবককে প্রতিপালন করে থাকে। তারপর সাদকাকৃত সম্পদের এক গ্রাস খাদ্য উহুদ পর্বতের ন্যায় বৃহৎ আকার ধারণ করবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. অর্থাৎ তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদ্কা গ্রহণ করেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯ ঃ ১০৪) আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারায় ইরশাদ করেন ঃ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ - অর্থাৎ আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। (২ ঃ ২৭৬)

৬২৫৪. আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ তা'আলা সাদ্কা কবুল করেন আর তিনি শুধু উত্তম বস্তু কবুল করেন।

৬২৫৫. আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সাদ্কা কবুল করেন এবং তিনি শুধু উত্তম বস্তুই কবুল করেন। তিনি সাদ্কাদাতার জন্যে সাদ্কাকে প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ স্বীয় অশ্বশাবককে প্রতিপালন করে। তারপর সাদকার এক গ্রাস খাদ্য উহুদ পর্বতের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে। এ অমিয় বাণীর সত্যতা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ঃ বাকারায় ইরশাদ করেন ঃ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ - অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সূদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং সাদ্কাকে বর্ধিত করে দেন। (২ ঃ ২৭৬)

৬২৫৬. আবূ হুরায়রা (রা.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার কোন বান্দা যখন উত্তম বস্তু দান করে, তখন আল্লাহ্ স্বীয় বান্দা থেকে তা কবুল করেন এবং তা স্বীয় ডান হাতেই গ্রহণ করেন। এরপর এটাকে প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ স্বীয় অশ্বশাবক কিংবা পরিবার সদস্যকে প্রতিপালন করে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি এক গ্রাস পরিমাণ খাবার দান করে, তখন তা আল্লাহ্ তা'আলার হাতে কিংবা হাতের তালুতে প্রতিপালিত হয়ে বাড়তে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ কর্তৃত্বে ও হিফাযতে উক্ত দান প্রতিপালিত হয়ে বাড়তে থাকে। তারপর এটা উহুদ পর্বতের ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে। সুতরাং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ তোমরা সাদ্কা প্রদান কর।

৬২৫৭. আবূ হুরায়রা(রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ডান হাত দ্বারা সাদ্কা গ্রহণ করে থাকেন এবং তিনি শুধু উত্তম বস্তুই গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কারোর এক গ্রাস পরিমাণ সাদ্কাকেও বড় আকার ধারণ করবার উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করেন, যেমন তোমরা কেউ তোমাদের অশ্বশাবককে যত্ন সহকারে প্রতিপালন করে থাক। কিয়ামতের দিন এক গ্রাস পরিমাণ সাদ্কা পরিপূর্ণতা অর্জন করবে এমনকি এটা তখন উহুদ পর্বতের চেয়েও বৃহৎ আকার ধারণ করবে।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াতাংশ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ – এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে ভালবাসেন না, যে বার বার স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কুফরী

করে এবং কুফরীর উপর স্থায়ী থাকে ও সূদ নেয়া–দেয়াকে হালাল মনে করে, আর সে সূদ ভক্ষণের ন্যায় কার্যাবলী ও পাপের কাজে মগ্ন থাকে। পাপের কাজ থেকে বিরত থাকে না এবং কাউকে তা থেকে নিষেধ করে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবের আয়াতসমূহে যে নসীহত করেছেন সেই সব নসীহতের প্রতি কর্ণপাত করে না।

(২৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৭. যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকার্য করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহ্ পাক এবং আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল থেকে সূদ দেয়া–নেয়া হারাম ঘোষণার ন্যায় শরীআতের যাবতীয় আহ্কামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত যাবতীয় ফরয ও নফল নেক কাজসমূহ আঞ্জাম দেয়, ফরয সালাতসমূহ কায়েম করে এবং সময় মত যাবতীয় ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব সহকারে আদায় করে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে নসীহত আসার পূর্ব পর্যন্ত সূদ দেয়া–নেয়ার পাপকার্যে লিপ্ত থাকার পর তাওবা করে, স্বীয় সম্পদের ফরয যাকাত আদায় করে, তাদের এ সব ঈমান, সাদ্কা ও আমলের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন দিনে তাদের প্রতিদান রয়েছে, যেদিন তারা এগুলোর ছওয়াবের প্রতি অত্যধিক প্রয়োজনবোধ করবে। সেদিন তাদের ঐ সব পাপ কাজের শাস্তির ভয় নেই, যা তারা অন্ধকার যুগে করেছে। তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে নসীহত আসার পূর্বে তারা কুফরীর আশ্রয় নিয়েছে এবং সূদ হারাম হওয়ার পূর্বে তারা সূদী সম্পদ ভোগ করেছে। কেননা, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নসীহত আসার পর আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের প্রতি মনোযোগ দিয়েছে, তাওবা করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ছওয়াব ও শাস্তির শুভ সংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের প্রতি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সূদ ভক্ষণের ন্যায় দুনিয়ায় অন্যান্য মন্দকাজ পরিত্যাগের জন্যে তারা দুঃখিত হবে না, যখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সংরক্ষিত মহা পুরস্কার অবলোকন করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এসব পাপ কাজ পরিত্যাগ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষিত মহা পুরস্কার তারা প্রাপ্ত হবেই।

(২৭৮) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

২৭৮. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।

(২৭৯) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

২৭৯. যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রেখ যে, এটা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এটাতে তোমরা অত্যাচার করবে না। অথবা অত্যাচারিত হবে না।

আল্লামা আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, প্রথমোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, হে মু'মিনগণ! যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশকে পালন কর এবং নিষেধ কাজ হতে বিরত রাখ, এভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে আল্লাহ্কে ভয় কর। আর যদি তোমরা তোমাদের ঈমান ও ঈমান অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ হও, তাহলে সূদ হারাম ঘোষিত হবার পূর্বে তোমাদের মূলধনের উপর সূদ হিসাবে যে অধিক সম্পদ তোমরা তোমাদের খাতকদের কাছে পাওনা রয়েছ, তা তাদেরকে ছেড়ে দাও, তাদের থেকে তা দাবী কর না।

এরূপও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি এমন এক সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা মুসলমান হয়েছে কিন্তু মুসলমান হবার পূর্বে তারা সূদের কারবারে অনেক অর্থ অর্জন করত। মুসলমান হবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল হবার পূর্বের সূদের অর্থের পাপ ক্ষমা করে দেন এবং যা বকেয়া রয়েছে তা হারাম ঘোষণা করেন।

উপরোক্ত অভিমত যে সব ব্যাখ্যাকারী সমর্থন করেন, তাঁরা তাঁদের দলীল হিসাবে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন।

৬২৫৮. সূদ্দী (র.) বর্ণনা করেন। তিনি এ আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا ...... لَا تُظْلَمُوْنَ -এর শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, এ আয়াত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) এবং বনী মুগীরার অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্ধকার যুগে তাঁরা দু'জনে অংশীদারী কারবার করতেন। বনী আমরের শাখা সম্প্রদায় ছকীফের কিছু সংখ্যক লোকের সাথেও তারা সূদী কারবার করতেন। ইসলামের শুভাগমনের পর দেখা যায় তাদের সূদী কারবারে বিপুল অর্থ জমা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ
يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং অন্ধকার যুগে লগ্নিকৃত অতিরিক্ত তথা সূদী অর্থ যা বকেয়া রয়েছে তা তোমরা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে মু'মিন হও।

৬২৫৯. ইব্ন জুরাইজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -এর শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, ছাকীফ সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর সাথে সন্ধি করে যে, মানুষের কাছে তাদের যে সূদী অর্থ পাওনা রয়েছে এবং তাদের কাছে মানুষের যে সূদী অর্থ দেনা রয়েছে সবই রহিত বলে গণ্য করা গেল। এরপর মক্কা বিজয় ঘটে এবং ইতাব ইব্ন উসায়দ (রা.)-কে মক্কার গভর্নর করা হয়। বনূ আমর ইব্ন উমায়র ইবন আওফ বনী আলমুগীরা থেকে সূদ আদায় করত এবং বনূ আল-মুগীরা জাহিলিয়া যুগে তাদের সাথে সূদী কারবার করত। ইসলামের

আবির্ভাবের পর দেখা যায়, বনূ আমর বনী আল–মুগীরার কাছে এরূপ সূদী বিপুল অর্থ পাওনাদার। বনূ আমর তাদের পাওনা দাবী করে। কিন্তু বনী আল–মুগীরা ইসলামী যুগে জাহিলিয়া যুগের সূদী অর্থ আদায়ে অস্বীকৃতি জানায় এবং গভর্নর ইতাব ইব্‌ন উসায়দ (রা.) –এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। ইতাব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে উপদেশ প্রার্থনা করে পত্র লিখেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .... لَاتُظْلَمُوْنَ- রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াত সহকারে ইতাব (রা.)–এর পত্রোত্তর দেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন, "যদি তারা রাযী হয়ে যায় তাহলে ভাল কথা, নচেৎ তাদেরকে যুদ্ধের কথা জনিয়ে দাও।"

ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اِتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যারা বনী আল–মুগীরা থেকে সূদ আদায় করত। তারা ছিল বনূ আমর ইব্‌ন উমায়রের মাসুদ, আবদে ইয়ালীল, হাবীব, রাবীআহ ও অন্যান্য। তবে তাদের মধ্যে আবাদ ইয়ালীল, হাবীব, রাবীআহ, হিলাল ও মাসউদ মুসলমান হয়ে যান।

৬২৬০. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত اِتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ –এর শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, অন্ধকার যুগে সূদী কারবার চালু ছিল। ইসলামের শুভাগমনের পর জনগণ ইসলাম কবুল করলে তাদেরকে সূদ বাদে শুধু মূলধন আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ-–এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, যদি তারা অতীতের বকেয়া সূদ ছেড়ে না দেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)–এর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো।

তিনি আরো বলেন, فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ- –এর পঠনরীতিতে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মদীনাবাসী সাধারণ কারীগণ فَاْذَنُوْا শব্দে অবস্থিত الف-কে قصر বা হ্রস্ব করে পড়ে থাকেন এবং ذال –এর উপর যবর দিয়ে পাঠ করেন। তখন এ শব্দটির অর্থ হবে كونوا على علم واذن তোমরা জেনে নাও এবং অবগত হও। কূফাবাসী সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ فاذنوا শব্দে অবস্থিত الف–কে দীর্ঘায়িত করে পড়েন এবং ذال-কে যবর দিয়ে পাঠ করেন। তখন এ শব্দটির অর্থ হবে তোমাদের ব্যতীত অন্যদেরকে জানিয়ে দাও এবং সংবাদ দাও যে, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী আরো বলেন, "এদুটো পঠনরীতির মধ্যে যাঁরা الف –কে قصر বা হ্রস্ব করে এবং ذال –কে যবর দিয়ে পড়েন, তাঁদের পঠন পদ্ধতি অধিকতর শুদ্ধ। তখন এ শব্দটির অর্থ হবে, তোমরা এটা জেনে নাও, এটাকে সুদৃঢ়ভাবে জেনে নাও এবং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অনুমতি দেয়া হয়েছে। উল্লিখিত অভিমতটিকে শুদ্ধতর বলে আমাদের গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সা.)–কে আদেশ করেছেন যেন তিনি ঐ ব্যক্তি থেকে বিরত থাকেন, যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অন্যকে অংশীদার করছে অথচ সে এরূপ কাজে সুদৃঢ় নয়।

আবার তাঁকে আদেশ করেছেন যেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর যে তা পরিত্যাগ করেছে তার সাথে যে কোন অবস্থায় যুদ্ধ করেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামে প্রত্যাবর্তন না করে। মুশরিকরা নবী (সা.)-কে অবহিত করেছে যে, তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে কিংবা তারা তাঁকে অবহিত করেনি। সুতরাং যুদ্ধের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুটো অবস্থার যে কোন একটির সাথে জাড়িত। সে হয়তো হবে মুশরিক, শিরক ইখতিয়ার করছে কিন্তু শিরকের উপর সুদৃঢ় নয়, কিংবা সে ছিল মুসলমান, এরপর সে ধর্মচ্যুত হয়ে যায় এবং যুদ্ধ করার অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। এ দুটো অবস্থার যে কোনটিই হোক না কেন, এটা সত্য যে, নবী (সা.) -এর প্রতি যুদ্ধকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা নয় যে, তিনি তার ইচ্ছা করেন তাই তাঁকে এটার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যদি তাকে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হতো, তাহলে সূদকে হালাল মনে করে ভক্ষণকারীর উপর তিনি তা অবশ্যই প্রয়োগ করতেন, অথচ মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি; কিংবা এযুদ্ধ করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি। উপরোক্ত দুটো অবস্থার কোনটিতে এরূপ আদেশ দেয়া হয়নি। সুতরাং জানা গেল, রাসূলুল্লাহ্‌কে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি যুদ্ধের হুকুমদাতা ছিলেন না।

আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার সমর্থন করেছেন এবং তাঁদের দলীল হিসাবে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন ঃ

৬২৬১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا إِلَى قَوْلِهِ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের মর্ম হলো, যে ব্যক্তি সূদী কারবার করে আসছে, এটা থেকে বিরত থাকছে না, মুসলমানদের পরিচালকের উপর কর্তব্য হলো তাকে অনুশোচনা করতে বলা। যদি সে অনুশোচনা করে ও সূদী লেনদেন থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা উত্তম, নচেৎ তাকে হত্যা করতে হবে।

৬২৬২. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন সূদখোরকে অস্ত্র ধারণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে।

৬২৬৩. অপর এক সনদেও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬২৬৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ - -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধের ভয় প্রদর্শন করেছেন যেমন তোমরা শুনছ। সুতরাং তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যায়, সেখানেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অথর্ব বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

৬২৬৫. অপর সূত্রেও কাতাদা (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬২৬৬. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ - -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, সুতরাং তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সঠিক সংবাদ জানিয়ে দাও।

৬২৬৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি - فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এর অর্থ - فَاسْتَيْقِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ (তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, এটা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ)।

আল্লামা ইবন জারীর তাবারী (রা.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, অত্র আয়াতাংশ فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -এর ভাবার্থ হচ্ছে, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যুদ্ধের হুমকি রয়েছে। এতে তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়নি যে, তারা অন্যদেরকে এ সংবাদ দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যাঃ

আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই এ তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার কর না আর কারো দ্বারা অত্যাচারিত হওনা।)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, যদি তোমরা তাওবা কর, সূদ খাওয়া ছেড়ে দাও এবং আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তাহলে তোমরা মানুষের কাছে যা পাওনা আছ, তার মূলধন তোমাদের জন্য বৈধ। তবে যা তোমরা সূদ ধার্যের মাধ্যমে মূলধনের সাথে সূদী সম্পদ যোগ করেছ, তা তোমাদের জন্য অবৈধ। উল্লিখিত তাফসীর যে সব ব্যাখ্যাকারী সমর্থন করেছেন, তাঁদের দলীল হিসাবে তাঁরা নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেন ও বলেন ঃ

৬২৬৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত মূলধনের স্বরূপ বর্ণনার্থে বলা হয়, যে সম্পদ তারা অন্যের কাছে পাওনা আছে, তা তাদের মূলধন হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং এ আয়াত অবতীর্ণ করে তা গ্রহণ করা তাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে। তবে যা অতিরিক্ত কিংবা বাহ্যত মুনাফা হিসাবে তাদের কাছে গণ্য ঐ সম্পদ তাদের নয় এবং তা থেকে কিছুই গ্রহণ করা তাদের জন্যে বৈধ নয়।

৬২৬৯. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ -এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, অত্র আয়াতাংশের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রাপ্য সূদী অর্থকে রহিত করে দিয়েছেন এবং শুধুমাত্র মূলধন গ্রহণ করাকে বৈধ করেছেন।

৬২৭০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে প্রদত্ত ঋণের মূলধনকে গ্রহণ করা তাদের জন্যে বৈধ করা হয়েছে । কিন্তু এর অতিরিক্ত কোন কিছু নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি।

৬২৭১. আস-সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা যে মূলধন দিয়েছিলে তা পুনরায় গ্রহণ করা বৈধ করা হয়েছে এবং সূদকে রহিত করা হয়েছে।

৬২৭২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন প্রদত্ত নিজ খুতবায় বলেছেন, "সাবধান! অন্ধকার যুগের সম্পূর্ণ সূদকে আজ রহিত করা হলো। সর্ব প্রথম যে সূদ আমি রহিত বলে ঘোষণা করছি তা হচ্ছে আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.)-এর সূদ।

৬২৭৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত খুতবায় বলেছেন, সমস্ত সূদ রহিত করা হলো এবং সর্ব প্রথম আব্বাস (রা.)-এর সূদ রহিত বলে ঘোষণা করা হলো।

পরবর্তী আয়াতাংশ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা তোমাদের খাতকদের কাছে যে সম্পদ ঋণ হিসাবে দিয়েছিলে তা ফেরত গ্রহণের বেলায় তাদের প্রতি জুলুম করবে

না, তার থেকে অতিরিক্ত নেবে না যে অতিরিক্ত তোমরা সময় বর্ধিত করার জন্যে তাদের উপর ধার্য করেছিলে। সুতরাং তোমরা তাদের উপর জুলুম না করে শুধুমাত্র মূলধন গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত যা সূদ হিসাবে গণ্য তাদের থেকে গ্রহণ করবে না। আর খাতকরাও তোমাদেরকে বর্ধিত পরিমাণ ধার্য করার পূর্বে যে মূলধন ছিল তা ফেরত দেবার সময় কম দিয়ে তোমাদের প্রতি জুলুম করবে না। তবে তারা মূলধনের অতিরিক্ত না দেয়াতে তোমাদের উপর জুলুম করা হবে না। কেননা, এ অতিরিক্ত সম্পদ তোমাদের জন্য নেয়া বৈধ নয়। আর এর মধ্যে তোমাদের কোন অধিকার নেই। কাজেই তারা তোমাদের অধিকার খর্ব করছে না ও জুলুম করছে না।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের উপরোক্ত তাফসীর অনুযায়ী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)–ও বলতেন। আর আমাদের এ ব্যাখ্যা পরবর্তী ব্যাখ্যাকারীরাও সমর্থন করেছেন। ব্যাখ্যাকারীরা তাঁদের সমর্থনের দলীল হিসাবে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ উপস্থাপন করেন ঃ

৬২৭৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লেখিত لَاتَظْلِمُوْنَ –এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা সূদ আদায় করবে না। আর وَلَا تُظْلَمُوْنَ –এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদেরকে কম দেয়া হবে না।

৬২৭৫. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে, তোমাদেরকে তোমাদের সম্পদ কম দেয়া হবে না এবং তোমারাও অসঙ্গতভাবে বাতিল পন্থায় তাদের থেকে অতিরিক্ত সম্পদ আদায় করবে না।

(٢٨٠) وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ط وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৮০. যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয় আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তাবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা তা জানতে।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী (রা.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন, যে সব খাতক থেকে তোমরা তোমাদের সম্পদ ফেরত নেবে যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয় ও বর্ধিত সময়ের জন্য সূদ ধার্য করার পূর্বে দেয়া মূলধন আদায় করতে অপারগ হয়।, তাহলে তাদেরকে তাদের সচ্ছলতা পর্যন্ত আদায়ের সময় প্রদান কর।

তিনি আরো বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত ذُوْعُسْرَةٍ শব্দটি كان –এর اسم হওয়ার কারণে حالت رفعى-তে আছে। তাবে كان -এর خبر –কে متروك ধরা হয়েছে। আর এ তথ্যের প্রতি আমি পূর্বেও ইংগিত করেছি। كان –এর خبر –কে ترك করা এজন্য সঙ্গত হয়েছে যে, আরবরা نكره –এর خبر –কে সাধারণত ضمير নিয়ে থাকে । তবে এখানে যদি كان -কে كان تا ধরা হয়, তাহলে خبر -কে متروك ধরার কোন প্রয়োজন হয় না এবং كان تام ধরাটা শুদ্ধ বলে পরিগণিত। তখন আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপঃ যদি তোমাদের খাতকদের মধ্যে কাউকে অভাবগ্রস্ত পাওয়া যায়, তাহলে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

৬২৭৬. উবায় ইব্ন কা'ব (রা.)–এর পঠন পদ্ধতিতে উল্লেখ করা হয়েছে- وَاِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ অর্থাৎ وَاِنْ كَانَ الْغَرِيْمُ ذَا عُسْرَةٍ অর্থাৎ যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বাঞ্ছনীয়। এই কিরাআত অনুযায়ী অর্থের দিক দিয়ে যদিও বাক্য শুদ্ধ, তবুও এ কিরাআতকে বিশুদ্ধ বলে ধরে নেয়া যায় না, কেননা তা মাসহাফে উছমানীর পরিপন্থী।

আল্লাহ্ পাকের বাণী فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ-এর ব্যাখ্যাঃ

তোমরা ঐরূপ খাতককে তার সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলাইরশাদ করেন فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ الخ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে সিয়াম কিংবা সাদ্কা অথবা কুরবানী দ্বারা এর ফিদ্য়া দেবে। (২ ঃ ১৯৬) এ ধরনের অন্যান্য জায়গায় حالت رفعى হবার কারণ সম্পর্কে আমি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি; পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত مَيْسَرَةٌ শব্দটি مَفْعَلَةٌ-এর পরিমাপে এসেছে এবং তা يُسْرٌ শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে যেমন مرحمة ও مشافة যথাক্রমে رحم ও شوم থেকে নির্গত হয়েছে। আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমাদের খাতকদের মধ্যে কেউ অভাবগ্রস্ত হয়, তোমাদের পাওনা সময় মত পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে তার সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া তোমাদের জন্যে বাঞ্ছনীয়।

৬২৭৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশ সূদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

৬২৭৮. মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সাথে আমানত আদায়ের ব্যাপারে ঝগড়া করে –এর মক্কার গভর্নর কাছে বিচারের জন্য হাযির হন। তিনি বিচারের রায় প্রদান করেন এবং খাতককে অবরোধ করার নির্দেশ দেন। লোকটি গভর্নরকে বলল যে, সে অভাবগ্রস্ত, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে ইরশাদ করেছেন وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ তখন গর্ভনর বললেন, অত্র আয়াতাংশে সূদ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ অর্থাৎ আমানত তার হকদারকে প্রত্যপর্ণ করতে আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়–পরায়ণতার সাথে বিচার করবে (৪ ঃ ৫৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন কোন বস্তু সম্বন্ধে আদেশ করেন না, যার জন্যে আমাদেরকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করবেন।

৬২৭৯. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি- وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ–এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এ আয়াতাংশ সূদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬২৮০. রবী' ইব্ন খায়সাম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ পাওনা ছিলেন। তাই তিনি খাতকের বাড়ী এসে দরজায় দন্ডায়মান হয়ে বলতেন, "হে অমুক ! যদি তোমার

সামর্থ থাকে, তাহলে ঋণ পরিশোধ কর। আর যদি তুমি অভাবগ্রস্ত হয়ে থাক, তাহলে সচ্ছলতা পর্যন্ত তোমার জন্যে অবকাশ দেয়া হলো।

৬২৮১. মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন,একদিন এক ব্যক্তি মক্কার গভর্নর শুরাহবিল (রা.)–এর কাছে এসে কথা বলেন এবং বলতে থাকেন যে, সে অভাবগ্রস্ত, সে অভাবগ্রস্ত। মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন আরো বলেন, আমি ধারণা করতে পেরেছিলাম যে, তিনি একজন অবরুদ্ধ লোক সম্পর্কে কথা বলছিলেন। তখন শুরাহবিল (রা.) বলেন, আনসারদের অত্র এলাকার লোকদের মধ্যে সূদের প্রচলন ছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ – । পক্ষান্তরে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন একটা কাজ করার নির্দেশ দেন না যার জন্যে পুনরায় তিনি আমাদেরকে আযাব দিবেন। কাজেই তোমরা আমানতের হকদারের কাছে আমানত প্রত্যর্পণ কর।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ –এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, "আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে সচ্ছলতা পর্যন্ত মূলধন আদায়ে অবকাশ প্রদান কর।"

৬২৮৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি - وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশের মাধ্যমে সূদ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বাঞ্ছনীয়। তবে অবকাশ আমানত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, আমানত তাৎক্ষণিকভাবে হকদারকে আদায় করতেই হবে।

৬২৮৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি - وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مَيْسَرَةٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে সচ্ছলতা। অন্য কথায়, সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত মূলধন আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

৬২৮৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি - وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে সূদ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৬২৮৬. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি - وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশ সূদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্ধকার যুগের লোকেরা সূদী কারবার করত। এরপর যারা মুসলমান হলেন, তাদেরকে শুধুমাত্র মূলধন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হলো।

৬২৮৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি - وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ميسرة শব্দের অর্থ হচ্ছে, المطلوب অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত খাতককে প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

৬২৮৮. আবূ জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি - وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مَيْسَرَةٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে الموت অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত অভাবগ্রস্ত খাতককে অবকাশ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

৬২৮৯. মুহাম্মাদ ইবন আলী (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

৬২৮৯/১ ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশ সূদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬২৯০. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহের ব্যাপারে الى ميسرة -এর শর্তকে الى الموت কিংবা الى الفرقة দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ ميسرة পর্যন্ত বিবাহ করার অবকাশ দেয়া হয়েছে। আর ميسرة অর্থ মৃত্যু কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ।

৬২৯১—৬২৯২. ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াত সূদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬২৯৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশের মর্ম হচ্ছে, অভাবগ্রস্ত খাতককে সময় বর্ধিত করা হবে। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে না। অথচ তখনকার নিয়ম ছিল যখন কারো ঋণ আদায়ের সময় হতো কিন্তু সে তা আদায় করতে অক্ষম হতো তখন তার জন্যে সময় বর্ধিত করা হতো এবং এজন্য তাকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হতো।

৬২৯৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশের মর্ম হচ্ছে, তার জন্যে সময় বর্ধিত করা হবে কিন্তু তজ্জন্য অতিরিক্ত অর্থ তাকে দিতে হবে না।

আবার অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সময় বর্ধিত করা ও অতিরিক্ত অর্থ না দেয়ার বিধানটি সর্ব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে কোন উপায়ে হোক, যদি কেউ কারোর কাছে কোন অর্থ পাওনা থাকে, বৈধ পন্থায় হোক কিংবা অবৈধ পন্থায় হোক, সময় মত পরিশোধ না করতে পারলে সময় দিতে হবে। কিন্তু সেজন্য কোন প্রকার অতিরিক্ত অর্থ দেয়ার নিয়ম নেই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬২৯৫. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ - -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অনুরূপভাবে প্রতিটি ঋণের ব্যাপারে কোন একজন মুসলিম তার অন্য অভাবগ্রস্ত মুসলিম ভাইয়ের উপর ঋণ আদায়ের জন্যে চাপ প্রয়োগ করতে পারেন না এবং তাকে ঋণ সময় মত আদায় না করায় বন্দী করতে পারেন না। এমনকি তার সচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত ঋণ দাবী করতে পারেন না। আলোচ্য আয়াতাংশে হালাল মূলধন আদায়ের ক্ষেত্রে অবকাশ দেয়ার কথা বলায় সর্বপ্রকার ঋণও এ বিধানের আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে।

৬২৯৬. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশটি ঋণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ -এর দ্বারা ঐসব ঋণদাতা ও খাতককে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে মুসলমান

হয়েছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগে তারা ছিলেন ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতা। মোটা অংকের সূদ সহকারে ছিল তাদের এই কারবার। যখন তারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন ঋণের টাকা পুরাপুরি আদায় হয়নি। তাদের মুসলমান হবার পর তাঁদের বকেয়া সূদকে আল্লাহ্ তা'আলা রহিত ঘোষণা করেন এবং শুধু মূলধন আদায় করার অনুমতি দেন যদি গ্রহীতা ঋণ আদায় করতে সামর্থ রাখে। তাদের মধ্যে যারা সময় মত ঋণ আদায় করার উপযোগী সম্পদের মালিক নন অন্য কথায় অভাবগ্রস্ত হন, তাদেরকে তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার বিধান প্রবর্তিত হয়। এরূপ নির্দেশ ছিল ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যিনি মুসলমান হয়েছিলেন এবং তার ছিল সূদী খাতক। কেননা, ইসলাম খাতকের ঐ ঋণকে রহিত করে দেয় যা সূদ প্রবর্তনের দরুন তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই শুধু মূলধন আদায় করারই তার ক্ষেত্রে হুকুম দেয়া হয়েছিল যা সে ঋণদাতা থেকে গ্রহণ করেছিল কিংবা নতুন সূদ আরোপ করার পূর্বে খাতকের পক্ষে আদায় করার বিধান ছিল। তবে শর্ত হলো তাকে সচ্ছল হতে হবে। যদি সে অসচ্ছল হয়। তাহলে সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে তাও আবার শুধুমাত্র মূলধন আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর মূলধনের অতিরিক্ত সূদী অর্থ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে যদিও আয়াতটি ঐসব লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, যাদের কথা আমি বর্ণনা করলাম এবং তাদের অসচ্ছল ঋণ গ্রহীতাকে সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত মূলধন আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ দেয়ার বিধান স্থির করা হলো কিন্তু সূদ প্রথা বাতিল হবার পর প্রতিটি ঋণ জাতীয় লেনদেনের ব্যাপারেও সচ্ছলতার বিধানটি প্রবর্তন করা হলো। অন্য কথায়, যে অন্য ব্যক্তির কাছে ঋণী ও ঋণ আদায়ের নির্ধারিত সময় সমাগত কিন্তু তার অসচ্ছলতার জন্যে আদায় করতে অপারগ, তখন তাকে সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়ার বিধান রয়েছে। কেননা, প্রতিটি ঋণদাতার ঋণ খাতকের সম্পদে বিরাজমান এবং তা থেকে ঋণদাতার ঋণ আদায় করা খাতকের দায়িত্বে অর্পিত। কিন্তু ঋণ তার প্রাণের বিনিময় নয়। সুতরাং যখন তার সম্পদ থাকবে না, তখন তার প্রাণকে বন্দী করে বা বিক্রি করে ঋণ আদায়ের কোন পন্থাই সঠিকভাবে বিবেচিত নয়। এটা এজন্য যে, ঋণদাতার ঋণ তিনটি সম্ভাব্য অবস্থার যেকোন একটিতে অবশ্যই বিরাজমান থাকতে হবে। প্রথমত হয়ত এটা খাতকের প্রাণের বিনিময়ে হবে, দ্বিতীয়ত হয়ত তা আদায় করা তার দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে। পরিণামে সে তার অন্য সম্পদ থেকে তা আদায় করবে। তৃতীয়ত হয়ত ঋণটি সঠিকভাবে তার সম্পদেই বিদ্যমান থাকবে। যদি ঋণটি সঠিক ভাবে তার সম্পদের মধ্যে বিরাজমান মনে করা হয়, তাহলে যখন তার সম্পদ বিলোপ হয়ে যায়, তখন ঋণদাতার ঋণও এর সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এরূপ অভিমত কেউ পেশ করেননি। অন্য একটি সম্ভাবনা হচ্ছে ঋণ গ্রহীতার প্রাণের বিনিময়ের সাথে সম্পৃক্ত। যদি তা-ই হয়, তাহলে যখন সে মারা যায়, তখন ঋণ গ্রহীতার ঋণ অবশ্যই বাতিল বলে ঘোষিত হতে হবে, যদিও ঋণগ্রহীতা সেই ঋণের পরিমাণ কিংবা তার থেকে অধিক সম্পদ ছেড়ে যায়। এরূপ অভিমত, কেউ পেশ করেননি। একথা সুস্পষ্ট যে, যখন এ দুটো সম্ভাবনাই কারো অভিমত নয়, যখন তৃতীয় সম্ভাবনাই কার্যকর তথা ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায়ের দায়িত্ব বহন করে। তাই সে তার সম্পদ থেকে ঋণ অবশ্যই আদায় করবে। যখন তার হাতে সম্পদ থাকবে না, তখন তার দায়িত্বে ঋণ আদায়ের বিষয়টি চাপিয়ে দেবার কোন পন্থা থাকে না। কেননা, যে সম্পদ দ্বারা সে ঋণ আদায় করবে তা তার এখন হাতে নেই। কাজেই এখন তাকে বন্দী করে ঋণ আদায়ের চেষ্টাও তখন ফলপ্রসূ চেষ্টা নয়। কেননা, সে ইচ্ছাকৃত ঋণ আদায়ের ব্যাপারে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না। যদি তা-ই হতো তাহলে হয়ত তার এজুলুমের জন্য তাকে বন্দী করে শাস্তি প্রদান করে ঋণ আদায়ের কোন একটা পন্থা উদ্ভাবন করা যেত।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমরা এ অসচ্ছল খাতককে মূলধন আদায়ের দায়মুক্ত করার লক্ষ্যে তাকে ঋণের পুরো অর্থটাই সাদ্‌কা করে দাও, তাহলে এটি সচ্ছলতা ফিরে আসার কাল পর্যন্ত ঋণ আদায়ের অবকাশ মঞ্জুর করা থেকেও শ্রেয় হবে। যদি তোমরা জান যে, সাদ্‌কার কিরূপ ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে বিশেষ করে যারা অভাবগ্রস্ত খাতকের ঋণ মাফ করে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যে কতই না ছওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

তবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায়ও তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন ঃ

তাদের কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, তোমরা যদি অসচ্ছল কিংবা সচ্ছল খাতককে মূলধনের অর্থ মাফ করে দাও, তবে তা উত্তম।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬২৯৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে বলা হয়েছে, তারা যে সম্পদ অন্যের কাছে দাবী করতে পারবে তা হচ্ছে, তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন মাত্র। আর মুনাফা কিংবা অতিরিক্ত সম্পদের মধ্যে তাদের কোন অধিকার নেই। তাই তা থেকে তাদের কোন কিছু নেয়াও সঙ্গত নয়। তাছাড়া, অত্র আয়াতাংশ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, যদি তোমরা মূলধন সাদকা করে দাও, তাহলে এটা হবেউত্তম।

৬২৯৮. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা মূলধন সাদ্‌কা কর। তবে তা তোমাদের জন্য হবে উত্তম।

৬২৯৯. ইব্‌রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যদি তোমরা তোমাদের মূলধন সাদ্‌কা কর, তাহলে তা হবে উত্তম।

৬৩০০. ইব্‌রাহীম (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬৩০১. ইব্‌রাহীম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা তোমাদের মূলধন সাদ্‌কা করে দাও, তাহলে এটা হবে উত্তম।

আবার কেউ কেউ বলেন, অত্র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা অভাবগ্রস্ত খাতককে মূলধন সাদ্‌কা কর, তাহলে তা হবে উত্তম। এরূপ অভিমত পোষণকারীদের দলীল হিসাবে নিম্নের হাদীসসমূহ উত্থাপন করা হলো ঃ

৬৩০২. আস্–সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা তোমাদের অভাবগ্রস্ত খাতককে তোমাদের মূলধন সাদকা কর, তাহলে তা হবে উত্তম। অত্র আয়াতাংশের মর্মানুযায়ী আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) আমল করেন।

৬৩০৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন এর সারমর্ম হচ্ছে, যদি তুমি তোমার মূলধন উক্ত খাতককে সাদ্‌কা করে দাও, তাহলে তা হবে তোমার জন্যে উত্তম।

৬৩০৪. উবায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। দাহ্‌হাক (র.)-কে وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা অভাবগ্রস্ত খাতককে মূলধন সাদ্‌কা করে দাও, তবে তা হবে উত্তম। আর খাতক যদি সচ্ছল হয়, তবে এ বিধান নয়। তার থেকে মূলধন আদায় করতে হবে। অভাবগ্রস্ত খাতক থেকেও মূলধন নেয়া হালাল। তবে তাকে সাদ্‌কা করে দেওয়া উত্তম।

৬৩০৫. দাহ্‌হাক (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, وَأَنْ تَصَدَّقُوا–এর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা তোমাদের মূলধন সাদ্‌কা কর। আর خَيْرٌ لَّكُمْ–এর অর্থ হচ্ছে, সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া উত্তম। সুতরাং অবকাশ দেয়ার চেয়ে সাদ্‌কা করে দেয়াকেই আল্লাহ্ পাক পসন্দ করেছেন।

৬৩০৬. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ –এর অর্থ হচ্ছে, অভাবগ্রস্ত খাতকের চেয়ে একবারে সাদ্‌কা করে দেয়া উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

৬৩০৭. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের তাফসীর প্রসেঙ্গ বলেন, এখানে উল্লিখিত অবকাশ প্রদান হচ্ছে ওয়াজিব। তবে সাদ্‌কা করাকে আল্লাহ্ তা'আলা অবকাশ থেকে বেশী পসন্দ করেছেন। আর সাদ্‌কা হচ্ছে অভাব গ্রস্তের জন্যে। যে সচ্ছল তার জন্য নয়।

ইব্‌ন জারীর তাবারীর মতে, অভাবগ্রস্ত খাতককে সাদ্‌কা করাটাই উত্তম। কেননা, এ অর্থটি অন্য অর্থের তুলনায় উত্তম।

আবার কেউ কেউ বলেন, সূদের বিধান সম্পর্কীয় এ আয়াতসমূহ সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৩০৮. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমার (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনের শেষ যে আয়াতখানি নাযিল হয় তা হলো, সূদ সম্পর্কীয় আয়াত। আর নবী (সা.) এ আয়াতখানির ব্যাখ্যা করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। অতএব, তোমরা সূদ ও এ সম্বন্ধে সন্দেহ বর্জন কর।

৬৩০৯. আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিন হযরত উমর (রা.) খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করার পর তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ ! আমি জানি না, আমরা হয়ত তোমাদেরকে এমন কাজের আদেশ দিচ্ছি, যে কাজে তোমাদের কোন কল্যাণ নেই। আবার আমি জানি না, আমরা হয়ত তোমাদেরকে এমন কাজ করতে নিষেধ করছি, যেটাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। আর জেনে রেখ, পবিত্র কুরআনের যে আয়াত সর্বশেষে নাযিল হয়েছে তা হলো সূদ সম্পর্কীয়।

আমাদের জন্য এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইহলোক ত্যাগ করেন। অতএব, যা সন্দেহজনক তা বর্জন কর, আর যা সন্দেহমুক্ত তা গ্রহণ কর।

৬৩১০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি সর্বশেষ কুরআনের যে আয়াতটি নাযিল হয় তা হচ্ছে সূদ সম্পর্কীয় আয়াত। আর আমরা এমন কাজের আদেশ দিচ্ছি, জানিনা, সেটাতে হয়ত অকল্যাণ রয়েছে এবং এমন কাজ থেকে বারণ করছি যার মধ্যে হয়তবা কোন অকল্যাণ নেই।

(٢٨١) وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৮১. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যানীত হবে। তারপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, কেউ কেউ বলেন, উল্লিখিত আয়াতটিও কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ আয়াত। যারা এ অভিমত পোষণ করেন ঃ

৬৩১১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.)–এর কাছে সর্বশেষ যে আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে তা হচ্ছে وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ الخ

৬৩১২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى الخ পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত সর্বাশেষ আয়াত।

৬৩১৩. 'আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ যে আয়াতটি নাযিল হয় তা হচ্ছে– وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ -

৬৩১৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনুল কারীমের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে– وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ -

৬৩১৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ - ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনাকারী ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, সাহাবা কিরাম (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) এ আয়াত নাযিল হবার পর এ পৃথিবীতে মাত্র নয় দিন জীবিত ছিলেন। এ নয় দিনের শুরু ছিল শনিবার, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তিকাল করেন সোমবার।

৬৩১৬. সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে এ পবিত্র হাদীসটি পৌছেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার আরশে পবিত্র কুরআনুল কারীমের বছরের প্রারম্ভিক সৃষ্টি সদৃশ প্রতিনিধিত্ব করে اٰيَةُ الدَّيْنِ অর্থাৎ যে আয়াতে হিসাব–নিকাশের (কিয়ামতের) দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে উল্লিখিত আয়াত - وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ إِلَى اللّٰهِ الاٰيَةُ –। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন, হে মানব জাতি ! তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্

তা'আলার দিকে ফিরে আসবে এবং তখন তাঁর সাথে তোমরা সাক্ষাৎ করবে। তাঁর কাছে তোমাদের ঐসব পাপকর্মের জন্যে জবাবদিহী করতে হবে যে অপকর্ম তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে; কিংবা ঐসব অপমানজনক কর্মকান্ডের জন্য যেগুলো তোমাদেরকে অপমান করবে অথবা লাঞ্ছনা–গঞ্জনামূলক কর্মকান্ডের জন্য যেগুলো তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করবে ও তোমাদের ইয্যত–সম্মানের মাথায় কুঠারাঘাত করবে কিংবা ঐসব ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের জন্যে যেগুলো তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। এরপর তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত আযাব এসে যাবে, যা প্রতিহত করার মত তোমাদের শক্তি থাকবে না। ঐ দিনটি কৃতকর্মের কর্মফল পাবার দিন। ঐ দিনে কারো তাওবা, সন্ধিমূলক প্রস্তাব, অনুশোচনা, অনুনয়–বিনয় ইত্যাদি কবুল করা হবে না। কেননা, এটা প্রতিদান, প্রতিফল, পুরস্কার ও হিসাব-নিকাশের দিন। প্রত্যেককে তার পুরস্কার পুরাপুরি দেয়া হবে। দুনিয়াতে যা সে অর্জন করেছিল ও ঐ জগতের জন্যে অগ্রিম প্রেরণ করেছিল, ভাল হোক কিংবা মন্দ হোক, কোন কিছুই নেক–বদ পড়ে যাবে না। সবকিছুই হাযির করা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সব কিছুরই পুরাপুরি ন্যায্যমত প্রতিফল দেয়া হবে। বান্দাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। অন্য কথায়, তাদেরকে কোন কিছুই কম দেয়া হবে না। আর যাকে পাপের জন্য সম পরিমাণ শাস্তি এবং ছওয়াবের জন্যে দশগুণ প্রতিফল দেয়ার বিধান রয়েছে, তাকে কিছু কম দেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। কাজেই, হে বদকার ! তুমি তোমার প্রতি এ জগতে ইনসাফ কর ও নিজকে সম্মানিত রাখ। বলা হবে, হে কল্যাণকামী ও পরোপকারী ! তুমি তোমার প্রতিদান ও প্রতিফল পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশকে ভয় করেছে এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিষেধাবলী প্রাপ্ত হবার পর এগুলোর প্রতি যত্ন নিয়েছে ও এদিনে এগুলোর হামলা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছে, নচেৎ এগুলো আজকে কিয়ামতের দিনে তার পিঠে ভারী বোঝা হিসাবে উপনীত হতো এবং তার নেক কাজের পাল্লা হালকা বলে পরিগণিত হতো। মহান আল্লাহ্ তাকে যে ভয় প্রদর্শন করেছেন, সে তা থেকে দূরে রয়েছে এবং তাকে যে নসীহত করেছেন, তা সে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(২৮২) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ○

২৮২. হে, মুমিনগণ তোমরা যখন এক অন্যে সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋর্ণের কারবার কর, তখন তা লিখে রাখ; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেহেতু আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর তার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লিখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষিগণকে যখন ডাকা হবে, এখন তারা যেন অস্বীকার না করে। এটি ছোট হোক কিংবা বড় লোক, মিয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হবে না। আল্লাহর নিকট এটি ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর ; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান-প্রদান কর, তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর, তখন সাক্ষী রাখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন অত্র আয়াতাংশ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন, হে ঐসব ব্যক্তিরা, যারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তোমরা যখন বাকী মূল্যে কেনাবেচা কর কিংবা নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমরা ঋণ প্রদান কর অথবা কারো থেকে গ্রহণ কর, তখন তা লিখে রেখ।

অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত أَجَلٍ مُسَمًّى-এর অর্থ নির্দিষ্ট কোন সময় যা উভয় পক্ষ নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করে থাকে। কোন কোন সময় অত্র আয়াতের বিধানের মধ্যে ঋণ এবং ঋণে বেচাকেনাও অন্তর্ভুক্ত হয়। যে সব বস্তুর মধ্যে ঋণে বেচাকেনা সঙ্গত, সেগুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত বেচাকেনার সময় বিক্রেতার কাছে ক্রেতা কিংবা ক্রেতার কাছে বিক্রেতা ঋণী থাকবে।

জায়গা, জমি নগদ মূল্যে বিক্রির ন্যায় বাকী মূল্যে বিক্রি করাও বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে মূল্য আদায়ের নির্ধারিত সময় উল্লেখ করতে হবে। এরূপে নির্ধারিত সময়ের জন্যে যাবতীয় বাকী লেনদেন বৈধ বলে গণ্য।

৬৩১৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) বলতেন যে, এ আয়াতটি বিশেষ করে বাকী বিক্রির বৈধতা প্রমাণের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিম্ন বর্ণিত হাদীসখানা প্রণিধানযোগ্য।

৬৩১৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতাংশে বাকী মূল্যে গম বিক্রির কথা বলা হয়েছে, যদি তা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্ধারিত সময়ের জন্যে সংঘটিত হয়।

৬৩১৯. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্র আয়াতাংশ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ- বাকী মূল্যে গম বিক্রি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যা নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্ধারিত সময়ের জন্যে সংঘটিত হয়।

৬৩২০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতখানি বাকী মূল্যে গম বেচাকেনার ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। যার পরিমাণ ও মূল্য আদায়ের সময় নির্ধারিত হতে হবে।

৬৩২১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط ...... নির্দিষ্ট পরিমাপে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে গমের লেনদেন প্রসঙ্গে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৩২২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণযোগ্য ধারে লেনদেনকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করেছেন এবং তাতে অনুমতি প্রদান করেছেন। আর তিনি আলোচ্য আয়াতখানি তিলাওয়াত করছিলেন।

ইমাম তাবারী বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আয়াতে بِدَيْنٍ শব্দটি উল্লেখ করার কারণ কি? অথচ আল্লাহ্‌র বাণী اِذَا تَدَايَنْتُمْ ধারে লেনদেন সম্পর্কেই বুঝাচ্ছে। আর পারস্পরিক লেনদেন কি ধার বা ঋণ ব্যতীত হতে পারে যে, এখানে بِدَيْنٍ শব্দটি পুনরায় বলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? তদুত্তরে বলা যায় যে, আরবদের মধ্যে تداينا শব্দটি تجازينا (আমরা পরস্পর প্রতিদান দিয়েছি।) ও تعاطينا (আমরা পরস্পরে আদান-প্রদান করেছি) অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন রয়েছে। যার অর্থ ধারে নেয়া ও ধারে দেয়া। এজন্য আল্লাহ্ তাঁর বাণী تداينتم দ্বারা যে লেনদেনের সংজ্ঞা দান করার উদ্দেশ্য করেছেন, তার হুকুম بِدَيْنٍ দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং তাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ হুকুম ঋণ বা ধারে মুআমালা করার হুকুম, পরস্পরে স্বাভাবিক আদান-প্রদান নয়। আর কোন কোন তাফসীরকার ধারণা করেছেন যে, دين শব্দটি গুরুত্ব দেয়ার জন্য উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌র বাণী فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ- এর মধ্যে كُلُّهُمْ বলার পর اَجْمَعُوْنَ শব্দটি তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁদের এ বক্তব্যের কোন যথার্থতা নেই।

আল্লাহ্ পাকের বাণী فَاكْتُبُوْ-এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী فَاكْتُبُوْهُ "তোমরা তা লিপিবদ্ধ কর" দ্বারা ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা পরস্পরে নির্দিষ্ট সময়ে যে ধার বা ঋণের কারবার করবে, তোমরা তা লিখে রেখ, তা বাকীতে বেচাকেনা হোক অথবা ঋণ হোক। আর আলিমগণ এব্যাপারে একাধিক মত পোষণ করেন যে, এই লিখনের দায়িত্ব কে পালন করবে? আর এটি ওয়াজিব, না মুস্তাহাব? তাঁদের কেউ কেউ বলেন, এই লিখন অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৩২৩. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ- এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাকীতে

ক্রয়–বিক্রয় করে তার প্রতি শরীআতের নির্দেশ এই যে, উক্ত লেনদেন ছোট হোক বা বড় হোক তা এক নিদৃষ্টিকালের জন্য লিখে রাখবে।

৬৩২৪. ইবৃন জুরাইজ হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে ঋণ করবে সে তা লিখে রাখবে আর যে ক্রয়–বিক্রয় করবে, সে তাতে সাক্ষী রাখবে।

৬৩২৫. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সুতরাং লিপিবদ্ধকরণ ওয়াজিব হবে।

৬৩২৬. রবী' (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর তিনি তাতে এও বাড়িয়েছেন যে, তারপর এ প্রশ্নে ঐচ্ছিকতা ও অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعضا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَه وَ لْيَتَّقِ اللّٰه رَبَّه - (তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপর কারো উপর আস্থা রাখে (এবং লিপিবদ্ধ না করে) তবে যেন যার উপর আস্থা রাখা হয়েছে, সে তার আমানত আদায় করে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করে।)

৬৩২৭. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সুলায়মান মারআশী (র.) আমার নিকট একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যক্তি কাআব (রা.)–এর সাথী ছিলেন। একদিন কাআব (রা.) তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কি এমন কোন মজলুম বা নির্যাতিত ব্যক্তি সম্পর্কে জান, যে তার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক তার ফরিয়াদ কবুল করেন নি? সাথীগণ বললেন, এ কেমন করে হতে পারে? তিনি বললেন, সে হলো এমন একব্যক্তি যে কোন বস্তু বিক্রয় করেছে কিন্তু সে তা লিপিবদ্ধ করেনি এবং সাক্ষীও রাখেনি। তারপর যখন তার মাল হালাল হলো (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার মাধ্যমে তার প্রাপ্য আদায়ের সময় হলো) তখন প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করল। আর সে মহান আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করল। অথচ তার সে ফরিয়াদ কবুল হলো না। কারণ, সে তার প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করেছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, ঋণ সম্পর্কিত চুক্তিনামা লিপিবদ্ধকরণ ফরয ছিল। তারপর মহান আল্লাহ্‌র বাণী– فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ - এ হুকুম রহিত করে দিয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৩২৮. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যদি তুমি প্রতিপক্ষের ওপর আস্থা রাখতে পার, তবে লিপিবদ্ধ না করা ও সাক্ষী না রাখায় কোন দোষ নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অপর কারো উপর আস্থা রাখে।

ইবৃন উয়ায়না (র.) বলেছেন যে, এ বর্ণনাটি قال ابن شبرمة عن الشعبى পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে।

৬৩২৯. আমর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ পর্যন্ত فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ - আবৃত্তি করেন এবং

এসে উপনীত হন। তখন তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ইখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে, যে তার প্রতিপক্ষের উপর আস্থা রাখতে চাইবে, সে তার প্রতিপক্ষের উপর আস্থা রাখবে।

৬৩৩০. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি প্রতিপক্ষের উপর আস্থা রাখে, তবে সে সাক্ষী রাখবে না এবং লিপিবদ্ধ করবে না।

৬৩৩১. শা'বী (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাফসীরকারগণ এমত পোষণ করতেন যে, আয়াত فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا লিপিবদ্ধকরণ ও সাক্ষী রাখা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আয়াতাংশকে রহিত করে দিয়েছে। আর এ হলো আল্লাহ্র পক্ষ হতে ইখতিয়ার দান ও করুণা স্বরূপ।

৬৩৩২. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (র.) ব্যতীত তাফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতাংশ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا লিপিবদ্ধকরণ ও সাক্ষী রাখার বিধানকে রহিত করে দিয়েছে।

৬৩৩৩. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ আয়াতটি এ হুকুমটিকে রহিত করেছে। যদি একথাটি না থাকত, তবে কারও জন্য লিপিবদ্ধকরণ ও সাক্ষী প্রমাণ রাখা ব্যতীত ঋণের কারবার করা জায়েয হতো না। সেহেতু এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু এসকল কিছু রহিত হয়ে গিয়েছে এবং বিষয়টি আস্থা রাখার উপর নির্ভরশীল হয়েছে।

৬৩৩৪. সুলায়মান তায়মী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (র.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বলেছেন, যে কেউ কোনরূপ আর্থিক লেনদেন করবে, তার জন্য কর্তব্য হলো যে, সে সাক্ষী রাখবে। তিনি বললেন, তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ - (সুতরাং যার উপর আস্থা রাখা হয়েছে, সে যেন তার আমানত আদায় করে দেন।)

৬৩৩৫. আমির (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এ পর্যন্ত পৌছান فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, যে তার প্রতিপক্ষের উপর আস্থা রাখতে চাইবে, সে তার উপর আস্থা রাখবে।

৬৩৩৬. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যদি তুমি সাক্ষী রাখ তবে তা বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা। আর যদি তুমি সাক্ষী না রাখ, তবে সে সুযোগও রয়েছে।

৬৩৩৭. ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শা'বী (র.)-কে বললাম, এ ব্যাপারে আপনার রায় কি যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট হতে কোন বস্তু গ্রহণ করল, তখন তার উপর কি সাক্ষী রাখা অপরিহার্য? বর্ণনাকারী বলেন, তখন শা'বী (র.) আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। তারপর তিনি বললেন, এ আয়াত দ্বারা পূর্ববর্তী বিধান রহিত হয়েছে।

৬৩৩৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا পর্যন্ত পাঠ করেন। তারপর তিনি বলেন, এ আয়াতাংশ তার পূর্ববর্তী হুকুমকে রহিত করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ -فَلْيَكْتُبْ এর ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে ইরশাদ করেছেন যে, ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতার মাঝে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত ঋণপত্রটি লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দিবে। যাতে করে হকদারের হক ক্ষুণ্ণ না হয়। আর অন্যায়ভাবে তার জন্য প্রমাণ দাঁড় করাবে না যার উপর তার ঋণ রয়েছে এবং ঋণগ্রস্তের উপর এমন কিছু বর্তাবে না যা তার উপর সাব্যস্ত নয়।

এমত যাঁরা পোষণ করেন ঃ

৬৩৪০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, লেখক তার লেখার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় করবে। কাজেই সে কোন সত্যকে গোপন করবে না এবং তাতে অন্যায়ভাবে কোন কিছু বৃদ্ধি করবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা ঃ

(লেখক যেন লিখে দিতে অস্বীকার না করে, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে লিখা শিক্ষা দিয়েছেন।) যেমন তিনি তাকে এ ইলমের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনেককে তাথেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

লেখকের নিকট যখন লেখার অনুরোধ করা হবে, তখন তার উপর লিখে দেয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৩৪১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লেখকের উপর লিখে দেয়া ওয়াজিব।

৬৩৪২. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা (র.)-কে প্রশ্ন করলাম, মহান আল্লাহ্র বাণীঃ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ (লেখক লিখে দিতে যেন অস্বীকার না করে)-এর অর্থ কি, লিখে দিতে অস্বীকার না করা লেখকের উপর ওয়াজিব? তিনি বললেন, হাঁ ওয়াজিব। ইব্ন জুরাইজ (র.) বলেন, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, লেখকের উপর লিখে দেয়া ওয়াজিব।

৬৩৪৩. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, লেখককে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ লিখতে শিক্ষা দিয়েছেন তদ্রূপ লিখে দিতে সে যেন অস্বীকার না করে।

৬৩৪৪. আমির ও আতা (র.) হতে বর্ণিত। তাঁরা আয়াত وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা যখন লেখক পেল না, তখন তোমাকে আহ্বান করা হলো। তখন তুমি তা করতে অস্বীকার কর না।

যাঁরা এ আদেশ রহিত বলে মনে করেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

যাঁরা বলেছেন যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত লিপিবদ্ধকরণ, সাক্ষী রাখা ও বন্ধক রাখা ইত্যাদি

আদেশ আয়াতের শেষাংশ দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে, তাঁদের মধ্য হতে একদল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করেছি। যাঁদের কথা আলোচনা করা হয়নি তাঁদের মতামত ঃ

৬৩৪৫. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ – লেখক অস্বীকার করবে না -- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ আদেশটি ছিল বাধ্যতামূলক। এরপর আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত আল্লাহ্র বাণীঃ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ 'কোন লেখক বা কোন সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না' দ্বারা তা রহিত করা হয়েছে।

৬৩৪৬. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, লেখকদের উপর লিপিবদ্ধকরণের এ আদেশ ওয়াজিব ছিল।

অপর একদল তাফসীরকার বলেছেন, তা ওয়াজিব অবশ্য। তবে লেখকের অবসর থাকা সাপেক্ষে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৩৪৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লেখকের যদি অবসর থাকে, তবে সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

আমার মতে এক্ষেত্রে সঠিক বক্তব্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরস্পর লেনদেনকারীকে তাদের মধ্যে সম্পাদিত ঋণপত্র লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেছেন এবং লেখককে তাদের মধ্যে তা সঙ্গতভাবে লিখে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ পাকের আদেশ ফরয হিসাবে পরিগণিত। তবে যদি সে আদেশটি উপদেশ কিংবা মুস্তাহাব বলে গণ্য করার কোন প্রমাণ থাকে। অথচ এ পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করার আদেশটি মুস্তাহাব বা উপদেশ বলে আমাদের নিকট কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং এ আদেশ পালন করা ফরয। এ আদেশ অমান্য করার উপায় নেই। যাঁরা এ আদেশ অমান্য করবে, তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হবে।

আর যাঁরা এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এতদ্সংক্রান্ত আদেশটি আল্লাহ্র বাণীঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে, তাঁদের এ মতের পক্ষে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কেননা, এতো লিপিবদ্ধকরণের উপকরণ ও লেখক না পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অনুমতি বিশেষ। কিন্তু যে ক্ষেত্রে লেখার উপকরণ ও লেখক উভয়ই বিদ্যমান, সে ক্ষেত্রে যদি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণের মুআমালা পাওয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীঃ فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ আয়াতাংশ দ্বারা যে আদেশ করেছেন, সে আদেশ পালন করা ফরয হবে। কোন আয়াত তখনই রহিত হয়, যখন সে আয়াতের হুকুমও রহিত হয়। একই আয়াতের হুকুম একই অবস্থায় নাসিখ ও মানসূখ হওয়া অসম্ভব। যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর যেখানে উভয়ের মধ্যে একটি অপরটির হুকুমকে রহিতকারী না হয়, সেখানে কোনটিই নাসিখ ও মানসূখ নয়। অন্যথায় যদি এটা অবশ্যম্ভাবী হয় যে, আল্লাহ্র বাণীঃ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ

(আর যদি তোমরা সফর অবস্থায় থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। আর যদি তোমরা একে অন্যের উপর আস্থা স্থাপন কর, তবে যার উপর আস্থা রাখা হলো সে যেন তার আমানত প্রত্যর্পণ করে।) নাসিখ বা রহিতকারী হয়েছে আল্লাহ্‌র বাণীঃ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ –এর জন্য, তবে এও অবশ্যম্ভাবী হবে যে, আল্লাহ্‌র বাণীঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا অর্থ ঃ তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করবে। (৫ ঃ ৬) মুকীম অবস্থায় পানি পাওয়া সত্ত্বেও এবং মুসাফির অবস্থায় পানি দ্বারা উযূ করা সম্পর্কিত আদেশটির জন্য রহিতকারী রূপে গণ্য হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ দ্বারা ফরয করেছেন। অনুরূপভাবে এও অবশ্যম্ভাবী হবে যে, যিহারের কাফ্‌ফারা সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا রহিতকারী হবে তাঁর বাণীঃ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ –এর দ্বারা। কাজেই, আয়াত فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ –কে যাঁরা মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ –এর নাসেখ বা রহিতকারী বলে অভিমত পোষণ করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, যদি এমনই হয়, তবে এ বক্তব্য ও তায়াম্মুম প্রসঙ্গে আমি যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছি এ উভয় বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তাঁরা হয়তো ধারণা করেছেন যে, যে সকল বিষয় প্রয়োজনীয়তার ইল্লাতের ভিত্তিতে মুবাহ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হুকুমটি তার সকল অবস্থার হুকুমকে রহিতকারী হবে। তারই নযীর হলো ঋণ ও অধিকার সম্পর্কিত চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত আদেশটি আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

কেউ যদি এরূপ বলেন যে, আমার বক্তব্য ও উপরোক্ত অভিমত পোষণকারীর বক্তব্য মধ্যে পার্থক্য হলো, মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ হতে বিচ্ছিন্ন কালাম। আর সফর অবস্থায় যদি লেখক পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কিত হুকুম فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ দ্বারা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا স্বতন্ত্র আয়াত হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য হলো যখন তোমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, এক্ষেত্রে যদি তোমাদের মধ্যে একে অপরের উপর আস্থা স্থাপন করে, তবে যার উপর আস্থা রাখা হলো সে যেন তার আমানত প্রত্যর্পণ করে দেয়। তদুত্তরে বলা হবে যে, তোমার এ বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণভিত্তিক বা যুক্তিভিত্তিক কি দলীল আছে? অথচ যে ঋণের মুআমালা লেখক ও লিপিবদ্ধকরণের উপকরণ পাওয়ার উপায় বিদ্যমান, তার হুকুম মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ দ্বারা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। আর যাঁরা এরূপ ধারণা করেছেন যে, মহান

আল্লাহ্র বাণীঃ فَاكْتُبُوهُ –তোমরা লিপিবদ্ধ কর ও আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ –লেখক যেন অস্বীকার না করে, এ জাতীয় আদেশ মুস্তাহাব ও উপদেশ হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে, তাদের নিকট তাদের দাবীর সমর্থনে দলীল–প্রমাণ কি তা জানতে চাওয়া হবে। তারপর তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সকল হুকুম যা তিনি তাঁর কিতাব কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন, তার মুকাবিলায় অবতীর্ণ করা হবে। আর তাদেরকে যে হুকুমটি এক ক্ষেত্রে দাবী করছে এবং অন্য ক্ষেত্রে অস্বীকার করছে উভয়টির পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এমতাবস্থায় তারা যে কোন একটি ক্ষেত্রে এমন কোন মতই পেশ করবে না, যা ঠিক অন্য ক্ষেত্রে তাদের উপর আবশ্যিক হয়ে পড়বে না।

যাঁরা বলেছেন যে, মহান আল্লাহ্র বাণীঃ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ এর মধ্যে اَلْعَدْلُ শব্দটির অর্থ اَلْحَقُّ –'যথাযথ', তাঁদের আলোচনা।[১]

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ط

এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে, আর এর কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।

وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا –এর ব্যাখ্যা ঃ

আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ ঃ সুতরাং লেখক যেন লিখে দেয় এবং যার উপর হক সে যেন লেখার বিয়য়বস্তু বলে দেয়। আর সে হলো ঋণগ্রহীতা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ঋণগ্রহীতা তার নিজের উপর ঋণদাতার যে ঋণ রয়েছে, লেখকের নিকট সে বিষয়ের ঋণপত্রে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আর লেখার বিষয়বস্তু বলার সময় যেন ঋণগ্রহীতা তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। কাজেই, সে যেন হকদার ব্যক্তির হক হতে কোন কিছু কম করার প্রশ্নে তাঁর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকে। আর তা হলো, সে হক থেকে অন্যায়ভাবে কিছু কম করা অথবা সীমালংঘনপূর্বক তা থেকে কিছু ছেড়ে দেয়া। যে জন্য তাকে জবাবদিহী করতে হবে। আর সে তার ছওয়াবসমূহের বিনিময়ে কিংবা হকদারের পাপরাশি বহন করা ব্যতীত আদায় করতে পারবে না। যেমন ঃ

৬৩৪৮. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কাজেই এরূপ করা অর্থাৎ লেখক লিখে দেয়া ও ঋণগ্রহীতা লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়া ওয়াজিব। আর সে যেন তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাথেকে কোন কিছু কম না করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সে যেন কোনরূপ অন্যায়–অবিচার না করে।

৬৩৪৯. ইবন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে যখন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেবে, তখন এ ব্যক্তির হক হতে যেন কিছু কম না করে।

১. তাফসীরে তারারীর কোন কোন নুসখায় এ ইবারতটি উধৃত আছে কিন্তু তৎসঙ্গে এমন কারো নামোল্লেখ করা হয়নি, যদি এমত পোষণ করেছেন। তাফসীরকারের নিকট এমন কোন পান্ডুলিপি ছিল, পরে তিনি তা ভুলে গিয়েছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ فَانْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীঃ فَانْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا –এর মধ্যে ঘোষণা করেছেন, যদি ঋণগ্রহীতা যার উপর ঋণের মাল সাব্যস্ত। সে যদি নির্বোধ তথা তার উপর যে ঋণ সাব্যস্ত হয়েছে, সে সম্পর্কে লেখার বিষয়বস্তু লেখকের নিকট সঠিকভাবে বলে দেয়ার ব্যাপারে অজ্ঞ হয়।"

৬৩৫০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি فَانْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, سَفِيْه (নির্বোধ) হলো লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার ও সে বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, বরং এক্ষেত্রে নির্বোধ বলে আল্লাহ্ তা'আলা যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেনঃ

৬৩৫১. হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি فَانْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নির্বোধ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ককে বুঝানো হয়েছে।

৬৩৫২. দাহ্হাক (র.) বর্ণিত। তিনি فَانْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নির্বোধ ও দুর্বল হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। কাজেই, তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিবে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে ঐ ব্যাখ্যাটিই উত্তম, যাঁরা বলেছেন যে, এক্ষেত্রে سَفِيْه (নির্বোধ) হলো লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার ব্যাপারে যে অজ্ঞ। আর ব্যাখ্যাটিই সঠিক হওয়ার কারণ হলো তা, যা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আরবদের পরিভাষায় السفه শব্দটির অর্থ, الجهل অজ্ঞতা–মূর্খতা। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ فَانْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا –এর মধ্যে সে সকল অজ্ঞমূর্খই অন্তর্ভুক্ত, যে সঠিকভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ায় অজ্ঞ। সে অপ্রাপ্তবয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক হোক, পুরুষ বা স্ত্রীলোক হোক। অধিকন্তু আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা হলো, এ আয়াত দ্বারা সে সকল মূর্খ লোককেই বুঝানো হয়েছে, যারা লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার ক্ষেত্রে ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে ওলট–পালট করে ফেলবে। অর্থাৎ সঠিকভাবে বলে দিতে অক্ষম, যারা এমন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোক, যাদের উপর অন্য কেউ অভিভাবক নয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের শুরুতে ইরশাদ করেছেন يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى –এর মাধ্যমে, অথচ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও যার উপর অন্য ব্যক্তি অভিভাবকত্ব করে, তার জন্য পরস্পর ঋণের কারবার করা জায়িয নেই। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ঋণপত্র লেখার বিষয় বলে দেয়ার আদেশ করেছেন, তাদের মধ্য হতে নির্বোধ–দুর্বলসহ লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ায় অপারগকে পৃথক করেছেন। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বল ও নির্বোধ ব্যক্তিকে অর্থাৎ লেখার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে লিখিয়ে দিতে অক্ষম, তাদের এ আদেশের আওতাভুক্ত করেননি। আর এও সুবিদিত যে, তাদের মধ্যে যে দুর্বল, সে হলো লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়ার অক্ষম ব্যক্তি, যদিও সে সবল সুঠামদেহী হোক না কেন। আর এ দুর্বলতা তার যবানের জড়তা বা

তাতে তোত্‌লামি থাকার কারণে। আর যে লেখার বিষয় বলে দেয়ায় অপারগ সে হলো লেখার বিষয় বলে দেয়ায় বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি। এমন প্রতিবন্ধী, যে লেখকের নিকট উপস্থিত হয়ে লেখার বিষয় বলে দেয়ায় অক্ষম কিংবা লেখার বিষয় বলে দেয়ার স্থান হতে তার অনুপস্থিতির কারণে। ফলে সে তার অনুপস্থিতির কারণে ঋণপত্রে লেখার বিষয় বলে দেয়ায় অক্ষম। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর হতে লেখার বিষয় বলে দেয়ার দায়িত্ব স্খালন করে দিয়েছেন, সে সকল কারণের প্রেক্ষিতে যা আমি উল্লেখ করেছি, যখন তা তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। আর তিনি সে কারণেই তাদেরকে অপারগ বলে গণ্য করেছেন। আর তাদের উপর হতে এ দায়িত্ব প্রত্যাহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবককে লেখার বিষয় বলে দেয়ার আদেশ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

যদি ঋণগ্রহীতা নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা লেখার বিষয় বস্তু বলে দিতে না পারে, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। এখানে وَلِيُّهٗ –এর অর্থ ولى الحق অর্থাৎ যথার্থ অভিভাবক। আর যাঁরা ধারণা করেন যে, এখানে سَفِيْهًا বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক আর ضَعِيْفًا বলতে বোধশক্তিহীন বৃদ্ধ, তাঁদের এ কথার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, যদি বাস্তবে তাই হতো, যেমন তাঁরা বলেছেন, তাহলে আল্লাহ্‌র বাণীঃ اَوْ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ –এর দ্বারা সেই অপারগ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে জ্ঞান–বুদ্ধিসম্পন্ন, নিজ সম্পদ ও জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে স্বাবলম্বী ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম –এটিই এ আয়াতাংশের অর্থ। তার এ অক্ষমতা হয়তো তার বাকশক্তিতে কোন দোষ থাকার জন্য অথবা লেখার স্থান হতে তার অনুপস্থিতির কারণে। আর যখন আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এরূপ হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ –এর অর্থ বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, সুস্থ মস্তিষ্ক, জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর তার সম্পদে কেউ অভিভাবক হয় না। যদিও সে মূক বা অনুপস্থিত হোক না কেন। আর তার সম্পদের উপর তার আদেশ ব্যতীত অন্য কারো কর্তৃত্ব জায়িয হবে না। আর তাতেই এ আয়াতাংশের অর্থের বিশুদ্ধতা নিহিত। যারা ধারণা করেছে যে, এক্ষেত্রে নির্বোধ হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বয়ঃপ্রাপ্ত অবোধ ব্যক্তি, উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা তাদের ধারণা বাতিল হয়ে যাবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৩৫৩. রবী' (র.) হতে বর্ণিত যে, তিনি আয়াত فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, وَلِيُّهٗ (তার অভিভাবক) হলো وَلِىُّ الْحَقِّ –যথার্থ অভিভাবক।

৬৩৫৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত যে,তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, যদি ঋণগ্রহীতা লেখার বিষয় বলে দেয়ায় অক্ষম হয়, তবে صاحب الدين (ঋণের মালিক) ন্যায্যভাবে লেখার বিষয় বলে দিবে।

সে সকল ব্যক্তি হতে উধৃত রিওয়ায়াতসমূহের আলোচনা যারা বলেছেন যে, এস্থানে ضعيف (দুর্বল) বলতে احمق (বোকা) উদ্দেশ্য এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ দ্বারা নির্বোধ ও দুর্বল -এর অভিভাবক উদ্দেশ্য ঃ

৬৩৫৫. দাহ্‌হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নির্বোধ ও দুর্বল ব্যক্তির অভিভাবককে ন্যায্যভাবে লেখার বিষয় বলে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে।

৬৩৫৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ضعيف দ্বারা احمق বুঝানো হয়েছে।

৬৩৫৭. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ضعيف দ্বারা احمق বুঝানো হয়েছে।

৬৩৫৮. ইব্‌ন যায়িদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে হলো এমন ব্যক্তি, যে নিজের অধিকার প্রমাণ করার জ্ঞান রাখে না এবং তাতে সে অজ্ঞ। এমতাবস্থায় তার অভিভাবক তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। আমি ইতিপূর্বে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হিসাবে উত্তম ব্যাখ্যাটির প্রতি নির্দেশ করেছি। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ -এর অর্থ হলো بِالْحَقِّ (যথাযথ ভাবে)

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَهُمَا الْاُخْرٰى وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَادُعُوْا ـ

অর্থ ঃ সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ তোমরা সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। আর সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে, তখন তারা যেন অস্বীকার না করে।

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা তোমাদের হক সংক্রান্ত বিষয়ের উপর দু'জন সাক্ষী রাখ। যেমন, আরবদের কথোপকথনে বলা হয়, فلان شهيدى على هذا المال وشاهدى عليه -এ সম্পদের বিষয়ে অমুক আমার সাক্ষী এবং আমার সাক্ষী তার বিরুদ্ধে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مِنْ رِّجَالِكُمْ -এর অর্থ হলো স্বাধীন মুসলমান সাক্ষী হতে পারবে, গোলাম অথবা স্বাধীন কাফির সাক্ষী হতে পারবে না।

৬৩৫৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়াত وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ -এর অর্থ হলো مِنْ اَحْرَارِكُمْ -তোমাদের মধ্যে স্বাধীন ব্যক্তিগণ হতে।

৬৩৬০. মুজাহিদ(র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, সাক্ষীদ্বয় যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে সাক্ষ্যদান ক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক গ্রহণযোগ্য হবে। আর الرجل ও المراتان শব্দ দু'টি كون হতে নিষ্পন্ন ক্রিয়ার প্রতি 'আতফ হিসাবে পেশ হয়েছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে বাক্যটিকে এভাবে বলতে পার فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ عَلٰى ذٰلِكَ (যদি সাক্ষীদ্বয় দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সে বিষয়ে সাক্ষীদান করবে।), আর যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এরূপ বলতে পারঃ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ يَشْهَدُوْنَ عَلَيْهِ (সাক্ষীদ্বয় যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দেবে।) আর যদি তুমি এরূপ বল, فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ كَانَ صَوَابًا (সাক্ষীদ্বয় যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হলেও শুদ্ধ হবে।) উপরোক্ত সব ব্যাখ্যাই সঠিক। আর যদি رجل ও امراتان শব্দ দু'টি নসব (যবর) যোগে পড়া হয়, তবে তা একটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষে জায়িয হবে। যেমন فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَاسْتَشْهِدُوْا رَجُلًا وَّامْرَاَتَيْنِ (সাক্ষীদ্বয় যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে তোমরা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী রাখ।) আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (সাক্ষীগণের মধ্যে যাদের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট থাক তাদের মধ্য হতে) অর্থাৎ দীনদারী ও সৎকর্মশীলতা বিচারে নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ হতে। যেমন ঃ

৬৩৬১. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, দীনের বিষয়ে তোমাদের হতে আর فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ (যদি সাক্ষীদ্বয় দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক।) আর তাও দীনের বিচারে তোমাদের হতে। এমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ হতে হবে, যাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট।

৬৩৬২. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন যেন তাদের পুরুষগণ হতে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে তারা সাক্ষী রাখে। আর যদি সাক্ষীদ্বয় দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী রাখবে, যাদের উপর তোমরা সন্তুষ্ট।

اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰاهُمَا الْاُخْرٰى –এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতের পঠনরীতি প্রসঙ্গে ইলমে কিরাআত –এর বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। অধিকাংশ হিজায ও মদীনাবাসী এবং কোন কোন ইরাকী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ আলোচ্য আয়াতের اَن –এর আলিফকে যবর দিয়ে এবং تضل ও تذكر –কে অনুরূপ যবর দিয়ে পাঠ করেছেন। এ অর্থে যে, যদি সাক্ষীদ্বয় দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যাতে স্ত্রীলোক দু'জনের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে, যদি সে ভুলে যায়।

এ অভিমতটি সুফিয়ান ইব্‌ন উআয়াইনা (র.) হতে বর্ণিত।

৬৩৬৩. হযরত সুফিয়ান ইব্‌ন উআয়াইনা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى –এর অর্থঃ ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ করা নয়, শব্দটিতো পুরুষ অর্থে ذكر হতে নিষ্পন্ন। এ অর্থে যে, যখন উক্ত স্ত্রীলোকটি অন্য একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষ্যদান করল, তখন তাদের উভয়ের এ সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যতুল্য হয়ে গেল।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ করিয়ে দেয়া।

অপর কয়েকজন তাফসীরকার أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى আয়াতাংশের ان অব্যয়টির মধ্যে الف –কে যেরযোগে পাঠ করেছেন। আর তাঁরা تذكر শব্দটিকে পেশযোগে তার كاف (কাফ) অক্ষরটিতে তাশদীদযোগে পাঠ করেছেন। যেন তা স্ত্রীলোক দু'জনের কাজ সম্পর্কে খবরের সূচনা স্বরূপ হয়। অর্থাৎ যদি স্ত্রীলোক দু'জনের একজন তার সাক্ষ্যদানের বিষয় ভুলে যায়, অপর স্ত্রীলোকটি তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে تذكر শব্দটি যে ভুলে যায় তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং আয়াতাংশ পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে পৃথক হবে। এ পাঠরীতিতে আয়াতের অর্থ এরূপ হবে যে, তোমরা তোমাদের পুরুষগণের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষ্যদানকারীকে স্থির কর। আর যদি তারা দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, সেসব সাক্ষীর মধ্য হতে যাদের সাক্ষ্যদানে তোমরা সন্তুষ্ট থাক। কেননা, যদি স্ত্রীলোক দু'জনের একজন ভুলে যায়, তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। স্ত্রীলোকটির কাজ সম্পর্কে নতুন করে সংবাদ দেয়ার ভিত্তিতে এ অর্থ গ্রহণ করা হবে। যদি স্ত্রীলোক দু'জনের একজন তার সাক্ষ্যদানের বিষয় ভুলে যায়, তবে তাদের মধ্যে স্মরণকারিণী স্ত্রীলোকটি অপর স্ত্রীলোকটিকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

হযরত আ'মাশ (র.) ও তাঁর অনুসারিগণ এ পাঠরীতি গ্রহণ করেছেন। আর হযরত আ'মাশ (র.) تضل শব্দটিকে এজন্য যবরযোগে পাঠ করেছেন, যেহেতু শব্দটি হরফে শর্ত إِنْ যোগে জযমের স্থলে পতিত হয়েছে। তাঁর পাঠরীতির প্রেক্ষিতে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হলো শব্দটি মূলত أَنْ تَضْلِلْ ছিল। তারপর যখন লাম দু'টির একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম বা সন্ধি করা হয়, তখন তাতে সহজতর হরকত দেয়া হয়। আর تذكر শব্দটিকে "فا" (ফা) সহ ব্যবহার করা হয়। কেননা, তা শর্তের জাযা রূপে উল্লিখিত হয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এসব পাঠরীতির মধ্যে তাঁদের পাঠরীতিই বিশুদ্ধ, যাঁরা ان تضل احدا هما এর মধ্যে ان অব্যয়টিকে যবরযোগে পাঠ করেছেন এবং فتذكراحداهماالاخرى–এর মধ্যস্থিত كاف অক্ষরটিকে তাশদীদযোগে পাঠ করেছেন আর ر (রা.) অক্ষরটিতে যবর দিয়েছেন। এ অর্থে যে, সাক্ষীদ্বয় যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দান করবে, যাতে যদি তাদের একজন ভুলে যায়, তবে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। অবশ্য تذكر –কে تضل –এর উপর আতফ্ (عطف)করে যবর দেয়া হয়েছে। আর ان অব্যয়টি كى –এর স্থলে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে যবর দান করা হয়েছে। আর তা শর্তের স্থলে পতিত হয়েছে। শর্তের জবাবটি পরবর্তী পর্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ "كى" অর্থে ব্যবহৃত "ان" –এর যবরের উপর যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং فتذكر –কে تضل–এর উপর আত্‌ফ করা হয়েছে। যাতে একথা বুঝা যায় যে, "أَنْ" অব্যয়টি "ما" –এর স্থলে অবস্থিত।

আমি উপরে বর্ণিত পাঠরীতিসমূহের মধ্যে এ পাঠকে এজন্য গ্রহণ করেছি, যেহেতু প্রাচীন যুগের ও পরবর্তী যুগের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের এ বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আ'মাশ ও তাঁর পাঠরীতির অনুসারিগণ এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের দলীল–প্রমাণও রয়েছে। আর মুসলমানের মধ্যে যে পাঠরীতি প্রচলিত রয়েছে, তা বর্জন করা বৈধ নয়। فتذكر শব্দটির মধ্যস্থ كاف অক্ষরটিকে তাশদীদযোগে পড়া আমরা এজন্য পসন্দ করেছি, যেহেতু তা স্ত্রীলোক দু'জনের একজন অপর জনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে তাশদীদযোগে পাঠ করাই উত্তম।

ইব্ন উআয়াইনা (র.) হতে আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ আমরা যে ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি, তা একটি ভুল ব্যাখ্যা। কতিপয় কারণে এ ব্যাখ্যার কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রথম কারণ হলো, তাঁর ব্যাখ্যাটি তাফসীরকারগণের মতের বিপরীত। দ্বিতীয় কারণ হলো একথা স্বীকৃত যে, স্ত্রীলোক দু'জনের একজন তার দেয়া সাক্ষ্যের বিষয় ভুলে যাওয়া অর্থ, সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু ভুলে যাওয়া। যেমন কোন ব্যক্তির দীন সম্পর্কিত ভ্রষ্টতা হলো, তার দীনী বিষয়ে অস্থিরতা, যার ফলে সে সত্যবিচ্যুত হয়ে পড়েছে। আর যখন স্ত্রীলোক দু'জনের একজন এ দোষে দোষী হয়েছে, তখন এটা কিরূপে বৈধ হবে যে, অপর স্ত্রীলোকটি সাক্ষ্যদানের বিষয়বস্তু ভুলে যাওয়া ও তাতে ভ্রষ্টতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে একত্রিতাবস্থায় পুরুষরূপে গণ্য হয়ে যাবে। কাজেই, এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষ্য দানের বিষয়ে ভ্রষ্টতার শিকার স্ত্রীলোকটি পুরুষরূপে গণ্য হওয়ার তুলনায় স্মরণ করিয়ে দেয়াই অধিক প্রয়োজনীয়। কেননা, যদি পুরুষরূপে গণ্য করা দ্বারা এ অর্থ উদ্দেশ্য করা হয় যে, স্মরণকারিণী তার সহযোগী সাক্ষ্যদানকারিণীকে সে যে বিষয় স্মরণ করার ব্যাপারে দুর্বল ছিল এবং ভুলে গিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে সবলতা দান করে, যা দ্বারা সে তাকে সাক্ষ্য বিষয়ে সবলতায় পুরুষতুল্য করেছে। যেমন নিজ কার্যক্ষমতায় সবল বস্তুকে ذكر তথা পুরুষ বলা হয়। আর যেমন আঘাত করায় কার্যকর তরবারিকে سيف ذكر পুরুষ তরবারি তথা ধারাল তরবারি বলা হয়। আর বলা হয় رجل ذكر –পুরুষ ব্যক্তি। এর দ্বারা নিজ কাজে করিৎকর্মা শক্তহাতে ধারণকারী দৃঢ়সঙ্কল্প উদ্দেশ্য করা হয়। ইব্ন উআয়াইনা (র.) যদি পুরুষরূপে গণ্য করা দ্বারা এ অর্থ উদ্দেশ্য করে থাকেন, তবে তাও ব্যাখ্যাকারগণের মতসমূহের একটি মতরূপে স্বীকৃত হবে। কেননা, যদি আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তা দ্বারা সে অর্থই উদ্দেশ্য হবে যা আমরা তার ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করেছি। যদিও এ অর্থে পঠিত পাঠরীতি আমাদের পসন্দনীয় পাঠরীতির বিপরীত হোক না কেন। যে কিরাআত অনুসারে تذكر শব্দটিতে كاف (কাফ) অক্ষরটি তাখফীফ তথা তাশদীদবিহীনভাবে পঠিত হয়েছে। অথচ কোন ব্যাখ্যাকার আয়াতাংশের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ অর্থে তাঁর পাঠরীতি গ্রহণ করেছেন, এমনটি আমাদের জানা নেই। কাজেই, সাধারণভাবে আমরা যা উল্লেখ করেছি এবং পসন্দ করেছি, তাই উত্তম ব্যাখ্যা।

اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى –এর ব্যাখ্যা ঃ

যাঁরা আমাদের ব্যাখ্যার অনুরূপ তাফসীর করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৩৬৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ ত'আলার বাণী ঃ

وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى ـ

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন, অচিরেই অধিকার বা হকসমূহ সাব্যস্ত হবে, তাই আল্লাহ্ পাক একে অন্যের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। কাজেই, তোমরা মহান আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার গ্রহণ কর। কেননা, তাতেই তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি সর্বাধিক আনুগত্য এবং তোমাদের সম্পদের জন্য অধিকতর নিরাপত্তা। আমার জীবনের শপথ, কেউ যদি মুত্তাকী হয়, তবে পবিত্র কুরআন তার জন্য মঙ্গলই বৃদ্ধি করবে। পক্ষান্তরে পাপাচারী ব্যক্তি যখন জানল যে, এ বিষয়ের উপর সাক্ষ্য রয়েছে, তখন তার কর্তব্য হলো যথারীতি তা আদায় করে দেয়া।

৬৩৬৫. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি স্ত্রীলোক দু'জনের একজন ভুলে যায়, তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।

৬৩৬৬. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, স্ত্রীলোক দু'জনের একজন যদি সাক্ষ্যের বিষয় ভুলে যায়, তবে অপরজন স্মরণ করিয়ে দিবে।

৬৩৬৭. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا অর্থাৎ যদি স্ত্রীলোক দু'জনের একজন ভুলে যায়, তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।

৬৩৬৮. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, فَتُذَكِّرَ শব্দটিতে উভয় প্রকার পাঠরীতিই সঠিক এবং উভয়ই সমপর্যায়ভুক্ত। আমরা শব্দটিকে فَتُذَكِّرَ রূপে পাঠ করি।

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষীগণকে সাক্ষ্য দানের জন্য আহ্বান করা হলে তাতে সাড়াদানে অস্বীকৃতি জানাতে নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো সাক্ষীগণকে যখন লিখিত চুক্তিপত্র ও হকসমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তারা সে আহ্বানে সাক্ষ্যদানে অস্বীকার করবে না।

যাঁরা এ অভিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৩৬৯. কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এক ব্যক্তি বিশাল এক ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় ছুটাছুটি করছিল। সেখানে একটি গোত্র বাস করত। লোকটি তাদেরকে সাক্ষ্যদানের প্রতি আহবান করল। কিন্তু তাদের মধ্য হতে একটি লোকও তার ডাকে সাড়া দিল না। বর্ণনাকারী বলেন, কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এরূপ করতেন وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا لِيَشْهَدُوا الرَّجُلَ عَلَىٰ رَجُلٍ সাক্ষীগণকে যখন সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবে না।

৬৩৭০. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এক ব্যক্তি ঘন বসতিপূর্ণ এক সম্প্রদায়ের নিকট ছুটাছুটি করছিল এ উদ্দেশ্যে যে, যেন তারা সাক্ষ্যদান করে। কিন্তু তাদের মধ্য হতে কেউই তার আহবানে সাড়া দেয় নি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

৬৩৭১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, যখন তোমাকে সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তুমি সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপই বলেছেন। তবে তাঁরা এও বলেছেন যে, এ দায়িত্ব সে সাক্ষীর ওপর আবশ্যিক হবে, যাকে অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয়েছে এবং সে ব্যতীত অপর কাউকে সাক্ষ্যদানের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না। আর যে ক্ষেত্রে অন্য কাউকে সাক্ষ্যদানের জন্য পাওয়া যাবে, সে ক্ষেত্রে আহূত ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে– ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৩৭২. হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাক্ষী ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য দেবে, ইচ্ছা না করলে সাক্ষ্য না দেবে। কিন্তু যদি অপর কাউকে সাক্ষ্যদানের জন্য পাওয়া না যায়, তবে অবশ্যই সাক্ষ্য দেবে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, আহ্বানকারী যখন সাক্ষীকে সাক্ষ্যদান করা ও সাক্ষ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তার নিকট যে তথ্য রয়েছে, তা উপস্থাপিত করার জন্য আহ্বান করবে, তখন সাক্ষ্যদানকারিগণ সাক্ষ্যদানে সাড়া দেয়ায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৩৭৩. হাসান (র.) হতে বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, উপস্থাপন করা ও সাক্ষ্যদান করা।

৬৩৭৪. মা'মার (র.) হতে বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, হাসান (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন যে, এখানে দু'টি আদেশ একত্রিত হয়েছে। একটি হলো এই যে, যখন তোমার নিকট সাক্ষ্য বিদ্যমান, তখন তুমি সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না। দ্বিতীয়টি হলো, যখন তোমাকে সাক্ষ্যদানের জন্য আহবান করা হবে, তখন তুমি তাতে সাড়াদানে অস্বীকার করবে না।

৬৩৭৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানদের মধ্য হতে যখন কেউ তার মুখাপেক্ষী হবে, তখন তার নিকট সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে সাক্ষ্যদানের জন্য হাযির হবে এবং তাকে আহ্বান করা হলে তা অস্বীকার করা তার জন্য বৈধ হবে না।

৬৩৭৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, উপস্থাপন করার জন্য। আর যখন তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য হাযির হতে এবং সাক্ষ্যের বিষয় উপস্থাপন করতে আহ্বান করবে, তখন সে এ বিষয়ে অস্বীকার করবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো, সাক্ষীগণকে যখন তাদের নিকট সাক্ষ্য সম্পর্কিত যে সকল তথ্য রয়েছে, সে সকল বিষয়ে সাক্ষ্যদান করার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তারা আহ্বানকারীর ডাকে সাক্ষ্য উপস্থাপনে সাড়া দেয়ার প্রশ্নে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৩৭৭. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন সে সাক্ষ্য দিবে।

৬৩৭৮. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যেহেতু তারা ইতিপূর্বে সাক্ষ্য দিয়েছে।

৬৩৭৯. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তারা সাক্ষ্য দিয়ে থাকবে।

৬৩৮০. মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে বলেছেন, যখন তোমার নিকট সাক্ষ্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী রয়েছে এবং তোমাকে আহবান করা হয়েছে।

৬৩৮১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমার নিকট সাক্ষ্য বিষয়ক তথ্য বিদ্যমান থাকলে তা প্রতিষ্ঠিত কর। তারপর তোমাকে যখন সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয়, তখন তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে তুমি তথায় গমন কর, আর যদি তুমি ইচ্ছা না কর, তবে তুমি তথায় গমন কর না।

৬৩৮২. ইমরান ইব্ন হুদায়র (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মাজলেযকে বললাম, একদল লোক আমাকে তাদের মধ্যে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকছে, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে সাক্ষ্যদান করা অপসন্দ করি। তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি যা অপসন্দ কর তা পরিহার কর। তারপর যখন তুমি সাক্ষ্যদান করবে, তখন তুমি আহূত হওয়ার পর তাতে সাড়া দাও।

৬৩৮৩. আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্যদানকারী সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত সাক্ষ্য দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে ইখতিয়ার রয়েছে।

৬৩৮৪. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করার কাজে।

৬৩৮৫. আবূ আমির আল–মুযানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আতা (র.)–কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে।

৬৩৮৬. হাসান (র.) হতে বর্ণিত। তাঁকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আমাকে আহবান করা হয়, অথচ তা আমি অপসন্দ করি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে আহ্বানে সাড়া নাও দিতে পার।

৬৩৮৭. মুগীরা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (র.)–কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান করা হলো। অথচ আমি ভুল করার আশঙ্কা করি। তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে সাক্ষ্য দিও না।

আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৩৮৮. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্বে যেহেতু সাক্ষ্য দিয়েছিল, কাজেই পরবর্তীতে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করতে পারবে না।

৬৩৮৯. সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সে হলো এমন ব্যক্তি, যার নিকট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।

৬৩৯০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাক্ষী যখন অবসর থাকবে, তখন সে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যদান করতে অস্বীকার করবে না।

৬৩৯১. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা (র.)–কে বললাম, وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর অর্থ কি? তিনি বললেন, তারা হলো সে সব লোক, যারা পূর্বে সাক্ষ্য দিয়েছিল। তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে, তার কোন ক্ষতি করা যাবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আতা (র.)–কে বললাম, এটা কেমন যে, যখন তাকে লেখার জন্য ডাকা হয়, তখন তার উপর অস্বীকার না করা ওয়াজিব, আর যখন তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয়, তখন তার সাক্ষ্যদান করা ওয়াজিব হয় না? তিনি বললেন, ব্যাপারটি এরূপই। লেখকের উপর লিখে দেয়া ওয়াজিব, আর সাক্ষী যদি ইচ্ছা করে সাক্ষ্য দেয়া তার জন্য ওয়াজিব নয়। কারণ, সাক্ষী অনেকেই পাওয়া যায়।

৬৩৯২. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাক্ষী যখন সাক্ষ্য দিয়েছে, তখন তাকে যদি ঘটনাস্থলে এসে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকা হয়, তবে সে তা অস্বীকার করতে পারবে না।

৬৩৯৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান (র.) وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ –এর ব্যাখ্যায় বলতেন যে, যখন তার নিকট সাক্ষ্য বিষয়ক তথ্য বিদ্যমান এবং তাকে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডাকা হয়েছে, সে যেন তা অস্বীকার না করে।

৬৩৯৪. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি তার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করে, অথবা কোন ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য চাওয়া হয়েছে এবং সে তার সাক্ষ্য দিয়েছে। আর সে সাক্ষীকে ও লেখককে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়েছে, তখন তাদের কর্তব্য হলো, এ ডাকে সাড়া দেয়া এবং যে সাক্ষ্যদানে ডাকা হয়েছে, সে সাক্ষ্য দেয়া।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, এ হলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সাড়াদান সম্পর্কিত একটি আদেশ। যে আদেশে পুরুষ ও মহিলা উভয়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যখন তাকে সত্য ঘটনার উপর সাক্ষ্যদান করার জন্য ডাকা হয়েছে, যা এমন একটি ঘটনা, যে বিষয়ে সে আগে সাক্ষ্য দেয়নি, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া তার জন্য মুস্তাহাব, ফরয নয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৩৯৫. আতিয়্যাহ আওফী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, তুমি সাক্ষ্য দান কর। এমতাবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য দিতেও পারো, নাও দিতে পারো।

৬৩৯৬. আতা (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এসবের মধ্যে সঠিক বক্তব্য হলো, তাঁদের যাঁরা বলেছেন যে, এর অর্থ– যখন সাক্ষিগণকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য শাসক অথবা বিচারকের নিকট ডাকা হবে, তখন সাক্ষিগণ তাতে সাড়াদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে না। এ বক্তব্যটি উত্তম একথা আমরা এজন্য বলেছি যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَلَايَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَادُعُوْا সাক্ষিগণকে সাক্ষ্যদানের জন্য আহ্বান করলে তারা যেন অস্বীকার না করে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাক্ষ্যদানের জন্য প্রদত্ত আহ্বানে সাড়া দেয়ার আদেশ করেছেন, আর তাদেরকে সাক্ষিগণ اشهداء রূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। অথচ তারা ইতিপূর্বে সাক্ষ্যদান করা ব্যতীত তাদেরকে সাক্ষিরূপে আখ্যাদান করা জায়িয নয়। সুতরাং বুঝা গেল, যে বিষয়ে সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষীগণ রূপে আখ্যাদান করা হয়েছে তারা সে বিষয়ে পূর্বাহ্নে সাক্ষ্য দিয়েছে। কেননা, কোন বিষয়ে তারা সাক্ষ্যদান করার পূর্বে তাদেরকে সাক্ষিগণ اشهداء বলা জায়িয নেই। যেহেতু যদি এ নামের সাথে তাদেরকে আখ্যায়িত করা হয়, অথচ তারা এমন বস্তুর উপর সাক্ষ্য দান করেনি, যার প্রেক্ষিতে তার জন্য এ নামটি যথার্থ হয়, তবে পৃথিবীর বুকে এমন কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না, যিনি এ মত পোষণ করবেন যে, এ লোকটিকে এ অর্থে সাক্ষী বলা হবে, সে অচিরেই সাক্ষ্যদান করবে কিংবা এ অর্থে যে, সে সাক্ষ্যদানে যোগ্যতাসম্পন্ন। যদিও এ নামের সাথে কাউকে নামকরণ করা অশুদ্ধ। তবে, যার নিকট অন্যের জন্য সাক্ষ্য বিদ্যমান কিংবা যে ব্যক্তি ইতিমধ্যে তার সাক্ষ্য আদায় করেছে, তার জন্য এ নাম আবশ্যিক হবে। কাজেই, একথা সুবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَلَايَاْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَادُعُوْا –এর দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যার বৈশিষ্ট্য আমরা উল্লেখ করেছি অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করেছে কিংবা পূর্বাহ্নে সাক্ষ্যদান করেছে, তারপর তাকে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি সাক্ষ্যদান করেনি এবং সাক্ষ্য বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করেনি, সাক্ষ্যদানের পূর্বে সে ব্যক্তিকে সাক্ষী বলা যায় না।

এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তারপর اَلشُّهَدَاءُ শব্দে আলিফ ও লাম অব্যয় ব্যবহার একথার প্রতি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যারা সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তারা কতিপয় পরিচিত ব্যক্তি এবং তারা সাক্ষ্যের বিষয়ে সম্যক অবগত। তারাই সে সকল লোক, যাদেরকে সাক্ষ্যরূপে দাঁড় করানোর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণীঃ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ- দ্বারা আদেশ দান করেছেন। বিষয়টি যখন এরূপই, তখন একথা স্পষ্ট যে, তাদেরকে আহ্বান করে সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে এবং তাঁরা সাক্ষ্যদান করেছে। আর যদি জনগণের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয়, তবে সেক্ষেত্রে এরূপ বলা হতো وَلَايَاْبَ شَاهِدٌ اِذَا مَادُعِىَ (যখন কোন সাক্ষীকে ডাকা হবে, তখন সে অস্বীকার করবে না।) আর যখন ঘটনাটি এমন স্থানে ঘটে, যেখানে সাক্ষ্যদানে উপযোগী অপর কেউ উপস্থিত না থাকে, এরূপ ক্ষেত্রে আহবানে সাড়া দিয়ে সাক্ষ্যদান করা তার উপর ফরয। যেমন লেখককে লিখে দেয়ার দাবী জানান হলে যদি সে স্থানে সে ব্যতীত অপর কোন লেখক উপস্থিত না থাকে, তবে তার উপর তা করা ফরয। যেরূপ কেউ যদি এমন স্থানে উপস্থিত হয়, যেখানে সে ব্যতীত অন্য কেউ ঈমান ও শরীআতের বিধানাবলী

সম্পর্কে অবগত নয়, আর সেখানে তার নিকট ঈমান ও আল্লাহ্‌র বিধানাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ এক ব্যক্তি এসে হাযির হয় এবং তাকে এ সকল বিষয় শিক্ষাদান করা ও তদ্বিষয়ে ব্যাখ্যাদানের আবেদন করে, তখন সে ব্যক্তির কর্তব্য হবে তাকে তা শিক্ষা দেয়া এবং তার নিকট এ সকল বিষয় ব্যাখ্যা করা। কিন্তু আমরা এ আয়াতের দ্বারা কোন ব্যক্তির উপর সাক্ষ্যদানে সাড়া দেয়াকে এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াজিব বলব না, যখন তাকে প্রথমত, এমন বিষয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয়েছে যার উপর সে সাক্ষী হয়েছে। বরং আমরা তা ছাড়া অন্যবিধ দলীল–প্রমাণ সাপেক্ষে ওয়াজিব বলব। আর তা হলো সে সকল দলীল–প্রমাণ যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর আমরা কোন ব্যক্তির উপর তার মুসলিম ভাইয়ের হক ইত্যাদি যা কিছু নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলো প্রতিপালন করা ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছি। আয়াতে উল্লিখিত شهداء শব্দটি شهيد এর বহুবচন।

وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ط ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ط وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ص وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ط وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ـ

ঋণ ছোট হোক অথবা বড় হোক মিয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হবে না। আল্লাহ্‌র নিকট তা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর, কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান–প্রদান কর, তা তোমরা না লেখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর, তখন সাক্ষী রাখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে তা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তোমরা যারা মানুষের সাথে পরস্পর ঋণের কারবার কর নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত তোমরা বিষয়টি ছোট হোক বা বড় হোক সঠিক মিয়াদসহ লিপিবদ্ধ করতে বিরক্তিবোধ কর না। কেননা, মিয়াদ ও মালের হিসাব লিপিবদ্ধ রাখা অধিক নিরাপদ।

৬৩৯৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا تَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এ আদেশটি ঋণ সম্পর্কিত। আর আল্লাহ্ পাকের বাণী لَاتَسْئَمُوْا –এর অর্থ হলো তোমরা বিরক্ত হয়ো না। বলা হয়, مِنْهُ سَئِمْتُ –আমি তার থেকে বিরক্ত হয়েছি। اَنَا اَسَامُ – আমি বিরক্ত হব। এর মাসদার হলো ঃ سَامَةً ও شَامَةً – যেমন কবি লবীদ বলেছেনঃ

وَلَقَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاةِ وَطُوْلِهَا * وَسُؤَالِ هٰذَا النَّاسِ كَيْفَ لَبِيْدُ ـ

আমি তো হায়াত ও তার দীর্ঘ জীবনের উপর বিরক্ত। লবীদ কেমন মানুষ? এ বিষয়ের প্রশ্নের উপরও বিরক্ত হয়ে পড়েছি।

কবি যুহায়র বলেছেন ঃ سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ + ثَمَانِيْنَ عَامًا لَا اَبَالَكَ يَسْاَمْ

"আমি জীবনের কষ্ট-ক্লেশের উপর বিরক্ত হয়ে পড়েছি। আর যে ব্যক্তি আশি বছর বেঁচে থাকে তোমার পিতার মরণ হোক।" অর্থাৎ আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। আর কোন কোন বসরী নাহু শাস্ত্রবিদ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِلَى اَجَلِه - এর ব্যাখ্যা اجل الشاهد -সাক্ষীর মেয়াদ পর্যন্ত। আর এর অর্থ হলো, যে মিয়াদের উপর সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। আমরা এতদ্ সম্পর্কিত বক্তব্য ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ "ذٰلِكُمْ" দ্বারা নির্ধারিত মিয়াদসহ ঋণপত্র লিপিবদ্ধকরণের অর্থ বুঝানো হয়েছে। আর তাঁর বাণীঃ اقسط দ্বারা 'ন্যায্যতর' অর্থ বুঝানো হয়েছে। এ অর্থেই বলা হয়, اقسط الحاكم অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক। তাথেকেই নিষ্পন্ন হয় يقسط (সে ন্যায়নিষ্ঠ হবে), মাসদার اقساط কর্তৃকারক বিশেষ্যে مقسط (ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি যখন সে তার বিচারকার্যে ন্যায়নিষ্ঠ হলো এবং তাতে সত্যে উপনীত হয়েছে)। আর যদি সে অবিচার বা অন্যায় আচরণ করে, তখন তা قسط يقسط قسوط থেকে হবে। এ অর্থেই আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَ اَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا আর অত্যাচারিগণ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। (৭২ঃ১৫) অর্থাৎ الجائرون অত্যাচারিগণ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি তাফসীরকারগণের একদল এরূপ বলেছেন। যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা ঃ

৬৩৯৮. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো "اعدل عند الله" - আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিকতর ন্যায্য।

وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত বাণী দ্বারা সাক্ষ্যের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধ এ অর্থ বুঝিয়েছেন। আর এ শব্দটির মূল হলো, বক্তার উক্তি "اقمت من عوجه" আমি এটিকে বক্রতা হতে সঠিক করেছি। যখন সে সেটিকে সোজা করেছে এবং তা সোজা হয়ে গেছে। লেখার কাজটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খুবই ন্যায্য বিষয় এবং তাতে যা লেখা হয়, তাও সাক্ষিগণের সাক্ষ্যদানের জন্য অধিকতর নির্ভুল। কারণ, ক্রেতা-বিক্রেতা এবং ঋণদাতা ও গ্রহীতা যেসব শব্দ দ্বারা নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে, তা সবই ঋণপত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং সাক্ষিগণের মধ্যে সাক্ষ্য সংশ্লিষ্ট শব্দাবলী নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হবে না। যেহেতু ঋণপত্রে অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলীর উপরই তাদের সাক্ষ্য একই রূপ হবে। তাদের মধ্যে ফয়সালা অধিকতর স্পষ্ট হবে, যখন তারা কোন বিচারকের নিকট যাবে, তখন তাদের মধ্যে ফয়সালা অধিকতর সহজ হবে। অন্যান্য কারণেও লেনদেনের বিষয়টি লিপিবদ্ধকরণ ফয়সলা নির্ভুল হওয়ার জন্য অধিক সহায়ক। আর তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিকতর পসন্দনীয় এজন্য যে, তিনি এর আদেশ করেছেন।

وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا -এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اَدْنٰى দ্বারা অধিকতর নিকটবর্তী অর্থ বুঝানো হয়েছে। শব্দটি دنو হতে নিষ্পন্ন ; আর তা হলো قرب -নৈকট্য। আর আল্লাহ্‌র বাণীঃ اَنْ لَّا تَرْتَابُوْا -এ অর্থ হলো, যেন তোমরা সাক্ষ্যদান ক্ষেত্রে সংশয়ে পতিত না হও।

৬৩৯৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এর অর্থ হলো, যেন তোমরা সাক্ষ্য বিষয়ে সংশয়ে পতিত না হও। আর تَرْتَابُوا শব্দটি ريبة ও বাবে افتعال থেকে আগত। আয়াতাংশের অর্থ হলো ঃ হে সম্প্রদায়! তোমরা হক কথা লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করনা যা তোমরা পরস্পরে লেনদেনের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ কর। ঘটনাটি যতই ছোট বা বড় হোক না কেন। কারণ, তোমাদের এই লিখে রাখা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এবং তোমাদের সাক্ষীগণ তদুপর সাক্ষ্যদানে অধিকতর নির্ভুল থাকবে। আর ঘটনাটি বিস্তারিত লিখে রাখলে তোমরা কখনও সন্দেহে পতিত হবে না।

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا –এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থ ঃ কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসার নগদ আদান–প্রদান কর, তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। খাতকদের নিকট প্রাপ্য হকসমূহ লিপিবদ্ধকরণে বিরক্তিবোধ না করার আদেশের পর আল্লাহ্ তা'আলা পারস্পরিক নগদ লেনদেনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হককে তা থেকে পৃথক করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা বর্জন করার প্রশ্নে ইখতিয়ার দান করেছেন। কেননা, বিক্রেতা ও ক্রেতা তাদের হক তাৎক্ষণিকভাবে হস্তগত করে থাকে। যেহেতু পারস্পরিক ক্রয়–বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের জন্য যে হক সাব্যস্ত হয়, পরস্পরের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাদের জন্য সে হক (মূল্য ও বিক্রীত বস্তু) হস্তগত করা ওয়াজিব। কাজেই, এক্ষেত্রে তাদের কোন পক্ষেরই অপর পক্ষের জন্য তা লিখে দেয়ার প্রয়োজন নেই। অথচ তারা উভয়ে নিজ নিজ হক হস্তগত করেছে। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ("হ্যাঁ, যদি তা সাক্ষাত লেনদেন যা তোমরা পরস্পরের মধ্যে সম্পাদন করে থাক)। তাতে কোন মিয়াদ নেই, কোন বিলম্ব নেই এবং ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। কাজেই, এরূপ ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ না করায় কোন দোষ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা তা লিপিবদ্ধ না করায় কোন দোষ নেই। অর্থাৎ নগদ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ না করায় কোন দোষ নেই। এ প্রসঙ্গে আমরা যা বলেছি একদল ব্যাখ্যাকারও তদ্রূপ বলেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৪০০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "যেমন শহর–বন্দরে তোমরা এরূপ লেনদেন প্রত্যক্ষ করে থাক, যাতে তোমরা এক হাতে গ্রহণ কর ও অপর হাতে প্রদান কর। এরূপ লেনদেনকারিগণের জন্য তা লিপিবদ্ধ না করায় কোন দোষ নেই।

৬৪০১. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ হতে فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا পর্যন্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত লেনদেন স্বল্প পরিমাণ কিংবা অধিক পরিমাণ হোক, মিয়াদসহ তা লিপিবদ্ধ করতে বিরক্তিবোধ না করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন। আর যে লেনদেন হাতে হাতে হয়, তা স্বল্প পরিমাণ কিংবা অধিক পরিমাণ হোক, তাতে সাক্ষ্য রাখার আদেশ করেছেন। তা লিবিপদ্ধ না করার ক্ষেত্রেও তাদেরকে ইখতিয়ার দান করেছেন। কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতাংশের পাঠ পদ্ধতিতে একাধিক মত পোষণ করেছেন। হিজায,

ইরাকেরও সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ –কে পেশযোগে পাঠ করেছেন। আর কূফাবাসী কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ তা যবর দিয়ে পাঠ করেছেন। তা আরবী ভাষায় চালু আছে। যেহেতু আরবগণ كان –এর সঙ্গে নাকারাসমূহ ও না'তসমূহকে যবর দিয়ে থাকে এবং তৎসঙ্গে كان –এর মধ্যে কর্মবাচ্য পদ উহ্য সাব্যস্ত করে। যেমন বলা হয়ে থাকে, اِنْ كَانَ طَعَامًا طَيِّبًا فَاْتِنَا بِهٖ অনুরূপভাবে পেশ দিয়েও পাঠ করা হয়। اِنْ كَانَ طَعَامٌ طَيِّبٌ فَاْتِنَا بِهٖ এরূপ ক্ষেত্রে নাকারা তার খবরের ইরাবের অনুরূপ ইরাবসহ তার অনুগামী হয়। উপরোল্লিখিত পাঠ পদ্ধতির মধ্যে আমরা যে পাঠ পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করেছি এবং এ ছাড়া অন্যবিধ পাঠ পদ্ধতি আমরা সঠিক মনে করি না, তা হলো, التجارة الحاضرة –কে পেশযোগে পাঠ করা। যেহেতু কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আর যাঁরা শব্দটিকে যররযোগে পাঠ করেছেন, তাঁরা তাঁদের মধ্যে সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘুর মত দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

এরূপ শব্দকে যবরযোগে পড়ার নজীর, যেমন কোন আরব্য কবি বলেছেনঃ

اَعَيْنَىَّ هَلاَّ تَبْكِيَانِ عِفَاقًا * اِذَا كَانَ طَعْنًا بَيْنَهُمْ وَعِنَاقًا

"একথা আমাকে হতবাক করেছে যে, তারা দু'জন কি নির্মল চরিত্রের জন্য ক্রন্দন করে না? যখন তাদের মধ্যে বিরাজ করছে মনোমালিন্য ও শত্রুতা।"

অন্য একজন কবি বলেছেনঃ

وَلِلّٰهِ قَوْمِى اَىُّ قَوْمٍ لِحُرَّةٍ * اِذَا كَانَ يَوْمًا ذَا كَوَاكِبَ اَشْنَعَا-

"মহান আল্লাহ্র শপথ। আমার সম্প্রদায় কতইনা হতভাগা। তাদের দিনগুলো অলক্ষুণে তারকারাজির প্রভাবাধীন অবস্থান করছে।"

নাকারাসমূহের ক্ষেত্রে আরবগণ এরূপ আমল এজন্য করে থাকে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি যে, নাকারার খবর তার ইস্মের অনুকরণের গণ্য যবর ধারণ করে। আর তার হুকুম হতে একটি হুকুম হলো, তার সঙ্গে পেশযুক্ত ইস্ম ও যবরযুক্ত ইস্ম হবে। কাজেই যখন তারা উভয় ইস্মকেই পেশযোগে পাঠ করবে, তখন ইসমগুলো পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হবে। আর তা খবরের অনুগামী হওয়ার প্রেক্ষিতে করা হবে। আর যখন তারা উভয় ইসমকে যবরদান করবে, তখন তারা كان –এর সঙ্গে যুক্ত ইসমটিকে পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহার করবে। এমতাবস্থায় শব্দটি পেশযোগে ও যবরযোগে পঠিত হবে। তারা এখানে নাকারাকে এমতাবস্থায় পেয়েছে যে, তার খবর তার অনুগামী রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তারা كان –এর মধ্যে একটি ইস্মে মাজহুল উহ্য হিসাবে গণ্য করেছে। যেহেতু তা যমীরের সম্ভাবনাযুক্ত ছিল।

আর কেউ কেউ এ ধারণা করেছে যে, যাঁরা আয়াতটিকে পেশযোগে اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ রূপে পাঠ করেছেন, তাঁরা শব্দটিকে تكون –এর স্থলে يكون অর্থে গণ্য করে রফা –এর সহিত পাঠ করেছেন। সুতরাং তাঁরা ধারণা করেছেন যে, শব্দটিকে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের "ياء" যোগে يكون পাঠ করা আবশ্যিক ছিল। কিন্তু তাঁরা ইরাব–এর দিক বিচার করে শব্দটির সঠিক পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করেছেন এবং তজ্জন্য এমন বস্তুকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন যা তজ্জন্য আবশ্যিক

ছিল না। আর তা এই যে, আরবগণ যখন كان –এর সঙ্গে নাকারা শব্দকে তার না'তসহ কিন্তু খবরসহ স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার করে, তখন তারা কখনো كان –কে স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার করে, আবার কখনো তাকে পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহার করে। সে হিসাবে তারা কখনো বলে ان كانت جارية صغيرة فاشتروها আবার কখনো বলে وان كان جارية صغيرة فاشتروها অর্থাৎ كان ফি'লে নাকিসকে পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহার করে। আর কখনো বিশেষণরূপে ব্যবহৃত নাকারা নসবযুক্ত হয়, কিংবা রফাযুক্ত হয়। আর কখনো তা স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়।

আর কোন কোন বসরী নাহুশাস্ত্রবিদ এ ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً মধ্যস্থিত تجارة حاضرة রফাযোগে পঠিত হয়েছে। এ হিসাবে যে, كان অব্যয়টি পূর্ণত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাতে খবরের মুখাপেক্ষিতা নেই। যার অর্থ হলো, "الا ان توجد" অথবা "الا ان تقع" কিংবা "الا ان تحدث" –এমতাবস্থায় সে তার নিজের জন্য এমন বস্তুকে অপরিহার্য করে নিল, যা তার জন্য অবশ্যম্ভাবী ছিল না। কেননা, তার জন্য এটা তখনই অবশ্যম্ভাবী হবে, যখন كان –এর জন্য কোন নসবযুক্ত (منصوب) পাওয়া যাবে না। আর التجارة الحاضرة শব্দটিকে রফাযুক্ত পাওয়া যাবে। আর সে এ বিষয়ে অসতর্ক ছিল যে, আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ উপরোক্ত كان ফি'লে নাকিসা –এর খবররূপে পতিত হওয়া জায়িয আছে। যা দ্বারা সে তার জন্য যা অবশ্যম্ভাবী করেছে, তা তাঁর না হলেও চলতো।

বসরী নাহুশাস্ত্রবিদগণের উক্তি হিসাবে আমি যা উধৃত করেছি, তা আরবী ভাষার দিক হতে অশুদ্ধ নয়। তবে আমরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তাই আরবী ভাষার সংগে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ এবং অর্থগতভাবে বিশুদ্ধতম। আর তা হলো এই যে, تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ –এর মধ্যে দু'টি অবস্থা হতে পারবে। একটি হলো এই যে, তা নসবের স্থলে অবস্থিত। কারণ, তা كان –এর খবর হিসাবে এবং التجارة الحاضرة তার ইসিমরূপে উল্লিখিত হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থা হলো এই যে, تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ বাক্যাংশটি التجارة الحاضرة –এর অনুসরণে রফা–এর স্থলে অবস্থিত রয়েছে। কেননা, নাকারার খবর ইরাবের দিক বিচারে নাকারার অনুসরণ করে থাকে। এ অবস্থায় বাক্যাংশটির অর্থ হবে الا ان تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم –।

وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, তোমরা স্বল্প পরিমাণ কিছু ক্রয়–বিক্রয় কর কিংবা অধিক পরিমাণ কিছু বিক্রয় কর, তার উপর সাক্ষী রাখ। তোমাদের পারস্পরিক হক সম্পর্কিত বিষয়ে যে ক্রয়–বিক্রয় তাৎক্ষণিক লেনদেনের মাধ্যমে অথবা সময় সাপেক্ষ লেনদেনের মাধ্যমে ক্রয়–বিক্রয় হয় সর্বাবস্থায় তোমরা সাক্ষী রাখ। কেননা, আমি তোমাদের শুধু লিপিবদ্ধ করার প্রশ্নেই ইখতিয়ার দিয়েছি, সে সকল ক্ষেত্রে, যেখানে পারস্পরিক হক সম্পর্কিত লেনদেন হাতে হাতে উপস্থিতভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা যার নিকট বিক্রয় করেছ বা যার নিকট হতে ক্রয় করেছ, সে বিষয়ে সাক্ষী রাখা বর্জন করায় আমার পক্ষ হতে কোনরূপ ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। কেননা, এরূপ লেনদেনের সাক্ষী না রাখার মধ্যে উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতির আশংকা রয়েছে। ক্রেতার ক্ষতি, যেমন, যদি বিক্রেতা বিক্রীত বস্তু অস্বীকার করে এবং যা সে বিক্রয় করেছে তার উপর তার মালিকানার সমর্থনে দলীল থাকে। অথচ ক্রেতার

সমর্থনে উক্ত বস্তুটি ক্রয় করার উপর কোন দলীল নেই। এমতাবস্থায় শরীআত মুতাবিক শপথসহ বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং উক্ত মাল তারই জন্য সাব্যস্ত হবে। ফলে, ক্রেতার মাল তথা প্রদত্ত মূল্য বাতিল হয়ে যাবে। আর বিক্রেতার ক্ষতি, যেমন, ক্রেতা যদি ক্রয় করার কথা অস্বীকার করে, অথচ বিক্রীত বস্তুর উপর হতে বিক্রেতার মালিকানা রহিত হয়ে গিয়েছে, আর তার জন্য ক্রেতার নিকট হতে বিক্রীত বস্তুর মূল্য গ্রহণ করা ওয়াজিব হয়েছে। এমতাবস্থায় শরীআতের হুকুম মত সে এ প্রসঙ্গে শপথ করবে। আর তাতে ক্রেতার নিকট হতে মূল্য গ্রহণ করা সম্পর্কিত বিক্রেতার হক বাতিল হয়ে যাবে। এজন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা উভয় পক্ষকে সাক্ষ্য রাখার আদেশ করেছেন, যাতে কোন পক্ষের হকই অন্য পক্ষের দ্বারা বিনষ্ট না হয়।

তাফসীরকারগণ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ –এর ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে ক্রয়–বিক্রয়কালে সাক্ষ্য রাখা ওয়াজিব হিসাবে প্রদত্ত আদেশ, না, তা মুস্তাহাব হিসাবে প্রদত্ত আদেশ? তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ আদেশটি মুস্তাহাব হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইচ্ছা করলে সাক্ষ্য রাখবে, না হয় রাখবে না।

যাঁরা এরূপ মত পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৪০২. শা'বী বর্ণিত। তিনি وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তুমি ইচ্ছা করলে সাক্ষী রাখতে পার, নাও রাখতে পার। কারণ, তুমি আল্লাহ্র বাণীঃ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ (তারপর যদি তোমাদের কেউ অন্য কারো উপর আস্থা রাখে, তবে যার উপর আস্থা রাখা হয়েছে, সে যেন তার কাছে রক্ষিত আমানত প্রত্যর্পণ করে)–এর প্রতি কি কর্ণপাত করছ না?

৬৪০৩. ইব্ন সাবীহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (র.)–কে বললাম, আপনি মহান আল্লাহ্র বাণীঃ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ –এর প্রতি লক্ষ্য করেছেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, তুমি যদি সে বিষয়ে সাক্ষী রাখ, তবে তা তোমার জন্য সে হক সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য দলীল হবে। আর যদি তুমি সাক্ষী না রাখ, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

৬৪০৪. ইব্ন সাবীহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান (র.)।–কে বললাম, হে আবূ সাঈদ (র.)! আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ –এর মর্মানুসারে আমি কি এমন কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করব এবং আমি জানি যে, সে ব্যক্তি দু'মাস কি তিন মাসের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করবে না? তবে আপনি কি আমার জন্য এটা দোষণীয় মনে করেন যে, আমি তার উপর কোন সাক্ষী রাখলাম না? তিনি জবাবে বললেন, যদি সাক্ষী রাখ, তবে তা তোমার জন্য সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য দলীল হবে। আর যদি তুমি সাক্ষী না রাখ, তবে তাতে কোন দোষ নেই।

৬৪০৫. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ক্রেতা–বিক্রেতাগণ যদি ইচ্ছা করে, তবে তারা সাক্ষী রাখবে। আর যদি তারা ইচ্ছা না করে তবে সাক্ষী নাও রাখতে পারে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন যে, ক্রয়–বিক্রয়ের সাক্ষী রাখা ওয়াজিব।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৪০৬. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণীঃ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "কিন্তু তোমরা যখন ক্রয়–বিক্রয় কর, তখন তোমরা তার সাক্ষী রাখবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেছেন নগদ যে লেনদেন করা হবে, তার সাক্ষী রাখতে। চাই তা ক্ষুদ্র লেনদেন হোক বা বৃহৎ হোক।

৬৪০৭. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। যে ক্রয়–বিক্রয় হবে, তাতে ক্রেতা–বিক্রেতা যদি ইচ্ছা করে সাক্ষী রাখবে, আর যদি ইচ্ছা না করে, সাক্ষী রাখবে না। যে ক্রয়–বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্য হবে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তা লিপিবদ্ধ করতে এবং তার সাক্ষী রাখতে আদেশ করেছেন। আর তা যথাস্থানে সম্পাদিত হবে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে উত্তম অভিমত হলো, প্রত্যেক বিক্রীত বস্তু ও খরিদ করা বস্তুর উপর সাক্ষী রাখা ফরয। যেমন, আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি আদেশই ফরয। হ্যাঁ, যদি কোন গ্রহণযোগ্য দলীলে একথা প্রমাণ হয় যে, এ আদেশটি মুস্তাহাব ও উপদেশ স্বরূপ বলা হয়েছে, তবে তা ভিন্ন কথা। আর যারা এরূপ বলেছেন যে, আল্লাহর বাণীঃ فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ দ্বারা এ আদেশ রহিত হয়ে গিয়েছে, আমরা ইতিপূর্বে তার বিপক্ষে দলীল, প্রমাণ পেশ করেছি। সুতরাং এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –এর ব্যাখ্যা ঃ

এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, তা ঋণপত্র লেখকগণ ও সে বিষয়ে সাক্ষিগণের প্রতি এমর্মে নিষেধাজ্ঞা, যেন তারা লিপিবদ্ধ করার সময় যা বলা হয়নি তা লিপিবদ্ধ না করে কিংবা সাক্ষী যা প্রত্যক্ষ করেনি তা সাক্ষ্য দিয়ে হকদারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৪০৮. তাউস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লেখক ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অর্থ হলো, এমন কিছু লেখা, যা লেখার কথা নয়। আর সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অর্থ হলো, সে যা প্রত্যক্ষ করেনি এমন বিষয় সাক্ষ্য দেয়া।

৬৪০৯. ইউনুস (র.) হতে বর্ণিত। হযরত হাসান (র.) বলতেন, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ –এর অর্থ হলো, মূল বিষয়ে কোন কিছু বৃদ্ধি করা বা পরিবর্তন করা। এবং وَلَا شَهِيْدٌ –এর অর্থ হলো, সাক্ষ্য গোপন না করা, আর যা সত্য তা ব্যতীত সাক্ষ্য না দেয়া।

৬৪১০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাক্ষী যেন সাক্ষ্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাককে ভয় করে। সে কোন সত্যকে কমাবে না এবং অসত্যকে বাড়াবে না। লেখক যেন তার লেখার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্কে ভয় করে এবং কোন সত্যকে বাদ না দেয়।

৬৪১১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَايُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَاشَهِيْدٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, لايضار كاتب অর্থাৎ যা লেখার কথা নয়, তা লেখা। আর لاشهيد অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ করেনি, তার সাক্ষ্য দেয়।

৬৪১২. কাতাদা (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা উধৃত রয়েছে।

৬৪১৩. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লেখক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অর্থ, তাকে যা লিখতে বলা হয়েছে তার বিপরীত লেখা। তিনি বলেন, আর সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত এভাবে হয় যে, তার সাক্ষ্যকে পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে সাক্ষ্য দান করা, যার ফলে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যা যা আমরা উধৃত করেছি, তার আলোকে শব্দটি মূলত وَلَايُضَارِرْ ছিল। এরপর راء কে راء –এর মধ্যে সন্ধি করা হয়েছে। যেহেতু এ দু'টি এক জাতীয় অক্ষর। আর উক্ত অক্ষরটিকে যবরযোগে হরকত দেয়া হয়েছে। যদিও তা জযমের স্থলেই অবস্থিত ছিল। কারণ, যবর সহজতর হরকত।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তার অর্থ হলো, লেখক ও সাক্ষী– তাদের নিকট ঘটনা সম্পর্কে যে জ্ঞান ও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে, তা প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে ডাকা হলে তারা তা থেকে বিরত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৪১৪. আতা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা হলো এই যে, তারা উভয়ে তাদের নিকট রক্ষিত বিষয় বিবৃত করবে।

৬৪১৫. জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা (র.)–কে বললাম, মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَايُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –এর অর্থ কি? তিনি বললেন, তাদের উভয়ের ক্ষতিগ্রস্ত না করার অর্থ হলো তাদের যা জানা আছে, তারা তা যথাযথ প্রকাশ করবে।

৬৪১৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –এর অর্থ হলো, যদি তাদেরকে সাক্ষ্য দানের উদ্দেশ্যে ডাকা হয়, তবে তারা বলবে, আমাদের অনেক ঝামেলা রয়েছে।

৬৪১৭. আতা ও মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তাঁরা وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَاشَهِيْدٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, লেখকের উপর লিখে দেয়া ওয়াজিব। আর সাক্ষী যদি পূর্বে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, তার উপর সে সাক্ষ্যদান করা ওয়াজিব।

অন্যান্য তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "বরং তার অর্থ, যার জন্য লেখা ও সাক্ষ্য প্রয়োজন, সে যেন লেখক এবং সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। তাঁদের ব্যাখ্যার আলোকে وَلَايُضَارَّ শব্দটিকে يُضَارَرْ পাঠ করেছেন।

যাঁরা এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৪১৮. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা.) আলোচ্য আয়াতাংশটি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ এভাবে তিলাওয়াত করতেন।

৬৪১৯. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) শব্দটিকে وَلَا يُضَارَر পাঠ করতেন।

৬৪২০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনিও وَلَا يُضَارَرْ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيْدٌ পাঠ করতেন। তিনি এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতেন, যার জন্য হক সাব্যস্ত সে ব্যক্তি গমন করবে এবং এর লেখক ও সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহবান করবে। সে হয়ত কোন প্রয়োজনীয় কাজে থাকতে পারে। কেননা, কোন কাজ বা প্রয়োজনের কারণে সে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য উপস্থিত না হতে পারলে সে গুনাহগার হবে। মুজাহিদ (র.) আরও বলেছেন ঃ সে তার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকবে না যে কারণে নিজের ক্ষতির আশংকা করবে।

৬৪২১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এখানে ক্ষতিগ্রস্ত করা হলো এই যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে যে, আমি তোমার মুখাপেক্ষী নই। আল্লাহ্ পাক আদেশ করেছেন যে, তোমাকে যখন ডাকা হবে, তখন তুমি তা অস্বীকার করবে না। এভাবে সে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, অথচ সে অন্য কাজে ব্যস্ত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আহ্বানকারীকে এরূপ কথা বলা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন– যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত (সাক্ষী ও লেখককে) কর, তবে তা তোমাদের জন্য পাপ।

৬৪২২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ – এর ব্যাখ্যায় বলতেন লেখক ও সাক্ষীর এমন কোন প্রয়োজন থাকতে পারে, যা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এমন অবস্থায় তাকে নিজ কাজে নিয়োজিত থাকতে দাও।

৬৪২৩. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তার (লেখক ও সাক্ষীর) কোন অসুবিধা থাকতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করনা।

৬৪২৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ – এর ব্যাখ্যায় বলতেন, কোন ব্যক্তি সাক্ষীর নিকট এসে এরূপ বলবে না যে, চল আমার জন্য লিখে দাও এবং আমার জন্য সাক্ষী দাও। তদুত্তরে সে বলল, আমার নিজস্ব কিছু প্রয়োজন রয়েছে, তুমি অন্য কাউকে তালাশ কর। আর সে তখন বলল, "আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয় তুমি আমার পক্ষে লিখে দিতে আদিষ্ট হয়েছ।" এটিই হলো তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। এরূপ ক্ষেত্রে তুমি তাকে তার হালে ছেড়ে দাও এবং অন্য কাউকে তালাশ কর। সাক্ষীর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য।

৬৪২৫. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কোন ব্যক্তি যখন লেখক অথবা সাক্ষীকে ডাকবে, তখন তারা বলবে, আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তখন যে ব্যক্তি তাদের উভয়কে ডাকবে সে বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উভয়কে আদেশ করেছেন যে, তোমরা লেখার ব্যাপারে ও সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাড়া দেবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এভাবে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।

৬৪২৬. উবায়েদ ইব্‌ন সুলায়মান বলেন, আমি দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -এর অর্থ হলো, ঐ ব্যক্তি যে লেখক অথবা সাক্ষিকে আহবান করল, যখন তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিল। তখন তারা উভয়ে বলল, আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে ব্যস্ত আছি, সুতরাং তুমি অপর একজনকে তালাশ কর। তখন আহবানকারী বলল, আল্লাহ্ তোমাদের উভয়কে আদেশ করেছেন যে, তোমরা উভয়ে এ আহবানে সাড়া দেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অন্য কাউকে তালাশ করতে এবং তাদের উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে আদেশ করেছেন। অর্থাৎ তাদের উভয়কে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হতে বিরত রাখবে না, যেহেতু সে তাদের উভয়কে ব্যতীত অন্যকে পাচ্ছে।

৬৪২৭. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তির ব্যস্ততা রয়েছে তুমি তার শরণাপন্ন হয়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সমীচীন নয়। যেমন তুমি তাকে বললে, আমার জন্য লিখে দাও, আর সে তা অমান্য না করে লিখে দিল, যার ফলে তার প্রয়োজন বিঘ্নিত হলো। অনুরূপ তোমার সাক্ষিগণের মধ্য হতে কোন সাক্ষী যে ব্যস্ত রয়েছে, তাকে তুমি এরূপ বলবে না যে, চল আমার জন্য সাক্ষ্য দাও, যা দ্বারা তুমি তাকে তার প্রয়োজন হতে বিরত রাখলে, অথচ তুমি অন্য কাউকে পেতে পার।

৬৪২৮. রবী' (র.) হতে বর্ণিত তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন আয়াত وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ লেখকের নিকট এসে বলত, আমার জন্য লিখে দাও। তখন সে উত্তরে বলত, আমি ব্যস্ত আছি কিংবা আমার প্রয়োজন রয়েছে, অতএব, অন্য কারো নিকট গমন কর। তখন সে তাকে বাধ্য করত এবং বলত, তুমি তো আমার জন্য লিখে দিতে আদিষ্ট হয়েছ। সুতরাং তুমি তা ত্যাগ করতে পার না। এভাবে সে লেখককে ক্ষতিগ্রস্ত করত, অথচ সে অন্য কাউকে পেতে পারত। আর কোন ব্যক্তি এসে বলত, আমার সঙ্গে চল এবং সাক্ষ্য দাও। তখন সে বলত, অন্য কারো নিকট যাও আমি ব্যস্ত আছি কিংবা আমার প্রয়োজন রয়েছে। তখন সে তাকে একথা বলে বাধ্য করত, তুমি তো আমাকে অনুসরণ করায় আদিষ্ট হয়েছ। এভাবে আহ্বানকারী ব্যক্তি লেখক বা সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করত অথচ সে অন্য কাউকে পেতে পারত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতাংশ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ অবতীর্ণ করেন।

৬৪২৯. তাউস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, লেখক বা সাক্ষীকে যখন আহবান করা হয়, তখন সে উত্তরে বলল, আমার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তখন আহ্বানকারী তাকে বাধ্য করে বলল, আমার জন্য লিখে দাও (এটাই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে)। তদ্রূপ সাক্ষীকেও ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না।

উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য বিশুদ্ধ, যাঁরা বলেছেন وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ -এর অর্থ হলো, যে লেখার জন্য ও সাক্ষ্য দানের জন্য আবেদন করে তার দ্বারা এ দু'জন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর তা এভাবে যে, তারা তার নিজের কাজ ছেড়ে লেখককে শুধু লেখার কাজেই ব্যস্ত রাখতে চায় এবং সাক্ষীকেও তদ্রূপ নিজের কাজ থেকে বিরত রেখে শুধু সাক্ষ্যদানে ব্যস্ত রাখতে চায়। যেমন আমরা ইতিপূর্বে এ অভিমত পোষণকারিগণের বক্তব্য উল্লেখ করেছি।

আমরা এ বক্তব্যকে উত্তম এজন্য বলেছি, যেহেতু এ আয়াতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে সম্বোধন افعلوا তথা আদেশসূচক ক্রিয়া কিংবা لاتفعلوا নিষেধসূচক ক্রিয়ার মাধ্যমে করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ঋণপত্র লিখিত হয়েছে, তাদের প্রতিই আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতে যাদের প্রতি আদেশ বা নিষেধ করা হয়েছে, তা অনুপস্থিত ব্যক্তির প্রতি আদেশ বা নিষেধ করার ন্যায় করা হয়েছে, যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ও আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا এবং আরো অনেক আয়াতে এরূপ বর্ণনাশৈলী দেখা যায়।

وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত কর যে সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তবে তা তোমাদের জন্য গুনাহের কাজ।

তাফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ আমাদের ন্যায় এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৪৩০. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তোমরা যদি তার বিরোধিতা কর, তবে তা' হবে তোমাদের জন্য পাপ কাজ।

৬৪৩১. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, فُسُوقٌ শব্দের অর্থ হলো গুনাহ্।

৬৪৩২. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ –এর অর্থ হলো গুনাহ্।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন যে, এর অর্থ হলো, লেখক ক্ষতিগ্রস্ত করবে, এভাবে যে, সে লেখার বস্তু বর্ণনাকারী যা বলবে তার বিপরীত লিখবে। আর সাক্ষী এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে যে, সে তার সাক্ষ্যকে পরিবর্তন করে ফেলবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এরূপ করা তোমাদের জন্য পাপ।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৪৩৩. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ تَفْعَلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, فُسُوقٌ হলো মিথ্যা। আর তা পাপাচারিতা হওয়ার কারণ হলো লেখক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে এবং তার লিখনকে পরিবর্তিত করেছে। এটাই মিথ্যা বলা। আর সাক্ষীর মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার অর্থ হলো। সে তার সাক্ষ্যকে বিকৃত করেছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সংবাদ দিচ্ছেন যে, তা মিথ্যা।

ইতিপূর্বে আমরা প্রমাণ করেছি যে, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ –এর অর্থ হলো তাদের উভয়কে লিখনপ্রার্থী ও সাক্ষ্যপ্রার্থী ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। আমাদের সে দলীল–প্রমাণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট ছিল। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَاِنْ تَفْعَلُوا দ্বারা এর হুকুম সম্পর্কে এমন লোকদেরকে খবর দেয়া হয়েছে যারা উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বস্তুত যারা তাদের উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করল, তারা তাদের প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করল, তাঁর সঙ্গে গুনাহ্ করল এবং এমন কার্যে লিপ্ত হলো যা তার জন্য হালাল নয়, আর এরই মাধ্যমে সে তার প্রতিপালকের বিরুদ্ধাচরণ করল।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যা ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ –এর ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (র.) বলেন, হে ধারে ব্যবসাকারিগণ ! তোমরা লিখন ও সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এবং আল্লাহ্‌র সীমারেখা ভঙ্গ করার ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য তোমাদের কর্তব্যসমূহ বর্ণনা করে দিবেন। অতএব, তোমরা এর উপর আমল কর। আর আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ –এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, তিনি তোমাদের আমলসমূহের হিসাব–নিকাশ রাখেন। আর তিনি তার বিনিময়ে তোমাদেরকে প্রতিদান দিবেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা উল্লেখ করেছি তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬৪৩৪. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তা এক প্রকার শিক্ষা, যা আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। সুতরাং তোমরা তা গ্রহণ কর।

(٢٨٣) وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ط وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ط وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না। যে কেউ তা গোপন করে, তার অন্তর অপরাধী। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা সবিশেষ অবহিত।

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ط –এর ব্যাখ্যা ঃ

কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতের পাঠরীতিতে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। সর্বত্রই কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ "كَاتِبًا" পাঠ করেছেন। অর্থাৎ তোমরা যদি এমন ব্যক্তিকে না পাও, যে তোমাদের জন্য ঋণপত্র লিখে দিবে যে, তোমরা নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত পরস্পর ঋণের কারবার করেছ। তবে সেক্ষেত্রে বন্ধক রাখা যাবে।

পূর্ববর্তী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একদল وَلَمْ تَجِدُوْا كِتَابًا পাঠ করেছেন। যার অর্থ যদি তোমাদের পক্ষে ঋণপত্র লেখার ব্যাপারে কোন উপায় না থাকে, তবে বন্ধক রাখা যাবে। চাই তা কাগজ–কলম কিংবা লেখকের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে হোক। আমাদের দৃষ্টিতে একমাত্র শহরবাসিগণের কিরাআতই জায়িয়। অর্থাৎ وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا পাঠ করা। যার অর্থ, এমন ব্যক্তি যে লিখে দিবে। কেননা,

মুসলমানগণের সহীফাসমূহে এভাবেই লিপিবদ্ধ আছে যে, হে ধারে ব্যবসাকারিগণ ! তোমরা যদি সফরে থাক, যেখানে তোমরা তোমাদের জন্য লিখে দেয়ার মত কোন লেখক না পাও এবং তোমরা পরস্পরে নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত যে ধারে ব্যবসা করেছ, যার জন্য আমি তোমাদেরকে লিপিবদ্ধ করতে ও সাক্ষী রাখতে আদেশ করেছি। যদি তোমাদের পক্ষে সে ঋণ সম্পর্কে ঋণপত্র লিখানোর কোন উপায় না থাকে, তবে তোমরা পরস্পর নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত যে ঋণের কারবার করেছ, তার মুকাবিলায় বন্ধক রাখ, যা তোমরা ঋণগ্রহীতার নিকট হতে হস্তগত করবে, যাতে তোমাদের মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

আমাদের এ অভিমত যাঁরা পোষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৪৩৫. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি সফরে থাকবে এবং সে অবস্থায় নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত ধারে কোন কিছু বিক্রয় করে। কিন্তু সে কোন লেখক না পায়, এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বন্ধক রাখার সুযোগ দান করেছেন। আর যদি সে লেখক পায়, তবে তার জন্য বন্ধক রাখার অধিকার নেই।

৬৪৩৬. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমরা যদি এমন লেখক না পাও যে তোমাদের জন্য লিখে দিবে, তবে তোমাদের জন্য বন্ধক রাখার সুযোগ রয়েছে।

৬৪৩৭. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে বিক্রয় কোন নির্দিষ্ট মিয়াদ পর্যন্ত ধারে সংঘটিত হয়, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা লিপিবদ্ধ করতে ও সাক্ষী রাখতে আদেশ করেছেন। এটা মুকীম অবস্থার হুকুম। আর যদি একদল লোক সফর অবস্থায় থেকে পরস্পর ক্রয়–বিক্রয় করে নির্দিষ্ট মিয়াদের উপর এবং তারা লিখে দেয়ার মত কোন লোক না পায়, তবে বন্ধক রাখার ইখতিয়ার থাকবে।

আমাদের বর্ণিত অন্য পাঠরীতির ভিত্তিতে যাঁরা এ আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৪৩৮. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا كِتَابًا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে কিতাব বা ঋণপত্র বলতে লেখক ও লেখার উপকরণ উদ্দেশ্য।

৬৪৩৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াতটিকে فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا كِتَابًا পাঠ করেছেন এবং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অনেক সময় মানুষ লেখার খাতা পায় কিন্তু লেখক পায় না।

৪৬৪০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا كِتَابًا পাঠ করতেন এবং বলতেন, অনেক সময় লেখক পাওয়া যায়। কিন্তু লেখার উপকরণ ইত্যাদি পাওয়া যায় না।

৪৬৪১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতকে وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كِتَابًا পাঠ করতেন এবং তার ব্যাখ্যায় বলতেন, كِتَابًا অর্থাৎ مِدَادًا –কালি। যদি তোমরা কালি না পাও, তবে এরূপ ক্ষেত্রে বন্ধক রাখার ইখতিয়ার থাকবে। তিনি বলেন, সফর ব্যতীত বন্ধকের অনুমতি নেই।

৬৬৪২. আবুল আলিয়াহ্ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا كِتَابًا পাঠ করতেন। তিনি বলেন, অনেক সময় কালি পাওয়া যায়, কিন্তু কাগজ পাওয়া যায় না।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ পাঠে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজায ও ইরাকের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ পাঠ করেছেন। অর্থাৎ رهن –এর বহুবচন রূপে رهان পাঠ করেছেন। যেমন كِبَاشٌ শব্দটি كَبْشٌ –এর বহুবচন, بِغَالٌ শব্দটি بَغْلٌ –এর বহুবচন এবং نِعَالٌ শব্দটি نَعْلٌ –এর বহুবচন।

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ –এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থ ঃ যদি ঋণগ্রহীতা মাল ও ঋণের মালিকের নিকট বিশ্বাসী হয় এবং ঋণদাতার নিকট তার বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার কারণে সফর অবস্থায় তার থেকে তার ঋণের মুকাবিলায় কোন কিছু বন্ধক স্বরূপ গ্রহণ না করে, তবে যেন ঋণগ্রহীতা তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সে যেন তার উপর ঋণদাতার যে ঋণ রয়েছে তা অস্বীকার না করে, বা তার নিকট হতে আত্মগোপন না করে, কিংবা ঋণসহ পলায়ন করার ইচ্ছা না করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহ্কে ভয় করে। এ কারণে যে, আল্লাহ্র শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে, যা হতে বাঁচার কোন উপায় নেই। আর তাকে যে ঋণের ব্যাপারে বিশ্বাস করা হয়েছে, সে যেন তা পরিশোধ করে দেয়।

আর যাঁরা মনে করেন যে, এ আয়াতে উল্লিখিত বিধানটি পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষী রাখা ও লিপিবদ্ধ করার যে আদেশ করেছেন তজ্জন্য রহিতকারী। ইতিপূর্বে আমরা তাঁদের মতামত উল্লেখ করেছি। আর এসকল মতের মধ্যে যে মতটি উত্তম, তা আমরা দলীল–প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করেছি। সুতরাং এখানে তা পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

৬৪৪৩. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এর দ্বারা শুধুমাত্র সফরকালীন সময় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মুকীম অবস্থা উদ্দেশ্য নয়। মুকীম অবস্থায় যদি লেখক পাওয়া যায়, তবে তার জন্য বন্ধক রাখার কোনই অবকাশ নেই এবং তাদের কেউ অপর কারো উপর আস্থা রাখবে না।

এটাই দাহ্হাক (র.)–এর অভিমত যে, ঋণদাতা যখন লেখক, লেখার উপকরণ ও সাক্ষী রাখার সুযোগ পাবে, তখন তার জন্য ঋণগ্রহীতার উপর আস্থা রাখার অবকাশ নেই। ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয়ে যদি সফর অবস্থায় থাকে, তবে তো বিষয়টি তদ্রূপই যেমন তিনি বলেছেন। যেমন আমরা ইতিপূর্বে এর বিশুদ্ধতার সমর্থনে দলীল–প্রমাণ পেশ করেছি।

কিন্তু তিনি আরও বলেছেন যে, বন্ধক রাখার বিষয়টিও আস্থা রাখারই অনুরূপ এবং হকদার ব্যক্তির জন্য লেখক, লেখার উপকরণ ও সাক্ষী রাখার উপায় থাকাবস্থায় বন্ধক রাখার অবকাশ নেই। চাই তা মুকীম অবস্থায় কিংবা মুসাফির অবস্থায় হোক। তবে তা একটি অর্থহীন কথা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বিশুদ্ধ সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

৬৪৪৪. তিনি ধারে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছেন এবং তার মুকাবিলায় তাঁর শিরস্ত্রাণটি বন্ধক রেখেছেন। সুতরাং যথাযথভাবে বন্ধক দেয়া এবং গ্রহণ করা সফর ও মুকীম উভয় অবস্থায় জায়িয আছে। যেহেতু

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে উল্লিখিত হাদীস বিশুদ্ধ রূপে সাব্যস্ত হয়েছে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। আর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বন্ধক রাখা সম্পর্কিত যে ঘটনা উল্লেখ করেছি তা এমন নয় যে, তিনি লেখক ও সাক্ষী পাচ্ছিলেন না। কারণ, মদীনাতুন নবীতে সর্বদা লেখক ও সাক্ষী পাওয়া সহজ ছিল। বরং যখন ক্রেতা–বিক্রেতা বন্ধক রেখে ক্রয়–বিক্রয় করল এবং তাদের জন্য লেখক ও সাক্ষী পাওয়ার উপায় বিদ্যমান, আর সে বিক্রয় অথবা ঋণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়, তখন তাদের উপর ওয়াজিব হলো, তা লিপিবদ্ধ করে রাখা এবং মাল ও বন্ধকের উপর সাক্ষী রাখা। তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করা ও সাক্ষী না রাখা শুধু তখনই বৈধ হয়, যখন তার ব্যবস্থা না থাকে।

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষিগণকে সম্বোধন করেছেন। সাক্ষ্য গোপন না করার জন্য তাকীদ দিয়েছেন।

সাক্ষিগণ যখন আহূত হবে, তখন যেন ঐ আহ্বানে সাড়া দিতে তারা অস্বীকার না করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ হে সাক্ষিগণ ! তোমরা যখন তোমাদের সাক্ষ্য বিচারকের নিকট পেশ কর, তখন তোমাদের সাক্ষ্যকে গোপন কর না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষীপ্রার্থীর প্রয়োজন মুহূর্তে বিচারকের নিকট বিষয়টি প্রমাণিত করার প্রাক্কালে তার সাক্ষ্য গোপন করা এবং তা প্রামণিত করতে অস্বীকার করার পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি তার সাক্ষ্য গোপন করল, সে পাপ করল। সে তার এ সাক্ষ্য গোপন করার জন্য আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করল।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৪৪৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, সুতরাং কারো জন্য তার নিকট যে সাক্ষ্য রয়েছে তা গোপন করা হালাল হবে না। তার সাক্ষ্য নিজের কিংবা তার পিতামাতার বিপক্ষেই হোক না কেন। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করবে, সে ব্যক্তি জঘন্য পাপে লিপ্ত হবে।

৬৪৪৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তার আত্মা পাপী।

৬৪৪৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জঘন্যতম কবীরা গুনাহ্ হলো, আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন– اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ অর্থঃ কেউ আল্লাহ্র শরীক করলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম। (৫ ঃ ৭২) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও সাক্ষ্য গোপন করা সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন– وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ –।

ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, সাক্ষীর কর্তব্য হলো যখনই তার নিকট সাক্ষ্য প্রার্থনা করা হবে, তখনই সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্য বিষয়ে অবহিত করবে।

৬৪৪৮. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন তোমার নিকট সাক্ষ্য বিদ্যমান এবং কেউ তোমাকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি তাকে তা অবহিত কর। তুমি এরূপ বল না যে, আমি তা

শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্ত করব। তুমি তাকে সাক্ষ্য বিষয় অবহিত কর, হয়ত সে তা দ্বারা মত পরিবর্তন করবে কিংবা সংরক্ষণ করবে।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ –এর অর্থ হলো, তোমরা তোমাদের সাক্ষ্যদানে, তা প্রতিষ্ঠা করায় ও আদায় করায় কিংবা সাক্ষ্যপ্রার্থী যখন প্রয়োজন মুহূর্তে তোমাকে তা পেশ করার জন্য আহবান করল, তখন তা গোপন করা এবং তোমাদের অন্যবিধ গোপন ও প্রকাশ্য আমলসমূহ আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত আছেন। তিনি তা তোমাদের জন্য হিসাব–নিকাশ রাখেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমলের ভাল অথবা মন্দ প্রতিদান দিতে পারেন, তোমাদের প্রাপ্য অনুসারে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ

(٢٨٤) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۭ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৮৪. আসমান এবং যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্রই। তোমাদের মনে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ্ পাক তার হিসাব তোমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্র–বৃহৎ যা কিছু আছে সব কিছুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ সবের ব্যবস্থাপনা তাঁরই। তাঁরই হাতে রয়েছে এগুলোর পরিবর্তন পরিবর্ধন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। কেননা, তিনিই তার ব্যবস্থাপক, মালিক ও পরিবর্তনকারী। আর আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এর দ্বারা সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গোপন করার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–হে সাক্ষিগণ! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করনা। যে ব্যক্তি তা গোপন করে, সে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ। আর আমার নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। আমি সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। আসমান ও যমীনের যাবতীয় পরিবর্তন আমারই হাতে। এর গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই আমার নিকট সুস্পষ্ট। অতএব তোমরা সাক্ষ্য গোপন করায় আমার কঠিন শাস্তিকে ভয় কর। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য গোপনকারীর জন্য রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা পাপীদের সাথে আখিরাতে কি ব্যবহার করা হবে, তার খবর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– যদি তোমরা প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে, ঋণদাতার হক সম্পর্কে তোমাদের নিকট সাক্ষ্য ইত্যাদি যা রক্ষিত আছে, তা গোপন কর, তথা তোমাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখ, আল্লাহ্ পাক তোমাদের এমনি মন্দ আচরণসমূহের হিসাব–নিকাশ গ্রহণ করবেন। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলের হিসাব–নিকাশ গ্রহণ করবেন। অতএব, তিনি যাকে ইচ্ছা তোমাদের মধ্য হতে খারাপ আমলের জন্য শাস্তি দিবেন। আর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। এরপর তাফসীরকারগণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

প্রসঙ্গে একাধিক মত পোষণ করেন। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, যা আমরা বলেছি তা দ্বারা সাক্ষ্য গোপন করার প্রশ্নে সাক্ষিগণকে সতর্ক করা হয়েছে। আর তাদের সমগোত্রীয় যারা পাপকে গোপন করেছে কিংবা প্রকাশ করেছে তারাও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৪৪৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে"।

৬৪৫০. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে"।

৬৪৫১. দাউদ (র.) হতে বর্ণিত। তাঁকে وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ইকরামা (র.) হতে বর্ণনা করে বলেন, তা'হলো ঐ সাক্ষ্য যা তুমি গোপন করেছ।

৬৪৫২. আবূ সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি ইকরামা (র.)–কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছেন, "সাক্ষ্যদান ক্ষেত্রে"।

৬৪৫৩. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ الخ – এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাক্ষ্যদান ক্ষেত্রে।

৬৪৫৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন, তা সাক্ষ্য গোপন করা ও তা প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৪৫৫. ইকরামা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, সাক্ষ্য গোপন করা ও তা প্রতিষ্ঠা করা।

অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেছেন, বরং এ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাহ্গণকে এ বিষয় জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে যে, তাদের হস্ত যা উপার্জন করেছে অর্থাৎ তারা যা আমল করেছে এবং তাদের অন্তরে যা উদিত হয়েছে কিন্তু তারা তা আমল করে নি –এসবের জন্য তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। আবার আয়াতে এরূপ ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। তারপর তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ দ্বারা এ হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে।

যাঁরা এরূপ বলেছেন ঃ

৬৪৫৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আয়াত لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবিগণ এ হুকুমটি কঠিন বলে মনে করেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ! আমাদেরকে কি সে জন্যও শাস্তি দেয়া হবে, যা আমরা আমাদের অন্তরে অনুভব করি? তখন আল্লাহ্ তা'আলা لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا

الاَّ وُسْعَهَا الاية হতে رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا পর্যন্ত নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার পিতা বলেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হ্যাঁ, رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হ্যাঁ।

৬৪৫৭. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত اِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ নাযিল হয়, তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ নাযিল করেন। আবূ কুরাইব (র.) বলেন, তখন তিনি পড়লেন رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا । - বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, قَدْ فَعَلْتُ (আমি এরূপ করেছি।) তিনি পড়লেন رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قَدْ فَعَلْتُ (আমি এরূপ করেছি)। তিনি পড়লেন, رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَتَلَنَا بِهِ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قَدْ فَعَلْتُ (আমি এরূপ করেছি ।) তিনি পড়লেন وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قد فعلت আমি এরূপ করেছি।

৬৪৫৮. সাঈদ ইব্‌ন মুরজানা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি এ আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ তিলাওয়াত করেন। তারপর হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) বলেন, এ আয়াতের মর্মানুযায়ী আমাদের যদি শাস্তি বিধান করা হয়, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তারপর হযরত ইব্‌ন উমর (রা.) এরূপ কান্নাকাটি করলেন যে, তাঁর অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট হাযির হলাম। আমি বললাম, হে আবুল আব্বাস ! আমি ইব্‌ন উমার (রা.)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি এ আয়াত اِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ তিলাওয়াত করেন। তারপর তিনি বলে উঠেন, এ আয়াতের মর্মানুযায়ী যদি আমাদেরকে-শাস্তি দেয়া হয়, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তারপর তিনি এমন কান্নাকাটি করলেন যে, তাঁর চোখের পানি ঝরতে থাকল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌ন উমার (রা.)-কে ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবা কিরাম এ আয়াত সম্পর্কে ভয় পেয়েছেন, যেমন ভয় পেতেন হযরত ইব্‌ন উমার (রা.)। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ নাযিল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াসওয়াসাহজনিত বিষয়কে রহিত করে দিলেন এবং বাস্তবে যে কথা ও কাজ হবে, তার হিসাব হবে।

৬৪৫৯. সাঈদ ইব্‌ন মুরজানা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি একদিন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর সামনে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি এ আয়াত لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَاِنْ

تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ الاية তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম ! যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ আয়াতের মর্মানুযায়ী শাস্তি দেন, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। তারপর ইব্ন উমর (রা.) এভাবে কান্নাকাটি করলেন যে, তাঁর কান্নার শব্দ শুনা গেলো। সাঈদ ইব্ন মুরজানা(র.) বলেন, আমি সেখান থেকে উঠে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর নিকট হাযির হলাম। হযরত ইব্ন উমর (রা.) যে আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন এবং তিলাওয়াত করার সময় যে অবস্থা হয়েছিলো, তা উল্লেখ করলাম। তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ আবদুর রহমানকে ক্ষমা করুন। শপথ আমার জীবনের ! আলোচ্য আয়াত যখন নাযিল হয়েছিল, তখন মুসলমানগণ তাই উপলব্ধি করেছিলেন। হযরত ইব্ন উমর (রা.) যা অনুভব করেছিলেন। এরপরই আল্লাহ্ তা'আলা لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا الخ সূরার শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, মানব মনের ওয়াসওয়াসাহ্ এমন বিষয় যা মানুষের আওত্তাধীন নয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ যে ভালো কাজ করবে, সে তার পুরস্কার পাবে এবং যে মন্দ কাজ করবে তার শাস্তি সে ভোগ করবে।

৬৪৬০. মা'মার যুহরী (র.)–কে বলতে শুনেছেন যে, তিনি আয়াত اِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইব্ন উমর (রা.)–এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং এ বলে কাঁদতে থাকেন ঃ যা আমাদের অন্তরলোকে উদিত হয়, সেজন্য আমরা শাস্তি পাব। তিনি এভাবে কাঁদছিলেন যে, লোকেরা তাঁর কান্না শুনতে পায়। তখন এক ব্যক্তি তথা হতে উঠে গিয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর নিকট গমন করে বিষয়টি উল্লেখ করেন। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.)–এর প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করুন। তিনি যা অনুভব করেছেন মুসলমানগণ এরূপই অনুভব করেছিলেন, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ অবতীর্ণ করেন।

৬৪৬১. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)–এর নিকট ছিলাম। তিনি তখন আয়াত اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ الخ পাঠ করেন এবং কান্না শুরু করেন। এরপর আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর নিকট গমন করলাম এবং তাঁর নিকট ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। তখন ইব্ন আব্বাস (রা.) হেসে উঠে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইব্ন উমর (রা.)–কে অনুগ্রহ দান করুন। তিনি কি জানেন না যে, আয়াতটি কি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে? এ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণ (রা.) ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমরা বল سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا এরপর তিনি বলেন اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ হতে وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অন্তরে উদিত মন্ত্রণাকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং যা কাজে পরিণত করা হবে তার উপর পাকড়াও করার বিধান করেছেন।

৬৪৬২. সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা ইব্ন উমর (রা.) اِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ তিলাওয়াত করেন। তাতে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে আসে। তারপর তাঁর একাজের কথা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) –এর নিকট পৌঁছায়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আবূ আবদুর রহমানের প্রতি রহমত নাযিল করুন। যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন সাহাবা কিরাম যা করেছিলেন, তিনি তাই করেন। তারপর তার পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা এ আয়াতের বিধান রহিত হয়ে যায়।

৬৪৬৩. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ –এর বিধান পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

৬৪৬৪. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন اِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবা কিরাম বললেন, আমাদেরকে কি সে কাজের জন্যও শাস্তি দেয়া হবে, যা আমাদের অন্তরে উদয় হয়েছে এবং আমাদের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ তা আমল করেনি? তিনি বলেন, তখন এ আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমাদের মুনাজাত কবূল করলাম। তিনি বলেন, এ উম্মতকে সূরা বাকারার শেষাংশ দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি।

৬৪৬৫. আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তার পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ –এ আয়াতের বিধান রহিত করে দিয়েছে।

৬৪৬৬. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ প্রসঙ্গে বলেছেন, পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا –এ আয়াতকে মানসূখ করে দিয়েছে। আর আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَاِنْ تُبْدُوْا –এর অর্থ হলো, গোপন রহস্য বিষয় হতে যা সে প্রকাশ করেছে এবং যা সে গোপন রেখেছে তার হিসাব–নিকাশ গ্রহণ করা হবে, যা পরবর্তী আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

৬৪৬৭. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত اِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ নাযিল হয়, তখন তাতে বিশেষ জটিলতা ছিল। তারপর তৎপরবর্তী আয়াত لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ অবতীর্ণ হয়। বর্ণনাকারী বলেন, কাজেই, তৎপূর্বে বা হুকুম ছিল এ আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়।

৬৪৬৮. ইব্ন আওন (র.) হতে বর্ণিত। শা'বী (র.)–এর নিকট বর্ণনাকারিগণ আলোচনা করেছেন যে, اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ لَهَا .... مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ আয়াতের শেষ পর্যন্ত বারবার তিলাওয়াত করা হতো।

৬৪৬৯. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইবন মাসউদ (রা.) বলেছেন, لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হিসাব–নিকাশের বিধান বলবত ছিল। তারপর যখন শেষোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন তা পূর্ববর্তী আয়াতটিকে রহিত করে দেয়।

৬৪৭০. দাহ্হাক (র.) ইব্ন মাসউদ (রা.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৪৭১. শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ আয়াতখানি পরবর্তী আয়াত لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

৬৪৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা اِنْ تُبْدُوْا مَا فِى اَنْفُسِكُم اَو تُخفُوهُ الاية –কে রহিত করা হয়েছে।

৬৪৭৩. ইকরামা ও আমির (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৪৭৪. আল–হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ এ–আয়াতখানির لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ দ্বারা রহিত করা হয়েছে।

৬৪৭৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –কে রহিত করা হয়েছে।

৬৪৭৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ্র বাণীঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা রহিত করা হয়েছে।

৬৪৭৭. ইব্ন যায়দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِلَى اٰخِرِ الْاٰيَةِ নাযিল হয়, তা মুসলমানগণের উপর কঠিন বলে বিবেচিত হয় এবং ভীষণ কষ্টদায়ক বলে গণ্য হয়। তখন তাঁরা রাসূলুল্লাহ্(সা.)–কে উদ্দেশ করে বললেন, যদি আমাদের অন্তরে কোন ভাবের উদয় হয় এবং আমরা তা কার্যে পরিণত না করি, সে জন্যও কি আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তবে যেন তোমরা সেরূপই বলতে চাও যেমন বনী ইসরাঈলরা বলেছিল سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا আমরা শুনলাম, তবে মানলাম না। তখন তাঁরা বললেন, বরং سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ! বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তাঁদের দুশ্চিন্তা দূর করে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ হতে وَلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ পর্যন্ত নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তা কার্যে পরিণত করা অর্থে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন এবং অন্তরে যা সৃষ্টি হয়, তাকে বর্জন করেছেন।

৬৪৭৮. আবূ উরায়দা বিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতটির বিধান তৎপরবর্তী আয়াত لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে।

৬৪৭৯. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেদিন এ আয়াত নাযিল হয়, সেদিন লোকেরা বুঝেছিল যে, তারা তাদের অন্তরে সৃষ্ট ওয়াসওয়াসা বা শয়তানী কুমন্ত্রণা ও তারা যা কার্যে পরিণত করেছে উভয়বিধ পাপের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। তখন তারা নবী পাক (সা.)-এর নিকট হাযির হলেন এবং আরয করেন, আমাদের মধ্যে কেউ যদি মনের কুপ্রবৃত্তিকে কার্যে পরিণত করে, আর যদি কার্যে পরিণত না করে আমরা কি সেজন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হব? আল্লাহ্র কসম মনের কুপ্রবৃত্তির উপর আমাদের কোন হাত নেই।" তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا দ্বারা এ আয়াত রহিত করেছেন।

৬৪৮০. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ -এর দ্বারা আলোচ্য আয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে।

যাঁরা বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর বান্দাগণকে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে তাদের হস্ত অর্জিত অপরাধ, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সাধিত অপরাধ ও তাদের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণা, যা তারা কার্যে পরিণত করেনি সবকিছুর জন্য শাস্তির বিধান করবেন- তাঁদের মধ্য হতে কিছু কিছু ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এ আয়াতটি মুহকাম শ্রেণীভুক্ত, তা মানসূখ বা রহিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের আমলসমূহ ও তারা যা আমল করেনি, কিন্তু তাদের অন্তরে তারা তা অনুভব করেছে এবং তারা তার নিয়্যাত ও সংকল্প করেছে, এতদুভয় শ্রেণীর অপরাধের জন্যই তাদের প্রতি শাস্তির বিধান করবেন। তারপর তিনি মু'মিনগণকে অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণার গুনাহ্ থেকে ক্ষমা করে দিবেন, কাফির ও মুনাফিকদেরকে তজ্জন্য শাস্তির বিধান করবেন।

যাঁরা এরূপ বলেছেন, তাঁদের আলোচনা ঃ

৬৪৮১. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াত রহিত হয়নি। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে একত্র করবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের অন্তরে যা গোপন করেছ, যা আমার ফেরেশতাগণ অবহিত হয়নি, আমি তোমাদেরকে সেগুলো অবহিত করব। অবশ্যই মু'মিনগণকে তিনি অবহিত করবেন এবং তাদের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণার গুনাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা করে দিবেন। তাদেরকে অন্তরে সৃষ্ট গুনাহ্ প্রকাশ করে দিয়ে ক্ষমা করে দেয়াই হলো يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদেরকে সে সম্পর্কে অবহিত করব। আর সন্দেহ্ সংশয়বাদী কাফির মুনাফিকদেরকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি যা গোপন করেছে, তাদেরকে তা অবহিত করবেন। তাই হলো فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ কিন্তু তোমাদের অন্তরসমূহ সন্দেহ পোষণ ও কপটতা ইত্যাদি যা অর্জন করেছে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার শাস্তি দেবেন।

৬৪৮২. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, তা তোমাদের আমলের গুপ্ত রহস্য ও তার প্রকাশ্য অংশ। আল্লাহ্ সেজন্য তোমাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। কাজেই এমন কোন মু'মিন ব্যক্তি নেই, যাকে কোন ভাল কাজ অন্তরে পুলক দান করেছে সে কাজটি করার জন্য, যদি সে আমলটি করে থাকে, তবে তার জন্য তাতে দশটি পূণ্য লেখা হবে। আর যদি সে তার উপর আমল করতে সক্ষম না হয়ে থাকে, তবে সেজন্য তার আমলনামায় একটি পুণ্য লেখা হবে। যেহেতু সে মু'মিন। আর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের গোপন বিষয় ও প্রকাশ্য বিষয় উভয়কেই পসন্দ করেন। আর যদি কোন মন্দ বিষয় তার অন্তরে সৃষ্টি হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা অবহিত করেন, যেদিন গোপন বিষয়াদি প্রকাশ পাবে। যদি সে তার উপর আমল না করে সেজন্য আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দিবেন না। আর যদি সে সেই আমল করে, তবে আল্লাহ্ তাকে তা মাফ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ -তারা সে সকল লোক, যাদের উত্তম আমলসমূহ আমি কবুল করি এবং তাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দিই।

৬৪৮৩. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত ঃ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, আমার লিপিতে তোমাদের আমলসমূহ হতে যা প্রকাশ পেয়েছে তাই লিখিত হয়েছে। আর যা তোমরা অন্তরে গোপন রেখেছ আজ আমি তার হিসাব গ্রহণ করব। তারপর আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করব।

৬৪৮৪. কায়স ইব্‌ন আবী হাযিম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কিয়ামতের দিবস সংঘটিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, সৃষ্টিকুল শুনে রাখুক, তোমাদের যে সকল আমল প্রকাশ পেয়েছে আমার লিপিতে তাই লিখিত হয়েছে। আর তোমরা যা অন্তরে গোপন রেখেছ, ফেরেশতাগণ তা লিপিবদ্ধ করেনি এবং তারা তা জানতনা। আমি আল্লাহ্ তোমাদের থেকে সংঘটিত সকল গুনাহ্ অবহিত আছি। আমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করব এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করব।

৬৪৮৫. ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলতেন, মানুষদের যখন হিসাব-নিকাশের জন্য ডাকা হবে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তারা অন্তরে যা গোপন রাখত এবং যা তারা বাস্তবে আমল করেনি সে বিষয়ে অবহিত করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমার থেকে তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকতনা। তোমরা মন্দ যা কিছু গোপন রাখতে তা তোমাদের অবহিত করব। তোমাদের সংরক্ষণকারী ফেরেশতাগণও তদ্বিষয়ে অবহিত ছিল না। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, এটাই মুহাসাবা।

৬৪৮৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হতে অপর সূত্রে, অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৪৮৭. রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ প্রসঙ্গে বলেছেন, এ আয়াতটি মুহকাম শ্রেণীভুক্ত, কোন কিছু এটাকে রহিত করেনি। يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

–এর অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাকে জানিয়ে দেবেন যে, তুমি তোমার বক্ষে এটা গোপন রেখেছ। তবে তজ্জন্য শাস্তি দেবেন না।

৬৪৮৮. আল–হাসান(র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ আয়াতটি মুহ্কাম শ্রেণীভুক্ত, এটা রহিত হয়নি।

৬৪৮৯. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, সংশয় ও প্রত্যয় সম্পর্কে।

৬৪৯০. মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ – এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, সংশয় ও প্রত্যয় প্রশ্নে।

৬৪৯১. মুজাহিদ (র.) হতে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আলী ইব্ন আবী তালহা বর্ণিত ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর ব্যাখ্যানুসারে এ আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমরা যদি প্রকাশ কর এবং তা তোমাদের দেহ ও অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ মাধ্যমে বাস্তবে ব্যক্ত কর কিংবা তোমরা যদি তা গোপন কর এবং তোমাদের অন্তরে তা লুকিয়ে রাখ, যার ফলে আমার সৃষ্টির মধ্যে কেউ তা অবগত হতে পারেনি, আমি তার হিসাব গ্রহণ করব। অনন্তর আমি ঈমানদারগণের জন্য সব ক্ষমা করে দেব। আর মুশরিক ও আমার দীনের ব্যাপারে কপটদেরকে শাস্তি দেব। আর এ বিষয়ে দাহ্হাক (র.) ও রবী' ইব্ন আনাস (র.)–এর ব্যাখ্যা হলোঃ তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তোমরা যদি তা ব্যক্ত কর অর্থাৎ আমলে পরিণত কর, কিংবা তোমরা যদি তার সংকল্প নিজ অন্তরে গোপন রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে অবহিত করবেন। তারপর তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আর এ ক্ষেত্রে মুজাহিদ (র.)–এর বক্তব্য আলী ইব্ন আবী তালহা বর্ণিত ইব্ন আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনার সদৃশ।

আর যাঁরা এ আয়াতকে মুহ্কাম শ্রেণীভুক্ত ও রহিত নয় বলেছেন এবং যাঁরা বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হলোঃ বান্দাগণ তাদের আমল হতে যা প্রকাশ করেছে ও গোপন করেছে তা আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবহিত করবেন– এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে একমত হয়েছেন, তাঁদের মধ্য হতে একদল ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টির নিকট হতে তারা তাদের যে সকল মন্দ আমল প্রকাশ করেছে এবং যে সকল মন্দ আমল গোপন করেছে সব কিছুরই হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন। আর তিনি তাদেরকে এর জন্য শাস্তি দেবেন। হ্যাঁ, তবে তারা যে মন্দ আমল গোপন করেছে এবং যা' তারা কার্যে পরিণত করেনি, তাঁর পক্ষ হতে তার শাস্তি হলোঃ দুনিয়ায় তাদের উপর যে সকল আপদ-বিপদ হয়ে থাকে এবং যে সকল বিষয় তাদেরকে চিন্তিত করে ও যা হতে তারা কষ্ট পেয়ে থাকে।

যাঁরা এরূপ বলেছেন ঃ

৬৪৯২. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, আইশা সিদ্দীকা (রা.) বলতেন, যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের চিন্তা করল কিন্তু তা আমলে পরিণত করেনি, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা প্রেরণ করেন, যেমন সে গুনাহের চিন্তা করেছে কিন্তু তার উপর আমল করেনি। আর তা তার জন্য কাফ্ফারা রূপে গণ্য হবে।

৬৪৯৩. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আয়াত ঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ –এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতেন, উম্মুল মু'মিনীন আইশা (রা.) বলেছেন, যে, সকল বান্দা কোন মন্দ কাজের চিন্তা করেছে এবং তার অন্তরে এর কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট হতে দুনিয়ায় এর হিসাব–নিকাশ গ্রহণ করবেন। সে ভয় করবে, চিন্তাগ্রস্ত হবে ও দুর্ভাবনার শিকার হবে।

৬৪৯৪. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আইশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, যে সকল বান্দা মন্দ কাজ ও পাপ কার্যের চিন্তা করেছে এবং তার অন্তরে এর কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা তার নিকট হতে এর হিসাব–নিকাশ দুনিয়াতেই গ্রহণ করবেন। সে ভয় করবে, চিন্তিত হবে, চিন্তা কঠিন হতে কঠিনতর হবে, কিন্তু সে তাতে কোন ফল লাভ করবে না, যেমন সে মন্দ কাজের চিন্তা করেছে কিন্তু তার কিছু আমলে পরিণত করেনি।

৬৪৯৫. উমাইয়া (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আইশা সিদ্দীকা (রা)–কে এ আয়াত وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ এবং আয়াত وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهِ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন আইশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, এ বিষয়ে আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে জিজ্ঞেস করেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, এ যাবত আমাকে কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেনি। হে আইশা! এগুলো হলো আল্লাহ্র পক্ষ হতে একের পর এক বান্দার নিকট জ্বর, বিপদ–আপদ, ফোঁড়া–পাঁচড়া ইত্যাদি যা পৌঁছে থাকে। এমনকি আসবাবপত্রকে তার নির্দিষ্ট স্থানে রাখে, তারপর সে তা হারিয়ে ফেলে এবং তজ্জন্য সে চিন্তান্বিত হয়, তারপর সে তা তার নিকটেই প্রাপ্ত হয়, এরূপ দুশ্চিন্তা মানুষের দুষ্ট কল্পনার শাস্তিস্বরূপ। এভাবে মু'মিন ব্যক্তি তার গুনাহ্ হতে বেরিয়ে আসে যেমন কর্মকারের ভাটি হতে সবুজ পোকা বেরিয়ে আসে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা যেসব বক্তব্য উল্লেখ করেছি, তন্মধ্যে উত্তম বক্তব্য হলো তাঁদের বক্তব্য, যাঁরা বলেছেন যে, আয়াতটি মুহকাম শ্রেণীভুক্ত এবং আয়াতটি মানসূখ বা রহিত নয়। তা এজন্য যে, নাসখ বা রহিতকরণ এমন হুকুমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, যে হুকুমটি তার অন্য হুকুমের কারণে নেতিবাচক হয়। আর এ নেতিবাচক হওয়াটা তার সকল অবস্থায় হয়ে থাকে। اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ এ আয়াতাংশ যে অর্থ বহন করে তার সম্পর্কে لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ আয়াতে নেতিবাচক কিছু নেই। কেননা এ আয়াতে হিসাব হওয়ার কথা আছে। কিন্তু হিসাব মাত্রই আযাবের কারণ হয় না। আর হিসাব হলেই বান্দাকে যে পাকড়াও করা হবে এমনও নয়।

আর আল্লাহ্ পাক পাপিষ্ঠ লোকদের সম্পর্কে খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের সামনে আমলনামা রাখা হবে। তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً اِلاَّ اَحْصَاهَا অর্থঃ হায় আপেক্ষ! এ কিতাবের কি হলো, ছোট-বড় কিছুই তো ছাড়েনি, সবই শুমার করেছে– (১৮ ঃ ৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের কর্মলিপি তাদের সগীরা ও কবীরা সকল গুনাহ্ শুমার করেছে। বস্তুত আমলনামা যদিও সগীরা ও কবীরা সকল গুনাহ্ই শুমার করেছে, তথাপি তা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর আনুগত্যকারী বান্দাগণের শুমারকৃত সকল গুনাহ্র জন্য

শাস্তিদান অপরিহার্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে কবীরা গুনাহ্ হতে আত্মরক্ষা করার বিনিময়ে সগীরা গুনাহ ক্ষমা করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এমর্মে তিনি তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন ঃ (৪ ঃ ৩১) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا সুতরাং এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাগণ হতে তারা যে সকল বিষয় গোপন রেখেছে তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা তাদেরকে সেসব গুনাহ্র জন্য শাস্তি দেয়াকে অপরিহার্য করে না। বরং তাদের নিকট হতে তাঁর হিসাব-নিকাশ লওয়াটা আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন তাদের প্রতি কৃত তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হতে পারে যে, তিনি তাদেরকে কি পরিমাণ ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে আমাদের নিকট এ মর্মে হাদীস পৌঁছেছে ঃ

৬৪৯৬. ইব্ন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর মু'মিন বান্দাগণের নিকটবর্তী হবেন। নিকটবর্তী হয়ে তিনি তাঁর বাহু তার উপর স্থাপন করবেন এবং তিনি তাকে তার পাপরাশি সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করাবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জান যে, তুমি এ গুনাহ্ করেছ? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দুনিয়ায় আমি এটাকে গোপন রেখেছি এবং আজ তা ক্ষমা করে দেব। তারপর তিনি তার পুণ্যসমূহ প্রকাশ করবেন। তখন তারা বলবে, هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (৬৯ ঃ ১৯) অথবা যেমন তিনি বলেনঃ আর কাফিরগণকে সাক্ষিগণের উপস্থিতিতে ডাকা হবে।

৬৪৯৭. সাফওয়ান ইব্ন মুহরিয হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা যখন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (র.)-এর সঙ্গে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করছিলাম তাঁর তাওয়াফকালীন অবস্থায় এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলল, "হে ইব্ন উমর (রা.)! আপনি কি শোনেন নি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুনাজাতে বলেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হবে, এত নিকটবর্তী যে, তিনি তার উপর তাঁর বাহু স্থাপন করবেন। তারপর তিনি তাকে তার গুনাহ্ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করাবেন এবং বলবেন, তুমি কি এটা জান? তখন সে দু'বার বলবে ঃ رَبِّ اغْفِرْ (হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ক্ষমা করুন) । এমন কি তার নিকট তা পৌঁছাবে যা পৌঁছানোর ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দুনিয়ায় আমি তোমার এ পাপ ঢেকে রেখেছি, আজ আমি তোমার জন্য তা ক্ষমা করে দেব। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, তারপর তার পুণ্যলিপি বা তার কর্মলিপি তার ডান হাতে দেয়া হবে। আর কাফির ও মুনাফিকদের ব্যাপারে সাক্ষ্যগণের উপস্থিতিতে ঘোষণা দেয়া হবেঃ (১১ঃ১৮) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাগণের সঙ্গে এ আচরণ করবেন যে, তিনি তাকে তার মন্দ আমল সম্পর্কে অবহিত করবেন, যাতে তাকে গুনাহ্ মাফ করে দিয়ে তার প্রতি তিনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তা অবহিত করে দিবেন। মু'মিন বান্দা যা তার অন্তর হতে প্রকাশ করেছে এবং যা সে গোপন রেখেছে সে বিষয়ে তার থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণের পরও আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করবেন। তারপর তিনি তার সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন, তার প্রতি তিনি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন তাকে তা অবহিত করার পর। এটাই তাঁর ক্ষমা প্রদর্শন যার ওয়াদা তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাগণের প্রতি করেছেন। এ অর্থেই বলা হয়েছে فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ (যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন)।

কেউ যদি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ একথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, সকল সৃষ্টিকেই তার সে গুনাহ্র জন্য শাস্তি দেয়া হবে, যা তারা নিজে অর্জন করেছে। আর তাকে সে পুণ্যকর্মের জন্যই পুরস্কৃত করা হবে, যা সে অর্জন করেছে।

তদুত্তরে বলা হবে, হ্যাঁ ব্যাপারটি এরূপই বান্দাকে শুধু এমন কাজের জন্য শাস্তি দেয়া হবে, যা করতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে অথবা যে কাজ করতে তাকে আদেশ করা হয়েছে, তা সে বর্জন করেছে।

তারপর যদি বলা হয় যে, ব্যাপারটি যখন এরূপই তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের অন্তর যা গোপন করেছে وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ দ্বারা সে বিষয়ে ভয় প্রদর্শনের কি অর্থ? যদি এটিই হয় যে, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ কারণ, আমাদের নফস যা' লুকিয়ে রেখেছে এবং আমাদের অন্তর যা গোপন করেছে কোন গুনাহের চিন্তা বা পাপের সংকল্প হতে, তা তো আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্জন করেনি অর্থাৎ কার্যে পরিণত করেনি।

তাকে উদ্দেশ করে বলা হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাগণের সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তার সেসব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন, যার চিন্তা তাদের কেউ করেছে কিন্তু সে তা কার্যে পরিণত করেনি। আর তা হচ্ছে তাঁর সে ওয়াদা যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তারা যখন কবীরা গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সগীরা গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ দ্বারা ভয় প্রদর্শন তো তাদের করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ করেছে এবং তাঁর একত্ব কিংবা তাঁর নবী(সা.)-এর নবূওয়াত এবং তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছেন অথবা আখিরাত ও পুনরুত্থান সম্পর্কে মুনাফিকদের মধ্য হতে তাদের অন্তর যে গুনাহের চিন্তা গোপন রেখেছে সে সম্পর্কেই উক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেমন, ইব্ন আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) এবং তাঁদের সাথে যাঁরা ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ -এর ব্যাখ্যা হচ্ছে على الشك واليقين অর্থাৎ সন্দেহ পোষণ ও বিশ্বাস স্থাপন প্রসঙ্গে।

অধিকন্তু আমরা একথাও বলব যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ দ্বারা সে ব্যক্তিকে ভয় দেখানো হয়েছে, যে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ করে গোপন রাখে। আর যেখানেই আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় থাকবে, সেখানেই আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ এ আয়াতাংশের দ্বারা ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি সে ব্যক্তির জন্যে, যে এমন কোন নিষিদ্ধ কাজের সংকল্প গোপন করেছে, যে কাজ পূর্বে হালাল ঘোষণা ছিল, এরপর আল্লাহ্ পাক তা হারাম ঘোষণা করেছেন, অথবা সে এমন কোন কাজ বর্জন করার ইচ্ছা গোপন করেছে, যা পূর্বে বর্জন করা বৈধ ছিল। এরপরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর তা করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। কোন মু'মিন যদি এরূপ কাজের সংকল্প করে অথচ তা কার্যকর করেনি এমন কাজের ভাব অন্তরে পোষণ করার জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে না যেমন বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

৬৪৯৮. যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের সংকল্প করে কিন্তু তা আমলে পরিণত করেনি, তার জন্য একটি ছওয়াব লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের সংকল্প করে কিন্তু সে কাজ করেনি, তার কোন গুনাহ্ লেখা হবে না।

এ বিষয়েই আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তাঁর মু'মিন বান্দাদের হিসাব গ্রহণ করবেন, তবে তাদেরকে সেজন্য শাস্তি দিবেন না। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ ও তাঁর নবীগণের নবূওয়াত সম্পর্কে সংশয় গোপন রাখে, তারাই হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও চির জাহান্নামী। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা ঘোষণা দিয়েছেন যেমন ইরশাদ হয়েছে وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেনঃ উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হলোঃ তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর আল্লাহ্ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। তারপর আল্লাহ্ পাক মু'মিনদেরকে তাঁর দান সম্পর্কে অবহিত করবেন যে, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন। 'আর মুনাফিকদেরকে তিনি শাস্তি দেবেন। যারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ ও তাঁর নবীদের নবূওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছে।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ –এর ব্যাখ্যা ঃ

মু'মিনের অন্তরে পাপাচারের যে ইচ্ছা হয়, তা মাফ করার, সম্পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহ্‌র রয়েছে। এমনিভাবে কাফিররা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ ও তাঁর নবীগণের নবূওয়াতের ব্যাপারে যে সন্দেহ পোষণ করে, তার শাস্তির বিধানে ও অন্যান্য সব কাজে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। কেননা, আল্লাহ্ পাক সর্বশক্তিমান।

(٢٨٥) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

২৮৫. রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে সে ঈমান আনয়ন করেছে এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে তাঁর ফেরেশতাগণে তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে৷ তারা বলে আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা আর তারা বলে আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি৷ আমাদের প্রতিপালক৷ আমরা তোমর ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।

এ আয়াতের ব্যাখ্যাঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর নিকট যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে। তিনি তা সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

৬৪৯৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ (রাসূল (সা.), তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে সে ঈমান আনয়ন করেছে।) –এর ব্যাখায় বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তখন নবী (সা.) বললেন, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

কেউ কেউ বলেছেন, উপরোক্ত আয়াতটি আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (٢٨٤) –এরপর নাযিল হয়েছে।

কেননা, এ আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সাহাবিগণ তাদের গোপনীয় বিষয়ে হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত ভীতি প্রদর্শনের কারণে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তারপর তারা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি বললেন, সম্ভবতঃ বনী ইসরাঈলের মত তোমরা سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا শুনলাম কিন্তু মানলাম না বলতে চাচ্ছ। তখন তাঁরা বললেন, কখনো নয়। আমরা তো বলছি, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا শুনলাম এবং মানলাম, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা.) এবং সাহাবাদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ করলেন اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ রাসূল তারপ্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে সে ঈমান আনয়ন করেছে এবং মু'মিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে, তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করেছে। পক্ষান্তরে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, মু'মিনগণ তাদের নবীর সাথে আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব এবং রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি এ মত ব্যক্তকারী মুফাসসিরদের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ্র বাণীঃ وَكُتُبِهٖ পদটির পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

মদীনা এবং ইরাকের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ উক্ত শব্দটিকে كتاب -এর বহুবচন পড়ে থাকেন। তাদের মতানুসারে আয়াতের অর্থ হবে- মু'মিনগণ সকলেই আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাগণে এবং ঐ সমস্ত কিতাবসমূহে ঈমান আনয়ন করেছে, যা তিনি তার পয়গাম্বর এবং রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। তবে কূফাবাসী কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ উক্ত শব্দটিকে একবচন পড়ে থাকেন। তাদের কিরাআত অনুসারে এ আয়াতের অর্থ হবে- এবং মু'মিনগণ সকলেই আল্লাহে, তাঁর ফেরেশতাসমূহে এবং ঐ কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছে তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি।

ইবন আব্বাস (রা.) وكتبه শব্দটিকে وكتابه পাঠ করতেন এবং বলতেন الكتاب শব্দটি كتب হতেও ব্যাপক অর্থবোধক। কেননা, كتاب শব্দটি এখানে جنس كتاب -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা আসরের আয়াত اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ -এর মধ্যে الانسان শব্দটি جنس الناس (মানব জাতি)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ما اكثر درهم فلان ودينار উদাহরণের মধ্যে دينار ও دارهم শব্দ দুটো جنس درهم ও جنس دينار -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ যদিও একটি প্রসিদ্ধ মাযহাব, তথাপি উক্ত আয়াতের পঠন পদ্ধতিসমূহের মধ্যে كتاب শব্দটিকে বহুবচন তথা كتبه পড়াই আমার নিকট শ্রেয় কেননা, এর পূর্বাপর সমস্ত শব্দই হচ্ছে বহুবচন। অর্থাৎ ملئكته - وكتبه - ورسله ইত্যাদি। সুতরাং পূর্বাপর শব্দগুলোর সাথে لفظى (শব্দগত) সামঞ্জস্য রক্ষা করার লক্ষ্যে كتب শব্দটিকে একবচন না পড়ে বহুবচন পড়াই আমার নিকট উত্তম।

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ (তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না)। এর ব্যাখ্যা ঃ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ বলে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মু'মিনদের সম্পর্কে এ কথাই ঘোষণা করছেন যে, তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য এবং পার্থক্য করি না।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন– لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ বাক্যে বর্ণিত لا نفرق শব্দটিকে যারা جمع متكلم–এর صيغه হিসাবে نون –এর সাথে পাঠ করেন, তাদের এ কিরাআতের মধ্যে عبارة উহ্য আছে। আর তা হচ্ছে يقولون। পরবর্তী বাক্য তা বুঝায় বিধায় তাকে حذف (বিলোপ) করা হয়েছে। মূল বাক্য ছিল, وَالمؤمنون كل امن بالله وملئكته وكتبه ورسله يقولون لا نفرق بين احد من رسله অর্থাৎ মু'মিনগণ সকলেই আল্লাহ্‌হে, তাঁর ফেরেশতাসমূহে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাঁরা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। বক্ষ্যমাণ বাক্য যেহেতু এখানে يقولون শব্দটি উহ্য আছে এ কথা বুঝায় একারণে يقولون শব্দটিকে এখানে উহ্য রাখা হয়েছে, যেমনিভাবে (সূরা রাদ ঃ ২৩-২৪) وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ আয়াতাংশের يقولون শব্দটিকে উহ্য রাখা হয়েছে। মূল عبارت ছিল يقولون سلام– পূর্বসূরী আলিমদের একদল লোক لايفرق بين احد من رسله –বাক্যাংশের لا يفرق শব্দটিকে ياء –এর সাথে পড়েন। এ মতানুসারে উপরোক্ত বাক্যাংশের অর্থ হলো মু'মিনদের সকলেই আল্লাহ্‌তে, তাঁর ফেরেশতাসমূহে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং তাদের কেউ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে না। একজনকে মেনে অন্য কাউকে অমান্য করে না, বরং তাদের সকলেই এ সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস করে এবং এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা নিয়ে এসেছেন, এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আগত সত্য। তাঁরা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর আনুগত্যের প্রতি দাওয়াত দেয় এবং নিজ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁরা ঐ সমস্ত ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে যারা হযরত মূসা (আ.)–এর প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে হযরত ঈসা (আ.)–কে অস্বীকার করে এবং ঐ খৃস্টানদের বিরুদ্ধাচরণ করে, যারা হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.) উভয়ের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)–কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও তাঁর নবূওয়াতকে অস্বীকার করে। অনুরূপ আরো ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধাচরণ করে, যারা আল্লাহ্‌র কতক রাসূলকে অমান্য করে এবং কতক রাসূলকে মান্য করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫০০. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলগণের মধ্যে বনী ইসরাঈলের মত তারতম্য করি না। তারা বলেছে, অমুক হলেন নবী, তবে অমুক ব্যক্তি নবী নয়। অমুকের উপর আমরা ঈমান আনয়ন করলাম, কিন্তু অমুকের উপর আমরা ঈমান আনয়ন করলাম না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যে সমস্ত কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ পড়েন, তাদের এ কিরাআত যেহেতু হাদীসে মশহুর দ্বারা প্রমাণিত, তাই এ কিরাআতকে শায (شاذ) বলে আখ্যায়িত করা যাবে না।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ (আর তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার নিকট ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন হবে আপনার নিকট) –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মু'মিনগণ সকলেই বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কথা এবং তার আদেশ–নিষেধ সব কিছুই শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক আমাদের উপর যে দায়িত্ব–কর্তব্য স্থির করেছেন আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং তার আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছি।

তারা বলে غفرانك ربنا –অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ক্ষমা করে দিন। غفرانك শব্দ দুটো এক্ষেত্রে سبحانك –এর মতই ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, نسبحك سبحانك

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, غفران ও مغفرة –এর অর্থ হলো, ক্ষমাকৃত ব্যক্তির গুনাহের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে আবরণ ঢেলে দেয়া এবং শাস্তি দেয়া হতে মুক্ত করে দেয়া।

-واليك المصير (আর প্রত্যাবর্তন হবে তোমারই নিকট) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের আশ্রয় ও প্রত্যাবর্তন–স্থল। অতএব, আপনি আমাদের পাপরাশি মাফ করে দিন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে, غُفْرَانَكَ তে نصب দেয়া হলো কেন? তবে তাকে বলা হবে যে,غُفْرَانَكَ মাসদার (মূল ধাতু) টি যেহেতু امر– (নির্দেশসূচক) তাই একে نصب দেয়া হয়েছে, কারণ আরবী ভাষাভাষী লোকেরা امر –এর স্থানে পতিত ও امر –এর অর্থ প্রকাশক مصدر এবং اسم সমূহের মাঝে نصب-ই প্রদান করে থাকে। সাধারণত তারা বলে, شكر الله يا فلان وحمداله –এর অর্থ হচ্ছে شكر الله واحمده তুমি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং তাঁর প্রশংসা কর। অনুরূপভাবে الصلاة الصلاة –এর অর্থ হচ্ছে صلوا তোমরা দুরূদ পাঠ কর। আরবীয় লোকেরা বলেন, اَللّٰهَ اللّٰهَ يَا قوم –(نصب –এর সাথে)। যদি এতে نصب না দিয়ে رفع দেয়া হয়, তবে উপরোক্ত বাক্যের অর্থ হবে, هوالله অথবা هذا الله তখন الله শব্দটি تركيب –এর মধ্যে خَبَرْ হবে। এই অবস্থায় একে امر –এর দ্বারা ব্যক্ত করা জায়িয।

যেমন জনৈক কবি বলেছেন ঃ

اِنَّ قَوْمًا مِنْهُ عُمَيْرٌ وَ اَشْبَاهُ * عُمَيْرٍ وَمِنْهُمْ السَّفَّاحُ

لَجَدِيْرُوْنَ بِالْوَفَاءِ اِذَا قَالَ * اَخُوْا لِنَّجْدَةِ السِّلَاحُ السِّلَاحُ -

غفرانك ربنا শব্দটিকে যদি কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ رفع (পেশ) এর সাথেও পড়েন, তথাপি তা ভুল হবে না। বরং আমার ব্যাখ্যা অনুসারে তা সহীহ্ হবে নিঃসন্দেহে।

বলা হয়, রাসূল (সা.) ও তার উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রশংসা গাঁথা–এ আয়াত নাযিল হবার পর জিবরাঈল (আ.) তাঁকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার উম্মতের বেশ প্রশংসা করেছেন। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ঝাঞ্চা করুন।

৬৫০১. হাকীম ইব্ন জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর প্রতি– আয়াতটি নাযিল হলো, তখন জিবরাঈল (আ.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার এবং আপনার উম্মতের বেশ প্রশংসা করছেন। সুতরাং আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে প্রদান করা হবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রার্থনা করে বললেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا এমনিভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠ করলেন।

(٢٨٦) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৮৬. আল্লাহ্ কারোও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তাও তারই। হে আমাদের প্রতিপালক। যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমনভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের গোনাহ্ মাফ কর, আমাদেরকে ক্ষম কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত কর।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত) এর ব্যখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তির প্রতি তাঁর সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যা মানুষের জন্য সম্ভব মানুষ তার উপরই আমল করে। যা মানুষের জন্য অসম্ভব এবং সাধ্যাতীত মানুষ এর উপর আমল করতে পারে না। পূর্বে এ সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করেছি যে, الوسع শব্দটি جهدنى هذا الامر ووجدت منه ও الجهد এর– اسم مصدر (মূল ধাতু)। যেমন وسعنى هذا الامر– اسم مصدر এর– والوجل

৬৫০২. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তারা হচ্ছে ঈমানদার লোক, তাদের ধর্মীয় বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই (২২ ঃ ৭৮)। তিনি আরো বলে يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (তোমাদের জন্য যা সহজ আল্লাহ্ তা চান, তোমাদের জন্য যা ক্লেশকর তা তিনি চান না (২ ঃ ১৮৫)। আরো ইরশাদ হয়েছে فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর (৬৪ ঃ ১৬)।

৬৫০৩. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ان تبدوا مافى انفسكم اوتخفوه يحاسبكم به الله আয়াতটি নাযিল হবার পর সাহাবিগণ চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের হাত, পা, ও রসনার দ্বারা যে গুনাহ্ হয় এর থেকে তো আমরা তওবা করতে সক্ষম, কিন্তু মনের ওয়াসওয়াসা ও জল্পনা–কল্পনা হতে আমরা কি করে তওবা করব এবং কিভাবে এর থেকে বিরত থাকব? এরপর জিবরাঈল (আ.) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (আল্লাহ্ কারো উপর এমন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত) নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। অর্থাৎ তোমরা ওয়াসওয়াসা হতে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে না।

৬৫০৪. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আয়াতাংশে বর্ণিত وسعها অর্থ হলো طاقتها (প্রত্যেক মানুষের শক্তি)। তারপর তিনি বলেন, মনের জল্পনা–কল্পনা নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের শক্তির সাধ্যাতীত বিষয়।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ –মানুষ ভাল যা উপার্জন করে, তা তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে, তাও তারই। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত لَهَا অর্থ لِلنَّفْسِ অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ ভাল যা উপার্জন করে এবং আমল করে তা তারই।

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ –এর মানে হলো, যে মন্দ প্রতিটি মানুষ করে তার শাস্তিও তার উপরই আপতিত হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫০৫. কাতাদা (র.) থেকে আল্লাহ্‌র বাণীঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ –এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত। তিনি বলেন, مَا كَسَبَتْ –এর অর্থ হলো خير বা কল্যাণ এবং وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ –এর অর্থ হচ্ছে অকল্যাণ।

৬৫০৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন لَهَا مَا كَسَبَتْ –যা ভাল আমল সে করেছে এবং وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ অর্থ যা মন্দ কাজ সে করেছে।

৬৫০৭. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৫০৮. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ –এর অর্থ হলো, হাত, পা এবং রসনার আমল।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا –এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, শক্তি বহির্ভূত কাজের বোঝা আল্লাহ্ কারো প্রতি চাপিয়ে দেন না। সুতরাং দীনী বিষয়াদি কারো জন্য সাধ্যাতীত, কষ্টকর এবং সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধকারী হবে না। এ কারণেই মনের জল্পনা–কল্পনা, ইচ্ছা–ইরাদা এবং ওয়াসওয়াসার কারণে কাউকে পাকড়াও করা হবে না।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا (হে আমাদের প্রতিপালক, যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে অপরাধী কর না।) –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে শিখিয়েছেন কিভাবে তারা দু'আ করবে এবং দু'আতে তারা কি বলবে ইত্যাকার বিষয়াদি। উক্ত প্রার্থনার তাৎপর্য হলো এই যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমি যদি ভুলে কোন ফরয তরক করি কিংবা কোন হারাম কাজ করে ফেলি, কিংবা শরীআতের দৃষ্টিতে অন্যায় এমন কোন কাজ অজ্ঞতার কারণে সঠিক ভেবে করে ফেলি, তবে তা ক্ষমা করে দাও।

৬৫০৯.ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র বাণীঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا –এর মর্মার্থ হলো, যদি আমি ভুলক্রমে কোন ফরয আমল তরক করি বা কোন হারাম কাজ করে ফেলি, তবে আমাকে ক্ষমা করে দাও।

৬৫১০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতের ভুলত্রুটি এবং মনের জল্পনা–কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

৬৫১১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا আয়াতটি অবতীর্ণ হবার পর জিবরাঈল (আ.) নবী (সা.)–কে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি এ দু'আ পাঠ করুন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ আমাকে প্রশ্ন করে যে, বান্দা যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করে আল্লাহ্র নিকট এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবু কি আল্লাহ্ তা'আলা এর জন্য বান্দাকে পাকড়াও করবেন?

এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, ভুল দু' প্রকার। একঃ ঐ ভুল যা বান্দার ত্রুটি ও গাফলতির কারণে হয়ে থাকে। দুই ঃ যে বিষয়টি মুখস্থ বা ইয়াদ করা প্রয়োজন ছিল, তা মুখস্থ করার ব্যাপারে আকল দুর্বল হবার কারণে এবং ভ্রান্ত ব্যক্তির অক্ষমতার কারণে ভ্রান্তি বা ভুল হওয়া। প্রথম প্রকার ভুল যা বান্দার গাফলতির কারণে হয়ে থাকে, প্রকারান্তরে তা আল্লাহ্র নির্দেশিত বিধানকে তরক করারই নামান্তর। এ তো ঐ বিধান যা তরক করার কারণে বান্দা আল্লাহ্ কর্তৃক পাকড়াও হয় এবং এ পাকড়াও হতে বাঁচার জন্যই বান্দা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে প্রার্থনা করে। মূলত এ ভুলের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)–এর প্রতি শাস্তির বিধান দিয়েছেন এবং তাকে জান্নাত হতে বের করে দিয়েছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا

অর্থঃ আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল ; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (২০ঃ১১৫) তিনি আরো ইরশাদ করেন ঃ فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا অর্থঃ সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল। (৭ ঃ ৫১)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে نسيان শব্দটি প্রথমোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর বান্দা رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا বলে-আল্লাহর নিকট দু'আ করে এ কথাই প্রার্থনা করে যে, হে আমার প্রতিপালক, ভুল করে, আমি যদি কোন ফরয কাজ তরক করি বা কোন হারাম কাজ করে ফেলি, তবে তুমি আমাকে পাকড়াও কর না। কেননা, যে আমল তরক করা হয়েছে, তা তো ত্রুটির কারণেই তরক হয়েছে।

আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা এবং কুফরীর কারণে এমন করা হয়নি। কেননা, যদি কুফরী বা অস্বীকৃতির কারণে এমন করা হতো, তবে পাকড়াও না করার জন্য দু'আ করা কস্মিনকালেও বৈধ হতো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। সুতরাং যে কাজটি করার নির্দেশ ছিল, তা না করার কারণেই বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا বলে প্রার্থন করছে। পক্ষান্তরে এ ক্ষমা প্রার্থনা ঐ ভুলের কারণেই, যে ভুলটি কুরআন হিফয করে তা তিলাওয়াত না করা এবং এর প্রতি বিশেষ যত্ন না নেয়ার কারণে হয়ে থাকে এবং যে ভুলটি নামায–রোযা ব্যতিরেকে অন্য কাজে লিপ্ত হবার কারণে নামায–রোযার কথা ভুলে যাওয়ার কারণে হয়।

বস্তুত বান্দার জ্ঞান–ক্ষমতার দৈন্য এবং মেধার দুর্বলতার কারণে বান্দা থেকে যে ভ্রান্তি হয় এ কারণে বান্দা অপরাধী নয় এবং তা কোন গুনাহের কাজও নয়। এ ধরনের ভ্রান্তির কারণে বান্দার তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা বা দু'আ করবার কোন যৌক্তিকতা নেই। কেননা এতে তো আল্লাহ্‌র নিকট এমন বিষয়েই ক্ষমা প্রার্থনা করা হচ্ছে যা মূলতঃ পাপ বা গুনাহ্ নয়। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, ইয়াদ করা বা মুখস্থ করার চরম ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরাভূত হয়ে যাওয়ার এই বিষয়টি ঐ ব্যক্তির মতই, যে চরম চেষ্টা–সাধনা করে কুরআন মজীদ মুখস্থ করার পর অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়া এবং কুরআন মজীদের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করা ব্যতিরেকেই নিজ অক্ষমতার কারণে তা ভুলে যায়। এরূপ ভুলের কারণে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা কখনো বান্দার জন্য সমীচীন নয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে বান্দার পক্ষ হতে কোন গুনাহ্ হয় নাই, যার অপরাধে সে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

অনুরূপভাবে خطاء –ও দুই প্রকার। একঃ বান্দাকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ কাজ করা। এ বান্দার خطاء (ভুল), এ জন্য বান্দাকে পাকড়াও করা হবে। যেমন আরবীতে প্রবাদ বাক্য আছে যে, خطى فلان واخطا (অমুকে অমুক কাজ করে خطاء (গুনাহ্) করেছে)। অনুরূপ অর্থে জনৈক কবি বলেছেন, اَلنَّاسُ يَلْحَوْنَ الْاَمِيْرَ اِذَاهُمْ + خَطِؤُا الصَّوَابَ وَلَا يُلَامُ الْمُرْشَدُ উক্ত কবিতায় বর্ণিত خَطِؤُا الصَّوَابَ শব্দটি اَخْطَؤُا الصَّوَابَ –এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে। তারা কল্যাণকর কাছে ভ্রান্তি করেছে। এ হচ্ছে এমন ভ্রান্তি যার কৃত গুনাহ্ হতে ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি ধাবিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। এ ধরনের خطاء কুফরী নয়।

দুই ঃ ঐ ভ্রান্তি যা মূর্খতার কারণে হয়ে যায় এবং তা এ ধারণার ভিত্তিতে সংঘটিত হয় যে, এ কাজ তার জন্য জায়িয আছে। যেমন রমযান মাসের রাতে কেউ এ ধারণার ভিত্তিতে খানা খায় যে, এখনো সুবহি সাদিক হয়নি। অথবা যেমন কোন ব্যক্তি বৃষ্টির দিন নামাযের ওয়াক্ত বিলম্ব করে ওয়াক্ত হওয়ার অপেক্ষা করছে এবং মনে করছে যে, বুঝি নামাযের সময় হয়নি। অথচ নামাযের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ এমন ভ্রান্তি, যার গুনাহ্ আল্লাহ্ তাঁর বান্দা হতে রহিত করে দিয়েছেন। এ ভ্রান্তি হতে অব্যাহতির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কোন কোন সম্প্রদায় মনে করেন যে, যেহেতু প্রার্থনা করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন কিংবা যেহেতু প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের অক্ষমতা এবং হীনতা প্রকাশ করা বান্দার জন্য মুস্তাহাব, তাই কৃত ভুল–ভ্রান্তির কারণে আল্লাহ্ কর্তৃক যেন মানুষ ধৃত না হয়

এজন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করা বান্দার উপর অপরিহার্য। অবশ্য মুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করার কোনই যৌক্তিকতা নেই। উপরোক্ত সম্প্রদায়ের এ মতামতের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি গ্রন্থ আমি প্রণয়ন করেছি, যা প্রত্যেক জ্ঞানবান মানুষের জন্য যথেষ্ট।

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا (হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না।) –এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হে লোক সকল। তোমরা বল, رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا আয়াতে বর্ণিত إِصْرًا –এর অর্থ হলো, العهد (অর্থাৎ অঙ্গীকার)। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي এখানে اصر শব্দটি عهد (অঙ্গীকার)–এর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসাবে رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا –এর অর্থ হবে। ربنا ولا تحمل علينا عهداً অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন অঙ্গীকার চাপিয়ে দিয়ো না, যার উপর কায়েম থাকতে আমরা অক্ষম এবং যা বহন করতে আমরা অসমর্থ। যেমন চাপিয়ে দিয়েছিলে তুমি আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত ইয়াহূদ এবং খৃস্টানদের প্রতি। যা ছিল তাদের জন্য চরম কষ্টসাধ্য কাজ। অথচ এ সমস্ত বিষয়াদির বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাদের থেকে ওয়াদা এবং অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি। তারপর তাদের প্রতি শাস্তি তরান্বিত করা হয়েছে। তাই দয়া পরবশ হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মাদী (সা.)–কে তার নিকট এ মর্মে দু'আ করার তা'লীম দিয়েছেন যে, তিনি যেন তাদের উপর পূর্ববর্তীদের মত আমলের ব্যাপারে এমনভাবে ওয়াদা ও অঙ্গীকার চাপিয়ে না দেন যে, তারা যদি এ আমল তরক করে কিংবা এ আমলের কথা ভুলে যায়, তবে পূর্ববর্তী উম্মতের মত তাদের উপরও পতিত হবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ বা আযাব। ইমাম তাবারী বলেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমি যা বললাম, মুফাস্‌সিরগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্ন তা প্রদত্ত হলো ঃ

৬৫১২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণীঃ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا –এর অর্থ হলো, তুমি আমাদের প্রতি পূর্ববর্তিগণের ন্যায় ওয়াদা–অঙ্গীকারের কোন গুরু দায়িত্ব অর্পণ করনা।

৬৫১৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا আয়াতাংশে বর্ণিত إِصْرًا –এর অর্থ হলো عهداً অর্থাৎ অঙ্গীকার।

৬৫১৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণীঃ إِصْرًا –এর অর্থ হলো عهداً অর্থাৎ অঙ্গীকার।

৬৫১৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِصْرًا অর্থ হলো عهداً (অঙ্গীকার)।

৬৫১৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا আয়াতাংশে বর্ণিত إِصْرًا –এর অর্থ হচ্ছে ঐ অঙ্গীকার, যা আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত ইয়াহূদীদের থেকে নেয়া হয়েছিল।

৬৫১৭. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا –এর মর্মার্থ হলো, আমাদের উপর অঙ্গীকারের এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা বহন করতে আমরা অক্ষম বা যা বাস্তবায়নে আমরা অসমর্থ। যেমনিভাবে চাপিয়ে দিয়েছিলে তুমি আমাদের পূর্ববর্তী উম্মত ইয়াহূদ এবং খৃষ্টানদের উপর, অথচ তারা তা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি। ফলে তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছ।

৬৫১৮. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, اِصْرًا অর্থ হচ্ছে المواثيق (অঙ্গীকারসমূহ)।

৬৫১৯. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِصْرًا –এর অর্থ হলো অঙ্গীকার যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ (العمران : ٨١) অর্থাৎ عهدى –এখানেও اصر শব্দটি অঙ্গীকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৫২০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ এখানে اِصْرِى শব্দের অর্থ হচ্ছে عَهْدِى অর্থাৎ আমার দেয়া অঙ্গীকার।

আর অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, اِصْرَ শব্দের অর্থ হলো ذنوب অর্থাৎ গুনাহ্। এ হিসাবে لَا تَحمل علينا اصرا –এর অর্থ হলো, আমাদের উপর কোন গুনাহের বোঝা অর্পণ করবেন না। যেমনিভাবে তা আপনি আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর অর্পণ করেছেন। আর পরিণামে আপনি আমাদেরকে পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় বানর ও শূকরে পরিণত করবেন না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫২১. আতা ইব্‌ন আবী রাবাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَلَاتَحمل علينا اصرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا –এর মর্মার্থ হলো, পূর্ববর্তিগণের ন্যায় আমাদের উপর গুনাহের বোঝা আরোপ করে আমাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করবেন না।

৬৫২২. ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا –এর অর্থ হলো, পূর্ববর্তী উম্মতদের ন্যায় আমাদের উপর এমন গুনাহের বোঝা অর্পণ করবেন না, যার কোন তওবা নেই এবং নেই কোন কাফ্ফারা।

অন্যান্য তাফসীরকারের মতে اِصر (হামযার মধ্যে স্বরচিহ্ন যের)–এর অর্থ الثقل –মানে বোঝা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫২৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا –এর মর্মার্থ হলো, হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের প্রতি এমন গুরুভার অর্পণ করবেন না, যা আমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীদের উপর অর্পণ করেছিলেন।

৬৫২৪. মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র বাণীঃ وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا –এর মাঝে বর্ণিত اِصْرَ শব্দের অর্থ হলো الامرا لغليظ গুরুভার এবং কঠোরতর দায়িত্ব। তবে الأصر – (হামযাতে স্বরচিহ্ন যবর)–এর অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজ আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া করা।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ (হে আমাদের প্রতিপালক। এমন ভার আমাদের প্রতি অর্পণ করনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই।) –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের মর্মার্থ হলোঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বল, হে আমাদের প্রতিপালক! এমন আমলের বোঝা আমাদের উপর অর্পণ করনা, যার বাস্তবায়ন আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ তা বহন করা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য। আর ব্যাখ্যাকারগণের একদলও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫২৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ – এর দ্বারা এমন কঠোর বিধানের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যার বাস্তবায়ন খুবই কঠিন। যেমন কঠোর বিধান দেয়া হয়েছিল। তোমাদের পূর্ববর্তিদের উপর।

৬৫২৬. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ –এর মর্মার্থ হলোঃ আমাদের প্রতি আমলের এমন বোঝা অর্পণ করবেন না, যা বাস্তবায়নে আমরা অক্ষম।

৬৫২৭. ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ –এর মানে হলো, আমাদের উপর এমন কোন দীনী বিধান ফরয করনা, যা বাস্তবায়নের ক্ষমতা আমাদের নেই। ফলে আমরা এর উপর আমল করতে সক্ষম হব না।

৬৫২৮. ইবন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ – এর দ্বারা বানর বা শূকরে পরিণত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

৬৫২৯. সালিম ইবন শাবূর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ –এর মানে হলো, الْغُلْمَةُ। কঠোরতর বিধান।

৬৫৩০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ – এর মানে হলো কঠিন বিধান ও পরাধীনতার শৃংখল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা বলেছি যে, এর মর্মার্থ হলো "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রতি এমন আমল চাপিয়ে দিয়ো না, যা বাস্তবায়নে আমরা অক্ষম।" এর কারণ হচ্ছে এই যে, মু'মিনগণ প্রথমে আল্লাহ্র নিকট এ প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাদেরকে তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুল–ভ্রান্তি বা অন্যায় করে ফেললে সে জন্য পাকড়াও না করেন এবং তিনি যেন পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তাদের প্রতিও কোন গুরুভার অর্পণ না করেন। তারপর এ আয়াতাংশ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই দীনী ব্যাপারে সহজতর বিধান কামনা করার সাথে এ অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এর বিপরীত অর্থের তুলনায়।

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا (আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।)–এর ব্যাখ্যাঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশেও আল্লাহ্ পাকের নিকট মু'মিনগণের প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। আর একথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বান্দা আল্লাহ্র বাণীঃ

وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ –এর মাধ্যমে তাদের প্রতিপালকের নিকট এ কথাই কামনা করছে যে, তিনি যেন তাদের দায়িত্ব পালনকে সহজ করে দেন। এ কারণেই পূর্বোক্ত বাক্যাংশের পর وَاعْفُ عَنَّا বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। এতে তারা এ কামনাই করছে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আরোপিত দায়িত্ব সম্পাদনে যদি তাদের কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তিনি যেন তা মাফ করে দেন। আর এ ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তিনি কোন শারীরিক শাস্তি প্রয়োগ না করেন। উপরে আমরা যা বলেছি কোন কোন তাফসীরকার ঠিক অনুরূপ ব্যাখ্যাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেছেন ঃ

৬৫৩১. ইব্‌ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এখানে وَاعْفُ عَنَّا–এর অর্থ হলো ঃ আমাদের প্রতি তোমার নির্দেশিত বিষয়ে যদি আমাদের কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তা মাফ করে দিন। আর আমাদের দোষ–ত্রুটি গোপন রাখুন। তা প্রকাশ করে আমাদেরকে অপমানিত করবেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, مغفرة –এর অর্থ পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি।

৬৫৩২. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاغْفِرْلَنَا –এর অর্থ হলোঃ আপনার পক্ষ হতে নিষিদ্ধ ব্যাপারে আমরা যদি জড়িয়ে পড়ি, তবে আপনি আমাদের প্রতি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন।

وَارْحَمْنَا (আমাদের প্রতি দয়া করুন) –এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আপনার ঐ দয়ার দ্বারা পরিবেষ্টন করে রাখুন, যার দ্বারা আপনি আমাদেরকে আপনার শাস্তি হতে মুক্তি দিবেন। কারণ, আপনার দয়া ব্যতিরেকে স্বীয় আমল দ্বারা তো কেউ আপনার শাস্তি হতে মুক্তি পাবে না। আর আপনি দয়া না করলে আমাদের আমল তো আমাদেরকে মুক্তি দেবার মত নয়। সুতরাং যে কাজে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, রাযী হবেন, আমাদেরকে এমন কাজের তাওফীক দান করুন।

৬৫৩৩. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَارْحَمْنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আপনি আমাদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন আপনার দয়া ব্যতীত আমাদের পক্ষে তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আপনি যে কাজ নিষেধ করেছেন আমাদের পক্ষে আপনার সে নিষেধ অমান্য করাও সম্ভব নয়। আপনার দয়া ব্যতীত কেউ নাজাত পায় না।

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ -আপনিই আমাদের অভিভাবক। সাহায্যকারী। যারা আপনার সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং আপনাকে অস্বীকার করে তাদের নয়। কেননা, আমরা আপনার উপরই ঈমান এনেছি এবং আপনার বিধান আমরা মেনে চলি। তাই যারা আনুগত্য করে আপনিই তাদের অভিভাবক আর যারা আপনার অবাধ্য তারা নাফরমান। সুতরাং আপনি আমাদের সাহায্য করুন। কেননা, আমরা আপনারই দল। আর আপনি আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত করুন। যারা আপনার একত্ববাদকে অস্বীকার করে, আপনাকে ছেড়ে অন্যান্য উপাস্য ও শরীকদের পূজা করে এবং আপনার নাফরমানী দ্বারা শয়তানের আনুগত্য করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, المولى শব্দটি " وَلِى فلان اَمرَ فُلَان " হতে নির্গত, اسم ظرف –এর صيغه। কারণ, যে যার কাজের কর্মবিধায়ক হয়, সেই তার অভিভাবক ও মাওলা

হয়। ولى থেকে আগত مولى শব্দটির عين كلمه অর্থাৎ لام যবরযুক্ত হওয়ায় الف কে ياء -মৌলা-এর দ্বারা পরিবর্তন করে مولانا বানানো হয়েছে। তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি তা পাঠ করলেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মুনাজাতসমূহ কবুল করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫৩৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা পাঠ করে যখন আল্লাহ্‌র বাণীঃ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেনঃ আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তিনি যখন رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا পাঠ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদের উপর সাধ্যের অতীত কোন দায়িত্ব দেব না। এরপর যখন তিনি وَاغْفِرْ لَنَا তিলাওয়াত করলেন, তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করলেন ঃ আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন وَارْحَمْنَا পাঠ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদের প্রতি দয়া করলাম। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ পাঠ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেনঃ আমি তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী করলাম।

৬৫৩৫. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত জিব্রাঈল (আ.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.)। পাঠ করুন ঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا তিনি তা পাঠ করলেন। জিবরাঈল বললেন, মনযূর হয়ে গিয়েছে। এরপর জিব্রাঈল (আ.) পুনরায় বললেন, পড়ুন, رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাও পাঠ করলেন। জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হ্যাঁ, মনযূর হয়েছে। এরপর আবারো জিবরাঈল (আ.) বললেন, পড়ুন رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ নবী করীম (সা.) তাও পাঠ করলেন। এবারো জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হ্যাঁ মনযূর হয়েছে। পুনরায় জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে বললেন, পড়ুন وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা পাঠ করলেন। জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হ্যাঁ মনযূর হয়েছে।

৬৫৩৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا নাযিল হওয়ার পর জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মাদ (সা.) ! কবুল হয়েছে। এরপর তিনি পাঠ করলেন।

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ـ وَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ – জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)। সব কবুল হয়েছে।

৬৫৩৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ থেকে رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا পর্যন্ত আয়াতটি নাযিল করার পর রাসূল (সা.) পাঠ করলেন, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

আমি তোমার প্রার্থনা মনযূর করেছি। এরপর তিনি পাঠ করলেন, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا –এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন আমি মনযূর করলাম। এরপর তিনি পুনরায় পাঠ করলেন, رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ এর জবাবেও আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, আমি কবুল করলাম। তারপর তিনি পুনরায় পাঠ করলেন, وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমার এ দু'আ আমি গ্রহণ করলাম।

৬৫৩৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا আয়াতাংশ নাযিল করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা পাঠ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হ্যাঁ–সূচক সম্মতি জানান।

৬৫৩৯. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا আয়াতটি নাযিল হবার পর রাসূল (সা.) তা পাঠ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হ্যাঁ, আমি তোমার এ প্রার্থনা মনযূর করেছি। এরপর তিনি পাঠ করলেন, رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا –এর উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমার এ প্রার্থনাও কবুল করেছি। বর্ণনাকারী বলেন, এ সূরার শেষাংশটি এ উম্মতকেই প্রদান করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে এ বিষয়গুলো প্রদান করা হয় নাই।

৬৫৪০. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ থেকে غُفْرَانَكَ رَبَّنَا পর্যন্ত পাঠ করলে উক্ত মুনাজাতের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তিনি لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا থেকে لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا পর্যন্ত পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে পাকড়াও করব না। এরপর তিনি رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا পর্যন্ত পাঠ করলে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের উপর কোন কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করব না এরপর তিনি وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا থেকে সূরার শেষাংশ পর্যন্ত পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের পাপ মোচন করলাম, মাফ করলাম, তোমাদের প্রতি দয়া করলাম এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে জয়যুক্ত করলাম। বর্ণনাকারী দাহ্হাক (র.) বলেন, উক্ত প্রার্থনাসমূহ কবুল করা নবী করীম (সা.)–এর জন্য খাস ছিল।

৬৫৪১. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বললেন, এ দু'আর মাধ্যমে আপনি আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত করুন। নবী (সা.) এ দু'আর দ্বারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট মুনাজাত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর কাংক্ষিত বিষয়সমূহ দান করেন। এ বিষয়টি নবী (সা.)–এর জন্য খাস ছিল।

৬৫৪২. আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'আয (রা.) এ সূরা এবং وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ –এর পাঠ শেষে আমীন বলেছেন।

سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾
۲۰۰ آیتیں اور
۲۰ رکوع ہیں

সূরা আলে–ইমরান

২০০ আয়াত, ২০ রুকূ মাদানী

।। দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. আলিফ্–লাম–মীম,

২. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও স্বাধিষ্ঠ, বিশ্বধাতা।

৩. তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইন্‌জীল–

৪. ইতিপূর্বে, মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; এবং তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতা।

সূরা আলে-ইমরান

(১) الٓمٓ ০ (২) اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ০

১-২. আলিফ- লাম- মীম। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নই। তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি স্বাধিষ্ঠবিশ্বধাতা।

আলিফ্--লাম-মীম। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, الم সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই এখানে এর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। অনুরূপভাবে اَللّٰه শব্দ সম্বন্ধেও পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ -এর মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ একমাত্র তিনিই, তাদের কল্পিত মা'বূদ এবং শরীকরা নয়। তিনিই যেহেতু একমাত্র রব এবং একমাত্র ইলাহ্, তাই ইবাদতের উপযুক্তও এককভাবে তিনিই। তিনি ব্যতীত অন্য সব কিছুই তাঁর মালিকানাভুক্ত এবং তাঁর সৃষ্টি। তাঁর রাজত্বে এবং মালিকানায় কোন শরীক নেই। সুতরাং মানুষের জন্য তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা জায়িয নেই। আর তাঁর রাজত্বে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাও জায়িয নেই। কেননা, তিনি ব্যতীত তাদের কল্পিত সমস্ত মা'বূদই তাঁর মালিকানাভুক্ত দাস। আর তিনি ব্যতীত সমস্ত বড় বড় বস্তুই তাঁর সৃষ্টি। আর মালিকানাভুক্ত দাসের উপর একক মালিকের ইবাদত করা অপরিহার্য- অপারিহার্য তাঁর মাওলা ও রিযিকদাতা আল্লাহ্র এককভাবে ইবাদত করা। আর আনুগত্য করা সৃষ্টির থেকে ঐ সত্তার, যিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। মানুষের উপর মুহাম্মাদ (সা.)-এর আনুগত্য ঐ দিন থেকেই জরুরী, যেদিন হতে তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং তাঁকে তাঁর গোত্রীয় ভাষায় তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, ঠিক এমন এক মুহূর্তে, যখন তারা দেবদেবী, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র, মানুষ, ফেরেশতা ইত্যাদির পূজায় লিপ্ত ছিল। পক্ষান্তরে প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিককে বাদ দিয়ে অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করে আদম সন্তানগণ গোমরাহীতেই নিমজ্জিত হয়েছে এবং গোটা পুরো উম্মাহ্ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সর্বোপরি তারা গায়রুল্লাহ্র ইবাদত করে সীরাতে মুস্তাকীমের বিপরীত দিকে অগ্রসর হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন যে, তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন, এই সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারো মা'বুদ হওয়ার অধিকার নেই। শুরুতে আল্লাহ্ পাক নিজের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আগত নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে তাঁর একত্ববাদের প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তারা এসে ঈসা (আ.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বিতর্ক আরম্ভ করে এবং আল্লাহ্ পাকের শানে উদ্ভট মন্তব্য করতে থাকে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা এ সূরার প্রথম হতে প্রায় আশিটি আয়াত অবতীর্ণ করেন। এসব আয়াতে তাদের বিরুদ্ধে এবং যারাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাদের ন্যায় কথা বলবে, সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি পেশ করেছেন। তারপর তারা এ সমস্ত প্রমাণাদি উপক্ষো করে নিজেদের গোমরাহী এবং কুফরীর উপর অবিচল থাকে। এরপর তিনি তাদেরকে মুবাহালার জন্য আহ্বান জানান। তারা তা অস্বীকার করে এবং তাদের থেকে জিযিয়া কর গ্রহণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্র নিকট অনুরোধ জানায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জিযিয়া গ্রহণের বিষয়টি কবুল করলেন। অবশেষে তারা নিজ দেশে ফিরে গেল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতগুলো যদিও তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে রব ও ইলাহ্ বানানোর ব্যাপারে যাদের মধ্যে এ প্রবণতা পাওয়া যাবে তারাও তাদের অনুরূপ হবে। আল্লাহ্ পাকের বর্ণিত এ প্রমাণাদির মধ্যে তারাও শামিল হবে। আর কুরআনের যে সমস্ত আয়াত খৃষ্টান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে পার্থক্য করে তাদের ক্ষেত্রে তা অনুরূপভাবে প্রযোজ্য হবে। তা তাদের বরখেলাফ দলীল হিসাবেও গৃহীত হবে।

নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে বলে যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁরা হলেন ঃ

৬৫৪৩. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজরানের খৃষ্টানদের মধ্য হতে ৬০ জন অশ্বারোহী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট হাযির হলো। এ দলে ১৪ জন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলো। তাদের মধ্যে তিনজন ছিল যে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক। এ তিনজনের একজনকে বলা হতো আকিব (العاقب)। তিনি ছিলেন কওমের আমীর, বুদ্ধিদাতা এবং তাদের উপদেষ্টা। তারা তার পরামর্শ ব্যতীত এক কদমও নড়াচড়া করত না। তাঁর নাম ছিল 'আবদুল মসীহ'। দ্বিতীয় জনকে বলা হতো আস-সায়্যিদ। তিনি ছিলেন তাদের মাঝে সর্বাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ভ্রমণ ও বাসস্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর নাম হলো, আয়হাম। আর তৃতীয়জন হলেন আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা। তিনি মূলত আরবের বনু বক্র ইব্ন ওয়ায়ল-এর লোক। তবে তিনি ছিলেন তাঁদের বিশপ ও শিক্ষক এবং তাদের ইমাম ও তাদের মধ্যে সর্বাধিক বড় আলিম ব্যক্তি। বস্তুত আবূ হারিছা তাদের মাঝে বেশ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এবং খৃষ্টান ধর্মীয় পুস্তকাদি শিক্ষা দিবার ফলে ধর্মীয় জ্ঞান ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। ফলে, রোম সম্রাট ও সেখানকার রাজ-রাজাড়গণ তার প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তার পরিচর্যা করেন এবং তাঁকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন করেন। এমনকি তারা তার জন্য বহু গীর্যা নির্মাণ করেন এবং তার ইল্ম ও উদ্ভাবন শক্তির কারণে বিভিন্নভাবে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইব্ন ইসহাক (র.) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) বলেছেন, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর দরবারে মদীনায় আগমন করে। তখন তিনি আসরের সালাত আদায় করছিলেন। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্র নিকট মসজিদে প্রবেশ করে। তখন তাদের গায়ে ছিল জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, জুববা এবং চাদর। তারা ছিল বনী হারিছ ইব্ন কা'বের সুন্দর সুপুরুষ। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবীদের থেকে যাঁরা তাদেরকে দেখেছেন, তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, তাদের আগমনের পর তাদের সমতুল্য কোন প্রতিনিধি দল আমরা আর দেখিনি। তখন তাদের সালাতের সময়ও নিকটবর্তী হয়েছিল। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর মসজিদেই নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। অতএব, তারা পূর্বদিকে ফিরে সালাত আদায় করল।

এরপর বর্ণনাকারী বলেন, তাদের যে চৌদ্দ জনের উপর সমস্ত কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাদের নাম হচ্ছে আল আকিব 'আবদুল মসীহ, আস্–সায়্যিদ আল্–আয়হাম, আবূ বকর ইব্ন ওয়ায়িলের ভাই আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা, আওয, হারিছ, যায়দ, কায়স, ইয়াযীদ নুবায়হ, খুওয়ায়লিদ, আমর খালিদ আবদুল্লাহ্ ও ইউহান্নাস। তাঁরা সকলেই ঐ ষাটজন অশ্বারোহী প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের থেকে আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা, আকিব আবদুল মসীহ এবং আস্–সায়্যিদ আয়হাম মোট এ তিন ব্যক্তিই কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে আলোচনা করেন। তারা খৃষ্টধর্মে তথা বাদশাহর দীনে অটল ছিল। অবশ্য তাদের দায়িত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তারা বলত, হযরত ঈসা (আ.) স্বয়ং আল্লাহ্। আবার বলত, তিনি আল্লাহ্র পুত্র। আবার কখনো বলত তিনি তিনের তৃতীয়। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কথা অনুরূপই। হযরত ঈসা (আ.) যে স্বয়ং আল্লাহ্, এ দাবীর যৌক্তিকতা পেশ করে তারা বলত, তিনি মৃতকে জীবন দান করেন, শ্বেত কুষ্ঠ, জন্মান্ধতা এবং অন্যান্য রোগ নিরাময় করেন এবং অদৃশ্যের খবর দেন। তিনি মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে এতে ফুঁক দেন আর অমনি তা পাখি হয়ে উড়ে যায়। অথচ এসব তিনি করতেন আল্লাহ্র নির্দেশে। আল্লাহ্ তাঁকে বিশ্ব মানবের সম্মুখে একটি নিদর্শন রূপে দাঁড় করানোর জন্যই এরূপ করিয়েছেন। তারা তাঁকে আল্লাহ্র পুত্র বলে দাবী করল এবং যৌক্তিকতা এভাবে পেশ করল যে, তাঁর কোন পিতা নেই। তদুপরি তিনি মাতৃক্রোড়ে থেকেই কথা বলতে পারতেন। অথচ ইতিপূর্বে কোন মানব সন্তানই এরূপ করেনি। তিনি যে তিনের তৃতীয় ছিলেন– এ দাবীর যৌক্তিকতা পেশ করে তারা বলল, আল্লাহ্ তা'আলা فعلنا-امرنا-خلقنا এবং قضينا ইত্যাদি বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ যদি এক ও লা–শরীক হতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি فعلت - امرت - خلقت ও قضيت অর্থাৎ একবচন প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করতেন। তাই তারা তিনজন। তিনি, ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতা মারইয়াম (আ.)।

আল্লাহ্ তা'আলা এ জালিমদের দাবী হতে পবিত্র এবং এ আলোকেই কুরআন নাযিল হলো। এতে আল্লাহ্ রাববুল আলামীন তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে তাদের কথাগুলো উল্লেখ করেছেন। তারপর পাদ্রীদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে কথা শেষ করার পর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা উভয়ই বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করনি। অতএব, ইসলাম গ্রহণ কর। তারা বলল, হ্যাঁ, আমরা আপনার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। নবী (সা.) বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছ। তোমাদের দাবী ঃ আল্লাহ্র সন্তান আছে, তোমাদের ত্রিশূল পূজা এবং শূকরের গোশত ভোজন করা ইত্যাদি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখছে। তখন তারা

প্রশ্ন করল যে, হে মুহাম্মদ! তবে বলুন তো তাঁর পিতা কে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) চুপ করে থাকলেন, তাদের কোন জবাব দিলেন না। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এসব কথা এবং তাদের মতবিরোধ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরানের শুরু হতে ৮৭টি আয়াত নাযিল করলেন। এর একটি আয়াত হলো, اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি তাদের দাবী হতে মুক্ত এবং পবিত্র। তিনি এও বলেছেন যে, সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষেত্রে তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সাথে সাথে তিনি তাদের কল্পিত কুফর ও শিরকজনিত কথা খন্ডন করে হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে তাদের অতিশয়-উক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করে বলেছেন, اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই অর্থাৎ আল্লাহর কর্মে তার কোন শরীক নেই। পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্‌র এ বাণীর উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া।

৬৫৪৪. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌র বাণীঃ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, একদা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ করল এবং তারা বলল, তার বাপের নাম কি? সর্বোপরি তারা আল্লাহ্ তা'আলার উপর মিথ্যা এবং অপবাদ আরোপ করল। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং তিনি কাউকে স্ত্রী ও সন্তানরূপে গ্রহণ করেন নি। তারপর নবী (সা.) তাদেরকে বললেন, তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই এবং তিনি তাঁর পিতার মতও নন। তারা বলল, হ্যাঁ জানি, আবার ইরশাদ হলো, তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, কখনো তিনি মৃত্যুবরণ করবেন না। অথচ ঈসা (আ.) একদিন মরে যাবেন? তারা বলল, হ্যাঁ, জানি। তারপর তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, আমাদের প্রতিপালকই সমস্ত জিনিসের তত্ত্বাবধায়ক, তিনিই সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করেন, হিফাযত করেন? আর সবার জীবিকার ব্যবস্থা করেন? জবাবে তারা বলল, হ্যাঁ জানি। তারপর নবী (সা.) বললেন, হযরত ঈসা (আ.) কি এগুলোর কোনটার ক্ষমতা রাখেন? তারা বলল, না, রাখেন না। তিনি বললেন, তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, আল্লাহ্‌র নিকট ভূমন্ডল ও নবমন্ডলের কোন কিছুই গোপন নেই? তারা বলল, হ্যাঁ, তাও জানি। এরপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র শিক্ষা দেয়ার বিষয় ব্যতীত আসমান-যমীনের কোন গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন কি? তারা বলল, না, জ্ঞাত নেই। এরপর নবী (সা.) বললেন, আমাদের প্রতিপালকই নিজ ইচ্ছা মুতাবিক ঈসা (আ.)-কে তাঁর মাতৃগর্ভে আকৃতিদান করেছেন, এটি তোমরা জান না? তারা বলল, হ্যাঁ, এও আমরা জানি। তারপর তিনি আবারো প্রশ্ন করলেন যে, তোমরা কি জান না যে, আমাদের প্রতিপালক পানাহার করেন না এবং তাঁর কখনো হদছ হয় না? তারা বলল, হ্যাঁ জানি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ঈসা (আ.)-কে একজন মহিলা গর্ভ ধারণ করেছেন, যেমন মহিলাগণ গর্ভধারণ করে তারপর তাঁকে প্রসব করেছেন, যেমন মহিলাগণ তার সন্তান প্রসব করে থাকে। এরপর তিনি পানাহার শুরু করেন এবং তাঁর হদছ হয়, এটি কি তোমরা জান না? তারা বলল, হ্যাঁ, জানি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাহলে তোমাদের দাবী কেমন করে সত্য হতে পারে? তিনি বলেন, তারা কথাটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা সত্ত্বেও পরে শত্রুতাবশত তা অস্বীকার করে। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, الٓمٓ ۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ (আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ ও বিশ্বধাতা)

আল্লাহ্‌র ইরশাদ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ (তিনি চিরঞ্জীব ও স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা) এ শব্দ দুটোর পাঠ প্রক্রিয়ার মাঝে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ রয়েছে। শহুরে কারীদের কিরাআত হলো, اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ –তবে উমর ইবনুল খাত্তাব ও ইব্‌ন মাসউদ (রা.)–এর পঠনরীতি ছিল اَلْحَىُّ الْقَيَّامُ আর আলকামা ইব্‌ন কায়স (রা.) পাঠ করতেন اَلْحَىُّ الْقَيِّمُ –শেষোক্ত কিরাআত সম্পর্কে বর্ণিত আছে।

৬৫৪৫. আবূ মা'মার (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলকামা (রা.)–কে اَلْحَىُّ الْقَيِّمُ পাঠ করতে শুনে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি নিজে কি তা পাঠ করতে শুনেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি জানি না।

৬৫৪৬. অপর সূত্রেও আলকামা (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে আলকামা (রা.) থেকে এর বিপরীতও বর্ণিত আছে।

৬৫৪৭. আলকামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلْحَىُّ الْقَيَّامُ পাঠ করেছেন।

আমাদের নিকট যে কিরাআত ব্যতীত অন্য কিরাআত জায়িয নেই, তা সমস্ত মুসলমানদের কিরাআত। এ কিরাআতটি প্রসিদ্ধ পাঠরীতি হিসাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে কেউ মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়নি। অধিকন্তু মুসলমানদের মাসহাফে যা বিদ্যমান আছে তা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোকদের কিরাআত, যারা পড়ে اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ اَلْحَىُّ –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اَلْحَيُّ –এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এ শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজের স্থায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং মৃত্যুর কথাটি তাঁর থেকে দূরীভূত করে দিয়েছেন। যা তিনি ব্যতীত সকলের জন্য অবধারিত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫৪৮. ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْحَىُّ ঐ সত্তাকে বলা হয়, যার উপর কখনো মৃত্যু আপতিত হয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বিতর্ককারী নাজরানের খৃস্টান পাদ্রীদের মতানুসারে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন।

৬৫৪৯. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْحَىُّ শব্দের অর্থ চিরঞ্জীব, যার মৃত্যু নেই।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে উল্লিখিত اَلْحَىُّ শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ শব্দের দ্বারা নিজের প্রশংসা করেছেন যে, তিনি হলেন এমন সত্তা যিনি যা ইচ্ছা করেন সবই সহজে সুসম্পন্ন হয়ে যায়। তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করার শক্তি কেউ রাখে না। তিনি কাফিরদের কল্পিত উপাস্যদের ন্যায় নিষ্কর্মা নন। এ শব্দের ব্যাখ্যায় অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, حَىٌّ –এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা চিরঞ্জীব। এ গুণটি কখনো তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌র ইল্‌ম থাকায় তাঁকে عليم বলা হয়েছে এবং ক্ষমতা থাকায় তাকে قدير বলা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ তাঁর যেহেতু হায়াতও রয়েছে, তাই তিনি নিজেকে حَىٌّ বলে অভিহিত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমার নিকট এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এ শব্দের দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর নিজের এমন চিরঞ্জীব হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন যে, কখনো তাঁর শেষ নেই, ফানা নেই। সাথে সাথে তিনি তাঁর স্বীয় সত্তা হতে ঐ সমস্ত অবস্থার অস্বীকৃতিও প্রকাশ করেছেন, যা সৃষ্টির উপর আপতিত হয়। তথা জীবন শেষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া ইত্যাদি। এ শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের এ সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁকেই উপাস্য এবং ইলাহ্ রূপে গ্রহণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য। অন্য কাউকে নয়। আর حَيٌّ ঐ সত্তাকে বলা হয়, যাঁর উপর মৃত্যু ও ধ্বংস কখনো আপতিত হয় না, যেমন মৃত্যুবরণ করছে তাদের কল্পিত রবসমূহ এবং যেমন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের মুখরোচক ইলাহ্গণ। এ আয়াতাংশের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাও বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর সৃষ্টি হতে যেগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে, নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তারা কখনো ইলাহ্ হতে পারে না এবং যার শেষ নেই, ধ্বংস নেই এমন ইলাহ্কে উপেক্ষা করে তারা কখনো ইবাদতের উপযোগী প্রভু হতে পারে না। বরং ইলাহ্ তো তিনিই হতে পারেন, যিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু বরণ করেন না, ধ্বংস হন না এবং কখনো নিঃশেষ হন না। তিনিই ঐ আল্লাহ্ যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই।

اَلْقَيُّوْمُ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

এ শব্দটির পাঠ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিরাআত বিশেষজ্ঞদের একাধিক মত রয়েছে যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর আমার নিকট পসন্দনীয় কোন্টি তাও কারণসহ আমি উল্লেখ করেছি।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, اَلْقَيُّوْمُ শব্দের পাঠ প্রক্রিয়া সম্পর্কে যতগুলো দিকের কথা আমি উল্লেখ করেছি এগুলোর অর্থ পরস্পর কাছাকাছি এবং সাদৃশ্যপূর্ণ। মোটামুটিভাবে বলা যায়, اَلْقَيُّوْمُ –এর অর্থ اَلْقَيِّمُ অর্থাৎ সমস্ত কিছুর সংরক্ষণ করা, এগুলোর জীবিকার ব্যবস্থা করা এবং নিজ ইচ্ছা মুতাবিক এগুলোর প্রতিপালন করা তথা পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং বাড়ান ও কমান ইত্যাকার বিষয়ে তিনি হচ্ছেন বিশ্বধাতা। যেমন বর্ণিত রয়েছে যে–

৬৫৫০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ –এর অর্থ হলো, সমস্ত কিছুর সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক।

৬৫৫১. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৫৫২. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْقَيُّوْمُ অর্থ হলো, সর্ব বিষয়ের সংরক্ষক। যিনি প্রতিটি বস্তু হিফাযত করেন, সংরক্ষণ করেন এবং যিনি সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করেন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, কোন কোন তাফসীরকার বলেন, اَلْقَيُّوْمُ অর্থ নিজ স্থানে স্থিতিমান। অর্থাৎ তাঁদের মতে اَلْقَيُّوْمُ অর্থ القيام الدائم স্থায়ী স্থিতি, যার কোন অন্ত নেই এবং মাঝে কোন রদবদল নেই। কেননা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার সত্তা হতে পরিবর্তন–পরিবর্ধন, স্থানান্তর এবং মানুষ ও অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় আবর্তন ও বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়সমূহ গ্রহণ করাকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫৫৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْقَيُّوْمُ অর্থ, সৃষ্টির মাঝে নিজ রাজ্যে নিজস্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকা, যার কোন শেষ নেই, নেই কোন অন্ত। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বিতর্ককারী নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কথার দ্বারা এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, ঈসা (আ.) তার নিজস্ব স্থান হতে স্থানান্তরিত হয়ে পড়েছেন এবং অন্যত্র চলে গিয়েছেন। তাই তিনি কখনো আল্লাহ্ হতে পারেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উভয়বিধ ব্যাখ্যার মাঝে আমার নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ঐ ব্যাখ্যা, যা মুজাহিদ ও রবী' (র.) দিয়েছেন। অর্থাৎ اَلْقَيُّوْمُ শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজ সত্তার প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনিই সর্ব বিষয়ের কর্ম বিধায়ক। তথা সৃষ্টি জীবের রিয্‌ক দেয়া না দেয়া, এদের হিফাযত ও সংরক্ষণ করা প্রভৃতি বিষয়াদি তাঁরই হাতে। যেমন আরবীতে প্রবাদ বাক্য আছে যে, فلان قائم بامر هذه البلدة (অর্থাৎ অমুক এ শহরের সর্ব বিষয়ক মুরব্বী ও তত্ত্বাবধায়ক।)

اَلْقَيُّوْمُ শব্দটি اَللّٰهُ يَقُوْمُ بِاَمْرِ خَلْقِهٖ এ- এ ব্যবহার পদ্ধতি থেকে এসেছে এবং এ শব্দটি فَيْعُوْل -এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত তা قَيْوُوْمٌ ছিল। তারপর واؤ ও ياء একত্রিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি ساكن ও দ্বিতীয়টি متحرك । তাই واؤ কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء কে ياء -এর মাঝে ادغام করে قيوم বানান হয়েছে। অনুরূপভাবে القيام শব্দটি قام يقوم থেকে এসেছে। তা মূলত القيوام ছিল الفيعال -এর ওযনে। এখানে ياء ও واؤ একত্রিত হয়েছে। এদের প্রথমটি ساكن এবং দ্বিতীয়টি متحرك তাই واؤ কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء কে ياء -এর মাঝে ادغام করে القيام বানান হয়েছে। পক্ষান্তরে قيوم শব্দটি যদি فَيْعُوْلٌ -এর ওযনে ব্যবহৃত না হয়ে فعول -এর ওযনে ব্যবহৃত হতো, তবে এর মূল হতো القووم -এমনিভাবে القيام শব্দটিও যদি الفيعال -এর ওযনে ব্যবহৃত না হয়ে الفعّال -এর ওযনে ব্যবহৃত হতো, তবে এর মূল হতো القوام যেমনিভাবে আল্‌-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ - اَلْقَيِّمُ শব্দটিও قام يقوم থেকে فعيل -এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। واؤ ও ياء এক সাথে জমা হয়েছে। এদের প্রথমটি ساكن এবং দ্বিতীয়টি متحرك তাই واؤ -কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে ياء -কে ياء -এর মাঝে ادغام করে القيم বানান হয়েছে। যেমন আরবীতে বলা হয়, فلان سيد قومه - । এখানে سيد শব্দটি ساد - يسود থেকে এসেছে। অনুরূপভাবে কথিত বাক্য هذا طعام جيد এ- বর্ণিত جيد শব্দটিও جاد يجود হতে উদগত হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র গুণবাচক এ নামটিকে এ শব্দে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসার মাঝে مبالغة করা। বস্তুত القائم -এর তুলনায় القيام - القيوم এবং القيم এ- এ শব্দ তিনটির মাঝে مبالغة -এর অর্থ ব্যাপকভাবে রয়েছে। হযরত উমর (রা.) القيّام পড়াকেই অধিক পসন্দ করতেন। কেননা, হিজাযবাসী ভাষায় এ শব্দটি বাকী দু'টির তুলনায় ব্যাপক অর্থবোধক। তাই তো তারা স্বর্ণকারকে الرجل الصيّاغ এবং অধিক বিচরণকারী ব্যক্তিকে الديار বলে। তবে (سورة نوح : ٢٦) لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا আয়াতাংশে বর্ণিত دَيَّار শব্দটি মূলত دار - يدور - دوارًا অর্থাৎ فعال ওযনের মূল ধাতুর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন

যেহেতু হিজাযের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই আল–কুরআনে শব্দটিকে পরিবর্তন না করে হুবহু ঠিক রাখা হয়েছে।

(٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۝

(٤) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৩. তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইনজীল।

৪. ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য ; এবং তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতা।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক।) – এর ব্যাখ্যা ঃ

অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ হে মুহাম্মাদ ! আপনার, ঈসার এবং সমস্ত কিছুর প্রতিপালক তিনিই, যিনি আপনার প্রতি কিতাব তথা কুরআন নাযিল করেছেন। তাওরাত ও ইনজীলের অনুসারীরা, বিতর্ককারী নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায় এবং মুশরিক লোকেরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে এ বিষয়ে সত্যসহ তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ – এ কুরআন পূর্ববর্তী নবী–রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ সমস্ত গ্রন্থের স্বীকৃতি দান করে। আর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেও এর সততার স্বীকৃতি বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, সকল গ্রন্থের অবতরণকারী একই সত্তা। নাযিলকৃত গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন জনের পক্ষ হতে হলে অবশ্যই এতে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হতো। ব্যাখ্যাকারগণও উক্ত মতামত পেশ করেছেন।

যাঁরা এমত প্রকাশ করেছেন ঃ

৬৫৫৪. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ –এর অর্থ এ কুরআন তাঁর পূর্ববর্তী কিতাব ও রাসূলগণের সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান করে।

৬৫৫৫. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ –এর মানে এ কুরআন পূর্ববর্তী কিতাব ও রাসূলগণকে সমর্থন করে।

৬৫৫৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ –এর মানে, তারা যেসব বিষয়ে একাধিক মত পোষণ করে, সেসব বিষয়ে সত্যসহ নাযিল করেছেন।

৬৫৫৭. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ

بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ –এর অর্থ, পূর্বে যে সব কিতাব ছিলো, কুরআন পূর্ববর্তী সে সব কিতাব সমর্থন করে।

৬৫৫৮. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ –এর মানে কুরআন তাঁর পূর্ববর্তী কিতাব ও রাসূলগণের সত্যতা ঘোষণা করে।

মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ ঃ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ (আর ইতিপূর্বে মানব জাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইন্‌জীল)

অর্থাৎ এ কুরআন নাযিল হবার পূর্বে মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ.)–এর উপর তাওরাত এবং হযরত ঈসা (আ.)–এর উপর ইন্‌জীল নাযিল করেছেন। مِنْ قَبْلُ ঐ কিতাবের পূর্বে , যা তিনি আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। هُدًى لِّلنَّاسِ মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবের প্রতি ঘোষণা। মহান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং তাঁর রাসূলগণের সত্যতার বিষয়ে মানুষ যে বিরোধ করেছে সে বিষয়ে। আমি আপনার প্রশংসা করি। হে মুহাম্মাদ ! যেহেতু আপনি আমার নবী ও রাসূল। এ ছাড়াও মহান আল্লাহ্‌র দীনের শরীআতের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৬৫৫৯.হযরত কাতাদা (র.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ –এর অর্থ এই যে, তাওরাত এবং ইন্‌জীল এ দু'টি কিতাবই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। এতে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে মানুষের জন্য পথ–নির্দেশনা, গ্রহণকারী লোকদের জন্য রক্ষাকবচ, সত্যয়নকারী এবং এর প্রত্যেকটি বিষয় আমলযোগ্য।

৬৫৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ –এর অর্থ, যেমনিভাবে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে, অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ.)–এর উপর তাওরাত এবং হযরত ঈসা (আ.)–এর উপর ইন্‌জীল নাযিল করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ ঃ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ (এবং তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করেছেন)

অর্থাৎ বিভিন্ন দল এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ হযরত ঈসা (আ.) ও অন্যান্য বিষয়ে যে একাধিক মত পোষণ করছে এ সবের ব্যাপারে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ কুরআনও তিনিই অবতীর্ণ করেছেন। ইমাম তাবারী (র.) বলেন, পূর্বেই আমি বলেছি যে, فُرْقَانٌ শব্দটি فُعْلَانٌ –এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি আরবদের কথা فَرَّقَ اللّٰهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ হতে উদগত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা হককে বাতিলের উপর বিজয়ী করার ব্যাপারে সহযোগিতা করে তিনি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধান করেন। তবে এ সাহায্য বলিষ্ঠ প্রমাণাদির মাধ্যমে ও হতে পারে এবং ক্ষমতা ও বল প্রয়োগের মাধ্যমেও হতে পারে। আমি যা বলেছি, কোন কোন তাফসীরকার তাই বলেছেন। তবে তাঁদের কথার মাঝে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন, এ কুরআন ঈসা (আ.)–এর ব্যাপারে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী গ্রন্থ। আবার কারো মতে, এ কুরআন শরীফ বিধানের ক্ষেত্রে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী গ্রন্থ।

৬৫৬১. মুহাম্মাদ বিন জা'ফর বিন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হলোঃ হযরত ঈসা (আ.)–এর ব্যাপারে হক ও বাতিলের মাঝে সিদ্ধান্ত স্বরূপ।

৬৫৬২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ–এর অর্থ হলো, তিনিই মুহাম্মাদ (সা.)–এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, এর দ্বারা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য বিধান করেছেন, এর মাঝে তিনি হালাল–হারামের বিধান দিয়েছেন এবং এতে তিনি শরীআতের বিধান ও শরীআতের সীমারেখা বর্ণনা করেছেন। এতে তিনি লোকদেরকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তিনি তাঁর নাফরমানী হতে।

৬৫৬৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতে اَلْفُرْقَانُ বলে কুরআনকে বুঝান হয়েছে। কারণ এর দ্বারাই তিনি হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে কাতাদা এবং রবী' (র.)–এর মতামত হতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়রের মতামতই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ –এর ব্যাখ্যায় তিনিই অকাট্য ও বলিষ্ঠ প্রমাণাদির মাধ্যমে ঈসা (আ.) ও অন্যান্য ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বিতন্ডাকারী খৃস্টান ও কাফির এবং মুহাম্মাদ (সা.)–এর মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছেন এ কথা বলাই অধিক শ্রেয়। কেননা, তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করা সম্পর্কে সংবাদ দানের পূর্বে কুরআন নাযিল করা সম্পর্কে সংবাদ দানের বিষয়টি পূর্বেই আল্লাহ্ পাক نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ –এর মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর এ আয়াতে কিতাব বলে কুরআনকেই বুঝান হয়েছে। সুতরাং এ কথাটি পুনরায় উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এতে কোন ফায়দা নেই এবং এতে নতুন কোন সংবাদও নেই।

আল্লাহ্‌র ইরশাদঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ (যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দন্ডদাতা।)

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন, তাঁর একত্ববাদ ও উলূহিয়্যাতের প্রমাণসমূহ এবং হযরত ঈসা (আ.)–কে আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে, সর্বোপরি যারা হযরত ঈসা (আ.)–কে ইলাহ্ ও রব বলে দাবী করে এবং আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান নির্ধারণ করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যারা কাফির, তারাই আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করে। আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও তাঁর দলীল প্রমাণাদি ইত্যাদি।

এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ –এর মানে হচ্ছে, কুরআন হক্কের পক্ষে বাতিলের বিপক্ষে পার্থক্যকারী প্রামাণ্য গ্রন্থ। কেননা وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ–এর পরপরই اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ আয়াতখানি উল্লেখ করা হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দাঁড়ায়ঃ যারা এ পার্থক্য বিধানকারী গ্রন্থকে অস্বীকার করে, যে গ্রন্থকে আল্লাহ্ তা'আলা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী হিসাবে নাযিল করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কড়া সতর্কবাণী ঐ সমস্ত লোকদের জন্য, যারা হক প্রকাশিত হবার পরও তা চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যারা হকের দলীল প্রত্যক্ষ করা সত্যেও সঠিক ও সরল পথের বিরুদ্ধাচরণ করে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে লোকদেরকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর রাজত্বে মহাপরাক্রমশালী। তিনি তাদের কাউকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলে কেউ তাকে বাঁধা দিতে পারবে না এবং কেউ কোন প্রকার অন্তরায়ও সৃষ্টি করতে পারবে না। পারবে না তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করে টিকে

থাকতে। অধিকন্তু যারা তার একত্ববাদের দলীল প্রতিষ্ঠিত হবার পর, সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবার পর এবং দলীল, প্রমাণের ভিত্তিতে তার পরিচয় লাভ করার পর এসমস্ত প্রমাণকে অস্বীকার করে, তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ্ সক্ষম। কোন কোন তাফসীরকার অনুরূপ ব্যাখ্যাই পেশ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ – এর অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্র আয়াত ও নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞাত হবার পর এবং তাঁর সম্পর্কে অবগত হবার পর যারা এতদ্সম্পর্কিত তাঁর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।

৬৫৬৫. রবী' (র.) থেকেও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

(٥) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝

৫. আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ ঃ তিনি আসমান-যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন। তাঁর নিকট কোন বিষয়ই গোপন নয়। সুতরাং নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায় যে আপনার সাথে আল্লাহ্র আয়াত তথা মারয়াম-তনয় ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করছে, হে মুহাম্মাদ! তা কি করে আমার নিকট গোপন থাকতে পারে? অথচ সর্ব বিষয়ে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। যেমন এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে ঃ

৬৫৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্নুল যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ –এর মর্মার্থ হলো, তারা যা ইচ্ছা করছে, তারা যা ষড়যন্ত্র করছে এবং ঈসা (আ.)-কে ইলাহ্ ও রব বানিয়ে তারা যা করতে চাচ্ছে, এসব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত আছেন।

(٦) هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই ; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর ইচ্ছা ও পসন্দমত তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন। কাউকে বালক, কাউকে বালিকা, কাউকে কালো, কাউকে লাল, এক কথায় মাতৃগর্ভে তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন লিঙ্গে এবং বিভিন্নরূপে তৈরি করেন। এর দ্বারা মানুষ সহজেই অনুমান করতে পারে যে, মাতৃগর্ভ হতে যত সন্তান জন্মগ্রহণ করছে, আল্লাহ্ই নিজ ইচ্ছামত তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের আকৃতি দান করেছেন। মাতৃগর্ভ হতে আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন হযরত ঈসা (আ.) তাঁদের মাঝে অন্যতম। তিনি যদি ইলাহ্ হতেন, তবে মাতৃগর্ভ কখনো তাকে ধারণ করতে পারত না। কারণ, মাতৃগর্ভ শিশুর স্রষ্টাকে কখনো ধারণ করতে পারে না। এতো কেবল সৃষ্টিকেই নিজের মাঝে ধারণ করতে পারে।

৬৫৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইবনুল যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মাতৃগর্ভে আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে সৃষ্টি করেছেন হযরত ঈসা (আ.)–ও তাদের মাঝে একজন। তিনি হযরত ঈসা (আ.)–সহ অন্যান্য সমস্ত আদম সন্তানকে মাতৃগর্ভ থেকেই সৃষ্টি করেছেন। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সুতরাং ইলাহ্ হওয়াও হযরত ঈসা (আ.)–এর পক্ষে সম্ভব নয়। ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই।

৬৫৬৮. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি তাঁর ইচ্ছামত মাতৃগর্ভে হযরত ঈসা (আ.)–কে আকৃতি দান করেছেন। অন্যান্য মুফাস্সিরগণ এ আয়াতের অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন।

৬৫৬৯. ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (আ.)–এর কতিপয় সাহাবী মহান আল্লাহ্র ইরশাদ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, শুক্র যথাস্থান হতে স্খলিত হয়ে মাতৃগর্ভে আপতিত হবার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের পেটে বিচরণ করে। তারপর তা রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। চল্লিশ দিন পর তা গোশতের পিন্ডে পরিণত হয়। তারও চল্লিশ দিন পর তা একটি আকৃতিতে পরিণত হলে আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তার আকৃতি গঠন করেন। ফেরেশতা তাঁর দুই আংগুলের মধ্যে মাটি নিয়ে এসে তার গোশ্ত পিন্ডের সাথে তা মিশ্রিত করেন এবং তার দ্বারা খামির তৈরি করেন। মহান আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক ফেরেশতা তার আকৃতি দান করেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, পুত্র সন্তান না কন্যা সন্তান, নেক বখ্ত, না বদ বখ্ত তার রিয্ক কি হবে, তার বয়স কত দিন হবে এবং সে কি কি কল্যাণ লাভ করবে এবং কি কি বিপদ তার উপর আপতিত হবে? মহান আল্লাহ্ আদেশ করেন, ফেরেশতা লিখেন। এ ব্যক্তি যখন মারা যাবে, তখন তাকে ঐ স্থানেই দাফন করা হবে, যে স্থান থেকে তার দেহের মাটি নেয়া হয়েছিল।

৬০৭০. হযরত কাতাদা (র.)থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র ইরশাদ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র শপথ, আমাদের প্রতিপালক মাতৃগর্ভে তাঁর বান্দাদের নিজ ইচ্ছামত তথা পুরুষ, মহিলা, কালো, লাল পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি বানাতে সক্ষম। তিনি তাঁর ইচ্ছামত তাদের আকৃতি দান করেন।

আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।)

এ আয়াতে আল্লাহ্র রবূবিয়্যাতে কারো শরীক হওয়া, কারো তাঁর সমতুল্য হওয়া এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের জন্য মা'বূদ হওয়া ছাবিত করা প্রভৃতি বিষয়াষয় হতে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত ও পবিত্র একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সাথে সাথে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট আগত নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং আরো অন্যান্য লোক যারা ঈসা (আ.)–এর মা'বূদ হওয়ার দাবীদার, তাদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং প্রতিবাদ করা হয়েছে ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধেও, যারা মহান আল্লাহ্র সাথে অন্যকেও মা'বূদ মনে করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর কতিপয় গুণাবলী সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করেছেন ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি, যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো, ইবাদত করে এবং ইবাদতে মহান আল্লাহ্র সাথে অন্যদেরকেও শরীক করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী,

প্রজ্ঞাময় সত্তা। কাজেই, যাদের থেকে আল্লাহ্ পাক প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা করেন কেউ তাদেরকে কোনরূপ সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং কোন অভিভাবক তার শাস্তি হতে কাউকে মুক্তিও দিতে পারবে না। কারণ, মহান আল্লাহ্ এমন মহাপরাক্রমশালী যে, সমস্ত সৃষ্টিজগত তার সামনে নত ও বিনয়ী হতে বাধ্য। আয়াতাংশে একথাও বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর কর্মে, প্রমাণের ভিত্তিতে যাদেরকে ধ্বংস করার, তাদেরকে ধ্বংস করা এবং প্রমাণের ভিত্তিতে যাদেরকে জীবিত রাখবার, তাদেরকে জীবিত রাখা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে কাউকে অক্ষম মনে করার ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাময়। যেমন হাদীসে আছে ঃ

৬৫৭১. মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –এর দ্বারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন এবং মুশরিকরা আল্লাহ্র সাথে যে অন্যকে শরীক করছে এর থেকে তিনি তার একত্ববাদ প্রমাণ করেছেন। عَزِيْزٌ মানে আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন, তবে যারা মহান আল্লাহ্কে অস্বীকার করছে, আল্লাহ্ তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। حَكِيْمٌ –এর মানে, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের আবেদন, নিবেদন গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রজ্ঞাময়।

৬৫৭২. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রতিশোধ গ্রহণে মহান আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী এবং নিজ কর্মের ব্যাপারে প্রজ্ঞাময়।

(٧) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ؔ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

৭. তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ; এগুলো কিতাবের মূল অংশ ; আর অন্যগুলো রূপক ; যাদের অন্তরে সত্য লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি, সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত ; এবং বোধশক্তি সম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না।

অর্থাৎ যে মহান আল্লাহ্র নিকট আসমান–যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই, তিনিই তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। কিতাবের মানে, কুরআন। আল–কুরআনকে কেন কিতাব বলে নামকরণ করা হয়েছে এর কারণ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। পুনরায় তা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ – এর মানে, কুরআনের কতগুলো সুস্পষ্ট আয়াত। مُحْكَمٰتٌ – এর অর্থ ঐ সমস্ত আয়াত, ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেগুলোকে দ্বিধামুক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর যথার্থতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং হালাল–হারাম, ভীতি–অঙ্গীকার, ছওয়াব–শাস্তি, আদেশ–নিষেধ, ওয়ায–দৃষ্টান্ত ইত্যাকার বিষয়ে যার গ্রহণযোগ্যতা সর্বজন বিদিত। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, সুস্পষ্ট (দ্ব্যর্থহীন) এ আয়াতগুলো কিতাবের মূল অংশ। অর্থাৎ এ আয়াতগুলো দীনের মূল স্তম্ভ, ফরয,

বিচার বিভাগীয় আইন–কানুন, মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ এতেই নিহিত আছে। এগুলোকে কিতাবের মূল অংশ বলে নামকরণ করার কারণ, এগুলোই কিতাবের বড় একটি অংশ এবং এতেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান। আরব সাহিত্যিকগণ ব্যাপকতর বড় ধরনের বস্তুকে أمٌ বলে নামকরণ করে। অনুরূপভাবে প্রধান সেনাপতির যে পতাকাতলে তার বাহিনী সমবেত হয় তাকেও أمٌ বলা হয়। এমনিভাবে শহর–বন্দরের বড় বড় কর্মকান্ডের যিনি পরিচালক থাকেন, তাকেও أمٌ বলা হয়। পূর্বে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই আবারো এখানে এর পুনরাবৃত্তি করা একান্তই নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এখানে هن امهات الكتاب অর্থাৎ বহুবচন প্রকাশক বিশেষ্যপদ ব্যবহার না করে هن ام الكتاب অর্থাৎ একবচন প্রকাশক বিশেষ্য পদ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, মুহ্কাম আয়াতসমূহের প্রত্যেকটি আয়াত পৃথক পৃথকভাবে ام الكتاب নয়। বরং এ আয়াতগুলো সমন্বিতভাবেই أمُّ الكِتَابِ। যদি প্রত্যেকটি আয়াতকে ام الكتاب বলা আল্লাহ্‌র প্রয়াস হতো, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ام الكتاب না বলে هن امهات الكتاب ই বলতেন। যেমন আল–কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে যে, وجعلنا ابن مريم وامه اية এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ايتين বলেননি। কারণ হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মা উভয়ে মিলেই হলো আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ নিদর্শন। পৃথক পৃথকভাবে তারা নিদর্শন নয়। যদি তাই হতো, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মু'মিনূন –এর ৫০ আয়াতে وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ايتين বলতেন। তারা উভয়ে মিলেই মহান আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ নিদর্শন। কেননা, পূর্ণাঙ্গ নিদর্শনটি স্বামী ব্যতীত হযরত মারইয়াম(আ.)–এর বাচ্চা প্রসব করা এবং মাতৃক্রোড়ে হযরত ঈসা (আ.)–এর কথা বলা। মোদ্দা কথা হচ্ছে, এতদুভয়ের মধ্যেই ছিল মানুষের জন্য একটি বিশেষ নিদর্শন।

আরবী ভাষার বাক্য বিন্যাস শাস্ত্রের একজন পন্ডিত ব্যক্তি বলেছেন, এখানে هن امهات الكتاب না বলে حكايةً–هن امّ الكتاب বলা হয়েছে। যেমন এক ব্যক্তি বলল مالى انصار। একথা শুনে অপর ব্যক্তি বলল, انا انصارك। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি বলল, مالى نظير। তারপর অন্য ব্যক্তি বললো, نحن نظيرك উপরোক্ত উপমাস্থলে انصارك এবং نظيرك শব্দ দুটোও এখানে حكايةً ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী কাব্যে এধরনের ব্যবহার রয়েছে। যেমন জনৈক কবি বলেছেনঃ

تَعَرَّضَتْ لِيْ بِمَكَانِ حَلٍّ - تَعَرُّضَ الْمُهْرَةِ فِي الطِّوَلِّ - تَعَرُّضًا لَمْ تَأْلُ عَنْ قَتْلاً لِي

উক্ত কবিতার মাঝে قَتْلاً শব্দটিকে حَكَايَةً রূপে قَتْلاً ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ الصلواة الصلواة শব্দদ্বয় থেকে নকল করে نودى الصلواة বলা হয়।

কেউ কেউ বলেন, عَنْ قَتْلاً لِي শব্দটি মূলত ان قتلالى ছিল, اَنْ কে عَنْ এর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা, আরবী ভাষায় عَنْ–اَنْ –এর স্থলে ব্যবহৃত হয়। قَتْلاً لِي –এর পূর্বে حرف جار-عن থাকা সত্ত্বেও শব্দটিকে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে, এর পূর্বে একটি আদেশসূচক ক্রিয়া উহ্য থাকার ভিত্তিতে। যেমন যবর দিয়ে বলা হয়, وَضَرْبًا لِزَيْدٍ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, এগুলো অর্থহীন বক্তব্য। কেননা, এ সমস্ত দলীলের ভিত্তিতে একথাই প্রমাণিত, যে, এ اعراب ও ضمير সংযোগ করার দ্বারা মূলত এগুলোর অবস্থার حكاية করাই

মূল উদ্দেশ্য। অথচ আমরা জানি যে, আল্লাহ্ তা'আলা أُمُّ الْكِتَابِ শব্দটি কারো কথা হতে নকল করেন নি। তাই বলা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি مخرج الحكاية (বর্ণনার উৎস) হিসাবে এখানে উল্লেখ করেছেন।

أُخَرُ শব্দটি أُخْرَى -এর বহুবচন। এ শব্দটি কেন غيرمنصرف এ নিয়ে আরবী ভাষাশ পন্ডিত ব্যক্তিদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে শব্দটি نعت হওয়ার কারণে غيرمنصرف এবং এর একবচন হচ্ছে أخرى أُخرى যেমনিভাবে جمع ও كتع শব্দ দুটো غيرمنصرف অনুরূপভাবে أُخر শব্দটিও غير منصرف । আবার কেউ কেউ বলেন, এর واحد এর মাঝে যেহেতু ياء আছে, তাই এ শব্দটি غير منصرف ।অর্থাৎ اخرى শব্দটি যেমনিভাবে غيرمنصرف অনুরূপভাবে أُخَر শব্দটিও غيرمنصر। তাদের মতে, যেমনিভাবে حمراء ও بيضاء শব্দ দুটো معرف ও نكره উভয় অবস্থায় غيرمنصرف ঠিক তদ্রূপ أخرى শব্দটিও غيرمنصرف । তবে এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, أُخرى এর বহুবচন এর واحد এর উপর নির্ভরশীল। তাই বলা হয় اخرى যেমনিভাবে غيرمنصوف অনুরূপভাবে اخر শব্দটিরও غيرنصرف । আর حمراء এবং بيضاء কে এর واحد এর বিপরীত ওযনে جمع করা হয়েছে। এদের এক বচনের শব্দ দুটো منصرف । তাই বলা হয় حمراء - حمر ও بيض ও بيضاء এবং حمر ও بيض এর অবস্থার মধ্যে যেহেতু পার্থ্যক রয়েছে, তাই এগুলোর منصرف ও غيرمنصرف হওয়ার মাঝেও পাথর্ক্য হয়ে গিয়েছে। আর اخر ও اخرى এর অবস্থার মধ্যে যেহেতু মিল রয়েছে তাই غير منصرف হওয়ার মধ্যেও উভয়টি সমান।

مُتَشَابِهَاتٌ অর্থ হলো, তিলাওয়াতের দিক থেকে অভিন্ন এবং অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন। যেমনিভাবে আল-কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, (২৫২) وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا (অর্থাৎ তাদেরকে দৃশ্যত অনুরূপ ফল দেয়া হবে।) অবশ্য এগুলোর স্বাদ হবে বিভিন্ন রকমের। এমনিভাবে অপর স্থানে ইরশাদ হয়েছে (৭০/২) إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا গরু বিভিন্ন রকমের হওয়া সত্ত্বেও গুণগত দিক থেকে গরুটি আমাদের নিকট সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

উপারোক্ত ব্যাখ্যানুপাতে আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, ঐ সত্তা যার নিকট আসমান-যমীনের কোন কিছুই গোপন নেই, হে মুহাম্মাদ (সা.),তিনিই তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এর কতগুলো আয়াত বর্ণনার দিক থেকে দ্বিধাহীন ও দ্ব্যর্থতা বিবর্জিত। এগুলোই কিতাবরের মূল অংশ। দীনী বিষয়ে এগুলোই তোমার জন্য এবং তোমার উম্মতের জন্য মূল বুনিয়াদ। ইসলামী শরীআত বিষয়ে এতেই তোমার ও তাদের সমস্যার সার্বিক সমাধান বিদ্যমান আছে। আর কতগুলো আয়াত আছে রূপক। এগুলো অর্থের দিক থেকে বিভিন্ন এবং তিলাওয়াতের দিক থেকে অভিন্ন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, যে সমস্ত আয়াত পালনীয়, যে সমস্ত আয়াত অন্যান্য আয়াতকে রহিত করে, তাই মুহ্‌কামাত। আর যে সমস্ত আয়াতে হালাল-হারামসহ বিভিন্ন হুকুমের বর্ণনা, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের বিবরণ, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির বর্ণনা এবং বিভিন্ন কাজের নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে, তাকেই মুহকাম বলা হয়। আর যে সমস্ত আয়াত আমলযোগ্য নয় এবং রহিত এগুলোই হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

এমত যাঁরা পোষণ করেন ঃ

৬৫৭৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, (৬.১৫১) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ –এ আয়াত এবং এর পরবর্তী তিনটি আয়াত মুহ্কাম। অনুরূপভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি মুহ্কাম (٣٩–٢٣ঃ ١٧)

৬৫৭৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে তা মুহ্কাম এবং যে সমস্ত আয়াতে হালাল–হারাম এবং করণীয় ও বর্জনীয় নির্দেশ বিদ্যমান আছে সেগুলোও মুহ্কাম। অনুরূপবাবে যে সমস্ত আয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করার পর আমল করা অবশ্য কর্তব্য, সে সমস্ত আয়াতই হলো মুহ্কাম। পক্ষান্তরে মুতাশাবিহাত সম্পর্কে বলা হয়, এগুলো منسوخ বা রহিত আয়াত। যে আয়াতকে অগ্রে কিংবা পশ্চাতে স্থান দেয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত আয়াত দ্বারা উদাহরণ দেয়া হয়েছে বা যে সমস্ত আয়াত দ্বারা শপথ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত আয়াত শুধু বিশ্বাসযোগ্য, বাস্তবে বর্ণনীয় নয় এগুলোই হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

৬৫৭৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াত কিতাবের মূল অংশ এবং যা অন্যান্য আয়াতকে রহিত করে এবং যা বিশ্বাসেযোগ্য ও পালনীয় এগুলোই হলো, মুহ্কাম। যে সমস্ত আয়াত রহিত এবং শুধু বিশ্বাসযোগ্য এগুলোই হলো মুতাশাবিহ আয়াত।

৬৫৭৬. ইব্ন আব্বাস (রা·) ইব্ন মাসঊদ (রা·) এবং আরো কতিপয় সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁরা আল্লাহ্র ইরশাদ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ ..... كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে এবং অবশ্য পালনীয় এগুলোই হলো মুহ্কাম আয়াত। আর রহিত আয়াতসমূহ হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

৬৫৭৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে এবং যে সমস্ত আয়াতে বর্ণিত হালাল–হারামের বিদানসমূহ অবশ্য পালনীয় এ সমস্ত আয়াত হচ্ছে মুহ্কামাত। আর যে সমস্ত আয়াত রহিত এবং শুধু বিশ্বাসযোগ্য– আমলযোগ্য নয়, এগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

৬৫৭৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত! তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমলযোগ্য আয়াতসমূহ হচ্ছে মুহকাম।

৬৫৭৯. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে এবং আমলযোগ্য সেগুলো হচ্ছে মুহ্কামাত। আর যে সমস্ত আয়াত রহিত– আমলযোগ্য নয়, কেবল বিশ্বাসযোগ্য সেগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

৬৫৮০. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে তা মুহ্কাম। আর যে আয়াত রহিত এবং যার তিলাওয়াত বিলুপ্ত ঐ আয়াতকে আয়াতে মুতাশাবিহাত বলা হয়।

৬৫৮১. দাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সমস্ত আয়াত রহিত হয়নি, সেগুলো মুহ্কাম। আর যে সমস্ত আয়াত রহিত হয়ে গেলো তা হচ্ছে মুতাশাবিহ্।

৬৫৮২. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, অন্য আয়াত রহিতকারী পালনীয় আয়াতসমূহ হচ্ছে মুহকাম এবং রহিত আয়াতসমূহ হচ্ছে মুতাশাবিহাত।

৮৫৮৩. উবায়দুল্লাহ্ বিন সুলায়মান বলেন, দাহ্হাক (র.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াত অন্য আয়াতকে রহিত করে এবং অবশ্য পালনীয়, সেগুলো হলো মুহ্কাম আয়াত। আর যে সমস্ত আয়াত রহিত শুধু বিশ্বাসযোগ্য কিন্তু আমলযোগ্য নয়, সেগুলো হলো মুতাশাবিহাত।

৬৫৮৪. দাহ্হাক (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াত রহিত হয়নি সেগুলো হলো মহ্কাম আয়াত। আর যে সব আয়াত রহিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যে সমস্ত আয়াতে হালাল–হারামের বিধি–বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো হলো মুহ্কাম। আর যে সমস্ত আয়াতে শব্দগত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অর্থগত দিক থেকে কোন অভিন্নতা নেই, বরং পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ সেগুলোকে মুতাশাবিহাত বলা হয়।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৬৫৮৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে সমস্ত আয়াতে হালাল –হারামের বিধান রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে মুহ্কাম। এতদ্ব্যতীত অভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত আয়াতগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। যেমনঃ (٢/٢٦) وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ আর যেমনঃ (١٢٥) كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

আরও যেমনঃ (৪৭ঃ ১৭) وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّ اٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ ইত্যাদি আয়াতগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

৬৫৮৬. অন্য সূত্রেও মুজাহিদ (র.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য মুফাস্সিরগণ এ–ও বলেছেন, যে সমস্ত আয়াতে এক ব্যাখ্যা ব্যতীত একাধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অবকাশ নেই সেগুলো হলো মুহ্কাম আয়াত। আর যে সমস্ত আয়াতের মাঝে একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভানাা আছে, সেগুলো হলো মুতাশাবিহ আয়াত।

যাঁরা এমত সমর্থন করেনঃ

৬৫৮৭. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ وَهُوَ الَّذِيْٓ

اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, মুহ্‌কাম আয়াতগুলো প্রতিপালক রব –এর প্রমাণ। এতে বান্দার মুক্তির উপায় বিদ্যমান। এতে বিদ্যমান তাদের বিবাদ–বিসম্বাদের ফয়সালা ও প্রতিবিধান। যে উদ্দেশ্যে এ সমস্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছে এ থেকে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন পরিবর্ধন কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া অন্য আয়াতসমূহ হলো মুতাশাবিহাত। অর্থের দিক থেকে পরস্পর সামঞ্জস্য পূর্ণ। এর মাঝে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং একাধিক ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণের অবকাশ আছে। এ সমস্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। যেমন তিনি হালাল–হারাম দ্বারা বান্দার পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। কাজেই এ সমস্ত আয়াত কাউকে সত্য ও ন্যায় হতে বিমুখ করে অন্যায় ও অসত্যের প্রতি ধাবিত করে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত আয়াত পূর্ববর্তী উম্মতের কাহিনী এবং তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণের বিবরণ সম্বলিত এবং যে সমস্ত আয়াতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর উম্মত দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাই হলো মুহ্‌কাম। আর মুতাশাবিহ ঐ সমস্ত ঘটনা সম্বলিত আয়াত যার শব্দগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোথাও অর্থ ভিন্ন শব্দ অভিন্ন। আবার কোথাও অর্থ অভিন্ন এবং শব্দ ভিন্ন।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৬৫৮৮. ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র.) থেকে বর্ণিত। একবার ইব্‌ন যায়দ (র.) আল্লাহ্‌র বাণীঃ الٓر كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ পড়েন এবং বলেন, এ সূরায় চব্বিশ স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর চব্বিশটি আয়াতে নূহ (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (هود : ٤٩) । تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَاءِ الْغَيْبِ এরপর ইরশাদ হয়েছে وَاِلٰى عَادٍ থেকে وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ পর্যন্ত। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা সালিহ, ইব্‌রাহীম, লূত ও শুআয়ব (আ.) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ হচ্ছে ইয়াকীনের কথা, নিশ্চিত করা। এর বিবরণ সম্বলিত আয়াতসমূহকে প্রথমে সুস্পষ্টভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। পরে তা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাবী বলেন, মুতাশাবিহ আয়াতের উপমা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) –এর কথা বিভিন্ন স্থানে বয়ান করেছেন। এ সবগুলো আয়াত হচ্ছে মুতাশাবিহ্ আয়াত। এ সবগুলোর অর্থ হচ্ছে এক ও অভিন্ন। কেননা ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ - حَيَّةٌ تَسْعٰى - اُدْخُلْ يَدَكَ - اُسْلُكْ يَدَكَ اَحْمِلْ فِيْهَا اُسْلُكْ فِيْهَا ইত্যাদির মাঝে অর্থগত দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। রাবী বলেন, তারপর দশ আয়াতে হূদ (আ.) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত সালিহ (আ.) সম্পর্কে আট আয়াতে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে অপর আট আয়াতে, হযরত লূত (আ.) সম্পর্কে আট আয়াতে, হযরত শুআয়ব (আ.) সম্পর্কে তের আয়াতে এবং হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে চার আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াতে উম্মত ও তাঁদের প্রতি প্রেরিত আম্বিয়া কিরাম সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে সূরা হূদের একশতটি আয়াত শেষ হয়।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, কুরআন মজীদের ঐ সমস্ত আয়াত মুহকাম যার অর্থ, ব্যাখ্যা ও তাফসীর আলিমগণ বুঝেছেন এবং উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আর মুতাশাবিহ ঐ সমস্ত আয়াত, যার অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। যেমন হযরত ঈসা (আ.)–এর অবতরণ

কাল, পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্যোদয়ের সময়, কিয়ামত কাল, দুনিয়া ফানা হয়ে যাওয়া ইত্যাকার বিষয়াদি। এগুলোর সঠিক ইল্‌ম আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো আর কারো কাছে নেই। তাদের ধারণা, সূরার শুরুতে উল্লিখিত حروف مقطّعات যেমন, الٓمٓ - الٓمٓصٓ - الٓمٓرٰ - الٓرٰ ইত্যাদিকে মুতাশাবিহ বলার কারণ এ শব্দগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হিসাবে জুমালের অক্ষরের দিক থেকেও একে অন্যের মুশাবিহ। বর্ণিত আছে যে, নবী (সা.)–এর জীবদ্দাশায় ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোকদের মনে কৌতূহল জাগে যে, তারা হিসাবে জুমালের অক্ষরসমূহের দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের সময়কাল সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে। জানবে তারা মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর উম্মতের শেষ সময়কাল সম্পর্কে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ কৌতূহলকে মিথ্যা পতিপন্ন করে তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এ সমস্ত অক্ষরের মাধ্যমে তোমরা এ বিষয়ের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে না। অন্য কোন অক্ষরের মাধ্যমেও তা জানতে পারবে না। এ সমস্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জ্ঞাত নয়।

একথাটি হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রিছাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম তাবারী (র.) বলেন, الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ –এর ব্যাখ্যায় আমি হযরত জাবির (রা.) এবং অপরাপর ব্যক্তিদের বর্ণনার উল্লেখ করেছি। ইমাম তাবারী (র.)–এর মতে হযরত জাবির (রা.) –এর বর্ণনাটি এ আয়াতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত। তা হলো ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এর সবটাই তিনি তাঁর জন্যে এবং তাঁর উম্মতের জন্যে সমগ্র বিশ্বাসীর হিদায়েতের লক্ষ্যে নাযিল করেছেন। সুতরাং এ কুরআনে এমন কোন বিষয় থাকতে পারে না,যা মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয়। অনুরূপভাবে এমন বিষয়ও থাকতে পারে না, যার প্রয়োজনীয়তা তো আছে কিন্তু তার ব্যাখ্যা বুঝার কোন উপায় নেই। এতে বোঝা যায় যে, কুরআনে যা আছে সবই মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। যদি এক আয়াত অপর আয়াতের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেয় বা ব্যাখ্যা করে এবং যদি কোন কোন আয়াত বুঝতে ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, যেমন আল–কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নির্দশন আসবে, সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে **ব্যক্তি পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ব্যক্তি ঈমানের মাধ্যমে কোন নেক আমল করেনি। (৬ ঃ ১৫৮)।** এ আয়াতাংশের মাধ্যমে নবী (সা.) তাঁর উম্মতকে একথা জানিয়েছেন যে, নিদর্শনের কথা মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে জানিয়েছেন, যারা পূর্বে ঈমান আনেনি, ঐ সময় তাদের ঈমান কোন কাজে আসবে না। আর ঐ সময়টি হচ্ছে পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্যোদয় হওয়া। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি মানুষের জানা দরকার তা হলো দিন, মাস এবং বছর দ্বারা বেষ্টিত করা ব্যতিরেকে যে বিশেষ তওবা কাজে আসবে একাল সম্পর্কে অবগত হওয়া। এ কথাটি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের ভাষায় বর্ণনা করিয়ে দিয়েছে। আর যে বিষয়ের ইল্‌ম মানুষের জন্য জরুরী নয়, তা হলো, এ নিদর্শনের প্রকাশকাল সম্পর্কে অবগত হওয়া। এ বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া দীন, দুনিয়ার কোথাও প্রয়োজন নেই। এ সমস্ত বিষয়াদি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জ্ঞাত আছেন এবং এর অনুরূপ যত বিষয়াদি আছে, যার মাধ্যমে ইয়াহূদী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর উম্মতের সময়কাল সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, যেমন الٓمٓصٓ–الٓرٰ–الٓمٓرٰ الٓمٓ– ইত্যাদি হরফগুলো যা حروف مقطعا–এর অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলো সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তারা এ সমস্ত অক্ষরের মাধ্যমে এ বিষয়টি উদঘাটন করতে পারবে না, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত এই যে, এগুলোর ব্যাখ্যা মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। মুতাশাবিহ্ যদি তাই হয় যা আমি বর্ণনা করেছি, তবে এছাড়া সমস্ত আয়াত মুহ্কাম। কেননা, মুতাশাবিহ আয়াত ব্যতীত অন্যান্য আয়াত হয়ত একার্থবোধক হবে। যার মাঝে এক ব্যাখ্যা ব্যতীত একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। এ ধরনের মুহ্কাম আয়াত শ্রবণের পর বুঝার জন্য কোন বিশ্লেষকের বিশ্লেষণের অপেক্ষা থাকে না অথবা এমন মুহ্কাম হবে যা একাধিক অর্থবোধক এবং যার মাঝে বহু ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। এ ধরনের মুহ্কাম আয়াত হয়ত মহান আল্লাহ্র বর্ণনার মধ্যে অনুধাবন করা যাবে, অথবা রাসূল (সা.)–এর বর্ণনার মাধ্যমে অনুধাবন করা হবে। এধরনের আয়াতের মর্মার্থ জ্ঞানী উলামা থেকে কখনো প্রচ্ছন্ন হয়ে যাবার মত নয়।

মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ এগুলো কিতাবের মূল অংশ। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতাংশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের একাধিক মত রয়েছে। আমি এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

কেউ কেউ বলেন, هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ (এগুলো কিতাবের মূল অংশ)–এর দ্বারা ঐ সমস্ত আয়াতকে বুঝান হয়েছে, যার মধ্যে ফরয, হুদূদ এবং শরঈ আহকাম বর্ণিত হয়েছে। তা আমাদের বক্তব্যের ন্যায় যা আমরা বলেছি।

৬৫৮৯. ইবন ইয়া'মর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র ইরশাদ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা ঐ সমস্ত আয়াতকে বুঝান হয়েছে, যার মধ্যে ফরয, হুদূদ এবং দীনের বুনিয়াদী বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন মক্কা শরীফকে اُمُّ الْقُرٰى মার্ত শহরকে ام خراسان এবং কাফেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে ام المسافرين বলা হয়।

৬৫৯০. ইবন ওয়াহ্ব, (র.) থেকে বর্ণিত। ইবন যায়দ (র.) মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, اُمُّ الْكِتَابِ –এর মানে হলো, جماع الكتاب ব্যাপক বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ। অন্যান্য মুফাস্সির বলেন, اُمُّ الْكِتَابِ বলে সূরার প্রারম্ভে বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহকে বুঝান হয়েছে। যারা দ্বারা সূরা আরম্ভ করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৫৯১. আবূ ফাক্তাহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সূরার প্রারম্ভে বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহ, যার দ্বারা কুরআন আরম্ভ করা হয়েছে اُمُّ الْكِتَابِ বলে এ বর্ণসমূহকেই বুঝান হয়েছে।

মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ যাদের অন্তরে বক্রতার প্রবণতা রয়েছে, অর্থাৎ যাদের অন্তরে সত্য লংঘন এবং সত্যবিমুখতার প্রবণতা রয়েছে। আরবী অভিদানে রয়েছে, زاغ فلان عن الحق অমুক সত্যবিমুখ হয়ে গিয়েছে। এ শব্দটি باب نصر এর ওযনে এসেছে। এর ক্রিয়ামূল হলো زَيْغًا – زَيَغَانًا – زَيْغُوْنَةً ও زُيُوْغًا ইত্যাদি। ازاغه الله মানে হলো, আল্লাহ্ তাকে সত্য বিমুখ

করে দিয়েছেন। ازغه ক্রিয়াটি باب افعال–এর ওযনে এসেছে। অনুরূপভাবে কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে, (৭ : ৩) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (হে আমাদের প্রতিপালক! হিদায়াত দানের পর আপনি আমাদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করবেন না।) ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আমি যা বলেছি ব্যাখ্যাকারগণও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এ মত পোষণ করেনঃ

৬৫৯২. মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, সত্য–বিমুখ হওয়া।

৬৫৯৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ–এর ব্যাখ্যায় বলেন زيغ –এর অর্থ সন্দেহ।

৬৫৯৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৬৫৯৫. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এরা হলো, সন্দিহান ব্যক্তিবর্গ।

৬৫৯৬. ইবন আব্বাস (রা.) ইবন মাসউদ (রা.), ও হযরত নবী করীম (সা.) এর কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, زَيْغٌ –অর্থ সন্দেহ।

৬৫৯৭. মুজাহিদ (র.) তেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, زَيغ এর অর্থ সন্দেহ। ইবন জুরায়জ (র.) বলেন الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ বলে মুনাফিকদেরকে বুঝান হয়েছে।

মাহান আল্লাহ্র ইরশাদ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ (যা রূপক তারা তার অনুসরণ করে।) অর্থাৎ যা রূপক এবং যার শব্দগুলো পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যে সমস্ত আয়াতে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ আছে, তারা এগুলোর অনুসরণ করে। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য নিজেদের বাতিল দাবীর মাধ্যমে নিজেদের গোমরাহী এবং সন্দেহের সম্প্রসারণ করা এবং সত্য থেকে লোকদেরকে দূরে রাখা।

৬৫৯৮. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মুহকাম আয়াতকে মুতাশাবিহ এর স্থলে এবং মতাশাবিহকে মুহ্কাম–এর স্থলে ব্যবহার করে লোকদেরকে সন্দিহান করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তকরণে সন্দেহ ঢেলে দেন।

৬৫৯৯. মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কুরআন মজীদে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুসরণ করে। যেন লোকেরা তাদের সৃষ্ট বিদআতের প্রতি আস্থা পোষণ করে এবং যাতে কুরআন মজীদ তাদের সৃষ্ট বিদ্আতের পক্ষে প্রমাণ হয় ও অন্যদেরকে সন্দেহের মাঝে নিক্ষেপ করে।

৬৬০০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ–এর ব্যাখ্যায় বলেন,ঃ তারা ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য যা রূপক এ ধরনের আয়াতের অনুসরণ করে। বস্তুত এ পথেই তারা পথভ্রষ্ট হয় এবং ধ্বংস হয়। এ প্রসঙ্গে অন্যান্য তাফসীরকারগণের বক্তব্যঃ

৬৬০১. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা منسوخ–ناسخ আয়াতের অনুসরণ করে। তারপর তারা বলে, কেন এ আয়াতের উপর আমল করা হচ্ছে এবং কেন منسوخ আয়াতকে উপেক্ষা করে ناسخ –এর উপর আমল করা হচ্ছে। منسوخ আয়াত নাযিল করার পূর্বে ناسخ আয়াত নাযিল করে কেন এর উপর আমলের নির্দেশ দেয়া হলোনা। অথচ ناسخ আয়াতের মাঝে এই এই অনুমোদন রয়েছে। তারা এও বলে যে منسوخ আয়াতের উপর আমলকারী ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলা হয়। অথচ এর উপর আমলকারী ব্যক্তির উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হতে পারে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ–এর দ্বারা কোন সম্প্রদায় বুঝান হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেনঃ

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে বুঝান হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর নিকট এসে তাঁর সাথে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে যে, "আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্র রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ?" এ আয়াতের তারা কুফরীজনিত ব্যাখ্যা করে। নিজেদের দাবীর সমর্থনে তারা নিম্নের রিওয়ায়াতটি পেশ করেন ঃ

৬৬০২. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায় নবী করীম (সা.)–এর নিকট এসে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং বলে اَنَّ عِيسَى كَلِمَةُ اللّٰهِ وَرُوحٌ مِنْهُ ঈসা (আ.) আল্লাহ্র বাণী এবং আল্লাহ্র আদেশ। এ কথাটি আপনি কি বিশ্বাস করেন না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হ্যাঁ, বিশ্বাস করি; মানি। তারা বলল, আমাদের জন্য সন্তোষজনক জবাব হয়েছে। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ (৩ : ৫৯)

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এ আয়াত আবূ ইয়াসিন ইব্ন আখতাব এবং তার ভাই হুয়াই ইব্ন আখতাব ও ঐ সমস্ত লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর হায়াত এবং তাঁর উম্মতের সময়কাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তারা الـر – الـمـر – الـمـص–الـم ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের দ্বারা এ বিষয়ের জ্ঞান হাসিল করতে চেয়েছিল। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন, فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ অর্থাৎ যে সমস্ত ইয়াহুদীর মধ্যে সত্য–বিমুখতার প্রবণতা আছে, তারাই বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্য রূপক আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। অর্থাৎ তারা ফিতনার উদ্দেশ্য ঐ বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহের অনুসরণ করে যাতে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এ সম্পর্কে প্রামাণ্য রিওয়ায়াতসমূহ সূরা বাকার প্রারম্ভে আমি উল্লেখ করেছি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা ঐ সমস্ত বিদাআতী লোকদেরকে বুঝান হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)কে দেয়া শরীআতের পরিপন্থী বিদআতের উদ্ভাবন করেছে। তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভবনাময় আয়াতসমূহের মনগড়া ব্যাখ্যা করে নিজেদের আবিষ্কৃত বিদাআতের পক্ষে প্রমাণ পেশ করে। অথচ, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন নিজে অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভাষায় এ সমস্ত আয়াতের সহীহ্ ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। যারা এ ব্যাখ্যা করেন, তারা নিম্নের রিওয়ায়াতগুলো প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন।

৬৬০৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণীঃ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যদি খারিজী সম্প্রদায় না হয়, তবে তারা কারা, তা আমি জানি না, আমার জীবনের কসম! বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার সাহাবী যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বায়আতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন, তাদের জীবন চরিতর মাঝে চাক্ষুষ্মান ও বুদ্ধিমান লোকদের থেকে যারা অনুসন্ধিৎসু তাদের জন্য রয়েছে সে বিষয়ে অবগতি এবং যারা উপদেশ গ্রহণেচ্ছু, তাদের জন্য রয়েছে উপদেশ। খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রোহ করল। মদীনা, শাম ও ইরাকে তখন বহু সাহাবী বসবাস করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর স্ত্রীগণও তখন জীবিত ছিলেন। তাদের পুরুষ লোকেরা হারূরা নামক স্থানে সমবেত হলো। সাহাবিগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন, তাতে তারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং তাদের আদর্শের প্রতি তারা আদৌ মনোনিবেশ করেনি। বরং তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর প্রতি সম্বোধন করে সাহাবীর দোষচর্চা করে এবং নিজেদের গুণাবলীর কথা আলোচনা করে। সাহাবিগণ তাদের এ কার্যকলাপ মনে মনে অপসন্দ করেন, মুখে এর প্রতিবাদ করেন এবং তাদের সাথে মুকাবিলা হলে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাঁরা তাদের হাত বেঁধে কঠোর শাস্তির বিধান করেন। আমি আমার জীবনের শপথ করে বলছি, খারিজীদের বিষয়টি যদি হক হতো, তবে অবশ্যই তা স্থায়ী হতো এবং অটুট থাকত। কিন্তু তাদের এপথ ছিল ভ্রান্ত। তাই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে গায়রুল্লাহ্র আবিষ্কৃত পথে বহুবিধ মতবিরোধ দেখা দেয়। এটাই ইতিহাসের অমোঘ বিধান। এ মতবাদ বহুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু তারা কি কোন দিন অভীষ্টলক্ষ্যে পৌছতে পেরেছে, সফলতা অর্জন করতে পেরেছে? এতদসত্ত্বেও তাদের উত্তরসূরীরা কেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না? পক্ষান্তরে তারা যদি হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকত, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ মতবাদকে জয়ী করতেন, তাদেরকে সফলকাম করতেন এবং সর্বতোভাবে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। কিন্তু তারা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেন এবং তাদের পা ফসকিয়ে দিলেন। এক যুগ অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদের প্রামাণাদির ভিত খসিয়ে দিলেন। তাদের উদ্ভাবিত মতাদর্শকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিলেন এবং রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেন তাদের। পক্ষান্তরে তারা যদি এ বিষয়টিকে গোপন রাখত, তবে তা তাদের হৃদয়ে বিষফোঁড়ার রূপ পরিগ্রহ করত। কিন্তু তা প্রকাশ করার কারণে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে এ পৃথিবীর পাতা হতে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন, আল্লাহ্র শপথ! এ হচ্ছে তাদের বাতিল মতাদর্শ। সুতরাং তোমরা এর থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ্র শপথ! ইয়াহুদী ধর্ম বিদাআত, খৃষ্টান ধর্ম বিদাআত, খারজী মতাদর্শ বিদাআত এবং সাবইয়া মতাদর্শ বিদাআত। এ সকল মতাদর্শের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ কোন বিধান নাযিল করেননি এবং কোন নবী এ সম্পর্কে কোন আদর্শ ও রেখে যান নি।

৬৬০৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এক সম্প্রদায় কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করেছে এবং ফিতনার শিকার হয়েছে। তারপর তারা রূপক আয়াতসমূহের অনুসরণ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমার জীবনের শপথ! অবশ্যই বায়আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবিগণই হুদায়বিয়ার বায়আতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। তারপর তিনি হযরত মা'মারের অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৬৬০৫. হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ থেকে শুরু করে وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বললেন, রূপক আয়াত নিয়ে কাউকে বিতর্ক করতে দেখলে মনে করবে, এদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেছেন। কাজেই, তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

৬৬০৬. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ থেকে আরম্ভ করে وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে বললেন, মুতাশাবিহাত নিয়ে কাউকে বিতর্ক করতে দেখলে মনে করবে উপরোক্ত আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। কাজেই এ ধরনের লোকদের থেকে তোমরা দূরে থাকবে। আইয়ূব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাদের সাথে কখনো বসবে না। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেই বুঝিয়েছেন। কাজেই তাদের থেকে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে।

৬৬০৭. হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) থেকে অন্য সূত্রেও এ আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে।

৬৬০৮. হযরত আইশা (রা.)–এর সূত্রে নবী (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৬০৯. নবী করীম (সা.)–এর সহধর্মিণী আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَ اُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করে বললেন, যারা রূপক আয়াতসমূহের অনুসরণ করে এবং এ নিয়ে যারা বিতর্ক করে, তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা তাদের সাথে কখনো বসবে না।'

৬৬১০. হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করে বললেন, কুরআন মজীদের রূপক আয়াতসমূহের অনুসারী লোকদেরকে দেখলে তোমরা মনে করবে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। কাজেই তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে।

৬৬১১. হযরত আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ আয়াতাংশ সম্পর্কে বিশেষভাবে বললেন, এ আয়াতে উল্লিখিত সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তাই তোমরা তাদেরকে দেখলে ভালরূপে চিনে রাখবে।

৬৬১২. হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যারা মুহ্কাম আয়াতকে উপেক্ষা করে রূপক আয়াতের অনুসরণ করে, তাদেরকে তোমরা দেখলে, তাদের থেকে দূরে থাকবে।

৬৬১৩. হযরত আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلاَّ

وَالرّٰسِخُوْنَ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, এ নিয়ে যারা বিতর্ক করে তোমরা তাদেরকে দেখলে মনে করবে আয়াতে নির্দেশিত ব্যক্তি তারাই। কাজেই, তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে।

৬৬১৪. আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা এ নিয়ে বিতর্ক করে, তাদেরকে দেখলে তোমরা মনে করবে আয়াতে নির্দেশিত ব্যক্তি তারাই। সুতরাং তাদের থেকে তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে।

৬৬১৫. আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রূপক আয়াতের অনুসরণকারী লোকদের কথাই উল্লেখ করেছেন। তাদেরকে দেখলে তোমরা তাদের থেকে দূরে থাকবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতের পূর্বাপর হতে এ কথা বুঝা যায় যে, যারা হযরত ঈসা (আ.) অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর উম্মতের সময়কাল সম্পর্কে আল–কুরআনে বর্ণিত মুতাশাবিহ্ আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তবে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর উম্মতের সময়কাল সম্পর্কে আয়াতে মুতাশাবিহাতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়েছিল, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয়টি অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। কেননা, আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ –এর মাধ্যমে ঐ সময়কাল সম্পর্কেই বলা হচ্ছে, যার সম্পর্কে তারা মুতাশাবিহ আয়াতের মাধ্যমে জানার ইচ্ছা করেছিল। বক্রহৃদয় সম্পন্ন লোকদের এ ব্যর্থ প্রচেষ্টার মুকাবিলায় আল্লাহ্ পাক বলেন, এ বিষয় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত বিষয়টি তো আল্লাহ্ তাঁর নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর উম্মতদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টি মানুষের নিকট লুক্কায়িত, তাই আল্লাহ্ তা'আলা লোকদেরকে জানাতে চাচ্ছেন।

আল্লাহ্র ইরশাদ اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ (ফিতনার উদ্দেশ্যে) ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ অর্থ হলো, শিরকের উদ্দেশ্যে তারা এরূপ করে। তারা নিম্নের বর্ণনা ক'টি নিজেদের দাবীর সমর্থনে পেশ করেন ঃ

৬৬১৬. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ অর্থ শিরকের ইচ্ছায়।

৬৬১৭. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْفِتْنَةُ অর্থ শিরক।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, اَلْفِتْنَةُ অর্থ اَلشُّبُهَاتُ অর্থাৎ সন্দেহ ও সংশয়। নিজেদের দাবীর সমর্থনে তারা নিম্নের দলীলগুলো পেশ করেন ঃ

৬৬১৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ابتغاء الفتنة মানে হচ্ছে, সন্দেহবাদিতা। এটাই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৬৬১৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ –এর অর্থ হলো, সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এ কারণেই তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

৬৬২০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْفِتْنَةُ অর্থ ঃ সন্দেহ। এ সন্দেহই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

৬৬২১. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْفِتْنَةُ অর্থ اَللَّبْسُ। অর্থাৎ সন্দেহ ও সংমিশ্রণ।

ইমাম তাবারী (র.)–এর মতে উভয় তাফসীরের মাঝে সঠিক ব্যাখ্যা তাই, যারা বলেন, اَلْفِتْنَةُ শব্দের অর্থ হচ্ছে, সন্দেহ–সংশয় ও সংমিশ্রণ। এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, যাদের অন্তকরণে সত্য–বিমুখতার প্রবণতা আছে এবং যারা সত্য লংঘনকারী, তারা আল–কুরআনের মুতাশাবিহ্ আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। অনুসরণ করে তারা ঐ সমস্ত আয়াতের, যার মাঝে বিভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। উদ্দেশ্য হলো, নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে সন্দিহান করে নিজেদের বাতিল মতাদর্শের উপর প্রমাণ পেশ করা। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মুহ্কাম আয়াতের যথার্থতার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। এ আয়াত যদিও মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তথাপি ইসলামে নব উদ্ভাবিত সমস্ত বিদাআতই এর মধ্যে শামিল আছে। চাই এ বিদাআতের আবিষ্কার খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে হোক, অথবা ইয়াহূদীদের পক্ষ হতে হোক, বা অগ্নিপূজকদের পক্ষ হতে হোক, বা সাবইয়্যা সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে হোক, বা খারিজীদের পক্ষ হতে হোক, বা কাদরিয়াদের পক্ষ হতে হোক, অথবা জাহমিয়্যা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হোক। সকল বিদাআতীর বিদাআত এর মধ্যে শামিল আছে। এদের সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, এ নিয়ে মতবিরোধ করতে দেখলে মনে করবে, তারাই সে সম্প্রদায়, যাদের কথা কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাদের থেকে তোমরা দূরে থাকবে। যেমন বর্ণিত আছে যে,

৬৬২২. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তাঁর নিকট খারিজী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা হলো, (এবং পলায়ন পর্বে তাদের কি করুণ অবস্থা হয়েছিল এ সম্পর্কে পর্যালোচনা হলো।) তিনি বললেন, তারা মুহ্কাম আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। তারপর ইব্ন আব্বাস (রা.) পাঠ করলেন, وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلاَّ اللهُ

اِبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ –এর ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি, তাই উভয়বিধ ব্যাখ্যার মাঝে সহীহ্ ও বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা। এ কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে, যাদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়েছে, তারা হচ্ছে মুশরিক। এসব আয়াতের ব্যাখ্যার মাঝে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে সন্দিহান করা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রমাণাদি পেশ করা, তাদেরকে হক থেকে বিরত রাখা। ইমাম তাবারী বলেন, এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কোন অর্থ নেই যে, তারা মুশরিক ছিল। শিরকী আকীদা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যেই তারা এরূপ করেছে।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهِ –এর ব্যাখ্যা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, ঐ সময়কাল, যা ইয়াহূদী সম্প্রদায় জানতে চেয়েছিল। অর্থাৎ حروف مقطعه –এর মাধ্যমে রাসূল (সা.) ও তার উম্মতের সময়কাল নিরূপণ করা। যেমন الم–المص–الر – ও المر ইত্যাদি বর্ণসমূহ।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৬৬২৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلاَّ اللهُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, –এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, تَأْوِيْلَهُ –এর মানে عواقب القران অর্থাৎ একদল লোক ناسخ আয়াত নাযিলের পূর্বেই এ কথা জানতে চাচ্ছিল যে, শরীআত প্রবর্তিত বিধান রহিতকারী আয়াত কবে অবতীর্ণ হবে এবং তাকে রহিত করবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬২৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِبْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা কুরআন মজীদের তাবীল তথা এর রহিতকরণ কাল সম্পর্কে জানতে চায়। এ ব্যর্থ চেষ্টার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ এর পরিণামকাল আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তাদের জানতে ইচ্ছা করে, ناسخ আয়াত কবে নাযিল হবে? কবে منسوخ আয়াতকে রহিত করবে?

অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, اِبْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ –এর ব্যাখ্যা হলো, মুতাশাবিহ আয়াতের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই যাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে এবং গোমরাহী আছে, তারা ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬২৫. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِبْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ -এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ্র বাণী ঃ خلقنا ও قضينا ইত্যাদির অপব্যাখ্যা দেয়া।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) ও সুদ্দী (র.) যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই বিশুদ্ধতার দিক থেকে অধিক যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি। কেননা, পূর্বোক্ত আলোচনায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। অথচ خلقنا ও قصينا –এর ব্যাখ্যা কোন মুশরিক জাহিল ব্যক্তিও জানে। তাই ঈমানদার পারদর্শী আলিমগণ এর ব্যাখ্যা আরও ভাল ভাবে জানেন।

আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না, আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।)

অর্থাৎ কিয়ামতের সময়কাল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর উম্মতের কাল এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে এ ধরনের বিষয়াদির ইল্‌ম আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না এবং ঐ সমস্ত লোকদের পক্ষে তা জানা সম্ভবপরও নয়, যারা গণনা ইত্যাদির মাধ্যমে এ সম্পর্কে জানতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত। তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। এর বাস্তব ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তাফসীরকারগণ এখানে একাধিক মত পোষণ করেন যে, আয়াতে اللّٰه শব্দের উপরই ওয়াক্‌ফ হবে, না اَلرَّاسِخُوْنَ শব্দটি اللّٰه শব্দের উপর عطف বা সংযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হবে? যদি عطف না হয়ে পৃথক বাক্য হয়, তবে এর অর্থ হবে, তারা বলে, আমরা মুতাশাবিহ্ আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং এ কথা মানি যে, এর সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই আছে। এসব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত সত্য।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬২৬. আইশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্ উভয় আয়াতের উপরই ঈমান রাখি। তবে মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা আমরা জানি না।

৬৬২৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা তা বিশ্বাস করি।

৬৬২৮. হিশাম ইব্ন উরওয়াহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা উরওয়াহ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলতেন, যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা এ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা জানত না। তবে তারা বলত, আমরা এগুলো বিশ্বাস করি। এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত।

৬৬২৯. আবূ নাহীক আসাদী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তোমরা তো لا الله –তে ওয়াকফ না করে এর পরবর্তী অংশের সাথে মিলিয়ে পড় অথচ এখানে ওয়াকফ রয়েছে। কেননা, গভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকদের জ্ঞান তো اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا বলা পর্যন্তই সীমিত।

৬৬৩০. উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী লোকদের জ্ঞান তো اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا পর্যন্তই সীমিত।

৬৬৩১. মালিক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗ اِلاَّ اللّٰهُ একটি স্বতন্ত্র বাক্য। وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا একটি পৃথক বাক্য। জ্ঞানে সুগভীর লোকেরাও আয়াতে মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ (অর্থ ঃ আর যারা জ্ঞানে সুগভীর) তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস রাখি, এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৩২. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যাঁরা আয়াতে মুতাশাবিহাতের অর্থ জানেন, আমি তাঁদের মধ্যে একজন।

৬৬৩৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাঁরা জ্ঞানে পারদর্শী, তাঁরা মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা জানেন, আমি তাঁদের মধ্য থেকে একজন।

৬৬৩৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যাঁরা দক্ষ আলিম, তাঁরা মুতাশাবিহ্ আয়াতের ব্যাখ্যা জানে এবং তাঁরা বলেন, এতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

৬৬৩৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাঁরা দক্ষ আলিম, তাঁরা এর ব্যাখ্যা জানেন এবং তাঁরা বলেন, আমরা এতে বিশ্বাস রাখি।

৬৬৩৬. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুতাশাবিহার অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর জ্ঞানে যাঁরা পারদর্শী, তাঁরা বলেন, আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। সবকিছু আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। তারা মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের উপর কিয়াস করে, যার একটি মাত্র অর্থ রয়েছে। তাদের এ ব্যাখ্যায় এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদের এক অংশ অন্য অংশকে সত্যায়িত করে। এমনিভাবে তাদের দলীল পরিপূর্ণ হয়। কুফর বিদূরিত হয়। বাতিলের মূলোৎপাটিত হয়।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, যারা প্রথমোক্ত কথা বলেন, তাদের কথা মুতাবিক আয়াতের অর্থ এ দাঁড়ায় যে, যারা দক্ষ আলিম, তারা মুতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা জানেন না। তবে মুতাশাবিহ আয়াত আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আগত এ কথার প্রতি তারা বিশ্বাসী। এ কথাটি এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন। বসরাবাসী আরবী ব্যাকরণবিদদের মতে الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ শব্দটি مبتداء হওয়ার ভিত্তিতে مرفوع এবং يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ – "خبر" হওয়ার ভিত্তিতে مرفوع। এমতাবস্থায় এ বাক্যটি সম্পূর্ণ একটি পৃথক বাক্য হবে। কূফাবাসী ব্যাকরণবিদদের মতে, الرَّاسِخُوْنَ শব্দটি يَقُوْلُوْنَ –এর خبر হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে। কারো কারো মতে, এখানে اَلرَّاسِخُوْنَ শব্দটি يقولون বিধেয় হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে।

যারা মনে করেন, জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিরাও মুতাশাবিহাতের ব্যাখ্যা জানেন, তাদের মতে وَالرَّاسِخُوْنَ শব্দটি الله শব্দের উপর عطف হয়েছে এবং এ কারণেই এতে رفع হয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, এ পর্যায়ে আমার নিকট সঠিক মত হলো, اَلرَّاسِخُوْنَ শব্দটি পরে উল্লিখিত يَقُوْلُوْنَ বিধেয় হওয়ার কারণে مرفوع হয়েছে।

আরবী ভাষায় تاويل শব্দের অর্থ হচ্ছে, تفسير–مرجع ও مصير। আরব কবি আ'শার কবিতার মধ্যেও তা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেন, عَلٰى اَنَّهَا كَانَتْ تَاَوُّلُ حُبِّهَا – تَاَوُّلَ رِبْعِيِّ السِّقَابِ فَاَصْحَبَا ـ

ال الشئ الى كذا থেকে تاويل শব্দের উৎপত্তি। যখন কোন বস্তু কোন দিকে প্রত্যাগমন করে, তখন এবাক্যটি ব্যবহৃত হয়। এর مضارع হচ্ছে يَؤُلَ এবং ধাতুমূল হচ্ছে اَوْلاً। اولته انا মানে হচ্ছে صيرته اليه –। বলা হয় اَحْسَنُ تَاْوِيْلاً –এর মানে হচ্ছে اَحسن جزاء অর্থাৎ উত্তম প্রতিদান (৪ঃ ৫৯) মানুষের কর্ম যেহেতু প্রতিদানের প্রতিই ধাবিত হয়, একারণে প্রতিদানকে تاويل বলা হয়।

ইমাম তাবারী বলেন, আ'শার কবিতায় উল্লিখিত تَاَوُّلَ حُبِّهَا –এর মানে হলো, تفسير حبها ومرجعه। এর দ্বারা কবি এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, প্রেমিকার মহব্বত প্রেমিকের হৃদয়ে প্রথমত বিন্দু বিন্দু ছিল। তারপর তা ছোট থেকে বড় হওয়ার দিকে ধাবিত হয় এবং প্রতিনিয়ত তা বাড়তে থাকে। ফলে তা ছোট থেকে বড় হয়। যেমন ছোট একটি ছিদ্র পর্যায়ক্রমে তা বড় হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, আ'শার কবিতাটি নিম্নোক্তভাবেও পড়া হয় ঃ

عَلٰى اَنَّهَا كَانَتْ تَوَابِعُ حُبِّهَا * تَوَالِىَ رِبْعِيِّ السِّقَابِ فَاَصْحَبَا ـ

আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ ঃ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ (যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস রাখি।)

"الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ" -এর মানে হচ্ছে, যারা জ্ঞানের কথা শুনে তা সংরক্ষণ করেছে, মুখস্থ করেছে এবং তা এমন ভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে যে, তাদের জানা ও বুঝার মধ্যে কোন সন্দেহ থাকে না। মূলত الراسخون শব্দটিও "رسوخ الشى فى الشى" থেকে উদগত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ثبوته وولوجه فى الشى অর্থাৎ কোন বস্তু কোন বস্তুর মাঝে প্রবেশ করা ও সুদৃঢ় হওয়া ইত্যাদি। বলা হয়, رسخ الايمان فى قلب فلان অর্থাৎ ঈমান অমুকের অন্তরে সুদৃঢ় হয়েছে। হাদীস শরীফে এমন ব্যক্তিদের প্রশংসা স্থান পেয়েছে।

৬৬৩৭. আবুদ্‌দারদা ও আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্(সা.)-কে راسخ فى العلم সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন, যার শপথ যথার্থ, যে সত্যবাদী, যার হৃদয় বলিষ্ঠ, যার পেট হারাম আহার্য থেকে পবিত্র এবং যার গুপ্তাঙ্গ ব্যভিচার হতে পবিত্র, সেই জ্ঞানে দক্ষ।

৬৬৩৮. আবুদ্‌দারদা ও আবূ উমামা (র.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) راسخون فى العلم সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর উত্তরে তিনি বললেন, যার শপথ যথার্থ, যে সত্যবাদী, যার হৃদয় বলিষ্ঠ, যার উদর হারাম আহার্য থেকে পবিত্র এবং যার গুপ্তাঙ্গ ব্যভিচার হতে পবিত্র, সেই জ্ঞানে দক্ষ। তাফসীরবিশারদদের মতে, তারা যেহেতু মুতাশাবিহাত সম্পর্কে اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا বলেছেন, এ কারণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে الراسخون فى العلم জ্ঞানে পারদর্শী বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নের হাদীসসমূহ এর প্রমাণ ঃ

৬৬৩৯. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি الرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, জ্ঞানে দক্ষ তারাই, যারা মুতাশাবিহ আয়াত সম্পর্কে বলে, আমরা এতে বিশ্বাস রাখি। এ সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত।

৬৬৪০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন ব্যক্তিরাই জ্ঞানে দক্ষ। তারা বলে, কুরআনের ناسخ منسوخ সমস্ত ব্যাপারেই আমরা বিশ্বাসী। এ সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত।

৬৬৪১. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা.) বলেন, জ্ঞানে সুগভীর তারাই, যারা উপরোক্ত কথা বলে। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেন, যারা জ্ঞানে পরিপূর্ণ, তারা বলে, এতে আমরা বিশ্বাসী। তারা এ কথাও বলে, رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
তারা আরো বলে, رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, জ্ঞানে যাঁরা দক্ষ, তাঁরা পবিত্র কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতে বিশ্বাস করেন, যদি তার ব্যাখ্যা তাঁরা জনেন না।

৬৬৪২. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্ঞানে যাঁরা দক্ষ, তাঁরা মুহ্কাম এবং মুতাশাবিহ সব আয়াতেই বিশ্বাস রাখেন।

আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ ঃ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا (এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত।)

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের মুহকাম ও মুতাশাবিহ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত। তিনিই এ কিতাব তাঁর নবী (সা.) প্রতি নাযিল করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৪৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, منسوخ–ناسخ এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত।

৬৬৪৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা দক্ষ আলিম তারা বলেন, এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত। তারা মুতাশাবিহ্ আয়াতের উপর ঈমান রাখেন এবং মুহ্কাম আয়াতের উপর আমল করেন।

৬৬৪৫. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ উভয় আয়াত সম্পর্কে বলেন, এসব আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

৬৬৪৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা মুহ্কাম আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, এর উপর আমল করে এবং মুতাশাবিহাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে কিন্তু আমল করে না। তারা বিশ্বাস করে, এসব আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত।

৬৬৪৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা দক্ষ আলিম, তারা এর উপর আমল করেন। তারা বলেন, আমরা মুহকাম আয়াতের উপর আমল করি এবং আমরা তা বিশ্বাসও করি। তবে মুতাশাবিহ আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখলেও এর উপর আমল করি না। আর এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (অর্থ ঃ বোধশক্তিসম্পন্নরা ব্যতীত আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।) –এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সুষ্ঠু, বিবেক–বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই নসীহত গ্রহণ করে এবং আল কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াত সম্পর্কে জ্ঞান বহির্ভূত কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল অজানা মুতাশাবিহ আয়াতকে জানা মুহকাম আয়াতের ন্যায় বিচার ও বিশ্লেষণ করে।

(٨) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۝

৮. হে আমাদের পালনকর্তা ! তুমি যখন আমাদের হিদায়াত করেছ, তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্র কর না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা।

অর্থাৎ যারা দক্ষ আলিম তারা আল-কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াত সম্পর্কে বলে, এতে আমরা বিশ্বাস রাখি এবং মুতাশাবিহ ও মুহকাম উভয় আয়াতই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! সরল পথ প্রদর্শনের পর, ফিতনা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যারা মুতাশাবিহ আয়াতের পেছনে পড়ে বিপদগামী হয়েছে, তাদের ন্যায় আমাদেরকেও বিপদগামী কর না। বরং আমাদেরকে তোমার কিতাবের মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করার তাওফীক দাও তোমার পক্ষ হতে আমাদের প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষণ কর। অর্থাৎ আমাদেরকে মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ্ উভয় আয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি প্রদানের জন্য তাওফীক দাও এবং এ স্বীকৃতির উপর আমাদেরকে অবিচল রাখ। তুমি তো মহান দাতা, তুমিই তো তোমার বান্দাদেরকে তাওফীক দিয়ে থাক। আর দীন, তোমার কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি সুদৃঢ় ঈমান দান কর। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ

৬৬৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশের মানে হচ্ছে, হে আমাদের প্রতিপালক ! শরীরিক দিক হতে আমরা ক্লান্ত হলেও মনের দিক থেকে আমাদের অন্তরকে বক্র কর না। তোমার পক্ষ হতে আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, পক্ষান্তরে "হিদায়াতের পর আমাদেরকে সত্য লংঘন প্রবণ করনা" এবং সত্য দীনের উপর অবিচল থাকার সাহায্য কামনা করে আল্লাহ্র নিকট করুণা ভিক্ষা চাওয়া–এর মধ্যে আল্লাহ্ পাক তাদের প্রশংসা করেছেন এমর্মে যে, তারা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে দূরদর্শিতা রয়েছে। সাথে সাথে কাদরিয়া সম্পদায়ের ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তারা বলে, "আল্লাহ্ যদি কারো হৃদয়কে বক্র করে দেন এবং সত্য থেকে বিমুখ করে দেন, তবে তা নিতান্তই জুলুম হবে।" এর জবাবে বলা হয়েছে, বিষয়টি যদি এমনই হয়, যেমন তারা বলে থাকে, তবে رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً الخ –এ আয়াতটি প্রশংসাসূচক না হয়ে বরং তা সমালোচনামূলক হবে। কেননা, তাদের কথা মত তখন لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا –এর মানে হবে, আল্লাহ্ যেন তাদের প্রতি কোন জুলুম ও নির্যাতন না করেন। অথচ এ ধরনের প্রার্থনা করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কারো প্রতি কখনো জুলুম করেন না। আল্–কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (سورة فصلت : ٤٦) (তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। সুতরাং জুলুম না করার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করার কোন অর্থ নেই। এতদ্সত্ত্বেও যারা এ কথা বলে, তাদের এ কথার ভ্রান্তির উপর ইসলামে যথেষ্ট দলীল মওজুদ আছে। সর্বোপরি যে মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য ত্যাগ করে বক্রতা অবলম্বন করে, তাদের হৃদয়কে বক্র করে দেয়া সর্বতোভাবেই ইনসাফ। জুলুমের লেশ মাত্রও এতে নেই। আগ্রহের সাথে আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করার বহু ফযীলত হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে।

৬৬৫০. উম্মে সালমা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) يَامُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ পড়ে رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

৬৬৫১. আসমা (র.) সূত্রেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৬৫২. শাহর ইব্ন হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালমা (রা.)–কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অধিকাংশ সময় দু'আর মাঝে বলতেন, اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ القلوب ثبت قلبى على دينك । একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.) ! অন্তর কি পরিবর্তন হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার দুই আঙ্গুলে মাঝে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করলে স্থির রাখেন। আর ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করে দেন। অতএব আমরা আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ্ ! পথ প্রদর্শনের পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না এবং তোমার পক্ষ হতে আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ কর। নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। উম্মে সালমা বলেন, এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.), আমাকে এমন কোন দু'আ শিক্ষা দিবেন কি, যা দ্বারা আমি আমার নিজের জন্য দু'আ করব। হুযূর (সা.) বললেন, তবে পাঠ কর اللّٰهم رب النبى محمد اغفرلى ذنبى واذهب غيظ قلبى واجرنى من مضلات الفتن

৬৬৫৩. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অধিকাংশ সময় দু'আতে পাঠ করতেন, يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك । একদা জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমরা তো আপনার উপর ঈমান আনয়ন করেছি এবং আপনার প্রতি প্রেরিত কিতাবের প্রতিও, এতদ্সত্ত্বেও আমাদের ভয় আছে কি? একথা শুনে তিনি বললেন, মানুষের হৃদয় আল্লাহ্ তা'আলার দুই আঙ্গুলের মাঝে বিদ্যমান।

৬৬৫৪. আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অনেক সময় বলতেন, يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك –। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা তো আপনার প্রতি এবং আপনার উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি এরপরও কি আমাদের আশংকা রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মানুষের হৃদয় আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাঝে বিদ্যমান। আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছা মুতাবিক তা পরিবর্তন করেন।

৬৬৫৫. নাওওয়াস ইব্ন সামআন কিলাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছি, প্রতিটি হৃদয়ই আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাঝে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে স্থির রাখেন, আবার ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সব সময়েই বলতেন, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك মীযান আল্লাহ্র হাতে, এর দ্বারা তিনি কোন সম্প্রদায়কে উচ্চাসন দান করেন, আবার কাউকে নীচে নামিয়ে দেন। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ করে থাকবেন।

৬৬৫৬. সামুরা ইব্ন ফাতিক উস্দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর একজন সাহাবী। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, মীযান আল্লাহ্র হাতে। এর দ্বারা তিনি কাউকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেন, আবার কাউকে নীচে নামিয়ে দেন। আদম সন্তানের হৃদয় রহমানের (দয়াময়ের) হাতের দুই আঙ্গুলের মাঝে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করলে তা বক্র করে দেন। আবার ইচ্ছা করলে তা স্থির রাখেন।

৬৬৫৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল 'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছি, এক হৃদয়ের ন্যায় সমস্ত মানুষের হৃদয় আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাঝে

বিদ্যমান। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك

৬৬৫৮. উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অধিকাংশ দু'আয় বলতেন, اللهم ثبت قلبى على دينك । তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা.)। অন্তরে কি পরিবর্তন হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ্র দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করলে তা স্থির রাখেন, আর ইচ্ছা করলে তা পরিবর্তন করেন। অতএব, আমরা আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ্ ! পথ প্রদর্শনের পর আমাদেরকে সত্যবিমুখ প্রবণ কর না। বরং আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ কর। তুমি তো মহা দাতা। মানব জাতিকে একত্রে সমাবেশ করা হবে।

(৯) رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি মানব জাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর কথার বরখেলাফ করেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (রা.) বলেন, আমরা আল-কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের উপরও ঈমান রাখি, কুরআনে বর্ণিত মুহ্কাম ও মুতাশাবিহ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত। তারা এ কথা বলার সাথে সাথে এ মর্মেও প্রার্থনা করে যে, رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ । অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! কিয়ামতের দিন আপনি লোকদেরকে সমবেত করবেন। সুতরাং সেদিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদেরকে মার্জনা করে দিন। আপনি তো দেয়া প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না। আপনি পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যারা আপনার উপর ঈমান আনবে, আপনার রাসূলের অনুসরণ করবে এবং আপনার নির্দেশ মুতাবিক আমল করবে, আপনি সেদিন তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিন। পক্ষান্তরে এ আয়াতে বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ্র নিকট এ মর্মে আবেদন করা হচ্ছে যে, তিনি যেন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) উপর ঈমান আনয়ন করার ব্যাপারে সাহায্য প্রদান করে তাদেরকে আমৃত্যু হকের উপর অবিচল রাখেন। তিনি যদি তাদের প্রতি এ আচরণ করেন, তবে তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর বান্দাদের থেকে যারা এরূপ আমল করবে, তাদেরকে তিনি জান্নাত দান করবেন। বাহ্যিকভাবে এ আয়াত যদিও خبر হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত ভাবে এ হচ্ছে انشاء । কেননা, এর মাধ্যমে বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা ও যাচঞা করা হয়েছে।

لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ –এর মানে হলো, পারস্পরিক বিষয়সমূহের মীমাংসা করার দিন। যেদিন প্রত্যেককেই স্ব–স্ব কার্য অনুযায়ী দন্ডপ্রাপ্ত কিংবা পুরস্কৃত করা হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, الميعاد শব্দটি المفعال –এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। তা اسم اله –এর واحد كبرى –এর صيغه – الوعد ধাতুমূল হতে এর উৎপত্তি।

কাফিরদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগবে না।

(১০) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝

১০. যারা কুফরী করে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে লাগবেনা ; এবং তারাই অগ্নির ইন্ধন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, বনী ইসরাঈলের যে সব ইয়াহুদী, মুনাফিক এবং আরবের যে সব মুনাফিক ও কাফির ব্যক্তিরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবূওয়াত সম্পর্কে জানার পরও তাঁকে অস্বীকার করে, তাদের অন্তকরণে রয়েছে বক্রতা। তারাই ফিতনা প্রত্যাশী হয়ে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করে। তাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রেহাই দিতে পারবে না। মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ করার কারণে তাদের উপর দুনিয়াতে আযাব আপাতিত হলে তাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা কোন কাজেই আসবে না। অধিকন্তু পরকালে তারাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন।

(১১) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

১১. তাদের অভ্যাস ফিরাউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ; তাঁরা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তিদান করেছিলেন। আল্লাহ্ দন্ডদান অত্যন্ত কঠোর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা কুফরী করে, আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন প্রকারেই উপকারী হবে না। তাদের প্রতি শাস্তি আপতিত হবার সময় ফিরআউনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছিল। ফলে, তাদের পাপের কারণে আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কালে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। তখন ফিরআউনী সম্প্রদায় তথা নূহ, হূদ, লূত ও তাদের অনুরূপ সম্প্রদায় যারা ত্বরিত আযাব কামনা করছিল, তাদের ন্যায় তাদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততিও আল্লাহ্‌র নিকট কোন কাজে লাগবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ -এর মানে হলো, كَسُنَّتِهِمْ (তাদের প্রথার মত) ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৫৯. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হলো, كسنتهم অর্থাৎ তাদের পন্থার ন্যায়।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ –এর মানে হলো, كعملهم (অর্থাৎ তাদের আমলের ন্যায়)।

৬৬৬০. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ –এর অর্থ হলো, ফিরআউনী কর্মকান্ডের ন্যায়।

৬৬৬১. দাহ্হাক (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ –এর অর্থ হলো,। ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কাজের ন্যায়।

৬৬৬২. ইব্ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হলো, ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কর্মকান্ডের ন্যায়। যেমন রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। বর্ণনাকারী এর সমর্থনে مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ (৪০ ঃ ৩১) আয়াতটি পাঠ করেন। এখানে داب শব্দটি عمل বা কাজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬৬৬৩. ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ –এর মানে হলো, كفعل ال فرعون –ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কর্মকান্ডের ন্যায়।

৬৬৬৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ –এর মানে হলো, كصنع ال فرعون –ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কাজের ন্যায়।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ –এর মানে হলো, كتكذيب ال فرعون ফিরআওনী সম্প্রদায়ের অস্বীকার করার ন্যায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৬৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত।তিনি كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের অস্বীকার করার বিষয়টি পূর্ববর্তিগণের অস্বীকার করার মতই ছিল।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, الداب শব্দটি মূলত دابت فى الامر دابا হতে গঠিত। এর অর্থ হলো, সর্বদা আমি কাজে লেগে রয়েছি এবং এ বিষয়ে কষ্ট সহ্য করেছি। তারপর আরবগণ এ শব্দটিকে কর্ম, বিষয় চরিত্র ও স্বভাবের অর্থে ব্যবহার করেছে। যেমন কবি সম্রাট ইমরাউল কায়স ইব্ন হাজর বলেন,

وَاِنَّ شِفَائِىْ عَبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ * فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ

كَدَأْبِكَ مِنْ اُمِّ الْحُوَيْرِثِ قَبْلَهَا * وَجَارَتِهَا اُمِّ الرَّبَابِ بِمَا سَلِ

ইমরাউল কায়স এখানে داب শব্দটিকে কর্ম, বিষয় চরিত্র ও অভ্যাসের অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় প্রবাদ আছে যে, هذا دابى ودابك ابدا অর্থাৎ আমার ও তোমার কাজ সর্বদা এই থাকবে। এর থেকেই বলা হয় دَابْتُ دُؤُوْبًا وَدَابًا। আরব সাহিত্যিকদের থেকে শ্রুত হয়ে আসছে, دَابْتُ دَابًا হামযা বর্ণে حركة –এর সাথে পাঠ করা।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ –এর ব্যাখ্যা ঃ

প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার পরও যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং তার রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

(১২) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

১২. যারা কুফরী করে তাদেরকে বল, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থাল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ –এর পঠনরীতি সম্পর্কে একাধিক মত রয়েছে।

কেউ কেউ এ দুটো শব্দকে ت বর্ণের সাথে মধ্যম পুরুষ হিসাবে পাঠ করেছেন। এতে কাফির লোকদেরকে এ মর্মে সম্বোধন করা হয়েছে যে, অচিরেই তারা পরাভূত হবে। তারা এ পঠনরীতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ (তোমাদের জন্য দুটি দলের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে) আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। তারা বলেন, এ আয়াতে لكم শব্দটিকে মধ্যম পুরুষ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতটিও মধ্যম পুরুষ হিসাবেই ব্যবহৃত হবে। তাই শব্দটি হবে ستغلبون এটিই হিজায ও বসরার কিরাআত বিশেষজ্ঞ এবং কূফার কতিপয় কিরাআত বিশেষজ্ঞের পঠনরীতি।

কেউ কেউ আয়াতটিকে ى ও ت উভয় বর্ণ যোগেই পাঠ করেছেন। তাঁরা বলেন, আরবদের কথা قُلت للقوم انكم مغلوبون وقلت لهم انهم مغلوبون –এর ন্যায় পাঠ করা জায়িয। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতটিকেও দুইভাবে পাঠ করা জায়িয। এ ধরনের পাঠরীতি অন্য আয়াতেও বিদ্যমান আছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর কিরাআতে আছে قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ تَنْتَهُوا يُغْفَرْلَكُمْ (ت –এর সাথে।) অথচ এটিই আমাদের কিরাআতে হলো, اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْلَهُمْ (ي –এর সাথে।) কূফার একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ আয়াতটিকে سَيُغْلَبُوْنَ وَيُحْشَرُوْنَ (ي –এর সাথে) পাঠ করেছেন। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে, তুমি ইয়াহূদ সম্প্রদায়কে বল, আরবের মুশরিকরা অচিরেই পরাভূত হবে এবং জাহান্নামে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। এমর্ম অনুসারে যারা উক্ত পঠনরীতি গ্রহণ করেছেন। তাদের নিকট ي (নাম পুরুষ) ছাড়া অন্য কোন কিরাআত জায়িযই হবে না।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এসব পাঠ–পদ্ধতির মধ্যে ت বর্ণসহ পাঠ করাই আমার নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয়। তখন এর অর্থ হবে, বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ফিত্না ও ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদে উল্লিখিত মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের অনুসরণ করে। হে মুহাম্মাদ (সা.) ! তাদেরকে বলে দিন, তোমরা অচিরেই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। আয়াতটিকে ي বর্ণের সাথে না পড়ে ت বর্ণের সাথে পড়াকে দু'টি কারণে আমি পসন্দনীয় বলে মনে করি ঃ (১) আলোচ্য আয়াতের পরেই রয়েছে قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ আয়াতটি। এখানে যেহেতু মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে, তাই আলোচ্য

আয়াতটিও মধ্যম পুরুষের সাথে ব্যবহৃত হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা, মধ্যম পুরুষকে মধ্যম পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট করাই উত্তম। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে,

৬৬৬৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদরের যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তিনি বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে বললেন, হে ইয়াহুদী সম্প্রদায়! কুরায়শরা যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে, অনুরূপ বিপর্যস্ত হবার পূর্বেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে নাও। উত্তরে তারা বলল, হে মুহাম্মাদ ! তুমি অদক্ষ, অযোগ্য কুরায়শদের সাথে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ধোঁকায় পতিত হয়ো না। তারা তো সম্পূর্ণই যুদ্ধবিদ্যায় অপারদর্শী ও অনভিজ্ঞ। আল্লাহর কসম। তুমি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে, তাহলে দেখতে, যুদ্ধ কাকে বলে এবং আমরা কেমন বীরপুরুষ । আজ পর্যন্ত আমাদের মত লোকদের সাথে যুদ্ধ করার কোন সুযোগ তোমার হয়নি। তখন নাযিল হয়, قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ হতে لِاُولِى الْاَبْصَارِ পর্যন্ত।

৬৬৬৭. আসিম ইব্ন উমার উব্ন কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ কুরায়শদেরকে পরাজিত করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহুদীদেরকে একত্রিত করলেন। পরবর্তী অংশ ইউনুস থেকে কুরায়বের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৬৬৬৮. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কায়নুকার বিষয়টি ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে বনূ কায়নুকার বাজারে একত্রিত করে বললেন, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়। কুরায়শদের প্রতি আল্লাহ্র যে ক্রোধ নিপতিত হয়েছে, অনুরূপ ক্রোধের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। তোমরা তো জান, আমি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। তোমাদের কিতাবেও এর উল্লেখ রয়েছে এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদের থেকে অঙ্গীকারও গ্রহণ করেছেন। এ কথা শুনে তারা বলল, হে মুহাম্মদ ! তুমি কি আমাদেরকে তোমার কওমের মত মনে করছ। যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকদের সাথে যুদ্ধ করে জয়ী হয়ে ধোঁকায় পতিত হয়ো না। আমরা তোমার সাথে যুদ্ধে জড়িত হলে বুঝতে পারতে, আমরা কত বীর পুরুষ।

৬৬৬৯. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ হতে لِاُولِى الْاَبْصَارِ পর্যন্ত আয়াতগুলো ইয়াহুদ সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

৬৬৭০. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণীঃ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বদর যুদ্ধের দিন ইয়াহুদীরা বলেছিল, কুরায়শদের উপর বিজয়ী হয়ে মুহাম্মাদ যেন গর্ববোধ না করে। তারা তো যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ এবং অজ্ঞ। তখন নাযিল হলো قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ সব বর্ণনা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, ইয়াহুদীদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে। তাদেরই সম্পর্কে নাযিল হয়েছে قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ আয়াতটি। সাথে সাথে এ সব বর্ণনা একথাও প্রমাণ করছে যে, سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ -কে ت -এর সাথে পড়াই উত্তম ى -এর সাথে পড়া থেকে।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ وَتُحْشَرُوْنَ –এর মানে হচ্ছে, এবং তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

وَبِئْسَ الْمِهَادُ –এর অর্থ, জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল, যেখানে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। মুজাহিদ (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬৬৭১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণীঃ وَبِئْسَ الْمِهَادُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কাফিররা তাদের নিজেদের জন্য বিছিয়েছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট বিছানা।

৬৬৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মুসলিম বাহিনী ও কাফির দলের বর্ণনা

(١٣) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ○

১৩. দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত ছিল, অন্যদল কাফির ছিল। তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখতে ছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ! ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে বল, قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ "তোমরা অচিরেই পরাভূত হবে" বলে আমি যা বলছি, এর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের জন্য এতে আলামত ও নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৭৩. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ –এ বর্ণিত اٰيَةٌ –এর মানে عبرة ও تفكر অর্থাৎ উপদেশ ও চিন্তা–ভাবনার বিষয় রয়েছে।

৬৬৭৪. রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন وَمُتَفَكَّرٌ

فئتين মানে فرقتين ও حزبين– الفئة –এর মানে একদল মানুষ।

التقتا –এর অর্থ, তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল। একদিকে ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তাঁর সাহাবিগণ, অপরদিকে ছিল কুরায়শ মুশরিক ব্যক্তিবর্গ।

فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর অর্থ, একটি দল মহান আল্লাহ্র আনুগত্য করত এবং মহান আল্লাহ্র দীনের জন্য যুদ্ধরত ছিল। এ দলে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ। আর অপর দলটি ছিল কাফির। তারা ছিল কুরায়শ মুশরিক।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৭৫. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিবদমান দু'টি দলের একদিকে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণ, অপর দলটি ছিল কুরায়শ কাফির।

৬৬৭৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬৬৭৭. হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যুদ্ধে লিপ্ত দু'টি দলের একদিকে ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তার সঙ্গিগণ। আর অপরদিকে কুরায়শ কাফির সম্প্রদায়।

৬৬৭৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বদর যুদ্ধের দু'টি দলের তথা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ এবং কুরায়শ মুশরিকদের মাঝে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৬৬৭৯. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬৬৮০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সেদিন মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়েছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ –এর মাঝে বিদ্যমান فِئَةٌ শব্দটিকে مبتداء (উদ্দেশ্য) হওয়ার ভিত্তিতে পেশ দেয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, فِىْ فِئَتَيْنِ –এর মানে হলো, واحداهما تقاتل فى سبيل الله এখানে احداهما শব্দটি যেমন مرفوع হয়েছে, অনুরূপভাবে فئة শব্দটিকেও رفع (পেশ) দেয়া হয়েছে। যেমন কোন এক কবি বলেছেনঃ

فَكُنْتُ كَذِىْ رِجْلَيْنِ رِجْلٌ صَحِيْحَةٌ + وَرِجْلٌ رَمٰى فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتْ

এখানে رجل শব্দটিকে مبتداء হওয়ার ভিত্তিতে رفع (পেশ)দেয়া হয়েছে। فئة শব্দটির ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপই করা হয়েছে। প্রখ্যাত কবি ইব্ন মুফার্রিগ –এর কবিতায়ও অনুরূপ প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

فَكُنْتُ كَذِىْ رِجْلَيْنِ رِجْلٌ صَحِيْحَةٌ * وَرِجْلٌ بِهَا رَيْبٌ مِّنَ الْحَدَثَانِ -

فَاَمَّا الَّتِىْ صَحَّتْ فَاَزْدُ شَنُوْاَةٍ * وَاَمَّا الَّتِىْ شَلَّتْ فَاَزْدُ عُمَانِ -

কবি উক্ত কবিতায় رجل শব্দটিকে উদ্দেশ্য مبتدا হওয়ার হিসাবে رفع (পেশ) দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আরব সাহিত্যিকগণও পুনঃ উধৃত উদ্দেশ্য যার সাথে বিধেয়ও রয়েছে এ ধরনের শব্দকে তারা কখনো পূর্বের اعراب অনুপাতে পড়ে। কখনো তারা এ ধরনের শব্দকে جملة مستانفة হিসাবে مرفوع (পেশযুক্ত) পড়েন। আবার কখনো তারা তা সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া হিসাবে যবরও দিয়ে থাকেন। এ ধরনের শব্দকে প্রথমোক্ত শব্দের উপর অনুমান করে جر দেয়াও জায়িয আছে। তখন উক্ত কবিতার প্রথম লাইনের

অর্থ হবে, فكنت كذلك رجلين : كذى رجل صحيحة ورجل سقيمة । অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতে فئة শব্দটিকে فى فئتين –এর উপর কিয়াস করে جر দেয়াও জায়িয আছে। তখন এর উহ্য ইবারত হবে فى فئتين التقتا فى فئة تقاتل فى سبيل الله । এ পঠন প্রক্রিয়া যদিও আরবী ভাষা শাস্ত্রের দিক থেকে বিশুদ্ধ কিন্তু এর বিপরীত পাঠরীতির উপর যেহেতু কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের ইজমা সংগঠিত হয়েছে, তাই এ পঠনরীতির অনুমতি আমি দেই না। فِئَةٌ শব্দটিকে قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا –এর দিকে লক্ষ্য করে যবর দিয়ে পড়া জায়িয।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ (তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল।) কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতের পঠন প্রক্রিয়ায় একাধিক মত পোষণ করেন। মদীনার আলিমগণ ترونهم –এর ت (মধ্যম পরুষ) হিসাবে পড়েছেন। এ হিসাবে এর অর্থ হবে, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায় ! নিশ্চয়ই যুদ্ধলিপ্ত এ দু'টি দলের মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একটি দল আল্লাহ্র পথে সংগ্রামরত ছিল এবং অপরটি ছিল কাফির। চোখের দেখায় তোমরা মুশরিকদেরকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখছিলে। এ কথার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মুসলমানদের উপদেশের বিষয় ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ হে ইয়াহুদ সম্প্রদায় ! চোখের দেখায় মুসলমানদের সংখ্যা কম এবং মুশরিকদের সংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকদের মুকাবিলায় মুসলমানগণই জয়লাভ করেছে। এ বিজয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। কূফা, বসরার অধিকাংশ এবং মক্কার কিছু সংখ্যক আলিম يرونهم অর্থাৎ ى (নাম পুরুষ)–এর সাথে পাঠ করেন। এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবেঃ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামরত মুসলিম সম্প্রদায় কাফিরদেরকে নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখছিল। এ হিসাবে আয়াতের মর্মার্থ হলো, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়! সম্মুখ সমরে লিপ্ত দু'টি দলের মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। এদের একটি আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করছিল আর অপর দলটি ছিল কাফির। মুসলমানগণ কাফিরদেরকে নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখছিল।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কারা কাদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখেছে? মুসলমানগণ কাফিরদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখেছে, না মুশরিকরা মসলমানদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখেছে, না অপর কোন সম্প্রদায় এক দলকে অন্য দলের দ্বিগুণ দেখেছে? আর আয়াতটিকে যারা ى –এর সাথে পাঠ করেন, তারা কি করে এ ব্যাখ্যায় উপনীত হলেন?

উত্তরে বলা হয়, এ ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যে দলটি অন্যদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখেছিল, তারা হলো মুসলমান সম্প্রদায়। মুসলমানরা কাফিরদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে মুসলমানদের নযরে কমিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে, তারা তাদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখেছিল। তারপর আবারো তাদেরকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে কমিয়ে ধরলেন। এবার তারা তাদেরকে নিজেদের সমসংখ্যক দেখলেন। যারা আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেন, তারা প্রমাণ স্বরূপ নিম্নের বর্ণনাটি পেশ করেন।

৬৬৮১. ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ বিষয়টি বদর যুদ্ধের দিন সংঘটিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন, যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় একবার আমি মুশরিকদের প্রতি তাকালাম। আমি তাদেরকে আমাদের দ্বিগুণ দেখলাম। এরপর আমি আবার তাদের প্রতি তাকালাম, এবার আমি তাদের মাঝে আমাদের চেয়ে একটি লোকও বেশী দেখলাম না। নিম্নোক্ত আয়াত (وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ (الانفال : ٤٤) যখন তোমরা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে, তখন তিনি তাদের সংখ্যা তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাচ্ছিলেন এবং তোমাদের সংখ্যাও তাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাচ্ছিলেন।) এর দ্বারাও একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে,

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায় ! মুসলমান ও কাফিরদের বিবদমান এ দু'টি দলের মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল বেশী এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তাদের তুলনায় কম। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতে ক্ষুদ্র দল নিজেদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে লাগল। একগুণ তো হলো তাদের নিজেদের সমপরিমাণ সৈন্য আর অপর গুণ হচ্ছে বর্ধিত সৈন্য–সামন্ত। تقليل (কমানো)–এর এটাও একটি অর্থ। এ সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি তাদের দৃষ্টিতে তাদের সংখ্যা নগণ্য করে দেখিয়েছেন। তবে تقليل –এর অপর একটি অর্থও আছে। ইব্‌ন মাসউদ (রা.) তাই বলেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের দৃষ্টিতে তাদেরকে সমপরিমাণ সংখ্যা দেখিয়েছেন, অতিরিক্ত সংখ্যা নয়। এ কথাই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে ইরশাদ করেছেন, وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً (স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পর সম্মুখীন হলে, তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখাচ্ছিলেন।)

অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যগণই কাফিরদেরকে নিজেদের তুলনায় দ্বিগুণ দেখছিল। তবে নিজেদেরকে যথাযথই দেখতে পাচ্ছিল। কম দেখছিল না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবী মদদের মাধ্যমে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। বিজয়ী করেছেন। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াত নাযিল করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ বিবদমান দু'টি দলের মধ্যে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, বদরে মুসলমানদের হাতে আল্লাহ্ কাফিরদের প্রতি যে আঘাত হেনেছেন, তারা যদি না মানে তবে তাদের প্রতিও এ শাস্তি আপতিত হবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৮২. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ –এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এ আয়াত বদর যুদ্ধের দিন দুঃখ–কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়। সেদিন মুজাহিদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ আর কাফিরদের সংখ্যা ছিল তাদের দ্বিগুণ। সেদিন মুশরিকদের সংখ্যা ছিল ছয়শ ছাব্বিশ। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের সাহায্য করলেন। এভাবেই তিনি মুসলমানগণের প্রতি বিষয়টিকে সহজ করে দিলেন।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুশরিকদের সংখ্যা ঐতিহাসিকগণের মতে যা বর্ণিত, এ বর্ণনা তার বিপরীত। কারণ দুই কারণে ঐতিহাসিকগণ তাদের সংখ্যা নিয়ে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন এক হাযার আর কেউ বলেন, তাদের সংখ্যা নয়শত হতে এক হাযারের মত ছিল। যারা এক হাযারের কথা বলেন, তারা প্রমাণ স্বরূপ নিম্নোক্ত বর্ণনা পেশ করেন ঃ

৬৬৮৩. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদর প্রান্তরের দিকে চললেন। ফলে মুশরিকদেরকে অতিক্রম করে আমরা বদর প্রান্তরে পৌঁছে গেলাম, তথায় আমরা দুই ব্যক্তিকে পেলাম। একজন কুরায়শী আর অপরজন হলো, উকবা ইব্ন আবূ মুঈতের আযাদ করা গোলাম। আমাদেরকে দেখে একজন পালিয়ে গেল। তবে উকবার আযাদকৃত গোলামকে আমরা ধরে ফেললাম। তারপর আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরায়শদের সংখ্যা কত? সে বলল, আল্লাহ্র কসম! তারা অনেক। তারা খুব শক্তিশালী। সে এ কথা বলার সময় মুসলমানগণ তাকে প্রহার করল। অবশেষে তাঁরা তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাদের সংখ্যা কত?" সে বলল, অনেক এবং তারা খুব শক্তিশালী। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার থেকে তাদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য খুবই চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে তা প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা দৈনিক কতটা উট যবাহ করে? সে বলল, প্রত্যহ দশটি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তা হলে তাদের সংখ্যা হবে এক হাযার।

৬৬৮৪. আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমরা তাদের অর্থাৎ মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে বন্দী করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের সংখ্যা কত? সে বলল, এক হাযার।

যারা বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল নয়শত থেকে এক হাযারের মত, তারা নিম্নের বর্ণনাসমূহ প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন ঃ

৬৬৮৫. উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খবর সংগ্রহ করার জন্য তাঁর একদল সাহাবীকে বদরের পানির দিকে প্রেরণ করলেন। তারপর তারা কুরায়শের কয়েকজন পানি সরবরাহকারীকে পেলেন। তাদের মধ্যে ছিল হাজ্জাজ গোত্রের গোলাম আসলাম, এবং বনী আসের গোলাম আবূ ইয়াসার। তারা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর নিকট নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সৈন্য সংখ্যা কত? সে বলল, অনেক। পুনরায় তিনি বললেন, তাদের সংখ্যা কত? তারা বলল, আমরা জানি না। তিনি বললেন, দৈনিক তোমরা কতটি উট যবাহ কর? তারা বলল, কোন দিন নয়টি আবার কোন দিন দশটি। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তাহলে এদের সংখ্যা হবে নয় শত থেকে এক হাজার।

৬৬৮৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সংখ্যা এক হাযার বা এর কাছাকাছি ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)–এর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের।

৬৬৮৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ.....رَأْىَ الْعَيْنِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের সংখ্যা মুসলমানদের কয়েকগুণ বেশী ছিল। এ যুদ্ধে এদের থেকে সত্তুর জন নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়।

৬৬৮৮. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াত বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ যুদ্ধে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শত পঞ্চাশ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর সাহাবিগণের সংখ্যা ছিল তিনশত তের।

৬৬৮৯. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবিগণের সংখ্যা ছিল তিন শত দশের চেয়েও অধিক। আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয় শত হতে এক হাযারের মত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত এ সমস্ত বর্ণনা ইব্‌ন আব্বাস (রা.)–এর বর্ণনার পরিপন্থী। তবে নয়শতের অধিক হওয়া যেহেতু রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত, তাই ইব্‌ন মাসউদ (রা.)–এর বর্ণনা মুতাবিক ব্যাখ্যা করাই সমধিক উত্তম।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সংখ্যা নয়শতের অধিক ছিল। তবে মুসলমানগণ তাদের যথাযথ সংখ্যা দেখেনি। বরং মুসলমানদের নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সংখ্যা মুসলমানদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। তারা বলেন, يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ –এর সম্বোধিত ব্যক্তি তারাই, যারা قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ –এর সম্বোধিত ব্যক্তি। অর্থাৎ তারা ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তবে পার্থক্য কেবল এই যে, قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ মধ্যম পুরুষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ –এর মধ্যে নাম পুরুষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ইয়াহূদীদের সামনে এবক্তব্য পেশ করার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বাক্যকে কখনো মধ্যম পুরুষ হিসাবে আবার কখনো নাম পুরুষ হিসাবে করাই উত্তম, যেমন حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ –এর মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

তারা বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, মুশরিকদের সংখ্যা তো মুসলমানদের তিনগুণ ছিল। তাতেও কিরূপে يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ বলা হলো? তাহলে আমরা বল্‌ব, দ্বিগুণের স্থলে তিনগুণ প্রকাশক শব্দ এবং তিনগুণের স্থলে দ্বিগুণ প্রকাশক শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষায় বিদ্যমান আছে। যেমন কোন ব্যক্তির নিকট একজন গোলাম আছে। তবে তার আরেকটি গোলাম প্রয়োজন। সে বলে, انا محتاج اليه الى مثله তারপর আবার বলে, احتاج الى مثليه । এসবের উদ্দেশ্য হলো, অনুরূপ আরেকটি গোলাম আমার প্রয়োজন এবং এর মত আরো দু'টি গোলাম আমার প্রয়োজন। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তির তিন হাযার টাকার প্রয়োজন, সে বলে, معى الف واحتاج الى مثليه এখানেও তিনগুণের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এখন যদি তার নিকট বিদ্যমান এক হাযারকেও مثل –এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়, তবে বিদ্যমান এক হাযার সহ আরো দুই হাযার মিলে তিন হাযারে পরিণত হবে। অনুরূপভাবে আরবী ভাষায়– اراكم مثلكم

اراكم ضعفكم - اراكم مثليكم এবং اراكم ضعفيكم বলা হয়। এসবগুলোর অর্থ হলো, আমি তোমাদেরকে তোমাদের তিনগুণ দেখতে পাচ্ছি।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এর যথাযথ অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে মুসলমানদেরকে তাদের দ্বিগুণ দেখিয়েছেন। তবে এ ব্যাখ্যা আল-কুরআনের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ অর্থঃ স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিলে, তখন তিনি তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন এবং তোমাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন। এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি উভয় দলকে অন্য দলের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক করে দেখিয়েছিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ অন্যান্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ আয়াতটিকে ترونهم - ت বর্ণের উপর পেশ দিয়ে পাঠ করেছেন। এ হিসাবে এর অর্থ হবে, يُرِيْكُمُوْهُمُ اللّٰهُ مِثْلَيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের দৃষ্টিতে তাদেরকে দ্বিগুণ করে দেখান।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা শব্দটিকে ى বর্ণের সাথে يرونهم পড়েন, তাদের কিরাআতই আমার নিকট অন্যান্য কিরাআত হতে অধিক বিশুদ্ধ। তখন আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, আর অপর দলটি হলো কাফির। তাদেরকে মুসসলমানগণ নিজেদের সংখ্যার দ্বিগুণ দেখে। এর কারণ ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত তাদেরকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। তাই তারা অনুরূপ অনুমান করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। এবার তারা তাদেরকে নিজেদের সংখ্যার সমপরিমাণ অনুমান করেছেন। এরপর তৃতীয় বার আবার আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সংখ্যাকে মুসলমানদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। এবার তারা তাদেরকে নিজেদের সংখ্যা হতে স্বল্প সংখ্যক বলে অনুমান করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৯০. আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন তাদেরকে আমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প সংখ্যক করে দেখান হলো। এমতাবস্থায় আমি আমার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি তাদেরকে সত্তুর সংখ্যক দেখতে পাচ্ছ? সে বলল, আমি তাদেরকে একশত দেখতে পাচ্ছি। তারপর আমরা তাদের একজনকে বন্দী করে এনে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের সংখ্যা কত ছিল? উত্তরে সে বলল, এক হাযার।

কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, তোমরা যদি তাদেরকে দেখতে, তাহলে তোমরা তাদেরকে তোমাদের দ্বিগুণ দেখতে।

৬৬৯১. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

এ উভয় বর্ণনা যা ইবন মাসউদ (রা.) থেকে আমি বর্ণনা করেছি, এর মধ্যে মুশরিকদের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানগণের মতপার্থক্যের কথাই প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এ সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যাপারটি বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছে। মুশরিকদের সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানগণের সংখ্যা

সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদ সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি মুসলমানদেরকে সহায়তা করবেন। অথচ ইয়াহুদীরা উভয় সম্প্রদায়ের আসল সংখ্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যেন তারা নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও শৌর্য–বীর্য দেখে ধোঁকা না খায় এবং যেন তারা ভীত হয় এ কারণে যে, মুশরিকদের অবাধ্যতার কারণে বদর প্রান্তরে যেমনিভাবে মহান আল্লাহ্ তাদেরকে মুসলমানগণের হাতে শাস্তি দিয়েছেন, তারাও যদি ঐ পথ অবলম্বন করে, তবে তাদেরকে ঠিক তদ্রূপ শাস্তি দেয়া হবে।

আল্লাহ্র বাণী ঃ رای العین –এর ব্যাখ্যাঃ رای শব্দটি رایته ক্রিয়ার مصدر (ধাতুমূল)।

যেমন বলা হয়, رایته رایا ورؤیة –আরো বলা হয় যে, رایت فی المنام رؤیا حسنة غیر مجراة । অনুরূপভাবে বলা হয়, هو منی رای العین – رای العین এ শব্দটিকে পেশ ও যবর উভয়ের সাথেই পড়া যায়। যেখানে আমার দৃষ্টি পতিত হয়, সে সম্পর্কে বলা যায়, هو من الرائی যখন কিছু লোক এমন স্থানে বসে যেখান হতে একে অন্যকে দেখতে পায়, তখন বলা হয়, والقوم راأو –। এ হিসাবে یرونهم –এর মানে হলো, তাদের দৃষ্টি তাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের চোখ তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ (অর্থ ঃ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।)

এ আয়াতে উল্লিখিত وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ বাক্যের অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন। একথাটি আরবদের কথা قد ایدت فلانا بکذا থেকে লওয়া হয়েছে। যখন কেউ কাউকে কিছু দ্বারা শক্তিশালী ও সাহায্য করে, তখন আরবগণ এ বাক্যটি প্রয়োগ করে। অনুরূপভাবে তারা বলে, فانا اؤیده تابیدا وفعلت منه ادته فانا ائیده ایدا ইত্যাদি। এর থেকেই লওয়া হয়েছে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ আয়াতটি। এখানে ذا الاید শব্দটি ذا القوة অর্থ শক্তিশালী অর্থাৎ ব্যবহৃত হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়! যুদ্ধে লিপ্ত এ দু'টি দলের মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। একটি দল যুদ্ধরত ছিল আল্লাহ্র পথে। আর অপর দলটি ছিল কাফির। মুসলমানগণ তাদেরকে চোখের দেখায় নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ দেখছিল। তারপর মুসলমানগণ সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে সুদৃঢ়, শক্তিশালী করলাম কাফিরদের উপর, যদিও তারা সংখ্যায় ছিল অনেক। ফলে, মুসলমানগণ কাফিরদের উপর জয়লাভ করে। এতে রয়েছে উপদেশ ও গভীর চিন্তার বিষয়। আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্যে শক্তিশালী করেন। তারপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, নিশ্চয়ই এতে অর্থাৎ উল্লিখিত লোকদের সাথে স্বল্প সংখ্যক মুসলমানকে অধিক সংখ্যক কাফিরের উপর বিজয় দান করে আমি যে সাহায্য করেছি, তাতে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশ রয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৯২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণীঃ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ ঘটনায় তাদের জন্য উপদেশ এবং চিন্তার খোরাক রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করেছেন।

৬৬৯৩. রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

নারী, সন্তান, সোনা, রূপা ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি

(١٤) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝

১৪. নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। এসব এ জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ্ তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়-স্থল।

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জন্য নারী, সন্তান ও উল্লিখিত যাবতীয় চিত্তাকর্ষক বস্তুর আসক্তি মনোরম করা হয়েছে। এর দ্বারা ইয়াহুদী সম্প্রদায় যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সত্যবাদিতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাঁর অনুসরণের উপর দুনিয়ার সামগ্রী ও নেতৃত্বের মায়াকে প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধমক দিয়েছেন।

৬৬৯৪. আবুল আশআছ হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৬৯৫. আবূ বাক্র ইব্ন হাফ্স ইব্ন উমর ইব্ন সা'দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ নাযিল হবার পর হযরত উমর (রা.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক। তুমিই এগুলোকে আমাদের জন্য মনোরম করে দিয়েছ। তখন নাযিল হলো قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (হে রাসূল। আপনি বলে দিন, আমি কি এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বস্তুর সংবাদ দেব? যারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে বেহেশতসমূহ, যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত)।

القناطير শব্দটি قنطار –এর বহুবচন। এর পরিমাণ নিয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, **قنطار** হলো, এক হাযার দুইশত উকিয়া। এক প্রকার স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৬৯৬. মুআয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হাযার দুইশত উকিয়ায় এক **قنطار** হয়।

৬৬৯৭. মুআয (রা.) থেকে অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

৬৬৯৮. ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হাযার দুইশত উকিয়ায় এক কিন্তার।

৬৬৯৯. আসিম ইব্ন আবিন নুজূদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হাযার দুই শত উকিয়ায় এক কিনতার।

৬৭০০. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬৭০১. উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এক হাযার দুইশত উকিয়ায় এক 'কিনতার'।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এক হাযার দুইশত দীনারে এক 'কিনতার'।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭০২. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, এক হাযার দুই শত দীনারে এক কিনতার।

৬৭০৩. হযরত হাসান (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হাযার দুইশত দীনারে এক কিনতার।

৬৭০৪. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,'এক হাযার দুইশত দীনারে এক কিনতার এবং এক হাযার দুইশত মিসকাল রৌপ্যে এক কিনতার।

৬৭০৫. দাহহাক ইব্ন মুযাহিম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, القناطيرالمقنطرة। মানে অনেক সোনা–রূপা। স্বর্ণ মুদ্রার এক হাযার দুইশত দীনার ও রৌপ্য মুদ্রার বার শত মিসকালে এক কিনতার।

কেউ কেউ বলেন, 'এক হাযার দুইশত দিরহাম অথবা এক হাযার দীনারে এক কিনতার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭০৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হাযার দুইশত দিরহাম বা এক হাযার দীনারে এক কিনতার হয়।

৬৭০৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হাযার দীনার বা এক হাযার দুইশত দিরহামে এক কিন্তার।

৬৭০৮. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন বার হাযারে এক কিন্তার।

৬৭০৯. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন বার হাযারে এক কিন্তার হয়।

৬৭১০. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বার হাযারে এক কিন্তার হয়।

৬৭১১. হাসান (র.) থেকে অপর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৭১২. হাসান (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দিয়াতের সমপরিমান এক হাজার দীনারে এক কিন্তার।

কেউ কেউ বলেছেন, কিন্‌তার হল, আশি হাযার দিরহাম অথবা একশত রিতল (এক রিতল সমান সাতছটাক) এর সমপরিমান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭১৩. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশি হাযারে এক কিন্‌তার।

৬৭১৪. সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। অপর সূত্রে তিনি বলেন, আশি হাযারে এক কিন্‌তার।

৬৭১৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বলতাম, একশত রিতল স্বর্ণ–মুদ্রা বা আশি হাযার রৌপ্য মদ্রায় এক কিন্‌তার হয়।

৬৭১৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একশত রিতল স্বর্ণমুদ্রা বা আমি হাজার দিরহামে এক কিন্‌তার হয়।

৬৭১৭. আবূ সালিহ্‌ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একশত রিত্‌লে এক কিন্‌তার হয়।

৬৭১৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একশত রিতলে এক কিন্‌তার হয়। আর তা হচ্ছে আট হাযার মিসকালের সমপরিমাণ।

কেউ কেউ বলেন, সত্তর হাযারে এক কিনতার।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭১৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্‌ পাকের বাণীঃ اَلْقَنَاطِيْرُ الْمُقَنْطَرَةِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, সত্তুর হাযার দীনারে এক কিন্‌তার।

৬৭২০. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৭২১. আতা–আল খুরাসানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) কিন্‌তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবার পর উত্তরে তিনি বললেন, সত্তুর হাযারে এক কিনতার হয়।

কারো কারো মতে, কিনতার হলো, একটি গরুর চামড়া ভর্তি স্বর্ণ।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭২২. আবূ নায্‌রা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গরুর চামড়া ভর্তি স্বর্ণ হলো এক কিন্‌তার।

৬৭২৩. আবূ নায্‌রা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক গরুর চামড়া ভর্তি স্বর্ণ হলো এক কিন্‌তার।

কারো কারো মতে অধিক মালকে কিনতার বলা হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭২৪. রবী' ইব্‌ন আনাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَلْقَنَاطِيْرُ الْمُقَنْطَرَةِ –এর মানে হচ্ছে=অধিক মাল। যেগুলোর কতক অংশ অন্য কতক অংশের তুলনায় অধিক। কোন কোন আলিম

আরবদের ভাবধারা উল্লেখ করে বলেন যে, আরবরা কিন্‌তার শব্দটিকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ওযনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করত না। তবে তাঁরা বলত, এটা একটা পরিমাপের নাম। ইমাম তাবারী (র) বলেন, এমনটি হওয়াই অধিক সমীচীন। কেননা, যদি এর পরিমাণ নির্ধারিত হতো, তবে পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকরদের মাঝে এ ধরনের মতবিরোধ কখনো হতো না। সুতরাং আমার মতে এ কথা বলাই যথাযথ মনে হচ্ছে যে, قنطار মানে অধিক মাল। যেমন বলেছেন রবী' ইব্‌ন আনাস (র.)। আর এর কোন পরিমাণও নির্দিষ্ট নয়। উপরোল্লিখিত বর্ণনার প্রেক্ষিতে তাফসীরকারগণ যা বলেছেন, তা তো সকলের সামনেই পরিষ্কার। مقنطرة মানে مضعفه অর্থাৎ কয়েকগুণ। ধরে নেয়া যেতে পারে যে, قناطير হচ্ছে কিনতারের তিনগুণ। আর مقنطرة হচ্ছে নয়গুণ। যেমন রবী' ইব্‌ন আনাস (র.) বলেছেন, القناطيرالمقنطرة মানে হলো, অনেক মাল, যার কিয়দংশ অপর অংশের তুলনায় অধিক। হাদীসেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬৭২৫. কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বর্ণ রৌপ্যের সম্পদকে القناطيرالمقنطرة বলা হয়। আর مقنطرة মানে হলো, এমন বহু পরিমাণ মাল, যার কিয়দংশ অপর অংশের তুলনায় অধিক।

৬৭২৬. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি القناطيرالمقنطرة -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে হচ্ছে সোনা-রূপা জাতীয় প্রচুর সম্পদ।

কারো কারো মতে, المقنطرة অর্থসীল মোহরকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭২৭. সুদ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি المقنطرة -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সীল মোহরকৃত দিরহাম ও দীনারসমূহ। وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا -এর অনুরূপ ব্যাখ্যা নবী করীম (সা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। এ বর্ণনা যদি সহীহ্ হয়, তবে এটাই যথেষ্ট।

৬৭২৮. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, قِنْطَارٌ -এর পরিমাণ হলো দু'হাযার।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ (চিহ্নিত অশ্বরাজি)-এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, المسومة -এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, المسومة -এর মানে الراعية অর্থাৎ বিচরণ করে আহারকারী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭২৯. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি الخليل المسومة -এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিচরণ করে আহারকারী অশ্বরাজি।

৬৭৩০. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৭৩১. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৭৩২. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর মানে বিচরণ করে আহারকারী অশ্বরাজি।

৬৭৩৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আব্যা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর মানে মাঠে বিচরণশীল অশ্বরাজি।

৬৭৩৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخيل المسومة –এর মানে মাঠে বিচরণশীল অশ্বরাজি।

৬৭৩৫. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخيل المسومة –এর মানে মাঠে বিচরণশীল অশ্বরাজি।

৬৭৩৬. রবী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخيل المسومة –এর মানে মাঠে বিচরণশীল অশ্বরাজি।

৬৭৩৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, এর মানে মাঠে বিচরণশীল অশ্বরাজি।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন, المسومة অর্থ সুন্দর ঘোড়া।

৬৭৩৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, المسومة –এর অর্থ হলো–সুন্দর ঘোড়া।

৬৭৩৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি الخيل المسومة –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে, সুন্দর ঘোড়া।

৬৭৪০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি الخيل المسومة –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ সুন্দর উত্তম ঘোড়া।

৬৭৪১. মুজাহিদ (রা.) থেকেও অনুরূপ আরেকটি বর্ণনা রয়েছে।

৬৭৪২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর মানে সুন্দর ঘোড়া।

৬৭৪৩. বশীর ইব্ন আবী আমর খাওলানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخيل المسومة সম্পর্কে আমি ইকরামা (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর অর্থ সুন্দর ঘোড়া।

৬৭৪৪. বশীর ইব্ন আবী আমর খাওলানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমি ইকরামা (রা.)–কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সুন্দর ঘোড়া।

৬৭৪৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخيل المسومة–এর মানে সুন্দর বাহাদুর ঘোড়া। এ সনদে আম্র ইব্ন হাম্মাদের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ মাঠে বিচরণশালী অশ্বরাজি।

অন্যান্য তাফসীরকার বলেছেন, الخيل المسومة –এর অর্থ চিহ্নিত অশ্বরাজি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৪৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الخيل المسومة এর অর্থ, চিহ্নিত অশ্বরাজি।

৬৭৪৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি الخيل المسومة –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ, চিহ্নিত অশ্বরাজি। এদের বিশেষ নিদর্শন হলো, এদের চিহ্নসমূহ।

৬৭৪৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এর মানে ঐ সমস্ত ঘোড়া, যাদের কপালে সাদা চিহ্ন আছে।

কারো কারো মতে, المسومة অর্থ, ঐ অশ্বরাজি যা জিহাদের জন্য তৈরী রাখা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৪৯· ইব্‌ন যায়দ (র.) বলেন, الخيل المسومة মানে, ঐ সব অশ্ব, যা জিহাদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, الخيل المسومة –এর বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হলো, উত্তম ও সুন্দর আকৃতিসম্পন্ন চিহ্নিত অশ্বরাজি। কেননা, আরবী ভাষায় تسويم বলা হয় اعلام (ঘোষণা দেয়া)–কে। আর সন্দুর ঘোড়াও যেহেতু নিজ উত্তম রং ও উত্তম আকৃতির বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে নিজ সৌন্দর্যের কথা ঘোষণা করে, তাই এগুলোকে الخيل المسومة বলা হয়। আরব কাব্যেও এ ধরনের ব্যবহার বিদ্যমান আছে। যুবইয়ান গোত্রের নাবিগা নামক মহিলা কবি ঘোড়ার প্রশংসা করে বলেছেনঃ

بِضُمْرٍ كَالقِدَاحِ مُسَوَّمَاتٍ عَلَيْهَا مَعْشَرٌ اَشْبَاهُ جِنّ

এখানে مسومات শব্দটি معلمات অর্থাৎ চিহ্নিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে লবীদের কবিতায় আছে ঃ وَغَدَاةَ قَاعِ الْقُرْنَتَيْنِ اَتَيْنَهُمْ * زُجَلاً يَلُوحُ خِلاَ لَهَا التَّسْوِيْمُ الشويم

التسويم শব্দটি এখানেও اعلام– এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম তাবারী (র.) বলেন ঃ مسومة– এর ব্যাখ্যায় المعلمة–المطهة এবং الرائعة বলা একই কথা। তবে যারা বলেন, এর অর্থ হচ্ছে الراعية তাদের মতে এশব্দটি اَسَمْتُ الْمَاشِيَةَ فَاَنَا اَسُمِيْهَا اِسَامَةً থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আরববাসী এ বাক্যটি ঐ সময় প্রয়োগ করেন, যখন ঘোড়া তৃণ–লতা ইত্যাদি আহার করে। অনুরূপ ব্যবহার কুরআন মজীদেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ (তা থেকে উদ্ভিদ জন্মায় যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। ১৬ ঃ ১০)

আখতালের কবিতার মধ্যেও আলোচ্য শব্দের অনুরূপ ব্যবহার পাওয়া যায় ঃ

مِثْلَ ابْنِ بَزْعَةَ اَوْ كَآخَرَ مِثْلِهِ * اَوْلَى لَكَ ابْنَ مُسِيْمَةَ الْاَجْمَالِ

এর মানে راعية الاجمال । মাঠে বিচরণকারী পশু বুঝাতে হলে তারা বলে, سامت الماشية سوماً –। এ কারণেই বলা হয়, ابل سائمة অর্থাৎ راعية –। তবে এর ব্যবহার আরবদের মধ্যে প্রসিদ্ধ নয়। سومتُ الماشية –এর মানে اَرْعَيْتُهَا –আমি তা চরিয়েছি। اسمتها –এর অর্থে ব্যবহৃত হলে আলোচ্য শব্দের অর্থ এই হবে। উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে مسومة –এর চিহ্নিত এ কথা বলাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইব্‌ন যায়দের বর্ণনার আলোকে مسومة –এর অর্থ المعدة فى سبيل الله যদি বলা হয় তবে এর সঠিক অর্থ হবে না।

وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ (গবাদিপশু এবং ক্ষেত–খামার) –এর ব্যাখ্যা ঃ

نعم-انعام –এরবহু বচন। এর মধ্যে আট প্রকার পশু শামিল রয়েছে, যা আল্‌ কুরআনে অন্যত্র বর্ণিত রয়েছে। যথা মেষ, ছাগল, গরু ও উট ইত্যাদি। اَلْحَرْثِ –এর মানে হলো, ক্ষেত–খামার। এ হিসাবে

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, নারী, সন্তান ইত্যাদি গবাদি পশু ও ক্ষেত-খামারের আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে।

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (এ সব পার্থিব জীবনের সামগ্রী। আর আল্লাহ্ পাকের নিকটেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।)-এর ব্যাখ্যা ঃ

ذالك শব্দটি اسم اشاره -। এর দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত সমুদয় বিষয়াদি তথা নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ذلك শব্দটি বহু অর্থবোধক বিভিন্ন বস্তুর উপর ব্যবহৃত হয় এবং এর দ্বারা বহু বস্তুকে বুঝান হয়।

مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, এ সব কিছু পার্থিব ভোগ্য সামগ্রী। অর্থাৎ এগুলো জীবিত লোকদের জীবনোপকরণ এবং নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরা করার উপায়। পার্থিব জগতে এগুলোর আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। তবে এগুলো পরকালে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপকরণ নয়। হ্যাঁ, যদি এগুলোকে আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় ব্যবহার করা হয়, এগুলোও পরকালে কাজে আসবে।

وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ অর্থ আর আল্লাহ্ পাকের নিকটই উত্তম আশ্রয়স্থল।

৬৭৫০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, حُسْنُ الْمَاٰبِ অর্থ, উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থল। আর তা হলো জান্নাত।

مَاٰبٌ শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল) مفعل -এর ওযনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কেউ প্রত্যাবর্তন করলে বলা হয়, اب الرجل الينا فهو يؤب ايابًا واوبةً وابيةً ومابًا (লোকটি আমাদের নিকট ফিরে এলো।) এ শব্দটিতে واو -এর পূর্বে যবর থাকার কারণে তা الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে এর عين كلمة (মধ্য অক্ষর) الف হয়েছে। কেননা, الف যবরকে চায়। محال - معاد - ماب ইত্যাদি শব্দগুলো مفعل -এর মত ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর عين كلمة (মধ্যাক্ষর)-এর حركة -কে فاء كلمة (প্রথমাক্ষর)-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ফলে এর واو বা ياء - الف -এ পরিণত হয়েছে এদের পূর্বে যবর থাকার কারণে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মহান আল্লাহ্র নিকট তো মর্মন্তুদ শাস্তিও রয়েছে এতদসত্ত্বেও কেমন করে বলা হলো। وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (আর মহান আল্লাহ্র নিকটই রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থল)। তবে এর উত্তরে বলা হবে, এ সুসংবাদ এক বিশেষ গুণের অধিকারী মানুষের জন্য। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যারা আল্লাহ্ পাককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে মহান আল্লাহ্র নিকট উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থল। পরবর্তী আয়াতে এ উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থলেরই বিবরণ পেশ করা হয়েছে।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, উত্তম প্রতাবর্তন-স্থল কি, এ সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তবে এর উত্তরে বলা হবে যে, তা হলো, ঐ জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে এবং তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী ও তারা অর্জন করবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি।

জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বর্ণনা

(١٥) قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

১৫. বল, আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু হতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী এবং আল্লাহ্র নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এখানে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ হে মুহাম্মাদ (সা.)! নারী, সন্তান এবং আয়াতে বর্ণিত অন্যান্য বিষয়াদির আসক্তি যাদের নিকট মনোরম করা হয়েছে, আপনি তাদেরকে বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উৎকৃষ্টতর বস্তুর সংবাদ দিব? অর্থাৎ নারী, সন্তান, সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং পার্থিব জগতে রকমারি ভোগ-সম্পদের আসক্তি যাদের নিকট মনোরম করা হয়েছে, এ সমস্ত বিষয় হতেও উৎকৃষ্টতর বস্তু সম্পর্কে আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব?

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত حرف استفهام তথা প্রশ্নবোধক শব্দটির শেষ সীমানা কোথায়, এ নিয়ে আরবী ভাষাবিদগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেন, مِنْ ذَالِكُمْ হলো এর শেষ সীমানা। এরপর হতে যাঁরা তাদের প্রতিপালককে ভয় করেন, তাঁদের সম্পর্কে নতুন করে সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কারো কারো মতে, এর শেষ সীমা হলো, لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا আর এ কারণেই جَنّٰتٌ শব্দটিকে পেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, خَالِدِيْنَ فِيْهَا শব্দটিতে যবর হওয়া এখানে বাঞ্ছনীয় لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا -এর অর্থ হলো, যারা আল্লাহ্ কর্তৃক আরোপিত ফরযসমূহ আদায় করে এবং পাপ কার্য হতে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর আনুগত্য করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবহমান। جَنَّاتٌ মানে উদ্যান। পূর্বে আমি এ সম্পর্কে প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা করেছি। تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -এর মানে হচ্ছে, বৃক্ষ্যরাজির পাদদেশে নদী প্রবহমান। জান্নাতে স্থায়ী হওয়ার মানে হচ্ছে, তথায় মানুষ চিরঞ্জীব হবে, জান্নাতের পবিত্র সঙ্গিনী হলো, ঐ সমস্ত জান্নাতী মহিলা, যারা মল-মূত্র ও অপবিত্র তথা পার্থিব জগতের হায়েয-নিফাস, শুক্রবিন্দু ও পেশাব ইত্যাদি হতে পবিত্র হবে। পূর্বে এ সম্পর্কে আমি আলোকপাত করেছি। এখানে এর পুনঃ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ -এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। رضوان শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল)। যেমন বলা হয়, رضى الله عن فلان فهو يرضى عنه رضا ۔ ورِضوانا ورُضوانا ومرضاة এ- শব্দটি হচ্ছে ناقص واوى - رُضوان (راء-এর মধ্যে ضمة -এর সাথে)-ও ব্যবহৃত হয়। এ ব্যবহার-বিধি কায়স গোত্রের লোকজন অবহিত। হযরত আসিম (র.) এভাবেই পাঠ করতেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য যে উৎকৃষ্টতর পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি। কারণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই জান্নাতী লোকদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৫১. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জান্নাতী লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ বস্তু আমি তোমাদেরকে দান করব কি? তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক ! এর চেয়েও উৎকৃষ্ট বস্তু আবার কি? তিনি বলবেন, তা হচ্ছে আমার সন্তুষ্টি।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ –এর ব্যাখ্যাঃ

যে আল্লাহ্কে ভয় করে, তাঁর আনুগত্য করে এবং মুত্তাকী লোকদের জন্য আল্লাহ্ যা তৈরি করে রেখেছেন, এগুলোকে যারা নারী, সন্তান এবং পার্থিব ভোগ্য বিষয়বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক সম্যক দ্রষ্টা। অনুরূপভাবে তিনি সম্যক দ্রষ্টা ঐ লোকদের প্রতিও, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে না, বরং আল্লাহ্র নাফরমানী করে, শয়তানের আনুগত্য করে এবং নারী, সন্তান ও তাদের নিকটস্থ পার্থিব ধন-দৌলতকে আল্লাহ্ প্রদত্ত নিআমতের উপর প্রাধান্য দেয়। আল্লাহ্ উভয় দল সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। তাই তিনি তাদের সকলকে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনের পর প্রতিদান দিবেন। অর্থাৎ নেককার বান্দাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন এবং পাপী লোকদেরকে শাস্তি দেবেন।

(١٦) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

১৬. যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান এনেছি ; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, হে নবী (সা.) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উৎকৃষ্টতর বিষয়ের সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।

تركيب –এর দিক থেকে اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ –এর মাঝে দুই প্রকারের সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় اَلَّذِيْنَ –কে যদি প্রথম اَلَّذِيْنَ থেকে بدل সাব্যস্ত করা হয়, তবে এর মধ্যে اعراب হবে جر -। আর مبتداء হওয়ার ভিত্তিতে এর মধ্যে اعراب পেশ رفع ও হতে পারে। তবে مبتداء –এর কারণে رفع ঐ সময় হবে, যখন অপর আয়াতের প্রারম্ভে এ বিষয়াদির আলোচনা করা হয়, যা প্রথমোক্ত اَلَّذِيْنَ –এর مصداق হতে ভিন্নতর। আল-কুরআনের অন্যত্রও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ তারপর উক্ত আয়াতের পরপরই উল্লেখ রয়েছে, اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ -। এখানে যের দেয়াও বৈধ।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا –এর মানে, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আপনার প্রতি, আপনার দীনের প্রতি এবং আপনার দেয়া বিধানের প্রতি ঈমান এনেছি। কাজেই আমাদের পাপসমূহকে ঢেকে দিন, দোযখের আযাব থেকে আমাদেরকে নাজাত দিন।

এখানে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিশেষ ভাবে দু'আ করা হয়েছে। এর কারণ, যাকে জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে রাখা হবে, সে-ই হবে সফলকাম।

قِنَا শব্দটি وَقَى اللّٰهُ فُلَانًا থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ আয়াতাংশের অর্থঃ আল্লাহ্ তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এ ধরনের বিষয়ে কেউ যদি কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে বলে قِنِى كذا –।

(١٧) اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং ঊষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।

اَلصَّابِرِيْنَ –এর মানে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে তারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে।

اَلصَّادِقِيْنَ –এর অর্থ যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল (সা.) এবং তাঁর প্রতি যা নাযিল হয়েছে, সে বিষয়ে ঈমান আনে এবং আল্লাহ্-রাসূলের বিধি-নিষেধ মুতাবিক আমল করে।

اَلْقَانِتِيْنَ –এর অর্থ, যারা মহান আল্লাহ্‌র অনুগত। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের প্রত্যেকটি শব্দ সম্পর্কে আমি পূর্বেই প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই পুনরায় এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। কাতাদা (র.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশদ আলোচনা করেছেন।

৬৭৫২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالْقَانِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَلصَّادِقِيْنَ ঐ সমস্ত লোক, যারা মুখে ঈমানের কথা স্বীকার করে, অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, গোপন ও প্রকাশ্যে সে ঈমানের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপিত করে।

اَلصَّابِرِيْنَ ধৈর্যশীল, অর্থাৎ যারা মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ব্যাপারে অটল থেকে বিভিন্ন অবৈধ কাজ পরিত্যাগ করে পরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন।

اَلْقَانِتُوْنَ যারা মহান আল্লাহ্‌র পুরাপুরি অনুগত।

اَلْمُنْفِقُوْنَ যারা নিজেদের মালের যাকাত আদায় করে এবং মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত খাতে তা প্রদান করে। যারা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে নিজেদের মাল অকাতরে ব্যয় করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اَلصَّابِرِيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ শব্দগুলো اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ –এর থেকে بدل হওয়ার ভিত্তিতে যের যুক্ত হয়েছে। আর এগুলোতে যের দিয়ে পাঠ করা এ কথাই প্রমাণ করে যে, اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ শব্দটিও যের দিয়ে পাঠ করা হয়েছে لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ –এর থেকে بدل হওয়ার ভিত্তিতে।

রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থীর বর্ণনা وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমাপ্রার্থী) –এর ব্যাখ্যা ঃ

কারা উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, তারা হলো, রাতের শেষ প্রহরে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৫৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো রাতের শেষ প্রহরে সালাত আদায়কারী।

৬৭৫৪. কাতাদা (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো ঐসমস্ত লোক, যারা রাতের শেষ প্রহরে সালাত আদায় করে।

অন্যান্য তাফসীরকারের মতে তারা হলো, ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৫৫. হাতিব (র.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন শেষ রাতে মসজিদের কোণে কোন এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম যে, হে আমার প্রতিপালক ! তুমি যা নির্দেশ দিয়েছ, তা অকাতরে পালন করেছি। এ তো রাতের শেষ প্রহর। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। তারপর তাকিয়ে দেখি যে, তিনি ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)।

৬৭৫৬. নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইব্‌ন উমর (রা.) রাত জেগে সালাত আদায় করতেন। তারপর নাফি' (র.)–কে জিজ্ঞেস করতেন, হে নাফি! আমরা রাতের শেষ প্রহরে পৌঁছেছি কি? যদি নাফি নেতিবাচক জবাব দিতেন, তবে তিনি পুনরায় সালাতে মশগুল হয়ে যেতেন। আর যদি ইতিবাচক জবাব দিতেন, তবে তিনি বসে দু'আ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হতেন। আর এমনিভাবেই তার সকাল হতো।

৬৭৫৭. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে সত্তরবার ইস্তিগফার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৬৭৫৮. জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে রাতের শেষাংশে সত্তরবার ইস্তিগফার করবে, তার নাম اَلْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ –রাতের শেষ প্রহরে প্রার্থনাকারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে।

অন্যান্য তাফসীরকারের মতে اَلْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যারা ফজরের জামাআতে হাযির হয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৫৯. ইয়াকূব ইব্‌ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি যায়দ ইব্‌ন আসলামকে জিজ্ঞেস করলাম, রাতের শেষ প্রহরে প্রার্থনাকারী কারা? উত্তরে তিনি বললেন, যারা ফজরের জামাআতে হাযির হয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اَلْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ –এর বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হলো, তারা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট এ মর্মে রাতের শেষ প্রহরে দু'আ করে যে, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে লজ্জাকর পরিস্থিতি হতে বাঁচিয়ে রাখেন।

اسحار – سحر শব্দের বহুবচন। আলোচ্য আয়াতের প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে, যারা রাতের শেষ প্রহরে প্রার্থনা করে। তবে আয়াতের অর্থ এ–ও হতে পারে যে, তারা আমল ও সালাতের মাধ্যমে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করে থাকে। তবে দু'আ ও প্রার্থনার অর্থেই শব্দটি অধিক প্রসিদ্ধ। ইসলামই আল্লাহ্ নিকট একমাত্র দীন।

(১৮) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই; ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানিগণও ইলাহ্ আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই। অনুরূপভাবে ফেরেশতা ও জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দেন।

আরবী تركيب অনুসারে اَلْمَلٰٓئِكَةُ শব্দটি معطوف এবং الله শব্দটি হলো معطوف عليه । আর اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ – شَهِدَ –এর مفعول হওয়ার ভিত্তিতে منصوب হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেছেন ঃ বসরাবাসী কতিপয় ব্যাখ্যাকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, شَهِدَ اللّٰهُ মানে, قضى الله অর্থাৎ আল্লাহ্ ফয়সালা করেন। তারা اَلْمَلٰٓئِكَةُ শব্দটিকে এ মর্মে পেশ দেন যে, তখন এর অর্থ দাঁড়াবে, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানিগণ সাক্ষ্য দেয়।

অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ –কে شَهِدَ ক্রিয়ার معمول সাব্যস্ত করে اَنَّ –এর الف এ যবর পড়েন। এবং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –এর الف –কে নতুন বাক্য হিসাবে যের পড়েন। পরবর্তীকালের কিছু কিরাআত বিশেষজ্ঞ উভয় আয়াতের الف –ই যবর যুক্ত পড়েন। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হলো। মহান আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই এবং তিনি এও সাক্ষ্য দেন যে, ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন। তাঁরা বলেন, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –কে اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ –এর উপর عطف করা হয়েছে। তারপর عطف–এর واؤ –কে উহ্য রেখে শব্দ থেকে حذف করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা এ দাবীর সমর্থনে ইবন আব্বাস (রা.) ও ইবন মাসঊদ (রা.)–এর পাঠপদ্ধতি পেশ করেন। ইবন আব্বাস (রা.) اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ – اَنَّهٗ –এর –তে যের এবং اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ –এর اَنَّ তে যবর পড়েন। তাঁর যুক্তি, اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ হলো, جملة معترضعه – اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ হল شَهِدَ ক্রিয়ার معمول । ইবন মাসঊদ (রা.) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –কে شَهِدَ – فعل এর معمول হিসাবে যবরসহ পড়েন এবং اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

–কে নতুন বাক্য হিসাবে যেরসহ পড়েন। তাঁর যুক্তি أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ বাক্যটি شَهِدَ–فعل–معمول এবং إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ হলো নতুন আয়াত। কারো কারো মতে, যদি উভয় আয়াতে الف –এর মধ্যে যবর দেয়া হয়, তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও ইব্‌ন মাসউদ (রা.) উভয়ের পাঠ পদ্ধতিতে সমন্বয় সাধিত হয়। তবে এ পাঠরীতি অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞের পাঠরীতির পরিপন্থী। এ ব্যাপারে কোন শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণনা বিদ্যমান নেই। তাই এ পাঠ পদ্ধতি ঠিক নয়। তবে সহীহ্ ও বিশুদ্ধ পাঠ পদ্ধতি হলো, أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ –এর الف –এ যবর পড়া এবং إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ –এর الف –এ যের পড়া। এ পাঠ পদ্ধতি অনুসারে إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ নতুন আয়াত হিসাবে গণ্য হবে। অবশ্য إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ –এর الف –এ যবর পড়ার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সুদ্দী (র.) থেকে একটি বর্ণনা রয়েছে।

৬৭৬০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ ..... لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা, ফেরেশ্‌তাকুল এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দেন যে, ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন। এ ব্যাখ্যা অনুপাতে বুঝা যায় যে, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ –এর عامل হলো شَهِدَ । উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ –এর মাঝে দুই রকম পাঠ পদ্ধতি বৈধ হতে পারে।

এক ঃ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ –এর الف টি منصوب (যবর) হবে এ হিসাবে যে, أَنَّ পদটি এখানে শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হলো, তিনি একক। এ ব্যাখ্যা অনুসারে এখানকার যবর বিশিষ্ট الف টি কোন কোন আরবী ভাষাবিদের মতে জের –এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর কারো কারো মতে যবরের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ আলোচনার দ্বারা এ কথাই প্রতিভাত হয় যে, شَهِدَ ক্রিয়া দ্বিতীয় أَنَّ –এর عامل , প্রথমটির মধ্যে নয়। এ ব্যাখ্যা মত আয়াতটি এমন হলো যেন তুমি বললে, شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন। কেননা, কথা দুটো মূলত একই। আর এক হওয়ার কারণেই তা অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ان এর الف –এ فتحة (যবর) হবে।

দুই ঃ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ –এর الف –এ যের হবে। তখন এ বাক্যটি নতুন একটি বাক্য হবে। কেননা, এটা جملهمعترضه । আর شَهِدَ শব্দটি عامل হয়েছে إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ –এর মধ্যে। তাই এখানকার الف টি হবে, যবর বিশিষ্ট। তখন আয়াতের অর্থ হবে, شَهِدَ اللّٰهُ فَإِنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلٰئِكَةُ أَنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ । যেমন বলা হয় যে, أَشْهَدُ فَإِنِّي مُحِقٌّ أَنَّكَ مما تعاب به برى –এখানে فَانِي مُحِقٌّ শব্দটি جملةمعترضه হিসাবে এর الف টি যের বিশিষ্ট হয়েছে। আর انك مما تعاب –কে اشهد –এর معمول হিসাবে ان –এর মধ্যে যবর দেয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ قَائِمًا بِالْقِسْطِ –এর মানে হলো, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে আদল ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন। القسط অর্থ ন্যায় ও সুবিচার। যেমন বলা হয়, هومقسط তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক। যদি কেউ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বলা হয়, قداقسط।

বসরাবাসী ইল্‌মে নাহুর কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, قَائِمًا بِالْقِسْطِ শব্দটি لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ –এর هو থেকে حال হয়েছে। কূফাবাসী ইলমে নাহুর কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন, এ শব্দটি شَهِدَ اللّٰهُ –এর اللّٰهُ শব্দ থেকে حال হয়েছে। অর্থাৎ সুবিচার প্রতিষ্ঠাকারী আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই। বর্ণিত আছে যে, বাক্যটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)–এর পাঠরীতি অনুসারে নিম্নরূপ, وَاُولُوا الْعِلْمِ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ ছিল। তারপর القائم থেকে الف ولام –কে ফেলে দেয়া হয়েছে। ফলে তা نَكِرَة (অনির্দিষ্ট) হয়ে যায়। তবে এ শব্দটি যেহেতু এখানে معرفة (নির্দিষ্ট) –এর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই তাতে نصب (যবর) দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, শব্দটির বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা হলো ঐ ব্যাখ্যা, যারা বলেন যে, এ শব্দটি اللّٰهُ শব্দের বিশেষণ হিসাবে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, اَلْمَلٰئِكَةُ وَاُولِى الْعِلْمِ –কে اللّٰهُ শব্দের উপরই عطف করা হয়েছে। তাই اللّٰهُ শব্দ থেকে তা حال সাব্যস্ত করাই উত্তম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –এর মানে, এক আল্লাহ্ যাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই । তিনি ব্যতীত আর কেউ মাবূদ হবার উপযুক্ত নয়। العزيز –এর অর্থ, তিনি এমন পরাক্রমশালী, যাঁর ইচ্ছাকে কেউ রোধ করতে পারে না এবং তিনি যদি কাউকে শাস্তি দেন বা কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, তবে তার থেকে প্রতিকার গ্রহণ করার মতও কোন সত্তা নেই। الحكيم অর্থ, প্রজ্ঞাময়। যাঁর পরিচালনায় কোন ত্রুটি নেই।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)–এর নবূওয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বিতর্ককারী খৃস্টান সম্প্রদায় এবং আল্লাহ্‌র সাথে শরীক নির্ধারণকারী ও আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করে অন্য কাউকে মাবূদরূপে গ্রহণকারী মুশরিক সম্প্রদায়ের অহেতুক বক্তব্যকে খন্ডন করেছেন এবং উক্ত লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, সমস্ত কিছুর তিনিই স্রষ্টা এবং কাফির ও মুশরিকদের মনগড়া মাবূদদেরও রব তিনিই। এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাক নিজেও সাক্ষ্য দেন এবং সাক্ষ্য দেন ফেরেশতা ও তাঁর বান্দাগণের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানীগুণী। সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন নিজের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য এবং মুশরিকদের আরোপিত অপবাদসমূহ থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করার জন্য। এ বিষয়টি এমন, যেমন আল্লাহ্ পাক মানুষকে আদব শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজেদের কাজকর্মের ক্ষেত্রে প্রথমত তার নাম নিয়ে আরম্ভ করার হুকুম দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের সাক্ষ্য সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। তাই তিনি প্রথমে নিজের কথা এবং পরে ফেরেশতা ও জ্ঞানিগণের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি তাদেরকে জানিয়েছেন যে, ফেরেশতা পূজারী মুশরিক, যারা ফেরেশতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আরো অন্যান্য অনেকেই করে আর আলিম সম্প্রদায় তাদের প্রতিষ্ঠিত কুফ্‌র ও শিরকী কার্যক্রমকে অপসন্দ করে এবং অপসন্দ করে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের মতামত ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদেরকে মাবূদরূপে গ্রহণকারী লোকদের মতামতকে, এসব কথা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন যে, ফেরেশতা ও জ্ঞানী লোকেরা সকলেই এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই এবং মহান আল্লাহ্‌কে বর্জন করে

অন্যদেরকে মাবূদ রূপে গ্রহণকারী মিথ্যাবাদী। এ আয়াত হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নবী করীম (সা.)-এর সাথে বিতর্ককারী নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ।

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ যেমনিভাবে جملة معترضه আয়াতাংশ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
خُمُسَهُ -এর মধ্যে বিদ্যমান فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ আয়াতাংশ جملة معترضه ।

এখানে মহান আল্লাহ্‌র নামের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্‌র নামের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে এবং নিজ সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে নিজের স্তুতি ও গুণাবলী প্রকাশ করার মাধ্যমে তিনি অন্যদের মাবূদ হওয়ার বিষয়টি রদ করে দিয়েছেন এবং মুশরিকদের মিথ্যাবাদী হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার বর্ণনা করে দিয়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, যারা বলেন, شَهِدَ মানে قضى তাদের এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ, এ ধরনের ব্যাখ্যা আরব-অনারব কোন অভিধানে নেই। কেননা, شهد এবং قضى উভয়ের অর্থ ভিন্নরূপ। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি যা বলেছি متقدمين তথা পূর্ববর্তী কোন কোন আলিম হতেও তা বর্ণিত আছে।

৬৭৬১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নাজরানের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মতামতের বিপক্ষে আল্লাহ্ পাক সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই এবং ফেরেশতা ও জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত।

৬৭৬২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, القسط অর্থ العدل অর্থাৎ ইনসাফ।

ইসলাম আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন

মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(১৯) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৯. ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসবার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর, কেউ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখান করলে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

এ ক্ষেত্রে দীন শব্দের অর্থ আনুগত্য ও বিনয়। যেমন কবি বলেছেনঃ

وَيَوْمُ الْحَزْنِ اِذْ حَشَرَتْ مَعَدٌّ * وَكَانَ النَّاسُ اِلَّا نَحْنُ دِيْنًا

এখানে দীন শব্দটি বিনয়ের সাথে আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে কবি কাত্তামীর কবিতার মধ্যেও দীন শব্দটিকে বিনয়ের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, كَانَتْ نَوَارُ تَدِيْنُكَ الْاَدْيَانَا

এ পংক্তিতে تدينك শব্দটি ذلل (বিনয়ের)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে আ'শা মায়মূন ইব্‌ন কায়স -এর কবিতায় রয়েছে যে, هُوَدَانَ الرِّبَابَ اِذْكَرِهُوا الدِّيْنَ دِرَاكًا بِغَزْوَةٍ وَصِيَالِ

কবিতায় বর্ণিত دَانَ শব্দের অর্থ ও ذلك الدين অর্থ الطاعة অর্থাৎ বিনয় ও আনুগত্য। الاسلام মানে বিনয় ও নম্রতার সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা। এর মূল হতে ক্রিয়াপদ اسلم –এর অর্থ হলো, সে ইসলামে প্রবেশ করেছে। যেমন বলা হয়, اَقْحَطَ الْقَوْمُ অর্থাৎ তারা অভাব–অনটনে পতিত হয়েছে। আরো বলা হয়, اَرْبَعُوْا –তারা বসন্তকালে প্রবেশ করেছে। অনুরূপভাবে اسلموا মানে হলো, তারা ইসলামে প্রবেশ করেছে। ইসলাম হলো, বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা। এ হিসাবে اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –এর ব্যাখ্যা হলো, যথাযথ আনুগত্য একমাত্র তাঁরই জন্য, মুখে স্বীকার করা এবং অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস করা। বিনয়ের সাথে তাঁর ইবাদত করা। আর তাঁর আদেশ–নিষেধ পালনের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করা। তাঁর সামনে বিনয়াবনত হওয়া। আত্মম্ভরিতা নয় এবং আল্লাহ্–বিমুখতাও নয়। সর্বোপরি তাঁর ইবাদতে কাউকে ও শরীক না বানানো। একদল মুফাস্সির আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় তাই বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৬৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইসলাম হলো, সাক্ষ্য দেয়া যে, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত বিধানসমূহের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করা। এটিই হলো মহান আল্লাহ্র দীন। এ দীন সহকারেই তিনি তাঁর রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওয়ালীগণকে এর দিকেই তিনি পথ–নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ছাড়া আর কোন ধর্মমত মহান আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা কোন কাজেও আসবে না।

৬৭৬৪. আবুল আলিয়া (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, الاسلام –এর অর্থ হলো, এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করা, নামায কায়েম করা, যাকাত দান করা এবং ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা।

৬৭৬৫. ইবন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণীঃ اَسْلَمْنَا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে, আমরা লড়াই বর্জন করে শান্তিতে প্রবেশ করেছি।

৬৭৬৬. মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর মানে, হে রাসূল ! আপনি বলুন, মহান আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস আপনার পক্ষ হতে নয় বরং এ দাওয়াত আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত শাশ্বত দাওয়াত।

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ (যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতবিরোধ ঘটিয়েছিল।)

আলোচ্য আয়াতের কিতাব শব্দ দ্বারা ইনজীল কিতাবকে বুঝান হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কেও খৃষ্টান কর্তৃক মহান আল্লাহ্র প্রতি আরোপিত অপবাদসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে চরম মতবিরোধ ঘটেছে এবং এ কারণেই তারা একে অন্যের থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অবশেষে একে অন্যের রক্তপাত ঘটানোকেও বৈধ ভাবতে আরম্ভ করেছে। তাদের এ পারস্পরিক মতবিরোধ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর বিদ্বেষবশত সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ হককে জানার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। এমনকি তাদের ইয়াকীন ছিল যে, অপবাদমূলক তারা যা বলছে, তা একেবারেই বাতিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রতি এ মর্মে ঘোষণা করেছেন যে, তারা যা বলছে, তা একেবারেই বাতিল এবং তাদের বক্তব্য পরিষ্কার কুফ্রীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের এহেন বক্তব্য অজ্ঞতার কারণে নয় বরং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে একথা বলছে এবং ক্ষমতা, নেতৃত্ব, বাদশাহীর লোভ ও পরস্পর বিদ্বেষবশত তারা এরূপ মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে।

৬৭৬৭. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আবুল আলিয়া (র.) বলেছেন, তারা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে কিতাব ও ইল্‌ম আসার পর। بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ –এর মানে দুনিয়া কামনায় এবং রাজত্ব ও ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষবশত মতবিরোধ করেছে। অবশেষে তারা একে অন্যকে হত্যা করেছে। অথচ তারা ছিল সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তি।

৬৭৬৮. ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِمَا جَاۤءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ এ আয়াত অধিক তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেন, তাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ হয়েছিল, দুনিয়া হাসিলের জন্য এবং নেতৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জনের জন্য। তিনি এও বলতেন যে, মহান আল্লাহ্র শপথ ! আমাদের যা কর্তব্য আমরা তার উপর আমল করেছি। কাজেই যে তোমাদের পরে এ পৃথিবীতে আসবে, সে মহান আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাতের উপর আমল করবে। আমরা তো পূর্বেই এর উপর আমল করেছি।

৬৭৬৯. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ.) মৃত্যুমুখে পতিত অবস্থায় বনী ইসরাঈলের সত্তর জন আলিমকে নিজের কাছে ডেকে আনলেন এবং তিনি তাদের প্রতি তাওরাত হিফাযতের দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। তিনি তাদেরকে তাওরাত হিফাযতের ব্যাপারে আমীন (আমানতদার) নির্ধারণ করলেন। প্রত্যেককে এক এক অংশের দায়িত্বভার প্রদান করলেন। বিদায়কালে হযরত মূসা (আ.) ইউশা ইব্ন নূন (আ.)–কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োজিত করে যান। হযরত মূসা (আ.)–এর ইন্তিকালের পর এক যুগ, দুই যুগ এবং তিন যুগ অতিবাহিত হলে তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। অথচ যে সত্তর জনকে কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তারা ছিল ঐ সত্তর জনেরই বংশধর। অবশেষে তাদের মাঝে অন্যায় রক্তপাতের সূচনা হয় এবং পরস্পর কলহ–দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। তাদের দ্বন্দ্বের মূলে ছিল পার্থিব জগতের ক্ষমতা, রাজত্ব ও ধন–ভান্ডার হাসিল করার অশুভ মোহ। এ কারণে আল্লাহ্ পাক জালিম বাদশাহ্কে তাদের উপর চাপিয়ে দেন এবং ঘোষণা করেন যে, ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র দীন। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা।

রবী' ইব্ন আনাস (রা.) বলেন, এতে বুঝা যায় যে, اُوْتُوا الْكِتٰبَ –এর দ্বারা বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে, খৃষ্টান সম্প্রদায় নয় । কিন্তু অন্যরা বলেন, اُوْتُوا الْكِتٰبَ দ্বারা ইনজীল কিতাবপ্রাপ্ত খৃষ্টান সম্প্রদায়কে বুঝান হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৬৭৭০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবীদের নিকট আল্লাহ্ একক, তাঁর কোন শরীক নেই এ সংবাদ আসার পরও তারা বিদ্বেষবশত পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছে। আর এ কিতাবী লোকগুলো হলো, খৃস্টান সম্প্রদায়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (আর যে মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে অবিশ্বাস করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ পাক হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানী ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য যে নিদর্শনাবলী ও দলীল–প্রমাণাদি প্রদান করেছেন, এগুলোকে যারা অস্বীকার করে, তিনি তাদের হিসাব অতি সত্বর গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে যে যা আমল করবে, আল্লাহ্ পাক তা হিসাব করে রাখবেন। তারপর পরকালে তিনি তাদের প্রতিদান দিবেন। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অতি সত্বর তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা অতি সত্বর হিসাব গ্রহণ করবেন এর মানে, আল্লাহ্ তা'আলা সকলের আমলকে সংরক্ষণ করেন। এতে মানুষের মত অঙ্গুলি দিয়ে গণনা করার তাঁর প্রয়োজন হয় না এবং হৃদয়ের সাহায্যের তাঁর দরকার হয় না। সাহায্য–সহযোগিতা এবং কোন প্রকার কষ্ট ব্যতিরেকেই তিনি এগুলোর সংরক্ষণ করতে সক্ষম। মুজাহিদ (র.) থেকেও سَرِيعُ الْحِسَابِ – এর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

৬৭৭১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্যায় আচরণসমূহের হিসাব অতি সত্বর গ্রহণ করবেন।

৬৭৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আমলগুলো সংরক্ষণ করেন।

(২০) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ○

২০. যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে আপনি বলুন আমি আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারিগণও। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বলুন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয় তারা সুপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন যে, হে রাসূল! নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায় যদি আপনার সাথে ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হতে চায়, তবে

তাঁরা আপনার সাথে বাতিল ও অন্যায় পদ্ধতিতে বিতর্ক করবে। তাই আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমি আমার অন্তর, মুখ এবং সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ মহান আল্লাহ্র প্রতি সমর্পণ করে দিয়েছে। আলোচ্য আয়াতে وجه অর্থাৎ মুখমন্ডলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ, মুখমন্ডল হলো, মানব সন্তানের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানী। কাজেই, মুখমন্ডল যখন কোন কিছুর সামনে আত্মসমর্পণ করে, তখন অবশিষ্ট অঙ্গ–প্রত্যঙ্গসমূহও তার সম্মানার্থে নিজেকে সমর্পিত করে দেবে।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَمَنِ اتَّبَعَنِ –এর মানে হচ্ছে, আমার অনুসারিগণও আত্মসমর্পণ করেছে। আলোচ্য আয়াতে مَن শব্দটিকে أسلمت –এর تاء –এর উপর عطف করা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৭৩. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَاِنْ حَاجُّوكَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যখন বাতিল পদ্ধতিতে তথা خلقنا – فعلنا – جعلنا ও امرنا ইত্যাদি বলে আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে (এতো বাতিল পদ্ধতি। তবে হক কোন্‌টি তারা তা জানে) তখন আপনি তাদেরকে বলে দিবেন, আমি তো আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারিগণও।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا (আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদেরকেও নিরক্ষরদেরকে বলুন, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে।) –এর ব্যাখ্যা ঃ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে, হে রাসূল ! ইয়াহুদ ও খৃস্টানদের কিতাবধারী লোকদেরকে এবং আরবের মুশরিক সম্প্রদায়, যাদের কোন কিতাব দেয়া হয়নি এ ধরনের লোকদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করুন। তোমরা কি মহান আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করছ এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র সাথে তোমরা যাদেরকে শরীক করছ, তাদেরকে বর্জন করে বিশ্ব–জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য ইবাদত ও দাসত্বকে একনিষ্ঠ করে নিয়েছ? অথচ তোমরা জান যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবূদ নেই। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের উপর দৃঢ় ঈমান রাখে এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করে, তবে তারা পথ পাবে। অর্থাৎ তারা হক ও সত্যের সন্ধান পাবে এবং হিদায়াতের পথে চলতে সক্ষম হবে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, اسلمتم প্রশ্নবোধক বাক্যের পর কেমন করে فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا তথা ইতিবাচক বাক্য ব্যবহার করা হলো? আরবী সাহিত্যে কি هل تقوم فان تقم اكرمك এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা বৈধ? এর জবাবে বলা হবে যে, আরবী ভাষায় এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করা বৈধ। যদি استفهام –কে امر তথা আদেশসূচক ক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ‐ (৫ : ৯১)। আয়াত বাহ্যিকভাবে প্রশ্নবোধক হলেও এখানে তা انتهوا তথা আদেশসূচক ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)–এর সাথীদের বিষয়ে ইরশাদ করেছেন, তারা মারইয়াম–তনয় হযরত ঈসা (আ.)–কে বলেছিলেন يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ

يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا ئِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ (٥ : ١١٢) এখানেও প্রশ্নবোধক আয়াতটিন আদেশসূচক আয়াত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, বলা হয়, هَلْ اَنْتَ كَافٍ عنا অর্থাৎ اكفف عنا। আরো বলা হয়, اين اين। এর অর্থ হচ্ছে اقسم فلاتبرح অর্থাৎ দাঁড়াও, যাবে না। একারণেই استفهام-কে امر-এর অর্থে ব্যবহার করা বৈধ, যেমন আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর কিরাআত অনুসারে আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ (٦١ : ١٠-١١) هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -এর জবাবে امنوا বলা বৈধ। এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যকে আদেশসূচক বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি আমাদের পঠনরীতিতে خبر হিসাবে পাঠ করা হয়েছে। আমাদের এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর পাঠ পদ্ধতি অনুসারে هَلْ اَدُلُّكُمْ -এই প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাব হলো, اٰمِنُوْا। (امر -এর صيغه -এর সাথে)। কেননা, এটিই হলো এর সঠিক ব্যাখ্যা। কোন কোন তাফসীরকার আমাদের ন্যায় ব্যাখ্যা করেছেন।

৬৭৭৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, اميين বা নিরক্ষর ঐসব লোক, যাদেরকে কোন কিতাব প্রদান করা হয়নি।

৬৭৭৫. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيِّنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, اميين বা নিরক্ষর ঐসব লোক, যারা লিখতে সক্ষম নয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ অর্থ ঃ আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, আপনি তাদেরকে যে ইসলাম ও বিশ্ব-প্রতিপালকের একত্ববাদের দিকে আহবান করছেন, তারা যদি এ আহবানে সাড়া না দেয়, তবে আপনি তো শুধু আমার রাসূল, আমার বাণী পৌঁছে দেয়াই আপনার কাজ। যে পয়গাম দিয়ে আপনাকে আমি আমার সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছি, তা পৌঁছান ব্যতীত আপনার অন্য কোন দায়িত্ব নেই। আপনার করণীয় তো কেবল আমার দেয়া আমানত আদায় করা। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের মধ্যে কার ইবাদতকে গ্রহণ করবেন এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। অবহিত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে ইসলাম গ্রহণ করে না ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়।

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

২১. যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করে, অন্যায়রূপে নবীগণকে হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়-পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও প্রমাণসমূহকে অবিশ্বাস এবং এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা হলো তাওরাত ও ইনজীলের ধারক কিতাবী সম্প্রদায়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৭৬. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। বলেন, তিনি ইয়াহূদ ও নাসারাদেরকে একত্রিত করলেন এবং তাদের সম্প্রদায় ধর্মের মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার পর তিলাওয়াত করলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ...... اِلٰى قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ তারপর মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ অর্থঃ তারা রাসূলগণকে হত্যা করত, যাদেরকে তাদের নিকট প্রেরণ করা হতো, ঐ অন্যায় হতে নিষেধাজ্ঞা বাণীসহ যে অন্যায় তারা করত এবং যে নাফরমানীতে তারা লিপ্ত হতো। যেমন হযরত যাকারিয়া (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) এবং অনুরূপ আরো বহু পয়গাম্বর।

মহান আল্লাহর বাণীঃ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ (অর্থঃ এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদের কে হত্যা করে।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ এ আয়াতের পাঠ পদ্ধতিতে একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। মদীনা, হিজায, বসরা, কূফা এবং অধিকাংশ শহরের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ –এর يَقْتُلُوْنَ শব্দটিকে (قتل) হত্যার অর্থে পড়েছেন। পরবর্তীকালের কূফাবাসী কতিপয় আলিম يُقَاتِلُوْنَ অর্থাৎ قِتَالٌ –এর অর্থে পড়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)–এর পাঠরীতি হলো এর মূল ভিত্তি। তাদের দাবী আবদুল্লাহ্ (রা.)–এর মাসহাফে রয়েছে وَقَاتَلُوْا তবে এ সব পাঠরীতির মধ্যে বিশুদ্ধতম পাঠরীতি হলো। ঐ পাঠরীতি যাঁরা يَقْتُلُوْنَ পড়েন। কেননা, এ ব্যাপারে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের ইজমা সংগঠিত হয়েছে। অধিকন্তু এটিই আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৭৭. মা'কাল ইব্ন আবূ মিসকীন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈলের নিকট যখন ওহী আসত, তখন তারা এর দ্বারা লোকদেরকে উপদেশ দিত। তবে তখনো তাদের নিকট যেহেতু কিতাব আসত না, তাই তারা আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামকে হত্যা করত। অনুরূপভাবে আম্বিয়া আলায়হিমুস্ সালামের অনুসারিগণের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে লোকদেরকে উপদেশ দিত এ কারণে তাদেরকে হত্যা করত। মূলত তারাই হলো, ঐসব লোক, যারা ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে লোকদেরকে নির্দেশ দিত।

৬৭৭৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ছিলেন নবীগণের অনুসারী দল। তারা লোকদেরকে মন্দ কাজে বাধা দিত এবং লোকদেরকে উপদেশ দিত, তাই তাদেরকে হত্যা করা হতো।

৬৭৭৯. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বনী ইসরাঈলের যারা নিরক্ষর

লোক ছিল, তাদের নিকট ওহী আসার পর তারা যখন নিজ সম্প্রদায়কে এ ব্যাপারে উপদেশ দিত, তখন তারা উপদেশদাতা লোকদেরকে হত্যা করে দিত। তারাই হলো ঐ সম্প্রদায়, যারা লোকদেরকে ইনসাফ কায়েমের আদেশ দিত।

৬৭৮০. আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) ! কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে কার? উত্তরে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা এমন কোন লোককে হত্যা করেছে যে, সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ দিত এবং অন্যায় ও অসত্য হতে বিরত রাখত। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ -

তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, হে আবূ উবায়দা ! শোন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় দিনের প্রথম প্রহরে একই সময়ে ৪৩ জন নবীকে হত্যা করেছিল। তারপর বনী ইসরাঈলের গোলামদের থেকে ১১২ জন লোক এর প্রতিবাদ করল এবং হত্যাকারী লোকদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিল এবং অসৎ কাজে বাধা দিল। তারপর তারা উপদেশদাতা সমস্ত লোকদেরকে সেদিনই দিনের শেষ প্রহরে হত্যা করে দিল। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথাই আলোচনা করেছেন। এ হিসাবে আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা করে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং হত্যা করে ঐ সমস্ত উপদেশ, দাতা ব্যক্তিগণ, যারা তাদের ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় এবং নবীগণকে হত্যা করা ও পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ –এর ব্যাখ্যা : হে রাসূল। আপনি তাদেরকে বলে দিন এবং জানিয়ে দিন যে, আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

(٢٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ٥

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলী ইহকাল ও পরকালে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

–এর মানে, যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে উপেক্ষা করে ইহকাল ও পরকালে তাদের কার্যাবলী নিষ্ফল হয়ে যাবে। দুনিয়াতে নিষ্ফল হবার অর্থ হলো, তারা ভ্রান্ত ও বাতিল হবার কারণে লোকজন তাদের কর্মের কোন প্রশংসা বা তারীফ করবে না এবং আল্লাহ্ও তাদের মর্যাদা বা খ্যাতি দান করবেন না। বরং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করবেন এবং নবীগণের উপর কিতাব অবতীর্ণ করতে নবীগণের মুখে তাদের গোপন বদ আমলের কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিবেন। ফলে দুনিয়াতে তাদের কেবল

দুর্নামই বাকী থেকে যাবে। ইহকালে এভাবেই তাদের কার্যক্রম নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর পরকালে নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবার মানে আল্লাহ্ পাক পরকালে তাদের জন্য শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। শাস্তির বিবরণ কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি ঘোষণা করেছেন, সেদিন তাদের কার্যক্রম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং এর বিনিময়ে তারা কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাককে অস্বীকার করা অবস্থায় তারা এ আমল করেছে। তাই তাদের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ وَمَا لَهُمْ مِّنْ النَّاصِرِيْنَ -এর মর্মার্থ হলো, এসব মানুষের কোন সাহায্যকারী নেই। তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ্ পাক যখন শাস্তি দেবেন, তা থেকে অব্যাহতি দেবার কেউ নেই।

(٢٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে আসমানী কিতাবের কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছিল, তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কিতাবের প্রতি আহবান করা হয়েছিল যেন তা তাদের মধ্যে সে কিতাব মীমাংসা করে দেয়, তারপর একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।

ইমাম আবূ জাফর (র) তাবারী বলেন, এখানে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, হে রাসূল! যাদের কিতাবের কিয়দংশ প্রদান করা হয়েছে আপনি কি তাদের দেখেন না? তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহবান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ তে বর্ণিত" "الكتاب" থেকে কোন্ কিতাব উদ্দেশ্য তা নিরূপণে মুফাস্সিরগণের একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে কিতাব বলতে তাওরাতকে বুঝান হয়েছে। এ কিতাবের বিধানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্যই তাদেরকে আহবান করা হয়েছে। অথচ এ কিতাব রহিতকরণের পূর্বে এর প্রতি এবং এর বিধানের সত্যতায় তারা স্বীকৃতি প্রদান করত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৮১. ইব্ন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহুদীদের শিক্ষাগারে একদল ইয়াহুদীর নিকট গমন করলেন। তারপর তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন। তখন নুআয়ম ইব্ন আম্র এবং হারিছ ইব্ন যায়দ তাঁকে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কোন্ দীনের অনুসারী? উত্তরে তিনি বললেন, ইবরাহীম (আ.)-এর মিল্লাত ও তার দীনের আমি অনুসারী। এ কথা শুনে তারা বলল, হযরত ইবরাহীম (আ.) ইয়াহুদী ধর্মের লোক ছিলেন। তারপর নবী (সা.) বললেন, তাহলে তাওরাত নিয়ে এসো তাওরাত আমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে দিবে। এতে তারা অস্বীকৃতি প্রকাশ করল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ - وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

৬৭৮২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইয়াহূদীদের একটি পাঠাগারে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীস الى التوراة –এর পরিবর্তে هلما الى التوراة বর্ণিত আছে। এতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ দুই ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল করেন اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ বিষয়বস্তুর দিকে থেকে এ হাদীস কুরায়বের হাদীসের সাথে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আলোচ্য আয়াতে কিতাব বলে কুরআন মজীদকেই বুঝান হয়েছে। যা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) –এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে। সেদিকেই একদল ইয়াহূদীকে আহবান করা হয়েছিল তাদের মাঝে সঠিক মীমাংসা করার জন্য। কিন্তু তারা অস্বীকৃতি প্রকাশ করে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৮৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হলো, আল্লাহ্র দুশমন ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তাদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য তাদেরকে মহান আল্লাহ্র কিতাব এবং তার নবী (সা.)–এর প্রতি আহবান করা হয়েছিল যার উল্লেখ রয়েছে। তাদের নিকটস্থ কিতাব তাওরাত এবং ইনজীলে। তারপর তারা এর থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যায়।

৬৭৮৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা ছিল ইয়াহূদী সম্প্রদায়। তাদেরকে মহান আল্লাহ্র কিতাব এবং তার নবীর প্রতি আহবান করা হয়েছিল, যার উল্লেখ রয়েছে তাদের কাছে রক্ষিত কিতাবে। এতদ্সত্ত্বেও তারা এর থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে যায়।

৬৭৮৫. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিতাবী লোকেরা নিজেদের বিবাদ ও ইসলামের দণ্ড বিধানের জন্য লোকদেরকে কিতাবের দিকে আহবান করত। আর নবী করীম (সা.) তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করতেন। কিন্তু তারা এর থেকে বিমুখ হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যে সকল মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। আমার মতে এ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে উত্তম ব্যাখ্যা হলো এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একদল ইয়াহূদী সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন। যারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)–এর জীবদ্দশায় তাঁর মুহাজির সাহাবা কিরামের মাঝে ছিল তাদেরকে মহান আল্লাহ্র কিতাব তাওরাতের দিকে আহবান করা হলো, তারা পাঠ করত। তাদের ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার জন্য। তাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসার জন্য তাওরাতের বিধানের প্রতি আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু এ আহবানে তারা সাড়া দেয়নি। বিবাদের বিষয়টি কি ছিল? এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। হতে পারে তাদের এ বিবাদ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর নবূওয়াত সম্পর্কে। হতে পারে এ বিবাদ ছিল, হযরত ইব্রাহীম

(আ.) ও তাঁর দীন সম্পর্কে আর এমনও হতে পারে, তাদের এ বিবাদ ছিল, ইসলামকে মেনে নেয়া সম্পর্কে। এও হতে পারে তাদের এ বিবাদ ছিল দন্ডবিধান সম্পর্কে। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে এসব বিষয়েই তাদের বিবাদ ছিল। তারপর তাদেরকে তাওরাতের বিধান মেনে নেয়ার জন্য আহবান করা হলে তারা এ আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, অবাধ্যকে এবং কোন্ বিষয়ে তারা অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে, এ ব্যাপারে আয়াতে সুস্পষ্ট কোন বিবরণ নেই। তাই বলা যায়, তারা অমুক লোক, অমুক নয়। এ কারণে এ বিষয়টি জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, আয়াতের অর্থ যে বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়েছে, সে বিষয়ের প্রতি সাড়া দেয়া তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল। কিন্তু তারা সে ডাকে সাড়া দেয়নি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কিতাবে বর্ণিত যেসব বিষয়ের উপর আমল করার ব্যাপারে তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এগুলোর প্রতি তাদের অস্বীকৃতির কথা বর্ণনা করে এ কথাই ঘোষণা করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)–এর সময়কালের লোকেরা মূসা (আ.) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিধানকে যেমনিভাবে উপেক্ষা করেছে, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সমসাময়িক লোকেরাও যেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সত্যের দাওয়াতকে উপেক্ষা করে পিছনে ফেলে না দেয়। অথচ হযরত মূসা (আ.)–এর সমসাময়িক লোকেরা ঐ কিতাব পাঠ করত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ –এর মানে, যে কিতাবের বিধান অনুসরণ করার জন্য তাদেরকে আহবান করা হতো, এর সত্যতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তারা তা উপেক্ষা করত। কিতাব বলে তাওরাতকে বুঝান হয়েছে। এ কথা বলার কারণ হলো, তারা কুরআন মজীদকে অস্বীকার করত এবং তাদের ধারণা অনুসারে তারা তাওরাতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করত। তাই তারা যাকে স্বীকৃতি দিত, তা আবার অস্বীকার করা তাদের স্বতিরোধিতারই নামান্তর এবং এ ভূমিকাই তাদের নিজেদের বিপক্ষে প্রমাণ হতে পারে। যে কুরআন মজীদকে তাওরাতের মাধ্যমে স্বীকার করা হয়েছে, তা পরবর্তীতে মিথ্যা জ্ঞান করা, তাদের বিরুদ্ধে জোরদার প্রমাণ। তাদের অভিযোগ চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে।

(٢٤) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৪. তা এ কারণে যে, তারা বলে থাকে, নির্ধারিত কয়েকটি দিন ব্যতীত আমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে না। বস্তুত ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে এসব মনগড়া কথা প্রবঞ্চিত করেছে।

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে বিতর্কিত বিষয়ে সঠিক মীমাংসা করার জন্য যাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহবান করা হয়েছিল, তারা তাওরাতের সঠিক বিধানের প্রতি সাড়া দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাদের এহেন আচরণের মূল কারণ হলোঃ তারা বলে, দিনকতক ব্যতীত আমাদেরকে অগ্নি স্পর্শ করবে না। তা হলো ৪০দিন। যে দিনগুলোতে তারা গো–বাছুর পূজা করেছিল। তারা নিজেদের দীন সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করার কারণে তারা প্রবঞ্চিত হয়ে বলে তারপর আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। দীনের ব্যাপারে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন হলো তাদের

মিথ্যা দাবী অর্থাৎ তাদের এ কথা বলা যে, আমরা আল্লাহ্র সন্তান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পূর্ব–পুরুষ ইয়াকূব (আ.)–এর সাথে এমর্মে অঙ্গীকার করেছেন যে, শপথ হতে মুক্তি লাভের সময় ব্যতিরেকে তিনি তার সন্তানদের কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন না। এসব উক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেঃ তাঁরা নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–কে এ মর্মে জানিয়ে দেন যে, তারা হলো, জাহান্নামী এবং তথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। তবে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং ঈমান এনেছে তাঁর নিয়ে আসা বিধানসমূহের উপর, তারা জাহান্নামী নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৮৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা বলে, কসম হতে মুক্তির সম পরিমাণ সময় ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। যে সময় আমরা গো-বৎস পূজা করেছি। তারপর আমাদের থেকে আযাব বন্ধ হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ অর্থাৎ দীন সম্বন্ধে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন অর্থাৎ তাদের কথা ঃ "আমরা আল্লাহ্র সন্তান এবং আমরা আল্লাহ্র বন্ধু" ইত্যাদি তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে।

৬৭৮৭. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণী ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহান্নামে আমাদেরকে মাত্র চল্লিশ দিন শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ এই দাবী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ছিল। কাতাদা (র.)–ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সে দিনগুলো হচ্ছে ঐসব দিন যখন আমরা গো-বৎস পূজা করেছি। তাদের এ দাবী খন্ডন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, দীন সম্বন্ধে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তথা তাদের কথা, "আমরা আল্লাহ্র সন্তান, আমরা আল্লাহ্র প্রিয়জন" ইত্যাদি তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে।

৬৭৮৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্র বাণীঃ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদেরকে তাদের কথা "দিন কতক ব্যতীত অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না" প্রবঞ্চিত করেছে।

(٢٥) فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৫. কিন্তু সেদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই, তাদের কি অবস্থা হবে? যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব এবং প্রত্যেককে তার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবেনা।

অর্থাৎ যেদিন আমি তাদেরকে একত্র করব, সেদিন এসব লোকের কি অবস্থা হবে? যারা এসব কথা বলেছে এবং যারা মহান আল্লাহ্র কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এই আচরণ করেছে। তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে প্রবঞ্চিত হয়েছে ও তার প্রতি মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এতে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে রয়েছে। তাদের জন্য ধমক ও সতর্কবাণী।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ –এর মানে, যে দিন তারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি ও আযাবের সম্মুখীন হবে, সেদিনের অবস্থা তাদের কত ভয়াবহ হবে। সেদিন তাদেরকে একত্র করে প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী পূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি বিধান করব। তখন কারো প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না। কেননা, কাউকে অন্যায়ের অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না এবং আমলের পরিপন্থী কাউকে পাকড়াও করা হবে না। ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে উত্তম পুরস্কার দেয়া হবে এবং মন্দ লোকদেরকে মন্দা পুরস্কার দেয়া হবে। কোন অবিচার ও ক্ষতির কারো কোন আশংকা নেই।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে এখানে فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ فِىْ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ না বলে فَكَيْفَ বলা হলো কেন? উত্তরে বলা হবে এখানে لام ও فِىْ –এর অর্থের মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। আর তা হলো এই যে, আলোচ্য আয়াতে যদি لام –এর ক্ষেত্রে فى পদটি ব্যবহৃত হতো, তবে আয়াতের অর্থ হতো فَكَيْف اِذَا جَمَعْنٰهُمْ فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَاذَا يَكُوْنُ لَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ وَالْعِقَابِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে যখন আমি তাদের একত্র করব, তখন কেমন শাস্তি আর আযাব আপতিত হবে তাদের উপর। এ অর্থটি لام যুক্ত অর্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা, لام যুক্ত হলে আয়াতের অর্থ হবে, فكيف اذا جمعناهم لما يحدث فى يوم لا ريب فيه ولما يكون فى ذالك اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه ماذا لهم حينئذ من العقاب واليم العذاب – অর্থাৎ যেদিন আমি তাদেরকে সন্দেহাতীত দিনে একত্র করব, সেদিনে উদ্ভাবিত অবস্থার কারণে এবং বিচারকার্য বিলম্বিত হবার জন্য তাদের অবস্থা কিরূপ হবে? কেমন হবে সেদিন তাদের আযাব ও শাস্তি? ليوم لاريب فيه শব্দটি لام যুক্ত হওয়া অবস্থায় এর মধ্যে থাকবে কাজের নিয়্যত ও অভীষ্ট বস্তুর সংবাদ, যাকে لام থাকার কারণে শব্দ হতে ফেলে দিয়ে নিয়্যতের মধ্যে বাকী রাখা হয়েছে। يوم –এর সাথে فِى সংযুক্তির মাঝে এ ফায়দাটি হাসিল হয় না। এ কারণেই এখানে فى ব্যবহার না করে। لام ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ليوم لاريب فيه

لاريب فيه –এর অর্থ হলো, এর আগমন ও সংঘটিত হবার ব্যাপারে কোন সংশয় এবং সন্দেহ নেই। পূর্বে এ সম্পর্কে যৌক্তিকভাবে প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে এর পুনরল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَوُفِّيَتْ –এর অর্থ হলো, মানুষ ভাল–মন্দ যা আমল করেছে মহান আল্লাহ্ এর পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিদান দিবেন এবং তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কোন নেককার ব্যক্তির নেকের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং কোন অপরাধীকে অপরাধ ব্যতীত শাস্তি দেয়া হবে না।

(٢٦) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

২৬. হে রাসূল! আপনি বলুন, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা নিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা ইযযত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে৷ নিশ্চয় আপনি সকলের বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

قُلِ اللّٰهُمَّ এর ব্যাখ্যা হলো, হে মুহাম্মাদ (সা.)–আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! اَللّٰهُمَّ শব্দের ميم –এ যবর–এর কারণ কি? এ বিষয়টি নিরূপণের ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কেননা, اَللّٰهُمَّ শব্দটি হলো منادى । আর নিয়ম আছে যে, منادى যখন مفرد হয় مضاف না হয়, তখন এর মধ্যে পেশ হয়। অনুরূপভাবে اَللّٰهُمَّ শব্দটি তো মূলত اَللّٰهُ ছিল। এর মধ্যে কোন ميم ছিল না, এর শেষে ميم আসলো কোথা থেকে এ নিয়েও আরবী ভাষাবিদদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

তাঁদের কেউ কেউ বলেন, প্রথমত اَللّٰهُ শব্দের সাথে দুই ميم যুক্ত করা হয়েছে। তারপর এক ميم –কে অন্য ميم এ– ادغام করে اَللّٰهُمَّ বানান হয়েছে। তবে الف ও لام বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে حرف نداء–ياء হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। যেমন তা ব্যবহৃত হয় ঐ সমস্ত اسم –এর মধ্যে যার মধ্যে الف ও لام নেই। الف ও لام ব্যতীত منادى– কে ياء দ্বারা আহবান করা হয়। যেমন, বলা হয়। يا عمرو ও يا زيد ইত্যাদি। এতে বুঝা যায় যে, اَللّٰهُمَّ –এর ميم এর– কে ياد –এর স্থলাভিষিক্ত বানান হয়েছে। এক অক্ষর বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে ميم ব্যবহার করার নিয়ম আরবী ভাষায় প্রচুর। যেমন فم–ابنم–هم–رقم ও سستهم ইত্যাদি শব্দ। উপরোক্ত শব্দসমূহের মধ্যে একটি অক্ষরকে বাদ দিয়ে এর পরিবর্তে শব্দের শেষে ميم যুক্ত করা হয়েছে। অনুরূপ প্রক্রিয়ায় اللّٰهم থেকে حرف نداء–ياء – কে –ফলে দেয়া হয়েছে। যার দ্বারা স্বভাবত اسم সমূহকে আহবান করা হয়। এজন্যেই اسم –এর শেষে ميم যুক্তি করে اَللّٰهُمَّ বানান হয়েছে।

তবে কেউ কেউ এ ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন। তারা বলেন, আরবী ভাযাবিদগণ, الف ও ميم হীন শব্দকে যেমনভাবে يا দ্বারা আহবান করে, অনুরূপভাবে তারা اَللّٰهُمَّ শব্দতে يا যুক্ত করে তাকে نداء দিয়ে থাকে। তাঁরা বলেন, পূর্বের কথা যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে আরবী ভাযাবিদ اَللّٰهُمَّ শব্দে কখনো يا যুক্ত করত না। অথচ اَللّٰهُمَّ শব্দে আরবী ভাযাবিদগণ তা ব্যবহার করেছেন। আরবদের লেখায় তার নযীর পাওয়া যায়ঃ وَمَا عَلَيْكِ اَنْ تَقُوْلِى كُلَّمَا – صَلَّيْتِ اَوْ كَبَّرتِ يَا اَللّٰهُمَّا – اُرْدُدْ عَلَيْنَا شَيْخَنَا مُسَلَّمًا ۔

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে سَبَّحتِ اَوكَبَّرتِ –। আরবরা اسماءناقصة –এর মধ্যে ميم مخففة –কে যুক্ত করে থাকেন। তারা বলেন, فم–ابنم ও هم ইত্যাদি। তারা বলেন, আমাদের মতে اللّٰهُ তে ام শব্দটি যোগ করে اَللّٰهُمَّ বানান হয়েছে। এর অর্থ হলো, يَا اَللّٰهُ اَمَنَّا بِخَيْرٍ ভাষায় অধিক ব্যবহারের –কে ফলে ادغام হয়ে اَللّٰهُمَّ হয়েছে। তারা বলেন, اُمَّ –এর همزه ফেলে দিয়ে ها অক্ষরে পেশ দেয়া হয়েছে। তাদের ধারণা মতে, আরবদের কথা هَلُمَّ اِلَيْنَا –এর মধ্যে هَلْ শব্দটির সাথে اَمَّ –শব্দটিকে যুক্ত করে পরে তাকে যবর দিয়ে পড়া হয়। আরবরা অক্ষরটিকে ফেলে দিয়ে হামযাসহ পাঠ করেন। তারা বলেন, يا الله اغفرلى يَا اَللّٰهُ আবার কখনো হামযা ব্যতীত পাঠ করেন যেমন ঃ يا الله اغفرلى –। যারা اللّٰه শব্দ থেকে হামযাকে حذف করে পাঠ করেন, তারা শব্দমূলের দিকে লক্ষ্য করেই একথা বলেন। কেননা এর মূল হচ্ছে الف ও لام । আর তা ঐ الف ও لام –এর মত যা اسماءمعرفة –এর মধ্যে زائد হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর যারা এখানে হামযাসহ পাঠ করেন তারা মনে করেন যে, এটা একটি হরফ।কেননা الله শব্দ থেকে তা কখনো ساقط হয় না। তারা আরবী কাব্যের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। যেমন জনৈক কবি বলেছেন ঃ

مُبَارَكٌ هُوَ وَمَنْ سَمَّاهُ * عَلَى اسمِكَ اللّٰهُمَّ يَا اللّٰهُ ـ

তারা বলেন, আরবী ভাষায় اَللّٰهُمَّ শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে এর ميم –কে তাশদীদ ব্যতিরেকেও পাঠ করা হয়। যেমন বলা হয়,

كَحَلفَةٍ مِّنْ اَبِى رِبَاحٍ * يَسمَعُهَا اللّٰهُمُ الكُبَارُ

কবিতায় বর্ণিত اَللّٰهُمَّ শব্দটিকে কোন কোন বর্ণনাকারী يَسمَعُهَا لاٰهُهُ الكُبَارُ পড়েছেন। আবার কেউ কেউ তা পড়েন يَسْمَعُهَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ كُبَار

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ (সার্বভৌম শক্তির মালিক, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা নিয়ে নেন।)

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর অর্থ ঃ সার্বভৌম শক্তির মালিক! হে দুনিয়া–আখিরাতের নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক! আপনি ব্যতীত আর কেউ এরূপ ক্ষমতার মালিক নয়। যেমন–

৬৭৮৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে মানুষের প্রতিপালক! ক্ষমতার অধিকারী সত্তা আপনিই তাদের একমাত্র বিচারক।

تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ –এর অর্থ হলো, আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং ক্ষমতার অধিকারী করেন এবং যাদের উপর ইচ্ছা আপনি কাউকে কর্তৃক দান করেন।

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ –এর মানে হচ্ছে, এবং যাদের থেকে ইচ্ছা আপনি ক্ষমতা নিয়ে নেন। এখানে ان تنزعه منه শব্দটিকে تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ –এর قرينه –এর ভিত্তিতে উহ্য রাখা হয়েছে। যেমন বলা হয়, خذما شئت وكن فيما شئت –এর অর্থ হলো, خذما شئت فِىْ اَىِّ – ان تاخذه ، وكن فيما شئت ان تكون فيه ، অনুরূপভাবে আল্‌– কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে।

(سورة الانفطار) صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ – এর অর্থ হলো। আল্লাহ্ যেমন ইচ্ছা, তেমনি তোমার আকৃতি দান করেছেন। কোন কোন তাফ্‌সীরকার বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'আ করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর উম্মতকে রোম সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য প্রদান করেন। এ দরখাস্তের প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৭৯০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা.) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে এ মর্মে দরখাস্ত করেছিলেন যে, তিনি যেন রোম ও পারস্যের রাজত্ব তাঁর উম্মতকে দিয়ে দেন। নবী করীম (সা.)–এর এ আরযীর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

৬৭৯১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, একদিন নবী করীম (সা) তার প্রতিপালকের নিকট এ মর্মে দু'আ করলেন যে, তিনি যেন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য তাঁর উম্মতের করতলগত করে দেন। এ দু'আর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এখানে اَلْمُلْكُ অর্থ হচ্ছে নবুওয়াত।

৬৭৯২. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ পাকের বাণী ঃ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, اَلْمُلْكُ অর্থঃ নবুওয়াত।

৬৭৯৩. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি অপমানিত করেন। সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতেই। আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা, রাজত্ব ও শক্তি প্রদান করে পরাক্রমশালী করেন। আর যাকে ইচ্ছা আপনি রাজত্ব কেড়ে নিয়ে এবং তার শত্রুকে তার উপর বিজয়ী করে হীনতম করেন। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। এ ব্যাপারে কারো কোন ক্ষমতা নেই। কেননা, আপনিই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। অন্য কোন মাখলুক নয় এবং কিতাবী ও আরব নিরক্ষর মুশরিক সম্প্রদায় আপনাকে বাদ দিয়ে যাদেরকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের কেউই এ ব্যাপারে সক্ষম নয়। যেমন ঈসা (আ.) এবং মানুষের মনগড়া প্রভুগণ। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে।

৬৭৯৪. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এসব বিষয় আপনারই হাতে। অন্য কারো হাতে নয়। নিশ্চয় আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ যেহেতু ক্ষমতা ও রাজত্ব আপনারই, তাই আপনি ব্যতীত অন্য কেউ এ সমস্ত বিষয়ে সক্ষম নয়।

মহান আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ

(٢٧) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২৭. আপনি রাতকে দিনে রূপান্তরিত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন। আপনি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণদান করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ تُوْلِجُ মানে تُدْخِلُ –। যখন কেউ তার বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন বলা হয়, قَدْوَلَجَ فُلَانٌ مَنْزِلَه -। এর থেকে مضارع হয় يلج এবং মূল উৎস হলো, ولوجا – ولجا ও ولجة -। তুমি যখন কাউকে কোথাও ঢুকাও, তখন তুমি বলবে, اَوْلَجْتُه –।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ এর মানে রাতকে কমিয়ে আপনি তাকে দিনে রূপান্তরিত করেন। ফলে দিন বেড়ে যায় এবং রাত কমে যায়। وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর অর্থ, দিনকে কমিয়ে আপনি তাকে রাতে রূপান্তরিত করেন। ফলে, দিন কমে রাত বেড়ে যায়।

৬৭৯৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আপনি রাতকে দিনে রূপান্তরিত করেন এবং দিনকে রাতে রূপান্তরিত করেন। ফলে, কখনো রাত হয় পনের ঘন্টা আর দিন হয় নয় ঘন্টা, আবার কখনো দিন হয় পনের ঘন্টা এবং রাত হয় নয় ঘন্টা।

৬৭৯৬. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, দিবসের যে অংশটুকু কমে তা রাত্রে পরিণত হয়। আর রাত্রের যে অংশটুকু কমে তা দিবসে পরিণত হয়।

৬৭৯৭. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, দিবারাত্রের যে কোন একটির থেকে যে অংশটি কমে, তা ধারাবাহিকভাবে অন্যটিতে পরিণত হয়। মুজাহিদ (র.) متعاقبان বলেছেন, না يتعاقبان বলেছেন, এ বিষয়ে আবূ আসিম (র.) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

৬৭৯৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, উভয়টির যে কোন একটি থেকে যে পরিমাণ সময় কমে, তা পর্যায়ক্রমে অন্যটিতে প্রবেশ করে।

৬৭৯৯. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন রাত কমে, দিন বাড়ে। আর যখন দিন কমে, রাত বৃদ্ধি পায়।

৬৮০০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি কমে অপরটি বৃদ্ধি পায়।

৬৮০১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী ঃ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাত দিনের অংশ গ্রহণ করে এবং দিন রাতের অংশ গ্রহণ করে। তাই বলা হয়, রাত কমে দিন বাড়ে এবং দিন কমে রাত বাড়ে।

৬৮০২. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী ঃ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, দিন–রাতের একটি অপরটি হতে কিছু সময় গ্রহণ করে। ফলে, কখনো রাত দিন থেকে লম্বা হয়, আবার কখনো দিন রাত থেকে লম্বা হয়।

৬৮০৩. ইব্‌ন যায়দ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী ঃ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, একটি বড়, অপরটি ছোট। এর কারণ একটি থেকে কিছু অংশ নিয়ে অপরটিতে অনুপ্রবেশ করান হয়। ফলে, একটি বেড়ে যায় এবং অপরটি কমে যায়।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ (আপনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান।)

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, তিনিই নির্জীব শুক্র হতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবিতের থেকে নির্জীব শুক্রের আবির্ভাব ঘটান।

যাঁরা এমত সমর্থন করেন ঃ

৬৮০৪. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি শুক্রবিন্দুর আবির্ভাব ঘটান পুরুষ থেকে। শুক্রবিন্দু নির্জীব আর পুরুষ জীবন্ত। আবার তিনি এ শুক্রবিন্দু হতে জীবন্ত পুরুষের আবির্ভাব ঘটান। অথচ এ শুক্রবিন্দু নির্জীব।

৬৮০৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, শুক্রবিন্দু হতে জীবন্ত মানুষ পয়দা হয়। অথচ শুক্রবিন্দু নির্জীব বস্তু। আবার তিনি জীবন্ত মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু হতে শুক্রবিন্দুর আবির্ভাব ঘটান। অথচ শুক্রবিন্দু নির্জীব।

৬৮০৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৬৮০৭. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ –এর ব্যাখ্যায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৮০৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, শুক্রবিন্দু নির্জীব। তিনি তা জীবন্ত মানুষ হতে সৃষ্টি করেন। আবার এ মৃত শুক্রবিন্দু হতে তিনি জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেন।

৬৮০৯. আবূ খালিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ থেকে শুক্রবিন্দু পয়দা করেন এবং শুক্রবিন্দু হতে পুরুষ পয়দা করেন।

৬৮১০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ মৃত শুক্রবিন্দু হতে জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেন এবং মানুষ হতে এ নির্জীব শুক্রবিন্দু তৈরি করেন।

৬৮১১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ শুক্রবিন্দুসমূহ থেকে জীবন্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবন্ত মানুষ থেকে নির্জব শুক্রবিন্দুসমূহের আবির্ভাব ঘটান। তিনি চতুষ্পদ জন্তু ও উদ্ভিদসমূহ থেকেও অনুরূপভাবে পয়দা করেন।

ইব্ন জুরাইজ (র.) ---- সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ থেকে শুক্রবিন্দুর আবির্ভাব ঘটানো এবং শুক্রবিন্দু হতে মানুষের আবির্ভাব ঘটানো এ একমাত্র তাঁরই কাজ।

৬৮১২. ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ – এর ব্যাখ্যায় বলেন, শুক্রবিন্দু হলো নির্জীব। এর থেকে তিনি জীবন্ত মানুষ তৈরি

করেন। আবার তিনি এ সমস্ত জীবন্ত মানুষ থেকে শুক্রবিন্দুসমূহ তৈরি করেন। অনুরূপভাবে নির্জীব বীজ থেকে তিনি চারাগাছ জন্মান। আবার জীবন্ত বৃক্ষ হতে নির্জীব বীজ পয়দা করেন।

অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্ তা'আলা বীজ হতে খেজুর বৃক্ষ এবং খেজুর বৃক্ষ হতে বীজ, শস্যকণা হতে শীষ এবং শীষ হতে শস্যকণা , মুরগীর পেট হতে ডিম এবং ডিম হতে মুরগী সৃষ্টি করেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮১৩. হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তা হল ডিম। জীবন্ত মুরগী হতে তিনি মৃত ডিমের আবির্ভাব ঘটান। তারপর এর থেকে আবার জীবন্ত মুরগীর আবির্ভাব ঘটান।

৬৮১৪. হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, বীজ হতে খেজুর বৃক্ষ এবং খেজুর বৃক্ষ হতে বীজ শীষ হতে শীষকণা এবং শস্যকণা হতে তিনি বীজ তৈরি করেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, তিনি কাফির হতে মু'মিন এবং মু'মিন হতে কাফিরের আবির্ভাব ঘটান।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮১৫. হযরত হাসান (র.) থেকে **বর্ণিত**। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফির হতে মু'মিন এবং মু'মিন হতে কাফিরের আবির্ভাব ঘটান। অথচ মু'মিনের অন্তর জীবন্ত আর কাফিরের অন্তর মৃত।

৬৮১৬. হযরত হাসান (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ -এর ব্যাখ্যয় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফির থেকে মু'মিন এবং মু'মিন থেকে কাফিরের আবির্ভাব ঘটান।

৬৮১৭. হযরত হাসান (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফির হতে মু'মিন এবং মু'মিন হতে কাফিরের আবির্ভাব ঘটান।

৬৮২০. হযরত সালমান (রা.) অথবা ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। বর্ণনাকারী বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তিনি হলেন হযরত সালমান (রা.)। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মাটির খামীরা থেকে ৪০ রাত-দিনে আদম (আ.)-কে তৈরি করেছেন। এরপর পবিত্র হাত দ্বারা এর দিকে ইশারা করলে পবিত্রাত্মা সকল তাঁর ডান হাতে এবং কলুষ আত্মাগুলো তার বাঁ হাতে বেরিয়ে এলো। এরপর তিনি এগুলোকে মিশ্রিত করে এর থেকে আদম (আ.)-কে তৈরি করেন। একারণেই বলা যায় যে, তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন। এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। অর্থাৎ কাফির থেকে মু'মিন এবং মু'মিন থেকে কাফিরকে বের করেন।

৬৮২১. যুহরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) একদিন তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় প্রবেশ করে একজন সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ স্ত্রীলোকটি কে? তিনি বললেন, তিনি আপনার একজন খালা। নবী করীম (সা.) বললেন, এশহরে বসবাসকারিণী খালারা আমার অপরিচিত। কাজেই, আমার এ খালার পরিচয় কি? তিনি বললেন, ইনি আল-আসওয়াদ ইব্‌ন আবদে ইয়াগুছের কন্যা খালিদা। তখন নবী করীম, (সা.) বললেন, পবিত্র ঐ সত্তা, যিনি জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত স্ত্রীলোকটি ছিলেন নেককার। অথচ তার পিতা ছিল কাফির।

৬৮২২. হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ তোমরা কি জান, কাফির মু'মিন জন্ম দেয়, পক্ষান্তরে মু'মিনও কাফির জন্ম দিয়ে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, তা এরূপই।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে এ পর্যন্ত আমি যতগুলো অভিমত বর্ণনা করেছি, এগুলোর মধ্যে শুদ্ধতম মত হচ্ছে ঐ ব্যাক্তির অভিমত, যিনি বলছেন যে, এ আয়াতের তাফসীর হলো, আল্লাহ্ নির্জীব শুক্র থেকে জীবিত ইনসান, জীবিত পশু ও জন্তু-জানোয়ারের আবির্ভাব ঘটান। আর তা মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটানোর অর্থ। তিনি আরো বলেন, জীবিত মানুষ, জীবিত জন্তু জানোয়ার থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নির্জীব শুক্রের সৃষ্টি করেন। আর এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ জীবিত প্রাণী থেকে মৃতের সৃষ্টি করেন। বস্তুত প্রতিটি জীবিতের শরীর থেকে কোন কিছু পৃথক হলে তা মৃত হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং শুক্র থেকে বের হবার পরই তা মৃত বস্তু হিসাবে গণ্য হয়। পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা নির্জীব শুক্র থেকে জীবিত ইনসান ও জীবিত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেন। অনুরূপভাবে আমরা বিবেচনা করতে পারি যে, প্রতিটি জীবিত বস্তু থেকে কোন কিছু পৃথক হয়ে পড়লে তা মৃত হিসাবে গণ্য হবে। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত তাফসীরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সূরা বাকারার ২৮নং আয়াতে। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (অর্থাৎ তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন দান করবেন। অবশেষে তাঁর নিকটেই তোমরা ফিরে যাবে। তবে যে ব্যক্তি এ আয়াতাংশের তাফসীরে বলেছেন যে, মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটানোর অর্থ হচ্ছে, শস্যকণাকে শস্যের শীষ থেকে এবং শীষকে শস্যকণা থেকে, ডিমকে মুরগী থেকে এবং মুরগীকে ডিম থেকে, মু'মিনকে কাফির থেকে এবং কাফিরকে মু'মিন থেকে আবির্ভাব ঘটানো। এরূপ তাফসীরের যদিও একটি অর্থবহ দিক রয়েছে, কিন্তু তা তত প্রচলিত নয় এবং জনসাধারণের ব্যবহারিক কথাবার্তায় তা তত সুস্পষ্ট নয়। এটা সুবিদিত যে, জনসাধারণের কাছে বহুল ব্যবহারিত ও সুস্পষ্ট পরিভাষা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার পাক কালামের ব্যাখ্যা প্রদান করা স্বল্প ব্যবহৃত অস্পষ্ট পরিভাষা থেকে অধিক উত্তম।

আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত الميت শব্দের পাঠ পদ্ধতিতে একাধিক মত রয়েছে। একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ আয়াতাংশে উল্লিখিত الميت শব্দটির

কে تشديد দিয়ে পড়ে থাকেন। তখন তার অর্থ হবে যে বস্তু মরে গেছে কিংবা মরে নাই এরূপ বস্তু থেকে আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত বস্তুর আবির্ভাব ঘটান।

অন্য একদল কিরআত বিশেষজ্ঞ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ আয়াতাংশে তা'আলা জীবিত বস্তুর আবির্ভাব ঘটান, কিন্তু যা মরেনি তার থেকে নয়। পুনরায় জীবিত বস্তু থেকে যে বস্তু মরে গেছে তার আবির্ভাব ঘটান তবে ঐ বস্তুটির আবির্ভাব নয় যা মরেনি। অর্থের এরূপ হেরফের হবার কারণ হচ্ছে আরবগণ যে বস্তু মরেনি এবং অতিশীঘ্র মরবে কিংবা এখনও মরেনি তার ক্ষেত্রে ميت শব্দটিকে تشديد দিয়ে পড়ে থাকেন। আর যে বস্তু মরে গেছে তার ক্ষেত্রে ميت শব্দটিকে تشديد বিহীন পড়ে থাকেন। যখন তাঁরা কারো প্রশংসা করার ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, انك مائت غدا وانهم مائتون অর্থাৎ তুমি আগামীকাল মরবে এবং তারাও মরবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেকটি বস্তু যা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি এরূপ উদাহরণে পেশ করা হয়ে থাকে। এর থেকে اسم فاعل -এর صيغه ব্যবহার করতে যেমন বলতে হয় هوالجائدبنفسه অথবা الطائبةنفسه بذلك আর اسم -এর অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে বলতে হয় هوالجوادبنفسه অথবা الطيبة نفسه -।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে পঠনরীতিগুলোর মধ্যে অধিক শুদ্ধ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির পাঠ পদ্ধতির যিনি الميت শব্দটির ياء বর্ণকে تشديد সহকারে পড়েছেন। কেননা, যে শুক্র কোন পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জীব বলে বিবেচিত হয়েছে তা থেকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত প্রাণী সৃষ্টি করেন। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা জীবিত পুরুষের পিঠে অবস্থিত নির্জীব শুক্র থেকে জীবিতকে সৃষ্টি করেন। উল্লেখ্য যে, স্খলনের পূর্বে শুক্র পুরুষের পিঠে জীবিত অবস্থায় ছিল, কিন্তু স্খলনের পর তা মৃত বলে বিবেচিত। আর এ মৃত বস্তু থেকেই জীবিত প্রাণী সৃষ্টি করেন। সুতরাং تشديد দেয়াই প্রশংসার ক্ষেত্রে আরবদের কাছে অধিক প্রযোজ্য।

পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাখলূক থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন এবং এমন পরিমাণ দান করেন যার কোন হিসাব নেই। হিসাববিহীন হবার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার যে সঞ্চিত সম্পদ রয়েছে তা হ্রাস পাবার কোন আশংকা নেই বা তা নিঃশেষ হয়ে যাবারও কোন সম্ভাবনা নেই।

৬৮২৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা নিরপেক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টিকে এত বেশি পরিমাণ রিযক দান করেন যে, তিনি তাঁর সংরক্ষিত সম্পদ হ্রাস পাবার কিংবা নিঃশেষ হয়ে যাবার কোন আশংকা করেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর অনুযায়ী পূর্ণ আয়াতটির ব্যাখ্যা হচ্ছে নিম্নরূপঃ হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ্ ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা নিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা আপনি পরাক্রমশালী

করেন, আর যাকে ইচ্ছা আপনি লাঞ্ছিত ও বিত্তহীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে। আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। মুশরিকরা যা দাবী করে তা সঠিক নয়। তারা বলে, আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের ইলাহ, উপাস্য ও প্রতিপালক রয়েছে, আল্লাহ্ ব্যতীত তারা অন্যের ইবাদত করে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তারা তাকে অংশীদার মনে করে। তারা আরো মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান রয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি হে আল্লাহ্ ! আপনার হাতেই সকল শক্তি। উপরোক্ত কাজগুলো আপনি আপনার অপরিসীম শক্তি দ্বারা সম্পাদন করেন, আর আপনি সর্বশক্তিমান। আপনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন। তখন দিন হ্রাস পেয়ে যায় ও রাত বেড়ে যায়। আবার কিছুদিন পর রাত হ্রাস পেয়ে যায় ও দিন বেড়ে যায়। আপনি মৃত্যু হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান। আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আপনার মাখলূক থেকে আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ এসব কাজ আঞ্জাম দেয়ার সামর্থ রাখে না।

৬৮২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ যে পরম শক্তির মাধ্যমে আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন, আপনি যাকে ইচ্ছা তার থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন, সে শক্তি কারো নেই। আপনি ব্যতীত অন্য কেউ তা করতে পারে না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যদি আমি হযরত ঈসা (আ.)-কে ঐসব বস্তু সম্বন্ধে ক্ষমতা দিয়ে থাকি, যেগুলোর কারণে তারা ঈসা (আ.)-কে মাবূদ বলে মনে করে যেমন মৃতকে জীবিত করা, রোগীদেরকে রোগমুক্ত করা, মাটি থেকে পাখি তৈরি করা এবং যাবতীয় অদৃশ্য বস্তুর সংবাদ দেয়া ইত্যাদি, তাহলে এগুলো শুধু মানুষের জন্য নিদর্শন হিসাবে এবং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি আমি যে তাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছি তার সত্যতা প্রমাণের জন্যে। তবে এমন আমার শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে, যা আমি তাকে দান করিনি তা হচ্ছে, কাউকে রাজ্য দান করা, নবূওয়াত প্রদান করা, রাতকে দিনে পরিণত করা এবং দিনকে রাতে পরিণত করা, মৃত থেকে জীবিতের আবির্ভাব ঘটানো এবং জীবিত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান; আর সৎকর্মপরায়ণ কিংবা অসৎ কর্মপরায়ণ যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা অপরিমিত রিযক প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এসব শক্তি আমি ঈসা (আ.)-কে দান করিনি এবং এসব ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দেইনি। এর থেকে তারা উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করছে না কেন? যদি ঈসা (আ.) মাবূদ হতেন, তাহলে সব কিছুর অধিকারীই ঈসা (আ.) হতেন। কিন্তু তাদের কোনো বিশ্বাস মতে ঈসা (আ.) বাদশাহদের থেকে পালিয়ে বেড়ান এবং বিভিন্ন শহরে ঘুরে বেড়ান। তা অবশ্য তাদের কিছু সংখ্যক লোকের বিশ্বাস ও ধারণা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

(٢٨) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

২৮. মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে

আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ্র দিকেই প্রত্যাবর্তন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কাফিরদেরকে সাহায্য–সহায়তাকারী ও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে মু'মিনগণকে মহান আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। يتخذ শব্দের ذال অক্ষরে زير (যের) দিয়ে পড়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটা نهى –এর صيغه অনুসারে শেষ অক্ষরে جزم হওয়ার কথা, কিন্তু পরবর্তী শব্দটিতে جزم হওয়ায় উচ্চারণ করা সম্ভব না হওয়ায় শেষ অক্ষরে যের বা كسره দেয়া হয়েছে। (আরবী ভাষার একটি নিয়ম হচ্ছে اذا حرك حرك بالكسرة অর্থাৎ যখন দু'টি جزم একত্রিত হবার কারণে حركت দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন كسره দ্বারা حركت দিতে হয়। আয়াতে করীমার অর্থ, হে মু'মিনগণ ! মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে সাহায্য-সহায়তাকারী রূপে গ্রহণ করনা তারা তাদের দীনের উপর কায়েম থাকা অবস্থায় তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করনা, অন্য মু'মিনগণের বিরুদ্ধেতাদেরকেসাহায্য-সহায়তা কর না এবং মুসলমানগণের দুর্বলতা তাদের কাছে ব্যক্ত করনা। যারা এরূপ করবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার কোন সম্পর্ক থাকবেনা। আল্লাহ্ তা'আলা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন। কেননা, তারা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত দীন থেকে মুরতাদ হয়ে পড়েছে এবং কুফরী অবলম্বন করেছে। তবে ব্যতিক্রম হলো, যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর, অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের কর্তৃত্বাধীনে থাক এবং তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাদেরকে ভয় কর। তখন তোমাদের জন্যে অনুমতি রয়েছে যে, তোমরা তাদের সাথে মুখে মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে এবং অন্তরে তাদের শত্রুতা পোষণ করবে। আর তারা যে কুফরীতে নিমজ্জিত রয়েছে, তার সাথে তোমরা একমত ঘোষণা করবে না এবং তাদেরকে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে সাহায্যও করবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮২৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতাংশে কাফিরদের সাথে নরম ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্য মু'মিন ব্যতীত তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতেও নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি কাফিররা মুসলমানগণের উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে তাদের সাথে নরম ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু দীনের ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করে যেতে হবে। আর এ তথ্যটির দিকে আল্লাহ্ তা'আলা পথ নির্দেশ করেছেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً অর্থাৎ তোমরা তাদের থেকে সতর্কতা অবলম্বন করবে।

৬৮২৬. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ –এর শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন আমর, কা'র ইব্ন আশরাফ, ইব্ন আবী হাকীক এবং কায়স ইব্ন যায়দ

মুনাফিকদের বন্ধু ছিল। তারা আনসারদের এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। যাতে তারা আনসারদেরকে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তখন রিফাআহ ইব্নুল মুনযির (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা.) এবং সা'দ ইব্ন খায়সামাহ (রা.) এ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললেন, এ সব ইহুদীর সংস্পর্শ তোমরা ত্যাগ কর, তাদের থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখ এবং তাদের সাথে কোন প্রকার বন্ধুত্ব রেখনা। অন্যথায় তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম ইসলাম থেকে বিচ্যুত করবে। কিন্তু আনসারদের ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি এবং তারা তাদের সাথে আরো অধিক বন্ধুত্ব স্থাপন ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে এ আয়াতে কারীমাহ নাযিল করেন ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْ لِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى قَوْلَهٗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

৬৮২৭. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى اَلَّا اَنْ تَتَّقُوْا الاية –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতের অর্থ মু'মিনগণ যেন মু'মিনদের ব্যতীত কোন কাফিরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে।

৬৮২৮. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াত لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ الاية –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ বন্ধুত্বের অর্থ হচ্ছে কাফিরদের দীনে তাদেরকে সাহায্য করা এবং কাফিরদের কাছে মুসলমানদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেয়া। যে ব্যক্তি এমন ঘৃণ্য কাজ করেন সে মুশরিক। আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন, তবে যদি তাদের থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়, তাহলে তাদের দীন সম্পর্কে তাদের কাছে বন্ধুত্ব এবং মু'মিনদের প্রতি মুখে মুখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে।

৬৮২৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, التقاة শব্দের অর্থ, মুখে কথাবার্তা বলা, কিন্তু অন্তরে ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখা।

৬৮৩০. ইক্‌রামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ, এমন ব্যবহার করবে যাতে কোন মুসলমানের রক্ত না ঝরে কিংবা তার সম্পদ লুটপাট না হয়।

৬৮৩১. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তবে তাদের সাথে পার্থিব কাজ–কারবার পরিচালনা ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখা বৈধ।

৬৮৩২. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৫৮৩৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াত لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَى اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আবুল আলিয়াহ্ (র.) বলেছেন, এ আয়াতে উল্লিখিত تقية –এর অর্থ, মুখে মুখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা, কাজে কর্মে নয়।

৬৮৩৪. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ –এর অর্থ যদি কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীসূচক বাক্য উচ্চারণ করার জন্যে বাধ্য করা হয়, তাহলে তার প্রাণের ভয়ে সে তা উচ্চারণ করতে পারে। অথচ তার অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অগাধ ভক্তিতে নিমগ্ন। এতে তার কোন পাপ নেই। সুতরাং التقية শুধুমাত্র মুখে মুখে উচ্চারণ দ্বারা হয়, অন্তরে নয়।

৬৮৩৫. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত التَّقِيَّةُ দ্বারা التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ বুঝান হয়েছে। আর তা হলো, যদি কাউকে আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানীসূচক কোন বাক্য উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে মানুষের ভয়ে উক্ত বাক্য উচ্চারণ করতে পারবে, এ শর্তে যে, তার অন্তর ঈমানের মাহাত্ম্যে প্রশান্ত এতে তার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, التقية শুধুমাত্র মুখে হয় (অন্তরে নয়)।

আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আবার কেউ কেউ বলেছেন, অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত " إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً " –এর অর্থ হচ্ছে " إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ " অর্থাৎ যদি তার আর তোমার মধ্যে আত্মীয়তা থাকে, তাহলে কাফির হওয়া সত্ত্বেও তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পার। যারা এরূপ মতামত প্রকাশ ও সমর্থন করেছেন, তারা তাদের দাবীর সপক্ষে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন।

৬৮৩৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মু'মিন ব্যতীত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন। তবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, হ্যাঁ, যদি তোমরা তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সতর্কতা অবলম্বন কর। অর্থাৎ মুশরিকদের সাথে আত্মীয়সুলভ ব্যবহার করে তাদের সাথে ও তাদের ধর্মের সাথে বন্ধুত্ব না রেখে মুশরিকদের থেকে তোমরা দয়া গ্রহণ করতে পার।

৬৮৩৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, কোন মুসলমানের জন্যে কোন কাফিরকে ধর্মীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বৈধ নয়। তিনি আয়াতাংশ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, যদি তোমার ও উক্ত কাফিরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকে, তাহলে তুমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।

৬৮৩৮. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, পার্থিব বিষয়াদি সম্পর্কিত আচার–ব্যবহারে তাদের সাথী, সঙ্গী হও এবং তাদের প্রতি দয়া কর, কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, কাতাদা (র.) اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ সৌজন্যও আত্মীয়তার বন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন, তার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ ও কারণ রয়েছে। তবে তা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর অধিক গ্রহণযোগ্য অর্থ হবে الا ان تخافوا منهم تقاة অর্থাৎ তবে হ্যাঁ যদি তোমাদের জন্য তাদের পক্ষ থেকে কোন প্রাণভয়ের কারণ দেখা দেয়, তাহলে তোমরা التقية গ্রহণ করতে পার। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে যে التقية –এর কথা ব্যক্ত করেছেন, তা শুধুমাত্র কাফিরদের সাথে করা যাবে অন্যদের সাথে নয়। আর কাতাদা (র.)–এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধনের নিমিত্ত তা বজায় রাখার জন্যে যে বিধান দিয়েছেন, তা আয়াতের বহুল প্রচলিত প্রকাশ্য অর্থ নয়, অথচ কুরআন মজীদে আরবের বিরল ব্যবহৃত বাক্যার্থের চেয়ে অত্যধিক ব্যবহৃত অর্থই অধিক গৃহীত। তাই আমাদের নেয়া অর্থই অধিক গ্রহণযোগ্য।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً –এর পঠনরীতিতে কারীগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। বিভিন্ন দেশের সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত تقاة শব্দটিকে تُؤَدَةً تُخَمَةً ও تُكَاةً –এর ন্যায় فُعَلَةً –এর পরিমাপে পাঠ করেছেন। এর থেকে واحدمتكلم –এর صيغة হবে اِتَّقَيْتُ –। আবার অন্য কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تَقِيَّةً অর্থাৎ فَعِيْلَةٌ –এর পরিমাপে تقية পড়েছেন।

তিনি আরো বলেন, আমাদের কাছে ঐ ব্যক্তির পাঠরীতি হচ্ছে গ্রহণযোগ্য যারা اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً পাঠ করেছেন। কেননা, হাদীসে মশহুল দ্বারা এ পঠনরীতি অধিক শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন যেন তোমরা পাপের কাজে লিপ্ত না হও কিংবা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না কর। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার দিকেই তোমাদের মৃত্যুর পর হাশরের দিন হিসাব–নিকাশ দেয়ার জন্যে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ যখন তোমরা তাঁর কাছে ফিরে যাবে অথচ তোমরা তাঁর আদেশ নির্দেশ লংঘন করেছ, তিনি যা নিষেধ করেছেন যেমন মু'মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার ন্যায় পাপের আশ্রয় নিয়েছ, তোমাদের, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে এমন শাস্তি ও আযাব স্পর্শ করবে যা প্রতিরোধ করার মত তোমাদের কোন শক্তি থাকবে না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং তাঁর আযাব তোমাদের স্পর্শ করা থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা কর, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মন্দ কাজের প্রতিফল প্রদানে অত্যধিক কঠোর।

(২৯) قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৯. বল, তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর, আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অবগত রয়েছেন এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মাদ ! তুমি ঐ ব্যক্তিদের বলে দাও, যাদেরকে তুমি মু'মিনদের ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছ, তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে যেমন কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তা যদি তোমরা গোপন কর কিংবা তোমাদের কাজ বা মুখ দ্বারা তা তোমরা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ তা'আলা তা জানবেন, তাঁর কাছে তা গোপন থাকবে না। সুতরাং যেন বলা হচ্ছে, তোমরা তাদের সাথে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব রাখবে না। যদি রাখ, তাহলে তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালক থেকে এমন কঠিন আযাব স্পর্শ করবে, যার প্রতিরোধ করার মত তোমাদের কোন ক্ষমতা নেই। কেননা, তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু জানেন, কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়। তিনি এসবের যথাযথ হিসাব রাখার ব্যবস্থা করেছেন যেন তিনি তোমাদের মধ্যে সৎকর্মীদেরকে সৎকর্মের প্রতিফল এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে তাদের কৃত দুষ্কর্মের প্রতিদান প্রদান করতে পারেন।

৬৮৩৯. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। **তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা যদি তারা গোপন করে কিংবা প্রকাশ করে সব কিছু সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা** অবগত রয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, اِنْ تُخْفُوْا مَافِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْتُبْدُوْهُ অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে, তা যদি তোমরা গোপন কর কিংবা প্রকাশ কর, তা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ --এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন আল্লাহ্ পাকের কাছে কোন কিছুই গোপন নয়, আসমানে হোক, কিংবা যমীনে হোক অথবা অন্য কোন জায়গায় হোক তাহলে যে সব লোক মু'মিন ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে, তারা জেনে রেখো, তোমাদের কাফিরদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করা এবং তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ার মনোভাব আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কেমন করে গোপন থাকতে পারে? তিনি আরো বলেন, اوتبدوه –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "অথবা তোমরা তাদেরকে অর্থাৎ কাফিরদেরকে কাজে-কর্মে বা মুখের বচনে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য কর, তাও আল্লাহ্ তা'আলা জানেন।"

আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্য করার ব্যাপারে শাস্তি প্রদানে শক্তি রাখেন এমনকি যা কিছু করতে তিনি ইচ্ছা করেন, তা সবই তিনি করতে পারেন। আর তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাতে তার অক্ষমতা নেই এবং তিনি যা করতে চান তা থেকে তাকে বিরত রাখার মতও কারোর শক্তি-সামর্থ নেই।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(৩০) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗۤ اَمَدًاۢ بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

৩০. যে দিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজে করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাইবে, সে দিন সে তার ও তার মধ্যে দুর ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোদেরকে সমাধান করতেছেন। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতাংশ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ اَمَدًا بَعِيْدًا –তে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সাবধান করেছেন ঐদিন সম্বন্ধে, যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেছে, তা পুরাপুরি বিদ্যমান পাবে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে, সেদিন তার ও ঐটার মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করবে। কেননা হে মানব জাতি, তোমরা জেনে রেখো, ঐদিন তোমাদেরকে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সুতরাং তোমরা তাঁকে তোমাদের পাপের জন্য ভয় কর।

তিনি আরো বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত محضرا শব্দটির ব্যাখ্যায় কাতাদা (র.) বলেছেন যে, তার অর্থ, 'পুরাপুরি বিদ্যমান'। এ প্রসঙ্গে তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

৬৮৪০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا –তে উল্লিখিত "مُّحْضَرًا" শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, তার অর্থ 'পুরাপুরি বিদ্যমান'।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, এ আয়াতাংশ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ الخ –তে উল্লিখিত "يَوْمَ تَجِدُ" –এর ব্যাখ্যা আরবী ভাষাভাষিগণ মনে করেন যে, তার অর্থ وَاذكُر يوم تَجِدُ (অর্থাৎ তুমি স্মরণ কর ঐ দিনকে, যেদিন প্রত্যেকে পাবে। আর তারা আরো মনে করেন, এরূপ অর্থ হবার কারণ, আদেশ ও উপদেশ প্রদান করার জন্য কুরআনুল করীম নাযিল হয়েছে। তাই এ আয়াতে যেন তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা তা স্মরণ কর। কেননা, কুরআনুল করীমের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে وَاتقوا يوم كذا وحين كذا (তোমরা অমুক দিন, অমুক সময়কে স্মরণ কর)। আর এ আয়াতে عملت শব্দের সাথে যে مَا অক্ষর উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ اَلَّذِى অর্থাৎ مَا অক্ষর اسم موصول হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা تجد عليه –এর جزاء হিসাবে গণ্য করা সঙ্গত নয়। তিনি আরো বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ وَمَا عملت من سوء –এ উল্লিখিত ما –টি পূর্বতন ما –এর معطوف হিসাবে বিবেচ্য এবং عملت শব্দটি صله হিসাবে গণ্য, এটা رفعى –এর حالت এ রয়েছে যেমন تَوَدُّ শব্দ رفعى –এর حالت –এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ প্রথমটি مبدا এবং দ্বিতীয়টি خبر হিসাবে গণ্য। কাজেই, পূর্ণ আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ

ঐ দিনকে স্মরণ কর, যেদিন প্রত্যেকে যে ভাল কাজ করেছে, তা সে বিদ্যমান পাবে। আর যে মন্দ

কাজ করেছে সে তারও ঐটার মধ্যে দূর ব্যবধান, কামনা করবে। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত اَلاَمَدُ –এর অর্থ, দূর ব্যবধান, যার নিকট পৌছা যায়। যেমন প্রসিদ্ধ কবি আত–তারমাহ বলেছে ঃ

كُلُّ حَيٍّ مُسْتَكْمِلُ عِدَّةَ الْعُمْرِ * وَمُوْدٍ إِذَا انْقَضَى أَمَدُهُ

অর্থাৎ প্রত্যেক জীবিত বস্তুই তার বয়সের নির্দিষ্ট সময়কে পরিপূর্ণ করে এবং তা সে চায়ও যখন তার নির্দিষ্ট সময়ের শেষ প্রান্তে পৌছে। এখানে امده –এর অর্থ, নির্দিষ্ট সময়ের শেষ প্রান্ত ।

যাঁরা এমত সমর্থন করেন ঃ

৬৮৪১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত اَمَدًا بَعِيْدًا –এর অর্থ مَكَانًا بَعِيْدًا অর্থাৎ 'দূরবর্তী স্থান'।

৬৮৪২. হযরত ইব্ন জুরায়জ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত اَمَدًا بعيدا –এর অর্থ, সুনির্দিষ্ট সময় বা মানুষের হায়াত।

৬৮৪৩. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেকে (বদকার) আকাংক্ষা করবে যেন দুনিয়ার কৃতকর্মের কোন দিনও সাক্ষাত না পায়। অথচ সে দুনিয়ার জীবনে ঐ পাপাচার দ্বারাই আনন্দ লাভ করত।

وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ (আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। আর আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর নিজের সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করছেন। যাতে তোমরা তাঁকে নারায করার মত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে তাঁকে অসন্তুষ্ট না করল। যদি তোমরা তাঁকে অসন্তুষ্ট কর, তাহলে এ অসন্তুষ্টির প্রতিফল পুরোপুরি ঐদিন তোমাদেরকে পেতে হবে, যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভাল কাজ করেছে তার প্রতিফল পুরাপুরি পাবে এবং যে মন্দ কাজ করেছে, সে আবেদন করবে যাতে তার মন্দ কাজের প্রতিফল ও তার মধ্যে দূর ব্যবধান সৃষ্টি হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট। আর যদি এরূপ ব্যবধান না হয়, তোমাদেরকে তাঁর মর্মন্তুদ আযাব স্পর্শ করবে, যে আযাব প্রতিরোধ করার মত তোমাদের কোন ক্ষমতা থাকবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। আর দয়ার লক্ষণগুলো হচ্ছে যে, তিনি তাদেরকে নিজের সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছেন, তাদেরকে তার মর্মন্তুদ আযাবের ভয় দেখাচ্ছেন এবং তাদেরকে তার অবাধ্যতাসূচক যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে উপদেশ দিচ্ছেন। অর্থাৎ অতি দ্রুত আযাব নাযিল করছেন না, বরং তাদেরকে সংশোধন হবার সুযোগ দিচ্ছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮৪৪. আমর ইব্ন হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ

رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ–এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ–এর অন্তর্ভুক্ত দয়ার একটি চিহ্ন হলো, তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে তাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছেন।

(৩১) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩১. হে রাসূল ! আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, এ আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াত এমন এক জাতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যামনায় জীবিত ছিল এবং তারা বলত, আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভালবাসি। তখন মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মানিত নবী (সা.)–কে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাদেরকে বলে দেন, যদি তোমরা যা বলছ, তার মধ্যে সত্যবাদী হও, তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ করবে। আর তাই হলো, তোমরা যা বলছ, তার সত্যতার একটি নমুনা।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮৪৫. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যুগে একদল লোক বলতে লাগল, হে মুহাম্মাদ (সা.) ! আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভালবাসি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ এ আয়াতে মহান আল্লাহ্র প্রেরিত নবী (সা.)–এর অনুসরণকে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁর অবাধ্যতাকে শাস্তির যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৬৮৪৬. অন্য এক সনদে হযরত হাসান (র.) থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৬৮৪৭. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ –এর শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, এক সম্প্রদায় ছিল, তারা মনে করত যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসে এবং তারা বলত আমরা আমাদের প্রতিপালককে ভালবাসি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে মুহাম্মাদ (সা.)–এর অনুসরণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং মুহাম্মাদ (সা.)–এর অনুসরণকে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে চিহ্নিত করলেন।

৬৮৪৮. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ –এর শানে নুযূল সম্বন্ধে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর যুগের একদল লোক বলতেন যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কাজের মাধ্যমে তাদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যে ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ الاية সুতরাং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর অনুসরণই তাদের কথার সত্যতা প্রমাণের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হলো।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, এটা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি একটি নির্দেশ। নাজরানবাসী খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরবারে আগমন করে হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে মহান বাণী উচ্চারণ করছিল, তখন তাদেরকে প্রতি-উত্তর দেবার জন্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আদিষ্ট হন। যদি তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে যা কিছু বলছে তা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভালবাসার নিদর্শন হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে আদেশ প্রদান করুন। কাজেই তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসরণ কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮৪৯. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمْ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ -এর অর্থ হলো, যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবেসে থাক এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলারমুহব্বতে ও সম্মানে ভালবেসে থাক, তাহলে فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ্ তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে উল্লিখিত দু'টি অভিমতের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইব্ন যুবায়র (র.)-এর অভিমত অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা, এ সূরার অন্য কোন জায়গায় কিংবা এ আয়াতের পূর্বেও এ সূরার কোন জায়গায় নাজরানবাসীদের প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোন সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই, যারা এরূপ দাবী করেছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। যদি এরূপ কোন দলের কথা উল্লেখ থাকত, তাহলে হাসান (র.)-এর দাবী অনুযায়ী এ আয়াত উক্ত দলের কথার উত্তরে পেশ করা হয়েছে বলে বুঝা যেত। তবে এ আয়াত সম্পর্কে হাসান (র.) যা বলেছেন এবং আমি উপরে যা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এ সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন সঠিক বর্ণনা নেই। কাজেই, এটা বলা সঙ্গত যে, তিনি যা বলেছেন তার সঠিক বর্ণনা তিনিই ভাল জানেন। তবে এ সূরায় তাঁর বর্ণনার সমর্থনে কোন আকার-ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, এ কথা বলা যেতে পারে যে, হাসান (র.) যে সম্প্রদায়ের কথা নাম উল্লেখ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন, তারাও নাজরানবাসী খৃষ্টানদের প্রতিনিধি দল হতে পারে। তাহলে তাঁর বর্ণনাও আমাদের বর্ণনার অনুরূপ হবে। তবে আমাদের এ বক্তব্যেরও কোন সঠিক উৎস নেই এবং আয়াতের মধ্যেও হাসান (র.)-এর অভিমতের পক্ষে কোন নিদর্শন নেই। তাহলে আমাদের পক্ষে শ্রেয় হচ্ছে আয়াতের ঐ বিশ্লেষণটিকে অগ্রাধিকার দেয়া, যার নিদর্শন আয়াতে পূর্বে ও পরে রয়েছে। এ আয়াতের পূর্বে ও পরে নাজরানবাসী খৃষ্টানদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধেও এ সূরায় বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। কাজেই এ আয়াত দ্বারাও তাদের কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আমাদের উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপঃ

হে মুহাম্মাদ (সা.) ! নাজরানবাসী খৃষ্টানদের প্রতিনিধিদলকে বলুন, যদি তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাস এবং তোমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর,

আর তোমরা তার সম্বন্ধে যা বলছ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ভালবাসার জন্যেই তা বলছ তাহলে তোমাদের কথাকে তোমাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ কর শুধু আমার অনুসরণের মাধ্যমে। কেননা, তোমরা ভালভাবেই জান যে, আমি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তোমাদের কাছে প্রেরিত, যেমন হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন ঐ ব্যক্তিদের কাছে প্রেরিত যাদের কাছে তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং যদি তোমরা আমার অনুকরণ ও অনুসরণ কর এবং আমি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে যা তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি, তা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং এ পাপের জন্য তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। কেননা, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপরাশির জন্যে ক্ষমাশীল এবং তাদের ও মাখলূকাতের অন্যদের প্রতিও পরম দয়ালু।

(٣٢) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○

৩২. হে নবী ! আপনি বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ্ কাফিরদের পসন্দ করেন না।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ হে মুহাম্মদ (সা.) ! নাজরানবাসী খৃস্টানদের প্রতিনিধিদলকে বলুন, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)–এর অনুগত হও। কেননা, তোমরা নিশ্চয় জান যে, তিনি আমার (আল্লাহ্‌র) মাখলুকাতের কাছে আমার প্রেরিত রাসূল। তাঁকে আমি সত্য সহকারে প্রেরণ করেছি। তাঁর নাম তোমরা তোমাদের কাছে রক্ষিত ইনজীল কিতাবে পাবে। তারপর যদি তোমরা তোমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করছি, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তা অগ্রাহ্য কর, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন না, যারা সত্যকে চিনবার পরও তা অস্বীকার করে কুফরীর আশ্রয় নেয় এবং তা সঠিক ভাবে জানার পরও অস্বীকার করে। আর প্রতিনিদিধলকে বলে দাও যে, তোমরা নবূয়াতকে অস্বীকার করার দরুন কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হবে তুমি যে সত্যের উপর আছ তা তারা অস্বীকার করছে এবং তোমার নবূওয়াতের সত্যতা প্রকাশ পাবার ও তোমার সম্বন্ধে তাদের সঠিক জ্ঞান অর্জনের পরও তারা কুফরীর আশ্রয় নিচ্ছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮৫০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হে নাজরানবাসী খৃস্টানদের প্রতিনিধিদল ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল (সা.)–এর অনুগত হও। কেননা, তোমরা তাঁকে চিন এবং তাঁর নাম তোমাদের কিতাব ইনজীল পাচ্ছ। কাজেই যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তোমাদের কুফরীর উপর অটল থাক, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের পসন্দ করেন না।

(٣٣) إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ○

৩৩. নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে, নূহকে ও ইব্‌রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতের মধ্যে মনোনীত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "এ আয়াতে إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদম (আ.) ও নূহ (আ.)-কে মনোনীত করেছেন এবং তাঁদের দু'জনকে তাঁদের দীনের জন্যে নির্বাচিত করেছেন। অনুরূপভাবে ইব্রাহীম (আ.) ও ইমরানের বংশধরগণকে তাঁরা যে দীনে ছিলেন তাঁদের দীনের জন্যে নির্বাচিত করেছেন। কেননা, তাঁরা আহলে ইসলাম ছিলেন অর্থাৎ তারা ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন। কাজেই, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁদের দীনকে অন্যসব বিপরীত দীন থেকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন, এখানে ইব্রাহীম (আ.) ও ইমরানের বংশধর দ্বারা মু'মিনগণকে বুঝান হয়েছে। আমরা পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, কোন লোকের বংশধর দ্বারা তার অনুসারী ও সম্প্রদায়কে বুঝান হয়ে থাকে। আর যারা তার রীতিনীতি মেনে চলে থাকে, তাকেও বংশধর বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আমাদের উপরোক্ত বর্ণনাটি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর বাণী থেকে নেয়া হয়েছে। তিনিও অনুরূপ বলতেন। এ প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য ঃ

৬৮৫১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াত إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "তারা হচ্ছেন ইবরাহীম (আ.), ইমরান (র.) ও মুহাম্মাদ (সা.) এর বংশধরদের মধ্যে মু'মিন ব্যক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ـ

অর্থাৎ "যারা ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ করেছিল, তারা এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে মানুষের মধ্যে তারা ইব্রাহীম (আ.)-এর ঘনিষ্ঠতম।"

৬৮৫২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এই দু'জন নবীকে আল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বজগতে মনোনীত করেছিলেন।"

৬৮৫৩. কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দুটি সৎ পরিবার ও দু'জন সৎলোকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদেরকে বিশ্বজগতে বিশেষ গুণে ভূষিত করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর।"

৬৮৫৪. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণীঃ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "নবূওয়াত দান করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিশ্বজগতে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন নবী, পরহিযগার এবং আল্লাহ্ তা'আলার খুবই অনুগত।"

(٣٤) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

৩৪. তারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি ইব্‌রাহীম (আ.) ও ইমরান (র.)–এর বংশধরদের মনোনীত করেছেন। তারা একে অপরের বংশধর। এ আয়াতাংশে উল্লিখিত ذُرِّيَّةً শব্দে الَ اِبْرَاهِيْمَ ও الَ عِمْرَانَ কে অনুকরণ করে نصب বা زبر দেয়া হয়েছে। তবে ذُرِّيَّةً শব্দটি نكره বা অনির্দিষ্ট এবং اَلْعِمْرَان শব্দটি معرفة –। যদি বলা হয় যে الاصطفاء কে পুনঃ ধরে নিয়ে ذرية শব্দটিকে مفعول হিসাবে نصب দেয়া হয়েছে, তাহলে তা হবে উত্তম। কেননা, তখন অর্থ দাঁড়াবে 'এক বংশধর থেকে অন্য বংশধর'কে মনোনীত করেছেন। আর এক বংশধর থেকে অন্য বংশধরকে দীনের বন্ধনে এবং ইসলাম ও সত্যের প্রতিনিধিত্বে অভিন্ন করা হয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল্ করীমের সূরায় তাওবার ৭১ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন ঃ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ মু'মিন নরনারী একে অপরের বন্ধু এবং সূরা তাওবার ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ اَلْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ অর্থাৎ মুনাফিক নর ও নারী একে অন্যের অনুরূপ। অন্য কথায় তাদের দীন এক, তাদের তরীকা বা চালচলন একইরূপ।এভাবে ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ –এর অর্থ, তাঁদের বংশধরদের একজনের দীন অন্যজনের দীনের ন্যায়। তাদের কালিমা এক এবং আল্লাহ্ তা'আলার একত্বে ও আনুগত্য স্বীকারে তাঁরই একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮৫৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, "তারা নিয়ত, আমল, সরলতা ও আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ সম্পর্কে একই বংশের অন্তর্ভুক্ত।"

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইমরান (র.)–এর স্ত্রীর কথা শ্রবণকারী এবং তিনি তাঁর অন্তরে মানত সম্পর্কে যে কথা লুক্কায়িত রেখেছিলেন, তাও আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। তিনি মানত করেছিলেন যে, যা কিছু তাঁর গর্ভে রয়েছে, তা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দেবেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٣٥) اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৫ "স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা রয়েছে তা একান্ত তোমার জন্যে আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে তা কবুলকর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি ঐ ঘটনাটি স্মরণ করুন, যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা রয়েছে তা একান্ত তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তা

তুমি আমার নিকট হতে গ্রহণ কর।" অত্র আয়াতে উল্লিখিত " اِذْ " শব্দটি পূর্বতন আয়াতে উল্লিখিত "سميع" –এর صلة হয়েছে। ইমরানের স্ত্রী হচ্ছেন মারইয়াম –এর মাতা। আর মারইয়ামের হচ্ছেন ইমরানের কন্যা ও 'ঈসা (আ.)–এর মাতা। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

৬৮৫৬. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইমরান (র.)–এর স্ত্রীর নাম ছিল হান্নাহ বিনত ফাকূদ ইব্‌ন কাবীল।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাদ (র.) ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারী বলেন, "ইমরান (র.)–এর স্ত্রীর নাম ছিল হান্নাহ বিনত ফাকূদ ইবন কাবীল। তাঁর স্বামী ছিলেন ইমরান (র.)। তিনি ইমরান (র.) ইব্‌ন ইয়াশহাম ইব্‌ন আমূন ইব্‌ন মান্‌শা ইব্‌ন হাযকিয়া ইব্‌ন ইহ্‌যীক ইউছাম ইব্‌ন 'আযারিয়া ইব্‌ন আম্‌ছিয়া ইব্‌ন ইয়াউশ ইব্‌ন আহ্‌যীহূ ইব্‌ন ইয়ায়িম ইব্‌ন আবইয়া ইব্‌ন ইয়াহফাশাত ইব্‌ন আসাবির ইব্‌ন রাহবা'আম ইব্‌ন সুলায়মান(আ.) ইব্‌ন দাউদ (আ.) ইব্‌ন ঈশা।

৬৮৫৭. অন্যসূত্রে ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ رَبِّ اِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِى مُحَرَّرًا –এর অর্থ "হে আমার প্রতিপালক। আমার গর্ভে যা কিছু রয়েছে, তা আপনার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করলাম অর্থাৎ আপনার ইবাদত বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্যে ইবাদতখানার মধ্যে তাকে উৎসর্গ করে দিলাম। আপনি ব্যতীত অন্য কিছুর খিদমত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে শুধু আপনার জন্যে উৎসর্গ করলাম। مُحَرَّرًا শব্দটিতে اَلَّذِىْ –এর অর্থে ব্যবহৃত مَا শব্দটি থেকে حال হবার কারণে فتح বা زبر দেয়া হয়েছে।"

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَتَقَبَّلْ مِنِّى –এর অর্থ 'হে আমার প্রতিপালক। আপনার জন্যে আমি যা উৎসর্গ করলাম, তা আপনি কবুল করুন। কেননা, আপনি اَلسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ যা আমি বলছি ও দু'আ করছি তা আপনি সর্বশ্রোতা এবং যা আমি অন্তরে নিয়ত করছি ও ইচ্ছা পোষণ করছি তার প্রকাশ্য ও গোপন কোনটাই আপনার কাছে অবিদিত নয়। ফাকূয়ের কন্যা ও ইমরান (র.)–এর স্ত্রী হান্নাহর মানতের কারণ বর্ণনার্থে একটি বিবরণ রয়েছে যে ঃ

৬৮৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) ও ইমরান (র.) দুই বোনকে বিয়ে করেন। হযরত ইয়াহ্‌য়া (আ.)–এর মাতা ছিলেন হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর স্ত্রী। আর হযরত মারয়াম (র.)–এর মাতা ছিলেন ইমরান (র.)–এর স্ত্রী। ইমরান (র). যখন মারা যান মারইয়াম (র.) তখন মায়ের সঙ্গে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, "তারা মনে করত হান্নাহ বৃদ্ধা হয়ে গেছেন, তাই তাঁর আর সন্তান হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ তারা ছিল আল্লাহ্‌ওয়ালা পরিবারভুক্ত। একদিন তিনি একটি গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি একটি পাখীর দিকে তাকালেন। সে তার বাচ্চাকে খাবার খাওয়াচ্ছে। অমনি তাঁর মধ্যে মাতৃত্ববোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেন যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে একটি ছেলে সন্তান দান করেন। তারপর তিনি গর্ভবতী হন। মারইয়াম (আ.) তখন তাঁর গর্ভে আসেন এমতাবস্থায় ইমরান (র.) মৃত্যুমুখে পতিত হন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে তাঁর গর্ভে সন্তান এসেছে, তখন তিনি তা আল্লাহ্ তা'আলার

জন্যে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গিত ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে ইবাদত করার কাজ নিয়োজিত করা হয় তাকে ইবাদতখানায় থাকতে দেয়া হয় এবং তার দ্বারা পার্থিব কোন কাজকর্ম করান হতো না।"

৬৮৫৯. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তারপর আল্লাহ্ পাক ইমরান (র.)-এর স্ত্রী ও তাঁর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা রয়েছে, তা আমি আপনার জন্যে উৎসর্গ করলাম। উৎসর্গের অর্থ যেমন বলা হয়, আমি মহান আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যে মুক্ত করে দিলাম। দুনিয়ার কোন কাজে তার সাহায্য নিব না। তারপর দু'আ করলেনঃ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

৪৮৬০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি - رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا আয়াতাংশের উল্লিখিত محررا শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে ইবাদতখানার খাদিম।"

৬৮৬১. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا এ উল্লিখিত مُحَرَّرًا শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে ইবাদতখানার খাদিম।"

৬৮৬২. শা'বী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত محررا শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ইবাদতের জন্যে কাউকে একেবারে মুক্ত করে দেয়া।

৬৮৬৩. শা'বী (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مُحَرَّرًا শব্দের অর্থ হচ্ছে, "আমি তাকে ইবাদতখানার জন্যে অর্পণ করলাম এবং তাকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্যে বিমুক্ত করে দিলাম।"

৬৮৬৪. শাবী (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৮৬৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مُحَرَّرًا শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "ইবাদতখানার জন্যে উৎসর্গ করলাম যাতে সে তার খিদমত করতে পারে।"

৬৮৬৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৮৬৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مُحَرَّرًا শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "পূতপবিত্র যার মধ্যে পার্থিব জগতের কোন কিছু মিশ্রিত হয়নি।"

৬৮৬৮. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مُحَرَّرًا শব্দটির অর্থ হচ্ছে, "ইবাদতগাহ ও গির্যার জন্যে উৎসর্গ করলাম।"

৬৮৬৯. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইয়র (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مُحَرَّرًا শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ইবাদতের জন্যে একেবারে মুক্ত করে দেয়া।"

৬৮৭০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا الاية –এর তাফসীর ও শানে নুযূল প্রসঙ্গে বলেন, ইমরান (র.)–এর স্ত্রীর গর্ভে যা ছিল, তা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে উৎসর্গ করে দিলেন। অথচ তাদের মধ্যে নিয়ম ছিল ঃ তারা পুরুষদেরকেই উৎসর্গ করে দিতেন। আর উৎসর্গকারী যখন কাউকে উৎসর্গ করে দিতেন, তখন তিনি তাকে ইবাদতখানায় নিয়ে গিয়ে উৎসর্গ করতেন। সে ইবাদতখানা ত্যাগ করতনা, সে সেখানেই থাকত এবং ইবাদতখানা ঝাড়ু দিত।

৬৮৭১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে তিনি তাঁর সন্তানকে ইবাদতখানার জন্যে উৎসর্গ করেদিলেন।"

৬৮৭২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ –এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ঘটনাটি ছিল এরূপ ঃ ইমরান (র)–এর স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং তিনি মনে করলেন যে, তিনি পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন। সুতরাং তিনি তা আল্লাহ্‌র জন্যে এমনভাবে উৎসর্গ করলেন যে, তার দ্বারা পার্থিব কোন প্রকার কাজ করান চলবে না।

৬৮৭৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইমরান (র.)–এর স্ত্রী তার গর্ভের সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে উৎসর্গ করে দিলেন।" বর্ণনাকারী আরো বলেন, "তখনকার যুগের লোকেরা তাদের পুরুষ সন্তানদেরকে এরূপে উৎসর্গ করতেন। আর উৎসর্গকারী যখন কাউকে উৎসর্গ করতেন, তখন তাকে ইবাদতখানায় স্থানান্তর করতেন। সে তা পরিত্যাগ করতে পারত না, বরং সেখানে তাকে থাকতে হতো এবং ইবাদতখানাকে ঝাড়ু দিতে হতো।"

৬৮৭৪. দাহ্‌হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "ইমরান (র.)–এর স্ত্রী তার ভাবী সন্তানকে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে উৎসর্গ করলেন এবং তাদের খিদমতের জন্যেও নিয়োজিত করলেন, যারা সেখানে কিতাব পড়তেন ও পড়াতেন।"

৬৮৭৫. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইমরান (র.)–এর স্ত্রী ছিলেন বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা। তাঁর নাম ছিল হান্নাহ। তিনি সন্তান প্রসব করতে সক্ষম ছিলেন না। তাই তিনি সন্তানের জন্যে অন্যান্য স্ত্রীলোকের প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তারপর তিনি বললেন, "ইয়া আল্লাহ্! যদি আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করেন, তাহলে আমি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্যে উৎসর্গ করে দেব। এটা আপনার প্রতি আমার মানত। তারপর আমার সন্তান বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" ইকরামা (র.) আরো বলেন, "অত্র আয়াতাংশ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا –এর অর্থ হচ্ছে, তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্যে মুক্ত ও উৎসর্গ করে দেয়া হবে।"

৬৮৭৬. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ الآيَةَ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "প্রথম তিনি তাঁর গর্ভে যা রয়েছে তা উৎসর্গ করেন এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেন ও পরিত্যাগ করেন।"

(٣٦) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ؕ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

৩৬. "এরপর যখন সে তাকে প্রসব করল, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। ছেলে তো মেয়ের মত নয়, আমি তাহার নাম মারইয়াম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্যে তোমার শরণ নিতেছি।"

ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "অত্র আয়াতাংশ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا –এর অর্থঃ যখন হান্নাহ তাঁর মানত প্রসব করেন। আর এজন্য مونث –এর ضمير যথা " ها " –কে ব্যবহার করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, " ها " নামের দ্বারা " ما " অক্ষরটি যা অত্র আয়াতাংশ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا । –এ উল্লেখ রয়েছে। এ উক্তির উত্তরে ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "তাহলে বাক্যটি হতো فلما وضعته قالت " رَبِّ انى وضعته انثى " অর্থাৎ সর্বত্র مذكر –এর ضمير ব্যবহার হতো। কিন্তু বস্তুত তা হয়নি। কাজেই وضعتها -এ উল্লিখিত " ها "–এর مرجع হবে النذيرة অর্থাৎ মানতের বস্তু।" তিনি আরো বলেন, " وضعتها " এর অর্থ হচ্ছে وَلَدَتْهَا অর্থাৎ আমি প্রসব করেছি। এজন্যই কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসব করলে বলা হয়ে থাকে وضعت المراة অথবা ভবিষ্যতে প্রসব করবে এরূপ হলে বলা হয়ে থাকে تضع وضعا –। পরবর্তী আয়াতাংশে বলা হয়েছে ঃ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى অর্থাৎ وَلَدَتُ النَّذِيرَةَ أُنْثَى কিংবা আমি মানতটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি অথচ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তিনি কি প্রসব করেছেন।

অত্র আয়াতাংশ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ –এ উল্লিখিত " وضعت " শব্দটির পঠন পদ্ধতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ " وَضَعَتْ " –কে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সংবাদ হিসাবে مونث–এর صيغه–তে পাঠ করেছেন। অর্থাৎ হান্নাহ (র.)–এর رب انى وضعتها বলার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা অধিক জানেন যে, তিনি কি প্রসব করবেন। কিছু সংখ্যক মুতাকাদ্দিমীন বা প্রাচীন কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ وضعتُ কে رفع দিয়ে واحد متكلم - صيغهএর হিসাবে পাঠ করেছেন। তখন এটা হান্নাহ (র.)–এর পক্ষ থেকে সংবাদ পরিবেশন করা বুঝাবে। তিনি বলেন, "আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আমার থেকে অধিক জানেন যে, আমি কি প্রসব করেছি।"

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত দু'টি পাঠ পদ্ধতির মধ্যে ঐ পাঠরীতিই অধিক গ্রহণযোগ্য যা মশহূর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর এ পাঠরীতির বিশুদ্ধতার বিষয়ে কেউ প্রতিবাদও

করতে পারে না। আর তা হলো, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتُ অর্থাৎ واحد مونث- এর صيغه সহকারে পাঠ করা। তবে وَضَعْتُ পড়া পাঠরীতির বিচারে নগণ্য হওয়ায় মশহুর পাঠরীতির মুকাবিলায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে-"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত মাখলুক থেকে অধিক জ্ঞাত যে, বিবি হান্নাহ কি প্রসব করেছেন।" তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বিবি হান্নাহ (র.) -এর বর্ণনা উল্লেখ করেন। বিবি হান্নাহ (র.) তাঁর প্রতিপালকের কাছে মানত সম্বন্ধে ওযর পেশ করেছিলেন وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى অর্থাৎ ছেলে তো মেয়ের মতো নয়। অথচ তিনি পূর্বে তার গর্ভস্থ সন্তানকে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাকে স্বীয় প্রতিপালকের ঘরের খিদমতের জন্যে একেবারে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এখন তিনি ওযর পেশ করে বলেন, '"ছেলে তো মেয়ের মত নয়।" কেননা, ছেলে খিদমতের জন্যে মেয়ে থেকে অধিক শক্তিশালী হয় এবং ছেলেই বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য অধিক উপযুক্ত। আর মেয়ে অনেক সময় পবিত্র ঘরে প্রবেশ করার উপযোগী থাকে না এবং ঝাড়ু দেয়ারও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যেমন- হায়য ও নিফাস দেখা দিলে মেয়েরা মসজিদে প্রবেশ করতে পারে না। তারপর বিবি হান্নাহ (র.) বলেন, 'আমি তার নাম রেখেছি 'মারয়াম'।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৮৭৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবাইয়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "এ ঘটনাটি ঘটে যখন বিবি হান্নাহ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যে মানত মেনেছিলেন এবং মানতকে মসজিদের খিদমতের জন্য একান্ত মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন।"

৬৮৭৮. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "ছেলে তো মেয়ের মত নয়। কারণ ছেলে-মেয়ের থেকে খিদমতের জন্যে অধিক শক্তিশালী।"

৬৮৭৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়াতাংশ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, "মেয়েরা এ কাজের জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। অর্থাৎ মসজিদের খিদমতের জন্যে তাদেরকে উৎসর্গ করা যেত না। কেননা, তাদেরকে সেখানে থাকতে হতো ও ঝাড়ু দিতে হতো। অথচ, তাদের হায়েযের ন্যায় সমস্যার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এসব অসুবিধার কথা স্মরণ করেই বিবি হান্নাহ (র.) বললেন, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى অর্থাৎ "ছেলে তো মেয়ের মত নয়।"

৬৮৮০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা শুধুমাত্র ছেলেদেরকে উৎসর্গ করত। তিনি আরো বলেন, এজন্যই বিবি হান্নাহ (র.) বলেছিলেন, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ অর্থাৎ ছেলে তো মেয়ের মত নয় এবং আমি এর নাম রাখলাম 'মারয়োম।"

৬৮৮১. হযরত রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি 'মারইয়াম' (র.)-এর জন্ম প্রসঙ্গে বলেন, ইমরান (র.)-এর স্ত্রী তাঁর গর্ভের সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র জন্যে উৎসর্গ করলেন এবং তিনি এ আশায় ছিলেন যে, তাকে ছেলে সন্তান দান করা হবে। কেননা, মেয়েরা তো মসজিদের খিদমতের কাজ আঞ্জাম দিতে

পারে না। মসজিদে সর্বদা অবস্থান করা ও ঝাড়ু দেয়ার ন্যায় খিদমত করা তাদের বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সম্ভব হয়ে উঠে না।

৬৮৮২. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বিবি মারইয়াম (র.)–এর জন্ম–বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বলেন, ইমরান (র.)–এর স্ত্রী মনে করেছিলেন যে, তাঁর গর্ভে ছেলে সন্তান রয়েছে। তাই তিনি তা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে উৎসর্গ করেন, যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে নিবেদন করলেন যে, হে আমার প্রতিপালক ! আমিতো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। আর ছেলে তো মেয়ের মত নয়। তিনি আরো বলেন, ছেলেদেরকেই শুধু উৎসর্গ করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তখন ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা সে প্রসব করেছে। তখন বিবি হান্নাহ্ (র.) বলেন, আমি তার নাম মারইয়াম রাখলাম।

৬৮৮৩. হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی –এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিবি হান্নাহ্ (র.) যখন মানত প্রসব করেন, তখন বলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। আর ছেলে তো হায়েয, নিফাস ইত্যাদিতে মেয়ের মত অপারগ নয় এবং কোন মেয়েলোকের পক্ষে পুরুষদের সাথে সহ–অবস্থান করা সঙ্গত নয়।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ وَاِنِّیْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (নিশ্চয়ই আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আপনার আশ্রয়ে দিতেছি।)

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ وَاِنِّیْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, হান্নাহ (র.) কন্যা সন্তান প্রসব করার পর বলেন, হে আমার প্রতিপালক। অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার জন্য ও তার বংশধরদের জন্যে তোমার শরণ নিতেছি। শরণের প্রকৃত উৎস এবং আশ্রয়স্থল ও নিরাপত্তার স্থান হলো আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনার প্রতি–উত্তর দিলেন এবং তাঁকে ও তাঁর বংশধরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করলেন। এজন্য মারয়াম (র.)–এর উপর তার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে পেশ করা হলো ঃ

৬৮৮৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যখনই কোন আদম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই শয়তান তাকে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়। তাতে নবজাতক চীৎকার দিয়ে উঠে। তবে ইমরান (র.)–এর কন্যা মারইয়াম (র.)–এর ব্যাপারটি ভিন্নরূপ। কেননা, যখন হান্নাহ (র.) তাঁর মানত অর্থাৎ মারইয়াম (র.)–কে প্রসব করেন, তখন বলতে লাগলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি, আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ নিতেছি। তখন একটি পর্দা দ্বারা তাকে আড়াল করা হলো এবং শয়তান সেই পর্দাকে স্পর্শ করল।

৬৮৮৫. অন্য এক সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আদম (আ.)–এর সন্তানদের যে কোন নবজাতক জন্ম নিলেই শয়তান তাকে স্পর্শ করতে

সক্ষম হয়। আর এ কারণেই নবজাতক চীৎকার দিয়ে উঠে। কিন্তু ইমরান (র.)–এর কন্যা মারইয়াম (র.) ও তাঁর সন্তান ঈসা (আ.)–এর বিষয়টি ছিল ভিন্নরূপ। কেননা, মারইয়াম (র.)–এর মাতা হান্নাহ্ (র.) যখন তাঁকে প্রসব করেন, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আমি মারইয়াম (র.) ও তার বংশধরের জন্য অভিশপ্ত শয়তান থেকে তোমার শরণ নিতেছি। তারপর তাদের দু'জনের সামনে পর্দা এসে যায়, তাতে শয়তান স্পর্শ করে চলে যায়।

৬৮৮৬. অন্য সনদেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেন।

৬৮৮৭. অন্য এক সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, বনী আদমের যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে শয়তান তাকে স্পর্শ করে। তখন এ স্পর্শের কারণে সে চীৎকার দিয়ে উঠে। তবে মারইয়াম (র.) ও তাঁর সন্তানের বিষয়টি ভিন্নরূপ। এরপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, হে শ্রোতাবৃন্দ ! এ প্রসঙ্গে অত্র আয়াতটি পাঠ করা যায়। وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ অর্থাৎ মারইয়াম (র.)–এর মাতা বলেন, আর আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ নিতেছি।

৬৮৮৮. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, বনী আদমের প্রতিটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই শয়তান তাকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করে। তবে মারইয়াম (র.) ও তার সন্তানকে পারনি।

৬৮৮৯. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি আদম সন্তান জন্ম নেয়ার দিনই তাকে শয়তান স্পর্শ করে। কিন্তু মারইয়াম (র.) ও তাঁর সন্তানকে স্পর্শ করতে পারেনি।

৬৮৯০. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অন্য এক সূত্রেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬৮৯১. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখনই কোন নবজাতক জন্ম নেয়, তখন তাকে শয়তান স্পর্শ করে। আর শয়তানের এ স্পর্শের দরুন সে চীৎকার করতে থাকে। কিন্তু মারইয়াম (র.) ও তাঁর সন্তানকে স্পর্শ করতে পারেনি। তারপর আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তোমাদের কেউ ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পার ঃ وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ অর্থাৎ মারইয়াম (র.)–এর মাতা বলেন, "এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার আশ্রয় নিচ্ছি।"

৬৮৯২. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কোন নবজাতক জন্ম নিলেই শয়তান তাকে একবার কিংবা দু'বার স্পর্শ করে, কিন্তু ঈসা ইবন মারইয়াম (আ.) ও মারইয়াম (র.)–কে স্পর্শ করতে পারেনি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেনঃ وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ অর্থাৎ মারইয়াম (র.)–এর মাতা হান্নাহ (র.) বলেন, "এবং আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার আশ্রয় নিচ্ছি।"

৬৮৯৩. ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন নবজাতক ভূমিষ্ঠ হবার পর চীৎকার করে উঠে, তবে মাসীহ ইবন মারইয়াম (আ.) ব্যতীত। শয়তান তার উপর প্রভাব ফেলতে পারেনি এবং তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

৬৮৯৪. ওয়াহ্‌ব ইবন মুনাব্বিহ্ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ঈসা (আ.) ভূমিষ্ঠ হন, তখন ছোট ছোট শয়তানগুলো ইবলীসের কাছে এসে বলল, মূর্তিগুলো স্বীয় মাথা নত করে ফেলেছে। ইবলীস বলল, এটা কোন একটা ঘটনা সংঘটিত হবার পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে। সে আরো বলল, তোমরা তোমাদের স্থানে অবস্থান কর বা অপেক্ষমাণ থাক। এ বলে সে উড়ে চলল এবং পৃথিবীর পূর্ব–পশ্চিমে প্রদক্ষিণ করল, তবু কিছুই দেখতে পেল না। এরপর সমুদ্রসমূহে গমন করল, তথায়ও কিছু পেল না। তারপর সে আবার ভূমন্ডলে উড়তে লাগল এবং হযরত ঈসা (আ.)–কে দেখতে পেল যে, তিনি গাধার তৃণভান্ডে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে রয়েছেন। সুতরাং এদৃশ্য দেখার পর ইবলীস অন্যান্য শয়তানের কাছে ফিরে এলো এবং বলল, একজন নবী গত রাতে জন্ম নিয়েছেন। কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হলে কিংবা সন্তান প্রসব করলে আমি সেখানে উপস্থিত থাকি। কিন্তু এ স্ত্রীলোক অর্থাৎ মারইয়াম (র.)–এর কাছে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। তখন অন্যান্য শয়তানরা নিরাশ হয়ে পড়ল একথা চিন্তা করে যে, এ রাতের পর মূর্তির পূজা, অর্চনা আর পূর্বের ন্যায় জৌলুস সহকারে সম্পাদিত হবে না। ইবলীস তাদেরকে আদেশ দিল যে, তোমরা বনী আদমের কাছে গিয়ে ক্ষিপ্রতার মাধ্যমে প্রতারিত করতে চেষ্টা করবে।

৬৮৯৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকে শয়তান তার একপাশে স্পর্শ করে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাদের মধ্যেও শয়তানের মধ্যে একটি পর্দা বা আড়াল সৃষ্টি করা হয়েছিল। তখন সে পর্দায় স্পর্শ করেছিল কিন্তু তাদের কাছে শয়তানের স্পর্শ পৌছতে পারেনি। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আরো বর্ণনা এসেছে যে, তারা অন্যসব আদম সন্তানের ন্যায় পাপে লিপ্ত হতেন না। তিনি বলেন, আমাদের কাছে আরো বর্ণনা এসেছে যে, ঈসা (আ.) যেমন স্থলভাগের উপর দিয়ে ভ্রমণ করতেন, অনুরূপ জলভাগের উপর দিয়েও ভ্রমণ করতেন। আর তা সম্ভব হতো ইয়াকীন ও ইখলাস কিংবা দৃঢ়তা ও একাগ্রতার দরুন যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে দান করেছিলেন।

৬৮৯৬. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَإِنِّىٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকে শয়তান তার এক পার্শ্বে স্পর্শ করে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) ও তার মাতাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তারা দু'জনে অন্য আদম সন্তানের ন্যায় পাপের কাজে লিপ্ত হতেন না। তিনি আরো বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করে বলেন যে, তিনি আমাকে ও আমার মাতাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছিলেন। সে জন্যই আমাদের ক্ষেত্রে ইবলীসের কোন অধিকার ছিল না।

৬৮৯৭. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন তার এক পার্শ্বে শয়তান স্পর্শ করে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.)–কে স্পর্শ করতে পারেনি। কেননা, যখন শয়তান তাঁকে স্পর্শ করতে যায়, তখন সে পর্দায় স্পর্শ করেছিল।

৬৮৯৮. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তুমি কি সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার কালে চীৎকার করে কাঁদতে দেখেছ? এটা অর্থাৎ কান্নাটা ঐটার অর্থাৎ শয়তানের স্পর্শের দরুন।

৬৮৯৯. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকে ভূমিষ্ঠ হবার কালে শয়তান স্পর্শ করে এবং সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে।

(٣٧) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৭. তারপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে উত্তমরূপে বর্ধিত করলেন এবং উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখনই তাঁর নিকট খাদ্য সামগ্রী দেখতেন এবং তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মারইয়াম! এসব তুমি কোথা থেকে পেলে? তিনি জবাব দিতেন। তা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ প্রদান করে থাকেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মারইয়াম (র.)–এর মাতা থেকে বিবি মারয়াম (র.)–কে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর মাতা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমত এবং তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

এ আয়াতাংশে উল্লিখিত قبول শব্দটি মাসদার (مصدر), তবে তা فعل =–এর باب অনুযায়ী হয়নি অর্থাৎ من غير لفظ الفعل হয়েছে। কেননা, যদি لفظ الفعل –এর অনুযায়ী হতো তাহলে বাক্যটি হত নিম্নরূপ ঃ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا تَقَبُّلًا حَسَنًا –। আরবী ভাষাভাষীরা প্রায়ই فعل –এর اصول অনুযায়ী مصدر ব্যবহার করে থাকেন। যদিও কোন কোন সময় فعل –এর মধ্যে الفاظ অতিরিক্ত হয়ে থাকে। যেমন, তারা বলে থাকে تَكَلَّمَ فُلَانٌ كَلَامًا অথচ যদি مصدر টি فعل –এর باب অনুযায়ী হতো, তাহলে, বাক্যটি হতো تَكَلَّمَ فُلَانٌ تَكَلُّمًا –। অনুরূপভাবে পরবর্তী বাক্যাংশ اَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا - وَاَنْبَتَهَا اَنْبَاتًا حَسَنًا হবার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে হয়েছে প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণবিদ আবূ আমর ইব্‌নুল্ আলা (র.) বলেছেন যে, তারা আরবদেরকে قبول শব্দটি ق অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়তে শুনেননি। অথচ যুক্তি মতে ق –এ পেশ দিয়ে পড়ারই কথা ছিল। কেননা, তদ্রূপ مصدر

যেমন, دُخُولٌ এবং خُرُوجٌ শব্দ দ্বয়ের فاء كلمه অথবা প্রথম অক্ষরে পেশ হয়ে থাকে। আরো বলা হয়ে থাকে যে, আরবী ভাষাভাষীদেরকে এরূপ অন্য কোন শব্দের প্রথম অক্ষরে পেশ দিয়ে পড়তে শুনা যায়নি।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯০০. হযরত আবূ আমর (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَاَنْبَتَهَانَبَاتًاحَسَنًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তার প্রতিপালক তাকে উত্তম খাদ্য খাবারের মাধ্যমে উত্তমরূপে লালন–পালন করেছেন। যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল এবং পূর্ণ যুবতী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

৬৯০১. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ– এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিবি মারইয়াম (র.)–এর মাতা বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য তার কন্যাকে উৎসর্গ করেছেন তা আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মারইয়াম (র.)–এর মাতা থেকে গ্রহণ করেন, তাকে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দেন এবং উত্তমরূপে লালন–পালন করেন। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের দেয়া খাদ্য–খাবারে লালন–পালন করান।

وكفلها زكريا আয়াতাংশে উল্লিখিত كفلها শব্দটির পাঠরীতিতে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একাধিক মত রয়েছে। হিজায, মদীনা ও বসরার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ كفلها শব্দটি ف –কে تشديد বিহীন পড়েন। তখন বাক্যাংশের অর্থ হয় যাকারিয়া (আ.) তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। তাদের দলীল হিসাবে কুরআনুল করীমের এক আয়াতাংশকে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ৪৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ অর্থাৎ "বিবি মারইয়াম (র.)–এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্য থেকে কে গ্রহণ করবে নির্ধারণের জন্য যখন তারা তাদের কলম নদীতে নিক্ষেপ করেছিলেন।" আবার কূফার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ كَفَّلَهَا শব্দটির "ف" –কে تشديد সহকারে পড়েছেন। তখন বাক্যাংশের অর্থ হবে وَكَفَّلَهَا اللّٰهُ زَكَرِيَّا অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা মারইয়াম (র.)–কে যাকারিয়া (আ.)–এর তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন।"

আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উল্লিখিত দু'টি পঠন পদ্ধতির মধ্যে كفلها শব্দটির "ف" তে تشديد সহকারে যে সব কিরাআত বিশেষজ্ঞ পড়েছেন, তাদের পাঠ পদ্ধতি অধিক গ্রহণীয়। তখন আয়াতাংশের অর্থ হবে كَفَّلَهَا اللّٰهُ زَكَرِيَّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যাকারিয়া (আ.)–এর তত্ত্বাবধানে লালন–পালন করেন। হযরত যাকারিয়া (আ.)–ও তাকে আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতিক্রমে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়েছিলেন। কেননা, তিনি লটারীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা লটারীর মাধ্যমে বিবি মারইয়াম (র.)–কে যাকারিয়া (আ.)–এর কাছেই অর্পণ করলেন। সূরা আলে ইমরানের ৪৪নং আয়াত বিবি মারইয়াম (র.) সম্বন্ধে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতকারীদের প্রতিযোগিতার সংবাদ পরিবেশন করছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাকারিয়া (আ.)–কে তাদের মধ্যে তাঁর জন্য শ্রেয় বলে লটারীর মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত যা আমাদের কাছে পৌছছে তা এরূপ ঃ

হযরত যাকারিয়া (আ.) ও তাঁর প্রতিযোগীদের মধ্যে হযরত মারইয়াম (র.)–এর তত্ত্বাবধান সম্পর্কে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হলে লটারীর উদ্দেশ্যে তাঁরা পানি পান করার পেয়ালা জর্দান নদীতে নিক্ষেপ করেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন। হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর পেয়ালা নদীর বুকে দণ্ডায়মান রইল, তার মধ্যে কোন পানি প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু অন্যদের পেয়ালায় পানি প্রবেশ করে ও সেগুলো নদীর পানিতে ডুবে যায়। এরূপে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর দাবীকে প্রতিযোগীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হিসাবে প্রমাণ করে দিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর পেয়ালা নদীর পানির উপরে স্থির রইল। কিন্তু, অন্যদের পেয়ালা পানির স্রোতে ভেসে গেল। এটাই ছিল হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার একটি আলামত। উপরোক্ত দু'টি প্রক্রিয়ার যেটিই শুদ্ধ হোক না কেন, এতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে যে, প্রতিযোগীদের মধ্যে হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন এ ব্যাপারে উত্তম। উপরোক্ত ঘটনায় দেখা যায় যে, হযরত যাকারিয়া (আ.) তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেলেন। আবার তা–ও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী।

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, অধিকতর শুদ্ধ পাঠ পদ্ধতি যা আমরা গ্রহণ করেছি অর্থাৎ كفلها শব্দের ف –কে تشديد সহকারে পাঠ করা। আর যারা ف অক্ষরকে تشديد বিহীন পড়েছেন, তারা তাদের দলীল হিসাবে أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ আয়াতাংশ উল্লেখ করেছেন। যেখানে ف –কে ت شديد বিহীন পড়া হয়েছে। কাজেই তাদের كفلها শব্দের ف কেও تشديد বিহীন পড়ার বৈধতা প্রমাণ হয়ে যায়। তবে তাদের এ দলীল তাদের দাবীর দুর্বলতাই প্রমাণ করে। কেননা, যে কোন বুদ্ধিমানের কাছে নিম্ন বাক্যটি উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ নয়। যেমন সে বলে, كفل فلان فلانا فكفله فلان অর্থাৎ অমুক অমুকের যামিন হয়েছে এবং সে তাকে লালন–পালন করেছে। তদ্রূপ সূরা আলে- ইমরানের ৪৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মারয়াম (র.)-কে তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে। আর এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের কলম নিক্ষেপের দ্বারা পরিচালিত লটারীর মাধ্যমে হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর উপরে অর্পণ করেছেন।

كَفَّلَهَا শব্দের পাঠ পদ্ধতির ন্যায় زَكَرِيَّا শব্দের পাঠ পদ্ধতিতেও কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে একাধিক মত দেখা যায়। মদীনা শরীফের অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ مد সহকারে পাঠ করেন এবং কূফার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ مد বিহীন পাঠ করেন। অথচ, দুটো পাঠরীতিই সুপরিচিত এবং এ দুটো পদ্ধতিই মুসলিম উম্মাহ্র কাছে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। কোন পাঠরীতিই অন্য পাঠরীতির বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে না। তাই যে কোন পদ্ধতিতেই পড়া হোক না কেন, তা শুদ্ধ বলেই বিবেচিত। তবে আমাদের কাছে অধিক শুদ্ধ হলো مد সহকারে পাঠ করা এবং تنوين ব্যতীত زبر দিয়ে পাঠ করা। কেননা, এটা অনারবী শব্দ। তাই শব্দের কোন রূপান্তর হয় না। অধিকন্তু, كَفَّلَهَا শব্দে আমাদের মনোনীত পাঠ পদ্ধতি হলো ف –কে تشديد সহকারে পাঠ করা। কাজেই, এ فعل –এর কারণে زكريا –কে مفعول হিসাবে খবর দিয়ে পড়া হয়ে থাকে।

زكريا শব্দের তৃতীয় পাঠ পদ্ধতি হলো ঃ زَكَرِىٌّ - । মুসলিম মিল্লাতের পঠনরীতি–, পরিপন্থী বিধায় তা গ্রহণীয় নয়। আর زكرى অর্থাৎ مد – কে حذف করে এবং ى – কে ساكن করে পড়া। ياء ও جر ও تنوين যুক্ত اسم نسبتى গুলোর ন্যায় বিভিন্ন اعراب – رفع – نصب – جر – এর স্থলে দিয়ে পড়া হয়। তখন বাক্যাংশের অর্থ হবে وَضَمَّهَا اللّٰهُ اِلٰى زَكَرِيَّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যাকারিয়া (আ.)–এর তত্ত্বাবধানে অর্পণ করেন। যেমন কোন এক কবি বলেছেনঃ فَهُوَ لِضُلَّالِ الهَوَامِ كَافِلٌ অর্থাৎ সে পশুগুলো হারিয়ে যাবার জন্য দায়ী। অন্য কথায়, যখন বিভিন্ন জন্তু, জানোয়ার হারিয়ে যায়, তখন সে নিজের দিকে দায়িত্ব প্রত্যাবর্তন করে। আবার কবির কথাটিকে এরূপও বলা হয়েছে فَهُوَ لِضُلَّالِ الهَوَافِى كَافِلٌঅর্থাৎ সে দ্রুতগামী উটগুলোর হারিয়ে যাবার জন্য দায়ী। অন্য কথায়, যখন জন্তু–জানোয়ার হারিয়ে যায় তখন সে নিজের দিকে দায়িত্ব প্রত্যাবর্তন করে। যখন উট ইত্যাদি দ্রুত চলে, তখন আরবরা বলে هفا الظليم —এর থেকেই কোন ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে مالك تكفل كل ضالة অর্থাৎ তুমি কেন প্রত্যেকটি হারানো জন্তুর দায়িত্ব নিচ্ছ। অন্য কথায়, তুমি এগুলোর দায়িত্ব নিজের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছ ও এগুলোকে ধরছ কেন?

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯০২. ইক্রামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ – এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রতিযোগী সকলে তাদের কলম নদীতে ফেলেন। স্রোত এগুলোকে নিয়ে গেল, কিন্তু যাকারিয়া (আ.)–এর কলম স্রোতের উজানে উঠল। তাই মারইয়াম (র.)–এর লালন–পালনের দায়িত্ব যাকারিয়া (আ.) গ্রহণ করেন।

৬৯০৩. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটির অর্থ হচ্ছে, যাকারিয়া (আ.) তাকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিলেন। তিনি আরো বলেন, তাঁরা তাঁদের কলম কিংবা নদীতে নিক্ষেপ করেন। তাঁরা স্রোতের দিকে নিক্ষেপ করেন। যাকারিয়া (আ.)–এর ছড়ি পানির স্রোতের মুকাবিলা করে। তখন যাকারিয়া (আ.) তাদেরকে লটারীর মাধ্যমে হারিয়ে দিলেন।

৬৯০৪. হযরত সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا – এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মারইয়াম (র.) যখন পয়দা হন, তখন তাঁর মাতা তাঁকে একটি কাপড়ের টুকরায় আবৃত করে মসজিদের মিহরাবে নিয়ে আসলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, যখন তিনি পূর্ণ বয়স্কা হন, তখন তাঁর মাতা তাঁকে মিহরাবে নিয়ে যান। বায়তুল মুকাদ্দাসে বসে যারা তাওরাত লিখতেন, তাদের নিকট কোন মানুষ মানতের ছেলে নিয়ে গেলে তাকে নিয়ে তারা লটারীতে অংশগ্রহণ করতেন এবং সিদ্ধান্ত নিতেন যে, কে তাকে নেবে, ও বিদ্যা শিক্ষা দেবেন। ঐ সময় হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন হযরত মারইয়াম (র.)–এর খালা। যখন তাঁরা লটারী দ্বারা মীমাংসা করতে তাঁকে নিয়ে আসলেন, তখন তাদেরকে হযরত যাকারিয়া (আ.) বললেন, যেহেতু তাঁর খালা আমার স্ত্রী, সেজন্য আমি তাঁর অভিভাবক হবার ব্যাপারে তোমাদের থেকে অধিক হকদার। কিন্তু, তারা হযরত যাকরিয়া (আ.)–এর কথায় রাযী হলেন না। তাই তারা জর্দান নদীর দিকে গমন করলেন

এবং এটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে যে, কে তাঁর অভিভাবক হবেন তাঁরা তাদের তাওরাত লিখার কলমগুলো পানিতে নিক্ষেপ করলেন এ শর্তে যে, যার কলম দন্ডায়মান থাকবে, ভেসে যাবে না, সে-ই হযরত মারইয়াম (রা.)-এর লালন, পালনের দায়িত্ব নেবেন। তারপর সকলের কলম ভেসে গেল, কিন্তু হযরত যাকারিয়া (র.)-এর কলম স্থির ছিল, যেন এটা কাঁদার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজেই তিনি হযরত মারইয়াম (রা.)-এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا -এর মধ্যে একথাই বর্ণনা করেছেন। তারপর হযরত যাকরিয়া (আ.) তাঁকে ঘরে নিয়ে গেলেন। আর তা ছিল মিহরাব বা মসজিদের মধ্যে উঁচু জায়গা।

৬৯০৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো, তিনি তাঁকে নিজের পরিবারভুক্ত করে নিলেন।

৬৯০৬. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রেও বর্ণিত। তিনি وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো তিনি তাদের সাথে কলমের লটারীতে জিতলেন।

৬৯০৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৬৯০৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا -এর ব্যাখ্যায় বলেন, মারয়াম (র.) তাদের সর্দার ও ইমামের কন্যা। কাজেই তথাকার আলিমগণ তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণে একাধিক মত প্রকাশ করেন এবং লটারীর মাধ্যমে তারা নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করেন যে, কে তাঁর দায়িত্বভার লাভে ভাগ্যবান হতে পারেন। হযরত কাতাদা (র.) আরো বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) ছিলেন হযরত মারইয়াম (র.)-এর মায়ের ভগ্নিপতি। তাই তিনি তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। হযরত মারইয়াম (র.) তাঁর কাছে ছিলেন এবং তিনি তাঁকে লালন-পালন করেন।

৬৯০৯. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মারয়াম (র.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তারপর হযরত মারয়াম মাতা হযরত মারয়াম (র.)-কে একটি কাপড়ের টুকরায় আবৃত করে মূসা ইব্ন ইমরানের ভাই হারূনের ছেলে কাহিনের বংশধরদের নিকটে নিয়ে গেলেন। তারা কা'বা শরীফের খিদমত আঞ্জাম দানকারীদের ন্যায় বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমত আঞ্জাম দিতেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা এই মানতটি গ্রহণ কর, আমি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি। এটা আমার কন্যা। অথচ কোন মেয়েলোক হায়েয অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে পারে না। এমতাবস্থায় আমিও তাকে আমার বাড়ী ফেরত নিচ্ছি না। তখন তারা বললেন, তিনি আমাদের ইমামের কন্যা। ইমরান তাদের সালাতে (নামাযে) ইমামতি করতেন এবং তাদের কুরবানীর পথ প্রদর্শন ছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ.) বললেন, তোমরা সকলে তাকে আমার নিকট রেখে দাও। অর্থাৎ তার লালন-পালনের দায়িত্ব আমাকে বহন করতে দাও। কেননা, তার খালা আমার স্ত্রী। তারা বললেন, যেহেতু তিনি আমাদের ইমামের কন্যা, তাই তাঁক রেখে যেতে আমাদের অন্তরে আমরা শান্তি পাই না। তবে তা লটারীর মাধ্যমে হতে পারে। তখন তারা যে কলম দিয়ে তাওরাত শরীফ লিখতেন, সেগুলোর সাহায্যে লটারীতে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু হযরত যাকারিয়া (আ.) লটারীতে জয়লাভ করেন এবং হযরত মায়ইয়াম (র.)-এর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৬৯১০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যাকারিয়্যা (আ.) হযরত মারইয়াম (র.)–কে নিজের মিহ্রাবে রাখতেন। এ অর্থেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন " وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا "।

৬৯১১. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মারয়াম (র.)–এর মাতা ও পিতা মারা যাওয়ায় তাঁর ইয়াতীম অবস্থায় হযরত যাকারিয়া (আ.) তাকে লালন–পালন করেন। তারপর তিনি হযরত মারইয়াম (র.) ও হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

৬৯১২. হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মারইয়াম (আ.) যাকারিয়া (আ.)–এর কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

৬৯১৩. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁকে তাঁর সাথে নিজের মিহ্রাবে রাখতেন।

৬৯১৪. হযরত হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا –এর ব্যাখ্যায় বলেন, উপস্থিত জনতা তাকে উপলক্ষ করে লটারীতে অংশ নিলেন। তবে হযরত যাকারিয়া (আ.) লটারীতে জয়লাভ করেন। এবং হযরত মারইয়াম (র.)–এর লালন–পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, হান্নাহ্ –এর কন্যা মারইয়াম (র.)–এর জন্মের পর কোন প্রকার লটারী, তর্কবিতর্ক বা বাধাবিঘ্ন ব্যতীত যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–কে লালন–পালন করেছেন। আর তিনিই তাঁকে লালন–পালন করার কারণ হচ্ছে মারইয়াম (র.)–এর শৈশবকালে পিতার পর মাতাও ইনতিকাল করেন এবং খালা ইশবা বিনত ফাকূয ছিলেন যাকারিয়া (আ.)–এর স্ত্রী। আবার এটাও কথিত আছে যে, ইয়াহ্ইয়ার মাতা ও ঈসা (আ.)–এর খালার নাম ছিল আশবা।

৬৯১৫. শু'আব আল জুবাই (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়ার মাতার নাম ছিল আশবা। সুতরাং যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–কে তাঁর খালার কাছে নিয়ে আসেন। তিনি বয়োপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সাথে সহবাস করেন। বয়োপ্রাপ্ত হবার পর তাঁকে তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে দিলেন। কেননা, তাঁর মাতা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, কলমের সাহায্যে তাঁর সম্পর্কে লটারীতে খাদিমদের অংশগ্রহণের ঘটনা ছিল এর বহু পরে, যখন যাকারিয়া (আ.) তাঁর ভরণ–পোষণের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েন। তারপর তাঁরা তাঁর ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এতে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। কিংবা তার প্রতি অথবা ভরণ–পোষণ বহনের প্রতিও তাঁদের কোন আসক্তি পরিলক্ষিত হয়নি।

ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, এসব মনীষীর উধৃত উল্লেখ করে আমি উপযুক্ত স্থানে মারইয়াম (র.)–এর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ্।

৬৯১৬. উপরোক্ত বর্ণনাটি ইব্ন ইসহাক থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আর উপরোক্ত তাফসীরের আলোকে যারা وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا আয়াতাংশের " ف " -কে تشديد বিহীন পড়েছেন, তাঁদের পঠন পদ্ধতিও শুদ্ধ বলে

পরিগণিত হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ তাফসীর ও ব্যাখ্যা শুদ্ধ কি না। তবে এটা সত্য যে, প্রথমোক্ত অভিমত অধিক প্রসিদ্ধ। যদি উপস্থিত মনীষিগণ লটারীর কোন দিন আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা যাকারিয়া (আ.)-এর মারইয়াম (র.)–কে লালন–পালনের পূর্বে নিয়েছিলেন। আর এটাও সত্য যে, যাকারিয়া (আ.) লটারীতে জয়লাভ করার পরই মারইয়াম (র.)–এর ভরণ–পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এজন্যই আমাদের কাছে " فا " –কে تشديد সহ পাঠ করা উত্তম।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ মিহরাবে মারইয়াম (র.)–কে প্রবেশ করাবার পর যখনই তিনি তাকে দেখতে যেতেন, তখন তার কাছে তার খাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনোপকরণ দেখতে পেতেন।

কথিত আছে যে, তার কাছে তিনি শীতকালে গ্রীষ্মকালের ফলফলাদি দেখতে পেতেন এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলফলাদি দেখতে পেতেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯১৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর কাছে একটি থলির মধ্যে অসময়ের আঙ্গুর ফল দেখতে পেতেন।

৬৯১৮. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত رزق –এর অর্থ হচ্ছে, অসময়ের আঙ্গুর ফল।

৬৯১৯. ইব্রাহীম (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত رزق –এর অর্থ হচ্ছে অসময়ের আঙ্গুর ফল।

৬৯২০. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (র.)–এ কাছে শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল দেখতে পেতেন। আর এ তথ্যটিই আলোচ্য আয়াতাংশ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৯২১-২২-২৩. দাহ্হাক (র.) থেকে বিভিন্ন সূত্রে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে।

৬৯২৪. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (র.)–এর কাছে অসময়ে আঙ্গুর ফল দেখতে পেতেন।

৬৯২৫. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর কাছে অসময়ের আঙ্গুর ফল দেখতে পেতেন।

৬৯২৬. আল–মুছান্না (র.) হতে বর্ণিত। তিনি মুজাহিদ (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬৯২৭. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর

প্রসঙ্গে বলেন, এখানে উল্লিখিত رِزْق –এর অর্থ হচ্ছে শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল।

৬৯২৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের কাছে এ নিয়ে হাদীস বর্ণনা করা হত যে, তাঁর নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল পেশ করা হতো এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল পেশ করা হতো।

৬৯২৯. কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর কাছে অসময়ের ফলফলাদি দেখতে পেতেন।

৬৯৩০. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর জন্যে সাতটি দরজার ব্যবস্থা করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর কাছে যেতে হলে সাতটি দরজা খুলে তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব হতো। তিনি যখন তাঁর কাছে গমন করতেন তখন তাঁর নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালীন এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফলফলাদি দেখতে পেতেন।

৬৯৩১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–কে তাঁর সাথে একই বাড়ীতে অর্থাৎ মিহরাবে রাখতেন। শীতকালে যখন তিনি তাঁর কাছে যেতেন, তখন তাঁর নিকট গ্রীষ্মকালীন ফল–ফলাদি দেখতে পেতেন এবং গ্রীষ্মকালে যখন যেতেন, তখন শীতকালীন ফল, ফলাদি দেখতেপেতেন।

৬৯৩২. দাহহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (র.)–এর নিকট শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল–ফলাদি দেখতে পেতেন।

৬৯৩৩. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর নিকট জান্নাতের ফল–ফলাদি দেখতে পেতেন। শীতকালে গ্রীষ্মকালীন এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল–ফলাদি দেখতে পেতেন।

৬৯৩৪. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি কতিপয় আহলি ইলম থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালীন এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল–ফলাদি দেখতে পেতেন।

৬৯৩৫. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,যখন যাকারিয়া (আ.) মিহরাবে মারইয়াম (র.)–এর নিকট প্রবেশ করতেন, তখন তিনি তাঁর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত, মানুষের পক্ষ থেকে নয়–বরং আসমান থেকে আগত খাদ্য–খাবার দেখতে পেতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলেন, যদি যাকারিয়া (আ.) জানতেন যে, এসব খাদ্য খাবার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে, তাহলে তিনি এসব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন রাখতেন না।

আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, যাকারিয়া (আ.) যখন মিহ্রাবে মারইয়াম (র.)–এরকাছে

প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর কাছে তাঁর খরচ বাবত যেসব খাদ্য, খাবার প্রেরণ করা হতো তার থেকে অতিরিক্ত খাবার তিনি দেখতে পেতেন। তখন তিনি এ অতিরিক্ত খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯৩৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (র.)–কে তাঁর মাতার মৃত্যুর পর লালন–পালন করেন। তিনি তাঁকে তাঁর খালা উম্মে ইয়াহ্ইয়া (র.)–এর তত্ত্বাবধানে রাখেন। তারপর মারইয়াম (র.) বয়োপ্রাপ্তা হলে তাঁরা তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে আসেন। কেননা, তাঁর মাতা বায়তুল মুকাদ্দাসের জন্যে তাঁকে নির্ধারণ করে গিয়েছিলেন। তনি বড় হতে লাগলেন ও প্রতিপালিত হতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর বনী ইসরাঈলে দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়। আর এ দুর্ভিক্ষের সময়ে মারইয়াম (র.)–কে লালন–পালন করা যাকারিয়া (আ.)–এর পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে পড়ে। তখন তিনি বনী ইসরাঈলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বনী ইসরাঈল । তোমরা কি জান, আল্লাহ্ তা'আলার শপথ, আমি সুনিশ্চিত যে ইমরান (র.)–এর কন্যাকে লালন-পালন করা আমার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা তখন বললেন, আমরাও এ দুর্ভিক্ষে বিপদগ্রস্ত হয়ে রয়েছি, যেমন আপনি বিপদগ্রস্ত হয়ে রয়েছেন। কাজেই আমাদের পক্ষেও তা কতদূর সম্ভব? এরূপে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলো। তাঁদের কেউই সোজাসুজি রাযী হলেন না বিধায় তাঁরা কলমের সাহায্যে লটারীর আশ্রয় নিলেন। তাতে বনী ইসরাঈলের একজন মিস্ত্রীর নামে তার লালন–পালনের ভার সম্পর্কিত লটারী আসে। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল জুরাইজ। বর্ণনাকারী আরো বলেন, মারইয়াম (র.)জুরাইজের পক্ষে খরচ বহন করার কষ্ট ও ক্লেশ লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হে জুরাইজ ! আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার ধারণাকে আরো স্বচ্ছ কর। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি তোমার ভরসা আরো জোরদার করা কেনন, আল্লাহ্ তা 'আলা আমাদেরকে অতি শীঘ্র উত্তম রিযক দান করবেন। জুরাইজ মারয়াম (র.)–এর কাছে খাবার পৌছিয়ে দিতেন। প্রতিদিন তাঁর পরিশ্রম থেকে যে পরিমাণ খাদ্য তাঁর জন্যে যোগ্য তা পাঠিয়ে দিতেন। যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে মারইয়াম (র.)–এর কাছে জুরাইজ খাদ্য পাঠাতেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তা বাড়িয়ে দিতেন। যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর কাছে যখন প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর কাছে অতিরিক্ত খাদ্য দেখতে পেতেন। জুরাইজ যা পাঠাতেন তার চেয়ে অধিক খাবার দেখে মারয়াম (র.)–কে তিনি জিজ্ঞেসা করতেন, এ খাবার তোমার কাছে কোথা থেকে আসে? তিনি বলতেন, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।

মিহ্‌রাবের তাহকীক সম্বন্ধে ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, প্রত্যেক মজলিস কিংবা সালাত আদায় করার জায়গার অগ্রবর্তী স্থানকে মিহরাব বলা হয়। এটা মজলিসের প্রধান, সম্মানিত ও উত্তম স্থানকেই বুঝায়। অনুরূপভাবে মসজিদের অগ্রবর্তী স্থানকেও মিহরাব বলা হয়। যেমন কবি আদী ইব্‌ন যায়দ বলেছেন ঃ

كَدُمَى الْعَاجِ فِى الْمَحَارِيْبِ اَوْ كَالاَبَيْضِ فِىْ الرَّوْضِ زَهْرَهُ مُسْتَنِيْرُ

অর্থাৎ মিহরাবগুলোতে হাতীর দাঁতে খচিত ও অংকিত সুন্দর সুন্দর ছবিগুলোর ন্যায় অথবা বাগানগুলোর মধ্যে বিরাজমান ছোট ছোট চারাগাছগুলোর অংকুরগুলোর ন্যায় তার ফুলের কুঁড়ি আলো বিচ্ছুরত করছে।

উপরোক্ত কবিতার পঙক্তিতে উল্লিখিত محاريب শব্দটির একবচন হচ্ছে محراب আবার কোন কোন মিহ্‌রাব –এর বহুবচন محارب –ও এসে থাকে।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, পরবর্তী আয়াতাংশ قَالَ يَامَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–কে বললেন, হে মারয়াম ! আমি তোমার কাছে যে রিযিক দেখতে পাচ্ছি এটা তুমি কোথা থেকে পেলে? মারইয়াম (র.) তাঁর প্রতি–উত্তরে বলতেন, এটা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁকে রিযিক দান করেন। সুতরাং তিনিই তাঁর কাছে তা পাঠিয়েছেন এবং দান করেছেন। যাকারিয়া (আ.)–এর এরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (র.)–কে এমন জায়গায় স্থান দিয়েছিলেন, যেখানে পরপর সাতটি দরযা খুলে পৌঁছাতে হতো। এরপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসতেন এবং সাতটি দরজা খুলে পুনরায় তার কাছে যেতেন। তাঁর কাছে গিয়ে শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল দেখতে পেতেন এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল দেখতে পেতেন। এসব দেখে তিনি অবাক্ হয়ে যেতেন এবং আশ্চর্য হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, এগুলো তুমি কোথা থেকে পেলে? প্রতি–উত্তরে মারইয়াম (র.) বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে।

৬৯৩৭. ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীসটি রবী' (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

৬৯৩৮. ইব্‌ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি সংখ্যক তাফসীরকার থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন।

৬৯৩৯. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু অত্র আয়াতাংশ يَامَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যাকারিয়া (আ.) মারয়াম (র.)–এর কাছে এমন সময় তাজা ফলের কাঁদি দেখতে পেতেন, যখন ঐধরনের ফল কারোর কাছে পাওয়া যেত না। তাই যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–কে জিজ্ঞেসা করতেন, এটা তুমি কোথা থেকে পেলে?

উপরোক্ত সনদে বর্ণিত আছে যে, ইবন আব্বাস (রা.) অত্র আয়াতাংশ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ মাখলূকাত থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ রিযিক এত পরিমাণে দান করেন, যার কোন হিসাব নেই আর কোন বান্দার কাছে তার সংখ্যাও জানা নেই। আর এ দানের কোন হ্রাস নেই। অনুরূপভাবে তাঁর ভান্ডারের কোন হ্রাস নেই। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর রাজত্বের পুরাপুরি হিসাব রাখেন। তাঁর নিকটবর্তী যারা রয়েছেন, তাদের সম্পর্কেও তার পুরাপুরি জ্ঞান রয়েছে। তিনি কাউকে তার হিসাবের বাইরে রিযিক দান করেন না, কেননা তাঁর রিযিকের হিসাব মাখলূকাত বা সৃষ্টি কর্তৃক অসম্ভব হলেও তাঁর কাছে তার যথাযথ হিসাব রয়েছে। যার সম্পদ সীমাবদ্ধ সে কাউকে অপরিমিত সম্পদ দান করতে পারে না। কেননা, তার ভান্ডার শেষ হয়ে যাবার বা হ্রাস পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার যে নিজের সম্পদের পুরাপুরি হিসাব সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না, তার পক্ষেও অপরিমিত দান করা সম্ভব নয়।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(৩৮) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তাঁর প্রতিপালকের নিকট দু'আ করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি আপনার নিকট হতে সৎ বংশধর দান করুন। আপনিই দু'আ প্রার্থনা শ্রবণকারী?

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ –এর অর্থ হচ্ছে, যাকারিয়া (আ.) যখন দেখলেন, মারইয়াম (র.)–এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা এমন রিযিক প্রেরণ করছেন, যার প্রেরণের ব্যাপারে কোন মানুষকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার তিনি করেননি। আর তিনি যখন মারইয়াম (র.)–এর সামনে এমন তাজা ফল–ফলাদি দেখতে পেলেন, যে ফল তখনকার মওসুমে পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাওয়া সম্ভব হয়নি। তখন তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা ও নিজে বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পুত্র সন্তান লাভের আশা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন মারইয়াম (র.)–কে জনমানবশূন্য অবস্থায় শীতকালে গ্রীষ্মকালীন এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল–ফলাদি দান করছেন আর এরূপ ঘটনা তখনকার যুগে মানুষের মধ্যে প্রচলনও ছিল না, বরং এর বিপরীত প্রচলন ছিল। অনুরূপভাবে বন্ধ্যা মেয়েলোকের সন্তান প্রসব করার নিয়মও তখনকার যুগে প্রচলিত ছিল না এবং এটার বিপরীতই প্রচলিত ছিল। তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সন্তান লাভের কামনা করেন এবং সৎ বংশধর লাভের নিমিত্ত তাঁর কাছে আকাংক্ষা প্রকাশ করেন। কেননা, কথিত আছে, তখনকার দিনে যাকারিয়া (আ.)–এরবংশধর প্রায় খতম হবার পথে ছিল।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯৪০-৪১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যখন যাকারিয়া (আ.)মারইয়াম (র.)–এর এরূপ অবস্থা দেখলেন অর্থাৎ শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল–ফলাদি এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল–ফলাদি তাঁর কাছে দেখতে পেলেন, তখন তিনি নিজ মনে বলতে লাগলেন, যে প্রতিপালক মারইয়াম (র.)–কে অসময়ে এটা দান করতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সৎ বংশধর দান করতে পারেন। এজন্যে তিনি পুত্র লাভের আকাংক্ষা প্রকাশ করেন। তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করতে লাগলেন। এরপর তিনি তাঁর প্রতিপালককে গোপনে ডাকতে লাগলেন এবং বললেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَائِىْ وَكَانَتِ امْرَأَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا -

অর্থাৎ "আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে। হে আমার প্রতিপালক। তোমাকে আহবান করে আমি কখনও ব্যর্থ হয়নি। আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের

সম্পর্কে ; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী; যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকূবের বংশের। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে কর সন্তোষভাজন। (১৯ ঃ ৪–৬)। তিনি আরো বলেন,

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

তিনি আরো বলেন, رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ – হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখনা। তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২১ ঃ ৮৯)

৬৯৪২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন যাকারিয়া (আ.) মারইয়াম (র.)–এর কাছে তা দেখলেন অর্থাৎ শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল–ফলাদি এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল–ফলাদি, তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, 'যে সত্তা মারইয়াম (র.)–এর নিকট অসময়ে এটা প্রদান করতে পারেন, তিনি আমাকেও পুত্র সন্তান প্রদান করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআ'লা ইরশাদ করেন ঃ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ অর্থাৎ " সেখানেই যাকারিয়া (আ.) তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেন।"

৬৯৪৩. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যাকারিয়া (আ.) মিহরাবে প্রবেশ করেন, দরজা–সমূহ বন্ধ করেদেন, তাঁর প্রতিপালকের কাছে মুনাজাত করেন এবং বলেন رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে……।"

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যাকারিয়া (আ.) সম্বন্ধে বলেঃ,

(٣٩) فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৩৯. যখন যাকারিয়া (আ.) কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন; সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী।"

৬৯৪৪. ইব্ন ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ বয়সেও নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ভবিষ্যৎ বংশধারা রক্ষা করার আশায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুনাজাত করেন, رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি আপনার নিকট হতে সুসন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দু'আ শ্রবণকারী।) এরপর তিনি বিনীতভাবে তাঁর আরযী এভাবে তারপর পেশ করলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا اِلَى قَوْلِهِ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

(অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে, আর কখনো আমি আপনার দরবারে দু'আ করে ব্যর্থ হইনি। আমার পর আমার আপন জনদের ব্যাপারে আশংকা করি আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাই আপনি আপনার নিকট থেকে দান করুন একজন উত্তরাধিকারী। যে আমার এবং ইয়াকূব বংশের উত্তরাধিকারীত্ব করবে। আর হে আমার প্রতিপালক তাকে করুন সন্তোষভাজন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَبِالاية (অর্থাৎ যখন হযরত যাকারিয়া (আ.) কক্ষে নামাযে দন্ডায়মান ছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বললেন--"

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র.) বলেন, رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً এ উল্লিখিত ذرية শব্দের অর্থ হচ্ছে النسل অথাৎ বংশধর এবং طيبة শব্দের অর্থ হচ্ছে المباركة অর্থাৎ বরকতময়।

৬৯৪৫. যেমন সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً - এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এ আয়াতে উল্লিখিত طيبة শব্দের অর্থ مباركة অর্থাৎ বরকতময় এবং من لدنك অর্থ হচ্ছে من عندك অর্থাৎ তোমার নিকট হতে।"

"অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত ذرية শব্দটি বহুবচন। তবে এটা কোন কোন সময় এক বচনেও ব্যবহৃত হয়। আর অত্র আয়াতাংশে তা একবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا

অর্থ ঃ তোমার তরফ থেকে আমাকে দান কর একজন উত্তরাধিকারী (ঃ ৫)

এখানে اولياء বা বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেননি। الزرية শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। তাই طيبة শব্দটিও অনুরূপভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কবি বলেছেন ঃ

اَبُوْكَ خَلِيْفَةٌ وَلَدَتْهُ اُخْرَى ٭ وَاَنْتَ خَلِيْفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالِ

অর্থাৎ "তোমার পিতা খলীফা, তাকে জন্ম দিয়েছে অন্য এক খলীফা এবং তুমিও খলীফা এ হচ্ছে চমৎকার পরিপূর্ণতা।"

লক্ষণীয় যে, খলীফা শব্দটিকে এখানে স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং শব্দ গঠনের দিকে লক্ষ্য করে তা করা হয়েছে, অথচ خليفة কথাটি প্রকৃতপক্ষে পুংলিঙ্গ।

অন্য একজন কবি বলেছেন ঃ

كَمَا تَزْدَرِىْ مِنْ حَيَّةٍ جَبَلِيَّةٍ ٭ سُكَاتِ اِذَا مَا عَضَّ لَيْسَ بِاَدْرَدَا

অর্থাৎ "পাহাড়ী সর্প দংশন করলে সে এরূপে দংশিত বস্তুকে গ্রাস করেনা যেরূপ মাথার উপরে দেয়া রুমালের মত জাল মাথাকে আবৃত করে ফেলে।" এ কবিতার এ পংক্তিটিতে جبلية শব্দটিকে مونث লওয়া

হয়েছে, কারণ এটি حية শব্দের صفت অথচ حية শব্দটি শব্দ হত مونث হলেও কবি এখানে পরে পুংলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন বলেছেন, اذاعض কেননা حية দ্বারা সম্পর্কে বুঝান হয়নি, বরং এ সম্পর্কেই বুঝান হয়েছে। এ ধরনের পংলিঙ্গের পরিবর্তে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা শুধু ঐসব শব্দে প্রযোজ্য যেগুলোকে কোন কিছুর اسم হিসাবে গণ্য করা হয়নি যেমন دابة-ذرية-خليفة। পক্ষান্তরে যদি এগুলো দ্বারা কোন ব্যক্তির নাম বুঝান হয়, তাহলে এগুলো ঐব্যক্তিসমূহের নাম হিসাবেই প্রযোজ্য হবে। তখন কোন কিছুর فعل বা نعت এর স্ত্রীলিঙ্গ হতে পারবে না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ -এর অর্থ আপনি দু'আ শ্রবণকারী। তবে سَمِيْعٌ শব্দটি অধিক প্রশংসনীয়। কেননা, এর অর্থ হয়ে থাকে ذُوْسَمِعٍ لَّهُ অর্থাৎ এর শ্রবণকারী।

বসরার কোন কোন নাহুশাস্ত্রবিদ মনে করেন যে, এ আয়াতাংশের অর্থ اِنَّكَ تَسْمَعُ مَا تُدْعٰى بِهِ অর্থাৎ আপনাকে যেভাবেই ডাকা হোক না কেন, আপনি তা নিঃসন্দেহে শোনেন। কাজেই পূর্ণ আয়াতের অর্থ, "ঐ সময় হযরত যাকারিয়া (আ.) আপন প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার নিকট হতে সৎ ছেলে সন্তান দান করুন। যে ব্যক্তি আপনার কাছে প্রার্থনা করে, আপনি তার দু'আ শ্রবণকারী।"

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ لا اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ -

অর্থ ঃ যখন যাকারিয়া কক্ষে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বল্‌ল, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থক, নেতা, নারী–বিরাগী এবং নেককারগণের অন্তর্গত নবী (৩ ঃ ৩৯)

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, "পরবর্তী আয়াতাংশ فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ –এর পাঠরীতিতে কিরাআতে বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। মদীনা শরীফের অধিকাংশ কিরাআতে বিশেষজ্ঞ এবং কূফাও বসরার কিছু সংখ্যক কিরাআতে বিশেষজ্ঞ فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ তে تاء التانيث দিয়ে পাঠ করেছেন এবং الملائكة শব্দটিকে مَلَك– এর جمع হিসাবে গণ্য করেছেন। অনুরূপভাবে আরবগণ مذكر– এর جمع– এর পূর্বে فعل ব্যবহার করলে مونث– এর صيغة এর ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ করে اسم مونث– এর جمع– এর পূর্বে কোন فعل ব্যবহার করলে তারা مونث – এর صيغه ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, বলা হয়ে থাকে جاءت الطلحات অর্থাৎ 'তালহাগণ এসেছিল'। আবার কূফার কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ ياء সহকারে পড়ে থাকেন। তখন তার অর্থ হবে فناداه جبريل অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) তাঁকে আহবান করলেন। অন্য কথায় ملائكة কে مذكر হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি, 'আরবগণ فعل مذكر – কে مونث হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। আবার فعل مونث – কেও مذكر হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। এখানে তারা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.)–এর কিরাআতকে অনুকরণ করে এরূপ

ব্যবহার করেছেন।”

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯৪৬. আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাম্মাদ (র.)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,"ইব্ন মাসঊদ (রা.) –এর পাঠরীতিতে রয়েছে فناداه جبريل وهو قائم يصلى بالمحراب অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে সম্বোধন করলেন। যখন তিনি তাঁর কক্ষে নামায আদায় করতে দাঁড়িয়েছিলেন।”

অনুরূপভাবে একদল ব্যাখ্যাকার "فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ" আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

৬৯৪৭. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশে فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, "এখানে الملائكة বলে جبريل জিবরাঈল (আ.) –কে বুঝান হয়েছে। অনুরূপভাবে وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى আয়াতাংশে উল্লিখিত الملائكة শব্দটির দ্বারাও جبريل জিবরাঈল (আ.)– কে বুঝান হয়েছে।”

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ আয়াতাংশে জিবরাঈল (আ.) –কে বুঝান কেমন করে সঙ্গত হবে? অথচ الملائكة শব্দটি বহুবচন। প্রতি–উত্তরে বলা যায় যে, এরূপ ব্যবহার কারো কারো মতে বৈধ। বহুবচন শব্দের দ্বারা সংবাদ পরিবেশন করে একবচনের অর্থ বুঝান হয়ে থাকে। আরবগণ বলে থাকেন।" خَرَجَ فُلَانٌ عَلَى بِغَالِ الْبُرُدِ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি খচ্চরের উপর আরোহণ করে ঠান্ডার মধ্যে রাস্তায় বের হলো। এখানে بِغَال শব্দটি বহুবচন। অথচ এর দ্বারা একটি খচ্চরকে বুঝান হয়েছে। অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে رَكِبَ السُّفُنَ অর্থাৎ সে একটি নৌকায় আরোহণ করেছে। এখানে اَلسُّفُنَ শব্দটি سفينة শব্দের বহুবচন। কিন্তু এর দ্বারা একটি নৌকা বুঝান হয়েছে।

আর যখন কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কার থেকে এ সংবাদ শুনেছিলে? প্রতি উত্তরে বলা হয় – من الناس অর্থাৎ মানব জাতি থেকে। অথচ সে একজন লোক থেকে শুনেছে।

আবার কেউ কেউ বলেন–

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا অর্থাৎ এদেরকে লোকে বলেছিল, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এটা তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছিল।" (৩ ঃ ১৭৩) এখানে উল্লিখিত -قَالَ لَهُمُ النَّاسُ- এর মধ্যস্থিত النَّاس দ্বারা একজনকে বুঝান হয়েছে। কুরাআনুল করীমের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ" অর্থাৎ যখন মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়। (৩০ ঃ ৩৩) "এখানে النَّاسَ দ্বারা একজনকে বুঝান হয়েছে। এভাবে আরবরা একজনকে বুঝাবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে থাকে, এতে কোন দোষ মনে করা হয় না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ - وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى এ- উল্লিখিত وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ এর অর্থ 'ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করলেন, যখন তিনি নামাযে দন্ডায়মান ছিলেন। কাজেই, وَهُوَ قَائِمٌ আয়াতাংশ হযরত যাকারিয়া (আ.)–কে ফেরেশতাদের আহবান করার

সময়ের একটি সংবাদ এবং يصلى শব্দ القيام থেকে حال হওয়ায় نصب -এর محل এ অধিষ্ঠিত রয়েছে। অথচ তা ياء সহকারে لفظ হিসাবে رفع -এর অবস্থায় আছে। محراب শব্দটি সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। তা মসজিদের সামনের ভাগে থাকে। এ আয়াতাংশ কিরাআত أَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ -এর পাঠরীতিতেও একাধিক মত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ أَنَّ এর الف -এ فتحه দিয়ে পাঠ করেছেন, এজন্য যে, এটা فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ এর পরে - منادى হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তা বাক্যের প্রারম্ভে না হয়ে মধ্যস্থলে হওয়ায় أَنَّ হিসাবে পঠিত থাকে। কূফার কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেষজ্ঞ ان الله -তে অবস্থিত ان -এর الف এ كسره দিয়ে পাঠ করেছেন। তারা বলেন,'বাক্যটি ছিল এরূপ قالت الملائكة ان الله يبشرك -কেননা, এখানে ندا বা আহবান করার বাক্যাংশটি قول বা বাণী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণবিদগণের মতে قول এর পরে ان হয় أَنَّ হয় না। তারা আরো বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর পাঠপদ্ধতিতেও এটাকে اِنَّ পড়া হয়েছে। যেমন পড়া হয়েছে فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب يازكريا

ان اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ -। তারা আরো বলেন, زكريا শব্দে যেমন حرف ندا কোন প্রকার আমল করতে পারেনি, অনুরূপভাবে اِنَّ -তেও আমল করতে পারেনি। অর্থাৎ ان কে أَنَّ রূপে গণ্য করতে পারেনি।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, 'আমাদের কাছে أَنَّ -কে فتحه দিয়ে পাঠ করাই অধিক সমীচীন। কেননা, এটা ند -এর পরে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হবে فنادته الملائكة لك অর্থাৎ এটা সম্পর্কে ফেরেশতাগণ তাকে আহবান করলেন। পরন্তু اِنَّ কে كسره দিয়ে পাঠ করার যুক্তি বর্ণনার্থে যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) এরূপ পাঠ করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, যুক্তি প্রদর্শনকারীরা যে দাবী করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) এরূপ পাঠ করতেন, এটা তাদের ধারণা মাত্র। প্রকৃত তথ্য এরূপ নয়। অধিকন্তু আয়াতাংশ فنادته الملائكة ও أَنَّ -এর মধ্যে يازكريا শব্দটি প্রতিবন্ধক হিসাবে পতিত হয়েছে। ندا ও أَنَّ -এর মধ্যে যদি এরূপ শব্দ দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, তাহলে আরবগণ أَنَّ তে ند -কে আমল করতে অনুমতি দেয় এবং মাঝে-মধ্যে তার আমল বাতিল বলেও মনে করা হয়। তার আমল বাতিল বলে গণ্য করার কারণ এটা পূর্বেই فنادى -তে আমল করা থেকে বিরত রয়েছে। তাই তারা পরবর্তীকালেও আমলের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নীতি অবলম্বন করে থাকেন। আর আমল করার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, এখানে হরফ ندا অন্যান্য -فعل-এর ন্যায় একটি فعل তবে আমাদের পাঠরীতিতে ندا ও আয়াতাংশ فنادته الملائكة এর মধ্যে -يازكريا -এর ন্যায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই। আর যদি এ দুটোর মধ্যে এরূপ কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে আরবী ভাষাভাষীদের কাছে বিশুদ্ধ কালাম হচ্ছে ناديت-এর জন্যে اسم المنادى কে فتحه (যবর) প্রদান করা। আর তারা فتحه কে এর উপর স্থাপন করেন। যেমন, তারা এরপর আগত ان -এর উপর فتحه প্রদান করেছেন। এটা যদিও সঙ্গত, কিন্তু তার আমল বাতিল বলে গণ্য। কাজেই আয়াতাংশ فنادته শব্দ زكريا مكنى এর সাথে সংযোজিত হয়েছে। অনুরূপভাবে সঠিক হলো ان -কে فتحه প্রদান করা এবং তার عامل -কে اسم المنادى স্বীকার করে নেয়া। অথচ, أَنَّ -কে فتحه প্রদান করা একটি পাঠরীতি এবং বিভিন্ন ইসলামী দেশে তা প্রচলিত। তবে

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, আয়াতাংশে উল্লিখিত يُبَشِّرُكَ শব্দটির পাঠরীতিতে একাধিক মত পরি অক্ষিত হয়। মদীনাও বসরার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ ان الله يبشرك আয়াতাংশে অবস্থিত ياء তে ضمه (পেশ) এবং شين -কে تشديد দিয়ে পড়েছেন অর্থাৎ باب تفعيل -এর صيغه হিসাবে পড়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে সন্তান প্রদান করার শুভসংবাদ দেন। যেমন, কোন মানুষ বলেন, بشرت فلانا البشرى بكذا وكذا অর্থাৎ আমি অমুক ব্যক্তিকে এই এই ব্যাপারে শুভসংবাদ দিয়েছি, অন্য কথায় اَتَتْهُ بَشَارَاتُ الْبُشْرٰى بِذٰلِكَ এ সম্বন্ধে তার কাছে শুভসংবাদ এসেছে।" কূফার কিরাআত বিশেষজ্ঞগণের একদল এবং অন্যরাও يَبْشُرُكَ اَنَّ اللّٰهَ অর্থাৎ ياء -কে فتحه এবং شين কে تشديد বিহীন ضمه দিয়ে পাঠ করেছেন। তখন আয়াতের অর্থ হবে ঃ ان الله يبشرك بوند يهبه لك অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সন্তান প্রদানের মাধ্যমে আনন্দিত করবেন। যেমন بشرت সম্বন্ধে কবি বলেছেন ঃ

بَشَرْتُ عِيَالِىْ اِذْ رَاَيْتُ صَحِيْفَةً * اَتَتْكَ مِنَ الْحَجَّاجِ يُتْلٰى كِتَابُهَا

অর্থাৎ হাজ্জাজ থেকে আগত সহীফা দেখে আমি আমার পরিবার-পরিজনকে আনন্দিত পেলাম। এ সহীফায় লিখিত বস্তু পাঠ করা হয়ে থাকে।" এরূপও বলা হয়েছে যে بَشَرْتُ কিনানা ও কুরায়শ বংশের অন্যান্য গোত্রীয় তিহামাবাসীদের পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। তারা বলে থাকেন بشرتُ فلانا بكذ অর্থাৎ অমুককে এবস্তুর কারণে আনন্দিত পেলাম। আরো বলা হয়ে থাকে اَنَا اَبْشُرُهُ بُشْرًا অর্থাৎ আমি তাকে খুবই আনন্দিত পাই। আরো বলা হয়ে থাকে هَلْ اَنْتَ بَاشِرٌ بِكَذَا অর্থাৎ তুমি কি এ সংবাদে আনন্দিত? এরূপ অর্থ বুঝানোর জন্যে আরবদের মধ্যে বহু কবিতা প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের পংক্তিগুলো প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَاِذَا رايتَ الباهشينَ الى العلى * غُبْرًا اَكُفُّهِمُ بِقَاعٍ مُمْحِلٍ

فَاَعِنْهُمُ وَابْشِرْ بِمَا بَشِرُوْا بِهِ * وَاِذَا هُمُ نَزَلُوْا بِضَنْكٍ فَانْزِلِ -

অর্থাৎ কবি তার সঙ্গীদের বলছেন, 'যখন তুমি তাদেরকে (প্রিয়ার কাফেলাটিকে) উঁচু ভূমির দিকে ধূলা বালি উড়িয়ে গমন করতে দেখবে, তখন তাদেরকে শুষ্ক ভূমিতে অবস্থান করতে থামিয়ে দাও, তাদের সাহায্য কর। যে বস্তুর মাধ্যমে তারা আনন্দিত হয়, তাদেরকে তা দ্বারাই আনন্দিত কর, আর যখন কোন সংকীর্ণ ভূমিতে তারা অবতরণ করে, তখন তুমিও তাদের সাথে তথায় অবতরণ কর।

যখন আরবরা কোন কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন তারা الف সহকারে বিশুদ্ধ বাক্য ব্যবহার করে থাকে। তখন বলা হয় তাকে اَبْشِرْ فلانًا بكذا - অমুক ব্যক্তিকে এ বস্তুটির দ্বারা আনন্দিত কর। তারা প্রায়ই বলেন لابشره بَشِره بكذا অথবা

হুমায়দ ইব্‌ন কায়স থেকে বর্ণিত। তিনি পাঠরীতি ياء -তে ضيعه এবং شين এ- كسره (যের) দিয়ে تشديد বিহীন পড়ে থাকেন অর্থাৎ يُبْشِرُكَ -।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯৪৮. হযরত মুয়ায আল-কূফী (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যে ব্যক্তি تشديد সহ يبشرك –কে পাঠ করেছেন, তিনি এটাকে بشارة থেকে مشتق(নিষ্পন্ন) মনে করেছেন। আর যে ব্যক্তি يبشرك –কে تشديد বিহীন يا ء কে فتحه দিয়ে পড়েছেন তিনি এটাকে سرور ও يسرهم- এর অর্থ থেকে مشتق (উদ্ভূত) বলে মনে করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে এখানে অধিক গ্রহণযোগ্য পাঠরীতি হলো, يا ء- কে ضمه দেয়া এবং شين– কে تشديد সহকারে পাঠ করা। তখন তা تبشير থেকে مشتق (নিষ্পন্ন) ধরা হবে। এ পরিভাষাটি অধিক প্রচলিত এবং জনসাধারণের কাছে অধিক প্রিয়। অধিকন্তু বিভিন্ন দেশের কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ تشديد দিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে একমত। যেমন তারা পড়ে থাকেন فيم تبشرون (সূরাহ্ হিজর, ঃ ৫৪) অর্থাৎ شين –এ تشديد দিয়ে পাঠ করে থাকেন। বস্তুত কুরআনুল কারীমের যেখানেই এধরনের আয়াত রয়েছে সেখানেই يا ء –কে ضمه ও شين –কে تشديد সহকারে পাঠ করা হয়ে থাকে। আর تشديد যুক্ত ও تشديد বিহীন শব্দদ্বয়ের অর্থে পার্থক্য রয়েছে বলে মুয়ায আল–কূফী থেকে যে বর্ণনা রয়েছে এধরনের বর্ণনা আরবী ভাষাভাষী জ্ঞানী লোকদের থেকে বিশুদ্ধ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কাজেই তাঁর থেকে যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে, তা সন্দেহাতীত নয়। প্রসিদ্ধ কবি জারীর ইব্ন আতিয়্যাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

يَابِشْرُ حُقَّ لِوَجْهِكَ التَّبْشِيْرُ * هَلاَّ غَضِبْتَ لَنَا ؟ وَاَنْتَ اَمِيْرُ

অর্থাৎ হে সত্যের সুসংবাদদাতা! তোমার দেয়া সুসংবাদই শুভ সংবাদ। কেন তুমি আমীর থাকা অবস্থায়ও আমাদের উপর রাগ করছ না? (অর্থাৎ তুমি জীবনের সর্বাবস্থায় মানুষের ও সত্যের সন্তুষ্টির জন্যে অব্যাহত ভাবে কাজ করে চলেছ।

এ কবিতা থেকে বুঝা যায় যে, কবি সৌন্দর্য, প্রশস্ততা ও আনন্দ বুঝাতে تبشير ব্যবহার করেছেন। البشر না বলে, التبشير বলা হয়েছে,কারণ উভয়ের ব্যবহার করেননি। অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য সামান্যই।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯৪৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى –এর ব্যাখ্যায় বলেন, ফেরেশতাগণ তাঁকে এ ব্যাপারে শুভ সংবাদ দিলেন।

আলোচ্য আয়াতাংশে ইয়াহ্ইয়া (يحيى) শব্দটি একটি اسم বা নাম। প্রকৃতপক্ষে এটা فعل ماضى–حَىَّ থেকে مضارع –এর صيغه হয়েছে। যদি কেউ জন্মের পর পরই না মরে জীবিত থাকে, তাহলে তাকে বলা হয়ে থাকে يحيى অর্থাৎ সে জীবিত থাকুক। আবার কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এ নামে ভূষিত করেছেন। তখন তার নামের অর্থ হবে, আল্লাহ্ তাকে ঈমান সহকারে জীবিত রেখেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯৫০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى –এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.)–কে শুভ সংবাদ দেন যে, তিনি তাকে এমন একজন সুসন্তান প্রদান করবেন, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান সহকারে জীবিত রাখবেন।

৬৯৫১. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى –এর ব্যাখ্যায় বলেন, يحيى –কে يحيى (আ.) বলে নাম রাখার কারণ, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান সহকারে জীবিত রেখেছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ –হে যাকারিয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তোমার ছেলে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, যে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারইয়াম –এর সমর্থক হবে। مُصَدِّقًا শব্দটিতে يحيى শব্দটির কারণে فتحه দেয়া হয়েছে। মূলত مصدقا শব্দটি يحيى শব্দটির অসামঞ্জস্যপূর্ণ صفت হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা يحيى শব্দটি معرفه, আর مصدقا শব্দটি نكره হওয়ায় এদের মধ্যে অসামঞ্জস্য বিরাজ করছে। আমাদের উপরোক্ত তাফসীরকে ব্যাখ্যাকারগণ সমর্থন করেছেন এবং এর সপক্ষে দালীল হিসাবে নিম্ন বর্ণিত হাদীসগুলো উপস্থাপন করেছেন ঃ

৬৯৫২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাকারিয়া (আ.)–এর স্ত্রী মারইয়াম (র.)–কে বললেন, "আমি অনুভব করছি যে, যা কিছু আমার পেটে রয়েছে, তা তোমার পেটের বস্তুটির সম্মানার্থে নড়াচড়া করছে।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর যাকারিয়া (আ.)–এর স্ত্রী ইয়াহ্ইয়া (আ.)–কে প্রসব করেন এবং মারইয়াম (র.) ঈসা (আ.)–কে প্রসব করেন। আর আল্লাহ্ তা 'আলা এজন্য বলেছেন যে, ইয়াহ্ইয়া (আ.) হবে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী অর্থাৎ ঈসা (আ.)–এরসমর্থক। অন্য কথায়ই ইয়াহ্ইয়া (আ.) ঈসা (আ.)–এর উত্তম সমর্থক ছিলেন।

৬৯৫৩. আর–রাক্কাশী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, بكلمة من الله –এর অর্থ হচ্ছে, ঈসা ইব্ন মারইয়াম।

৬৯৫৪. অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র.) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬৯৫৫. কাতাদা (র.) থেকেও অপর সূত্রে অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

৬৯৫৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, ইয়াহ্ইয়া (আ.) হলেন ঈসা ইব্ন মারইয়াম এবং তাঁর তরীকা ও রীতিনীতির সমর্থক।

৬৯৫৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি ছিলেন ঈসা ইব্ন মারইয়াম –এর প্রথম সমর্থক।

৬৯৫৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ইয়াহ্ইয়া(আ.) ছিলেন ঈসা (আ.) এবং তাঁর সুন্নাত ও রীতিনীতির সমর্থক।

৬৯৫৯. রবী‘ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ইয়াহ্ইয়া (আ.) ছিলেন সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঈসা (আ.)–কে সমর্থন করেছিলেন। আর ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী ও আল্লাহ্ প্রদত্ত আত্মা।

৬৯৬০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ইয়াহ্ইয়া (আ.) ঈসা (আ.)–কে সমর্থন করতেন।

৬৯৬১. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, ইয়াহ্ইয়া (আ.) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঈসা (আ.)–কে সমর্থন করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঈসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ্র বাণী। আর ইয়াহ্ইয়া (আ.) ছিলেন ঈসা (আ.)–এর খালাতো ভাই। আর তিনি ঈসা (আ.) থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ।

৬৯৬২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতাংশ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, অত্র আয়াতে উল্লিখিত كلمة من الله দ্বারা ঈসা ইব্ন মারইয়াম (র.)কে বুঝান হয়েছে। তাঁর নাম ছিল المسيح –।

৬৯৬৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.)থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ঈসা (আ.) ও ইয়াহ্ইয়া (আ.) উভয়ে খালাতো ভাই ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া (আ.)–এর মাতা মারয়াম (র.)–কে বলতেন, আমার পেটে যে সন্তান রয়েছে, আমি দেখছি যেন তোমার পেটের সন্তানকে সিজদা করছে। আর এ তথ্যটির দিকে আল্লাহ্ তা‘আলা مصدقا بكلمة من الله আয়াতাংশ দ্বারা ইংগিত করেছেন। এখানে مصدقا –এর অর্থ হচ্ছে পেটে থাকা অবস্থায় সিজদা করা। বস্তুত তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যে ঈসা (আ.)–কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং ঈসা (আ.)–এর নবূওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। অথচ ইয়াহ্ইয়া (আ.) ঈসা (আ.) থেকে বয়সে ছিলেন বড়।

৬৯৬৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত كلمه শব্দের অর্থ হচ্ছে ঈসা (আ.)–এর কাছে প্রেরিত আল্লাহ্র বাণী।

৬৯৬৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ –এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াহ্ইয়া (আ.)–এর মাতা ঈসা (আ.)–এর মাতার সাথে মুলাকাত করেন। আর তখন ইয়াহ্ইয়া (আ.) এবং ঈসা (আ.) উভয়েই মাতৃগর্ভে ছিলেন। তখন যাকারিয়া (আ.)–এর স্ত্রী বললেন, হে মারইয়াম! আমি অনুভব করছি যে, আমিও গর্ভবতী। পক্ষান্তরে মারইয়াম (র.) বললেন, আমিও অনুভব করছি যে, আমিও গর্ভবতী। যাকারিয়া (আ.)–এর স্ত্রী আরো বললেন, আমার পেটে যে সন্তান রয়েছে, তা তোমার পেটের সন্তানটিকে সিজ্দা করছে বলে আমি অনুভব করছি। আর এটাকেই আল্লাহ্ তা‘আলা مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

৬৯৬৬. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ – এর অর্থ হচ্ছে, তিনি ছিলেন ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ.)–এর সমর্থক।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, বসরাবাসী কিছু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদের মতে এখানে بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ –এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব, যেমন আরববাসীরা বলে থাকেন أَنْشَدَنِىْ فُلَانٌ كَلِمَةً كَذَا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি আমার কাছে অমুক ব্যক্তির كلمه অর্থাৎ قصيده পাঠ করেছেন। ইব্ন জারীর তাবারী (র.) আরো বলেন, এরূপ ব্যাখ্যা হচ্ছে বাক্যের প্রকৃত তাফসীর সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিণতিস্বরূপ এবং নিজের খেয়ালখুশী মতে কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা করা।

سَيِّدًا – এর ব্যাখ্যা ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ইয়াহ্ইয়া (আ.) ইলম ও ইবাদতের দিক দিয়ে ছিলেন নেতা ও ভদ্র। مصدقا শব্দের উপর সম্পর্কিত হওয়ায় سيدا শব্দকেও যবর দেয়া হয়েছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ইয়াহ্ইয়া (আ.) সম্বন্ধে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি ছিলেন ঈসা (আ.)–এর সমর্থক এবং নেতা। سيد শব্দটি فعيل –এর পরিমাপে।

৬৯৬৭. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি سَيِّدًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র শপথ, তিনি ইবাদত, ধৈর্য, ইলম ও পরহেযগারীতে ছিলেন শীর্ষস্থানীয়।

৬৯৬৮. কাতাদা (র.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে উল্লিখিত سَيِّدًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, আমি শুধু ইলম ও ইবাদতের ক্ষেত্রেই السيد (বা নেতা) কথাটি প্রযোজ্য বলে মনে করি।

৬৯৬৯. কাতাদা (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, "السيد" শব্দটির অর্থ হচ্ছে الحليم বা ধৈর্যশীল।

৬৯৭০. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) বলেন, السيد শব্দটির অর্থ হচ্ছে الحليم অর্থাৎ ধৈর্যশীল।

৬৯৭১. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, سيدا শব্দটির অর্থ হচ্ছে السَّيِّدُ التقى বা সাবধানতা অবলম্বনকারী নেতা।

৬৯৭২. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি سَيِّدًا শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলেন, سَيِّدًا শব্দের অর্থ, الكريم على الله تعالى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানের পাত্র।

৬৯৭৩. রাক্কাশী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, سَيِّدًا শব্দের অর্থ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সম্মানিত।

৬৯৭৪. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত سَيِّدًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ ধৈর্যশীল ও পরহেযগার ব্যক্তি।

৬৯৭৫. দাহ্হাক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سَيِّدًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ পরহিযগার ও ধৈর্যশীল।

৬৯৭৬. সুফিয়ান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سَيِّدًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ ধৈর্যশীল ও পরহিযগার।

৬৯৭৭. ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত السَّيِّدُ শব্দের অর্থ السَّيِّدُ الشَّرِيْفُ সম্ভ্রান্ত নেতা।

৬৯৭৮. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سَيِّدًا শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, এর অর্থ السَّيِّدُ الْفَقِيْهُ الْعَالِمُ অর্থাৎ ফকীহ ও আলিম নেতা।

৬৯৭৯. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سَيِّدًا শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ ধৈর্যশীল ও পরহিযগার।

৬৯৮০. হযরত ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতাংশে উল্লিখিত سَيِّد শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, তার অর্থ এমন নেতা, যাকে ক্রোধ কাবু করতে পারে না। অন্য কথায়, যিনি কাম–ক্রোধের উর্ধ্বে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ حَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ এ– উল্লিখিত حَصُوْرًا শব্দের অর্থ, এমন ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সম্ভোগ থেকে বিরত রয়েছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়ে থাকে "حصرت من كذا" অর্থাৎ তা থেকে আমি বিরত রয়েছি। যখন কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তখন বলা হয় أُحْصِرَ –। অনুরূপ যদি কেউ কিরাআত পড়ার সময় থেমে যায়, আর অগ্রসর হতে না পারে, তাহলে তার সম্বন্ধে বলা হয় حَصِرَ فُلَانٌ –। পুনরায় حَصَرَ الْعَدُوَّ বলা হয়, যখন জনগণ দুশমনকে ঘেরাও করে ফেলে এবং তাদেরকে যে কোন প্রকার কাজকর্ম থেকে বিরত রাখা হয়। এজন্যই যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীদের সাথে বাইরে বের হয় না, তাকে حصور বলা হয়ে থাকে। যেমন, কবি আখতাল বলেছেন ঃ

وَشَارِبٍ مُّرْبِحٍ بِالْكَاسِ نَادَمَنِىْ * لاَ بِالْحَصُوْرِ وَلاَ فِيْهَا بِسَوَّارِ

অর্থাৎ আমি এক মদ্যপায়ী বন্ধুর সাহচর্য লাভ করছি, যে পেয়ালা পরিপূর্ণ করে নিজে মদ্যপান করে ও আমাকে মদ্য পান করায়।

প্রকাশ থাকে যে, আমি আমার বন্ধু–বান্ধব ত্যাগী নই এবং ইচ্ছামত মদ্যপান করার ব্যাপারে আমি কারো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীও নই। আবার কোন কোন সময় بسوار –কে بسار পড়া হয়ে থাকে।

এমন ব্যক্তিকে حصور বলা হয়, যে তার গোপন তথ্য প্রকাশ করে না বরং তা লুকিয়ে রাখে ও প্রকাশ হবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেমন, কবি জারীর তাঁর দুশমনদের ষড়যন্ত্র তাঁকে কোন ক্ষতি করতে পারে না বলে দাবী করে বলছেন ঃ

وَلَقَدْ تَسَاقَطَنِيْ الْوُشَاةُ ، فَصَادَفُوْا * حَصِرًا بِسِرِّكِ يَا أُمَيْمَ ضَنِيْنًا ـ

অর্থাৎ নিন্দুকেরা কোন কোন সময় আমার ইযযত ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে ইচ্ছা করে (অকৃতকার্য হয়ে থাকে) কিন্তু (কবি নিজেকে সম্বোধন করে বলেন,) হে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তারা তখন তোমার অপরাজয়ের রহস্য জানার জন্যে এমন ব্যক্তির মুকাবিলায় উপনীত হয়ে থাকে, যে রহস্য প্রকাশ করার ব্যাপারে অত্যধিক কৃপণ।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, حصور শব্দের যতগুলো অর্থ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, সবগুলোর মূল এক। আর তা হলো, المنع الحبس অর্থাৎ বিরত রাখা, বিরত থাকা। আমরা প্রথমত যে অর্থটি পেশ করেছি, তা বহু তাফসীরকার গ্রহণ করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৬৯৮১. ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এ আয়াতে উল্লিখিত حَصُوْرًا শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বলেন, তার অর্থ, এমন ব্যক্তি, যে স্ত্রী–সম্ভোগ করে না।

৬৯৮২. হযরত ইব্‌নুল আস (রা.)–এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রতিটি মানব সন্তান যে কোন একটি পাপের বোঝা সঙ্গে নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে। কিন্তু হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ.)–এর সঙ্গে কোন পাপের বোঝা থাকবে না। এরূপ বলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাটির দিকে হাত বাড়ালেন এবং লাকড়ীর একটি ছোট্ট টুক্‌রা উঠালেন ও পুনরায় বললেন, অন্য লোকের যা পাপ রয়েছে তার তুলনায় এ ব্যক্তির পাপ হবে মাত্র লাকড়ির এ ছোট্ট টুকরার পরিমাণ। আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্বন্ধে ইরশাদ করেছেন ঃ سَيِّدًا وَّحَصُوْرًا অর্থাৎ তিনি ছিলেন নেতা ও সংযমী।

৬৯৮৩. সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ.) ব্যতীত প্রত্যেকে কোন না কোন পাপ নিয়ে কিয়ামতের দিন দন্ডায়মান হবে। তিনি ছিলেন কাপড়ের আঁচলের ন্যায় বস্তুটি ধারণকারী জিতেন্দ্রিয়।

৬৯৮৪. হযরত ইবনুল্–আস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ.) ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার কোন বান্দাহ্‌ই কোন না কোন পাপে জড়িত হিসাবে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাযির হবে। উপরোক্ত সনদে রহিত একজন বর্ণনাকারী সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র.) বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত حصورا শব্দের অর্থ, এমন ব্যক্তি যিনি স্ত্রী–সম্ভোগ করেন না এবং তার সাথে রয়েছে শুধুমাত্র কাপড়ের আঁচলের ন্যায় একটি বস্তু।

৬৯৮৫. সাঈদ ইব্‌নুল মুসায়্যিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,এ আয়াতে উল্লিখিত حصورا শব্দটির অর্থ, এমন ব্যক্তি যিনি স্ত্রীলোকদের প্রতি আসক্ত নন। তারপর তিনি মাটিতে হাত রাখলেন এবং একটি খেজুরের আঁটি উঠালেন ও বললেন, তার সাথে রয়েছে ঠিক এটার মত একটি বস্তু।

৬৯৮৬. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত حصورا শব্দের অর্থ, এমন ব্যক্তি যে স্ত্রী–সম্ভোগ করে না।

৬৯৮৭. সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে আরেকটি অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৬৯৮৮. অন্য এক সনদেও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

৬৯৮৯. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশে উল্লিখিত حصورا শব্দের অর্থ, তিনি এমন ব্যক্তি যে স্ত্রী–সম্ভোগ করে না।

৬৯৯০. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত الحصور শব্দের অর্থ, এমন ব্যক্তি যে স্ত্রীর নিকটবর্তী হয় না।

৬৯৯১. রাক্কাশী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতাংশে الحصور শব্দের অর্থ, এমন এক ব্যক্তি যিনি স্ত্রীর নিকটবর্তী হয় না।

৬৯৯২. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত الحصور শব্দের অর্থ, এমন ব্যক্তি, যার কোন সন্তান হয় না এবং যার কোন বীর্য নেই।

৬৯৯৩. দাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতে উল্লিখিত حصورا শব্দের অর্থ, এমন ব্যক্তি যার বীর্য নেই।

৬৯৯৪. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি অত্র আয়াতে উল্লিখিত حصورا শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হতো যে, حصور ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি স্ত্রীলোকদের নিকটবর্তী হন না।

৬৯৯৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,অত্র আয়াতে উল্লিখিত الحصور শব্দের অর্থ হচ্ছে, এমন ব্যক্তি, যে স্ত্রীলোকদের নিকটবর্তী হয় না।

৬৯৯৬. অন্য সূত্রেও কাতাদা (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৬৯৯৭. কাতাদা (র.) থেকে অপর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৯৯৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الحصور শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার বীর্যপাত হয় না।

৬৯৯৯. ইউনুস (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, الحصور শব্দটির অর্থ হচ্ছে, এমন ব্যক্তি, যিনি স্ত্রীলোকদের কাছে গমন করেন না।

৭০০০. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, الحصور শব্দটির অর্থ হচ্ছে, এমন ব্যক্তি, যিনি স্ত্রীলোকদের ইচ্ছা পোষণ করেন না।

৭০০১. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, حصُورا শব্দটির অর্থ হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যিনি স্ত্রীলোকদের নিকটবর্তী হন না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ–এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি এমন এক রাসূল যাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেন যিনি তাদেরকে তাঁর প্রতিপালকের আদেশ, নিষেধ, হালাল ও হারাম সম্বন্ধে অবগত করান এবং তাঁর মাধ্যমে তাদের কাছে যা কিছু প্রেরণ করেছেন তা তিনি তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন।

অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مِنَ الصَّالِحِيْنَ বাক্যাংশের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যবান নবীগণের কথাই উল্লেখ করেছেন। পূর্বে আমরা নবুওয়াতের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং দলীল বর্ণনা সহকারে তার মূল বস্তু নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

(٤٠) قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ○

৪০. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কি রূপে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বললেন, এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা, তা করেন।

ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী (র.) বলেন, অত্র আয়াতাংশ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ –এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, যখন যাকারিয়া (আ.) নিজ কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়া (আ.)–এর সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহ্র কালামের সমর্থক, নেতা, জিতেন্দ্রিয় এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে অর্থাৎ আমার বয়সের সমান যাদের বয়স হয়েছে তাদের সাধারণত সন্তান হয় না। আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অত্র আয়াতে উল্লিখিত العاقر শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন মেয়েলোক, যার কোন সন্তান হয় না। এজন্য বলা হয়ে থাকে ঃ امراة عاقر ও رجل عاقر অর্থাৎ একটি বন্ধ্যা মেয়েলোক ও একটি নিঃসন্তান পুরুষ। বিশিষ্ট কবি আমির ইব্ন তুফায়ল বলেন ঃ

لَبِئْسَ الْفَتَى اِنْ كُنْتُ اَعْوَرَ عَاقِرًا * جَبَانًا فَمَا عُذْرِىْ لَدَىْ كُلِّ مَحْضَرٍ

অর্থাৎ যদি আমি কোন সময় কানা, নিঃসন্তান ও ভীরু বলে প্রমাণিত হই, তাহলে আমি কাপুরুষ বলে পরিচিত হব। এরপর প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে কিংবা কষ্টসাধ্য পরিস্থিতির মুকাবিলায় নিজেকে পেশ না করার জন্যে আমার পক্ষে সাফাই হিসাবে জনগণের কাছে কোন ওযর ও আপত্তি গ্রহণীয় হবে না।

অত্র আয়াতে উল্লিখিত الكبر শব্দটি مصدر –। যেমন বলা হয়ে থাকে, كَبِرَ فُلَانٌ فَهُوَ يَكْبَرُ كِبَرًا অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। অতএব, সে আরও বৃদ্ধ হতে চলছে।

কুরআনুল করীমের অন্য জায়গায় কিংবা সূরা মারয়ামের ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (অর্থাৎ আমি বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছি।) উপরোক্ত দুটো আয়াতাংশে بلغ শব্দটি ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে বার্ধক্য আমার কাছে পৌছছে এবং আমি বার্ধক্যে পৌছেছি। দুটো বাক্যাংশের অর্থই প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। কাজেই প্রকৃত অর্থ হবে আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আরবী ভাষায় এধরনের ব্যবহার অহরহ প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন কোন ব্যক্তি বলে থাকে, قَدْ بَلَغَنِىَ الْجَهْدُ অর্থাৎ আমার কাছে কষ্ট পৌছেছে। অন্য কথায় اِنِّىْ فِىْ جَهْدٍ অর্থাৎ আমি কষ্টে আছি।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে, তা হচ্ছে যদি কেউ বলে, যাকারিয়া (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার একজন বিশিষ্ট নবী হওয়া সত্ত্বেও কি করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান জন্ম হবে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অথচ তাঁকে ফেরেশ্তাগণ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, এটা তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার সুসংবাদ। তিনি কি ফেরেশ্তাদের সত্যবাদিতায় সন্দেহ পোষণ করেছেন? আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি যাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের পক্ষে এরূপ বলা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অথচ তিনি একজন নবী (আ.); আর আম্বিয়া ও প্রেরিত রাসূলদের জন্যে তো এটা মোটেই সঙ্গত নয়। অথবা এরূপ কথার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। এটাতো পূর্ববর্তী সম্ভাবনা থেকে আরো অধিক মারাত্মক। কাজেই যাকারিয়া (আ.) কেন এরূপ বললেন, তা একটি বিরাট প্রশ্ন। উত্তরে বলা যায়, প্রশ্নটি এখানে নিতান্ত অমূলক। এ প্রসঙ্গে অধিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত হাদীসসমূহ প্রণিধানযোগ্য ঃ

৭০০২. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া (আ.) যখন ফেরেশতাগণের নিকট ইয়াহ্ইয়া (আ.)–এর সুসংবাদ পেলেন, তখন শয়তান তাঁর নিকট এসে বলল, হে যাকারিয়া (আ.)। আপনি যে দৈববাণী শুনেছেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে নয়, বরং এটা শুধু আপনাকে উপহাসের পাত্র হিসাবে প্রমাণ করার জন্যে শয়তানের তরফ থেকে উচ্চারণ করা হয়েছে। কেননা, তা যদি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে হতো, তাহলে আপনার কাছে অন্যান্য ওহীর ন্যায় নিয়মানুযায়ী ওহী নাযিল করা হতো। সুতরাং এটা শয়তানের উচ্চারিত বাণী। এতে যাকারিয়া (আ.) সন্দেহে উপনীত হলেন ও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! কিরূপে আমার পুত্র সন্তান হবে অথচ আমি বৃদ্ধ ও আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?

৭০০৩. ইকরামা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাকারিয়া (আ.) ওহী পাওয়ার পর শয়তান তাঁর কাছে আগমন করল এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত নিয়ামতকে কলুষিত করার ইচ্ছা করল। তাই সে বলল, আপনি কি জানেন, আপনাকে কে এই বাণী শুনিয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের ফেরেশতাগণ আমাকে সম্বোধন করেছেন। শয়তান বলল, না, এটা ছিল শয়তানের বাণী। যদি তা আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হতো তাহলে তা আপনাকে গোপনে বলা হতো; যেমন আপনি তাঁকে গোপনে আহ্বান করেছেন। এজন্যেই যাকারিয়া (আ.) বললেন, رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً (অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দিন)।

উপরোক্ত দু'টি হাদীসে বর্ণিত শয়তানী প্রতারণার প্রেক্ষিতে যাকারিয়া (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যা বলার তা বললেন এবং প্রশ্নের প্রতি উত্তর দিলেন। যেমন বললেন,

اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ (অর্থাৎ কেমন করে আমার পুত্র সন্তান জন্ম নিবে?) তার অন্তরে শয়তানী প্রতারণা অনুপ্রবেশ করায় কিংবা মিশ্রিত হওয়ায় তিনি ধারণা করতে লাগলেন যে, তিনি যে বাণী শুনেছেন, তা ফেরেশতাদের ব্যতীত অন্য কারোর পক্ষ থেকেও হতে পারে। তাই তিনি বললেন, আমার কেমন করে পুত্র সন্তান জন্ম নেবে? আর পুত্র সন্তান হবার সম্ভাবনা এবং ফেরেশতা কর্তৃক প্রদত্ত সুসংবাদকে জোরদার করার জন্যে তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নিদর্শন দেখান।

উপরোক্ত প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর এভাবেও দেয়া যায় যে, যাকারিয়া (আ.) জানার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁকে যে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা কি তার বর্তমান স্ত্রীর মাধ্যমে হবে? অথচ সে বন্ধ্যা, না অন্য কোন স্ত্রীলোকের মারফতে হবে? এরূপ উত্তর দেয়া হলে উপরোক্ত দু'জন উত্তর প্রদানকারী যেমন ইকরামা (র.) ও সুদ্দী (র.) বা তাদের ন্যায় অন্য কোন উত্তর প্রদানকারীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে তৃতীয় উত্তরটি।

পরবর্তী আয়াতাংশ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ –তে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, যে বৃদ্ধলোক সন্তান উৎপাদনী ক্ষমতা থেকে নিরাশ হয়েছে এবং বন্ধ্যার ন্যায় যে স্ত্রীলোক থেকে সন্তানের আশা করা যায় না, তাদের থেকে সন্তান সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এরূপ সহজ ব্যাপার, হে যাকারিয়া (আ.)! যেরূপে তোমার সন্তান ইয়াহ্ইয়া (আ.) ও তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা পয়দা করেছেন। কেননা, তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। এটা তাঁর জন্যে কঠিন ব্যাপার নয় এবং যা ইচ্ছা তিনি তা করেন তাঁকে বারণ করার মত কেউ নেই। আর তাঁর কুদরত ও ক্ষমতা এতই প্রবল যে, তার কোন নযীর নেই। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

৭০০৪. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এরূপে আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা তা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে যাকারিয়া! এর পূর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম অথচ তুমি তখন কোন কিছুই ছিলে না।"

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

(٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ ۝

৪১. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। তিনি বললেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

আল্লাহ্ পাকের বাণী ঃ " قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً " –এর ব্যাখ্যা ঃ

অত্র আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যাকারিয়া (আ.)–এর উক্তি সম্বন্ধে ইরশাদ করেন যে, যাকারিয়া (আ.) বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আহ্বান করা হয়েছে এবং আমি যে আওয়ায শুনেছি, তা যদি তোমার ফেরেশতাদের আওয়ায হয়ে থাকে, আর তা তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্যে সুসংবাদ হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে একটি নিদর্শন দিন। এ নিদর্শন বলে দেবে যে, আপনার ফেরেশতার মাধ্যমে যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, তা বাস্তবে পরিণত হবে। তাহলে শয়তান আমার কাছে যে প্রতারণা উথাপন করেছে, তা দূরীভূত হয়ে যাবে। কেননা, শয়তান আমার অন্তরে একথাটি অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়েছে যে, এটা ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কারোর বাণী এবং অন্য কারো থেকে প্রদত্ত সুসংবাদ। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য।

৭০০৫. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) বলেছিলেন, হে প্রতিপালক! এ শব্দ যদি আপনার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, তবে আমার জন্যে একটি নিদর্শন দিন।

আমরা ইতিপূর্বেই বলেছি যে, এক্ষেত্রে আয়াত অর্থ চিহ্ন, পুনরায় এর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আরবী ব্যাকরণবিদগণ আয়াত শব্দের পঠন–রীতি সম্পর্কে একাধিক মত পোষণ করেন।

এখানে হামযাটি বাদ দেয়া হলো। কেননা এটি ছিল কারো কারো মতে মূলত أَيَّةٌ ; কিন্তু তাশদীদ সহকারে পাঠ করা কঠিন হওয়ার কারণে তাকে আলিফ করা হলো, যাতে করে তাশদীদের পূর্বে যবর থাকে। যেমন আরবী ভাষাবিদগণ বলেন, أَيْمَا فُلَانٌ فَأَخْزَاهُ اللّٰهُ এখানে أَيْمَا শব্দ أَمَّا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যরা বলেন, أَيَّةٌ শব্দটি মূলে ছিল فاعلة –এর কাঠামোতে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হোল, তাহলে এর তাস্‌গীর (تصغير) أُوَيْيَةٌ না হয়ে أُيَيَّةٌ হবে কেন? উত্তরে তাঁরা বলেন, فاطمة –এর তাসগীর যেমন فطيمة বলা হয় এখানেও তাই। এর উত্তরে বলা হবে যে, কোন পুরুষ কিংবা মহিলার নাম হলে তখনই কেবল فاعلة –এর তাসগীর فعيلة হয়, অন্য ক্ষেত্রে নয়। আর অন্যরা বলেন, এটি

মূলত فعلة –এর কাঠামোতে أيية ছিল। প্রথম ياء টি আলিফে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমনটি حاج ও قامة –এর মধ্যে হয়ে থাকে। এই পক্ষের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, আরবরা শুধুমাত্র তিনটি পদ–নিঃসৃত শব্দে (فى اولاد الثلثة) এই পদ্ধতি কার্যকর করে। যাঁরা উল্লিখিত পক্ষের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে, তাঁরা বলেন যে, ব্যাপারটি যদি ওদের বক্তব্য মুতাবিক হতো তাহলে نواة –কে ناية এবং حياة শব্দকে حاية পাঠ করা হতো।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী قَالَ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا (তিনি ইরশাদ করলেন, নিদর্শন এই যে, তুমি একাধারে তিনদিন ইশারা ব্যতীত কথা বলতে পারবে না।

এ প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমতঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর আরযীর জবাবে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ইয়াহ্ইয়া নামক ছেলে সন্তান তাঁকে দান করা হবে। আর এ সন্তানপ্রাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ ইশারা ব্যতীত হযরত যাকারিয়া (আ.) কথা বলতে পারবে না।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭০০৬. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ফেরেশতাগণ সরাসরি হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফেরেশতাগণ মুখোমুখি তাঁর সাথে কথা বলা সত্ত্বে তিনি প্রমাণ চেয়েছিলেন, তাই তাঁকে মৃদু কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং তাঁর বাকশক্তি রহিত করে দেয়া হয়েছিল। ফলে ইশারা ইংগিত ব্যতীত তিনি কথা বলতে সক্ষম ছিলেন না। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন: اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا

৭০০৭. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, ফেরেশতাগণ হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দিন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিন ইংগিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত رَمْزًا মানে হলো 'ইঙ্গিত'। এটি ছিল মৃদু শাস্তি স্বরূপ। ফেরেশতাগণ সামনাসামনি এসে সুসংবাদ দানের পরও প্রমাণ চাওয়ায় এই শাস্তি দেয়া হয়।

৭০০৮. হযরত রবী'(র.)থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا প্রসংগে বলেছেন, "প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ পাকই উত্তমরূপে অবগত।" তবে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাঁর নিকট এসে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) সম্পর্কিত সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তবু তিনি আয়াত বা নিদর্শন চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বাকশক্তি রহিত করে দেয়া হলো।

৭০০৯. হযরত রবী' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাকই ভালো জানেন। আমাদেরকে জানানো হয়েছে, তাঁর বাকশক্তি রহিত করে দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, ফেরেশতাগণ তাঁর সম্মুখে

এসেছিলেন, তারপর তাঁকে হ্যরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) নামক সন্তানপ্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, বলেছিলেন إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى (আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া নামক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন)। তাঁর সাথে ফেরেশতাগণের কথাবার্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিদর্শন চাইলেন। ফলে তাঁর বাকশক্তি রহিত করে দেয়া হয়েছে। তিনি ইংগিত ব্যতীত কথা বলতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। رَمْزًا মানে- اِيْمَاء -ইশারা।

৭০১০. হযরত যুবার ইব্‌ন জুফার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا -এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ.) -এর মুখের মধ্যে জিহবাটি ফুলে বড় হয়ে মুখ ভরে গিয়েছিল। তিন দিন পর আল্লাহ্ তা'আলা তা হতে তাঁকে মুক্তি দিলেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اَلَّا تُكَلِّمَ বাক্যে تُكَلِّمَ শব্দকে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ যবর দিয়ে পড়েছেন। একারণে যে, বাক্যের অর্থ এমন- قَالَ اٰيَتُكَ اَنْ لَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ -তোমার নিদর্শন হচ্ছে, আগামী তিন দিন তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না, সুতরাং এই اَنْ হচ্ছে সেই اَنْ যা فعل مضارع -এর সাথে ব্যবহৃত হয়ে সেটিকে যবর দেয়, যেটি اسم (বিশেষ্য)-এর সাথে ব্যবহৃত হয়ে اسم (বিশেষ্য) কে যবর দেয়, সেটি নয়। আয়াতের অর্থ যদি এ হতো যে, ايتك انك لا تكلم الناس ثلثة ايام الا رمزا (তুমি তিনদিন পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকবে, তাহলে মারফূ হিসাবে لَا تُكَلِّمُ হতো। কারণ, তখন اَنْ শব্দটি তাশদীদযুক্ত না হয়ে তাশদীদবিহীনে পরিণত হতো। কিন্তু অন্য অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায়। এ পদ্ধতিতে পড়া জায়িয হচ্ছে না।

আরবদের মতে رمز শব্দটি প্রধানত 'দু ঠোঁটের ইশারা" অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো দু'ভ্রু-এর ইশারাও দু' চোখের ইশারা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে শেষোক্ত দুটো বহুল প্রচলিত নয়। আবার কখনো অনুচ্চ ও ফিসফিসে আলাপকে رمز বলা হয়। যেমন, জুআয়য়্যাহ ইব্‌ন আইযের কবিতাঃ وَكَانَ تَكَلُّمُ الْاَبْطَالِ رَمْزًا + وَهَمْهَمَةً لَهُمْ مِثْلَ الْهَدِيْرِ (নেতাদের সাথে কথা বলে সে অনুচ্চ স্বরে · বাক বাকুম করে যেন পোষা কবুতরে।)

এ থেকেই বলা হয় رَمَزَ فُلَانٌ (অমুক ব্যক্তি চুপিসারে কথা বলেছে)। এও বলা হয় যে, ضَرَبَهُ ضَرْبَةً فَارْتَمَزَ مِنْهَا (তাকে মেরেছে তারপর মৃত্যু যন্ত্রণায় সে কাতরিয়েছে। কবি বলেন, خَرَرْتُ مِنْهَا لِقَفَاىَ اَرْتَمِزُ (তাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছি, তারপর কোঁকাচ্ছিলাম।))।

হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর সংবাদ প্রদান সম্পর্কিত اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا আয়াতে رَمْزًا শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সে সম্পর্কে ভাষ্যকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। একপক্ষ বলেছেন, আয়াতের মর্ম এই যে, তিন দিন পর্যন্ত দু'ঠোঁটের ইশারা ব্যতীত জিহবা নেড়ে কথা বলতে পারবে না।

যাঁরা এই মত পোষণ করেন ঃ

৭০১১. মুজাহিদ (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِلَّا رَمْزًا মানে দু' ঠোঁট নাড়ানো।

৭০১২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। ثلثة ايام الا رمزا সম্পর্কে তিনি বলেন, দু'ঠোঁটের ইংগিত দান।

৭০১৩. মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ আরও একটি বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা رمز শব্দটি "ইংগিত ও ইশারা" অর্থে ব্যবহার করেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭০১৪. হযরত দাহ্হাক (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِلَّا رَمْزًا -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, رمز অর্থ ইশারা।

৭০১৫. উবায়দ ইব্ন সুলায়মান (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِلَّا رَمْزًا -এর ব্যাখ্যায় হযরত কাতাদা (র.)–কে আমি বলতে শুনেছি رمز অর্থ কথা না বলে হাত ও মাথা দিয়ে ইশারা করা।

৭০১৬. ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, اِلَّا رَمْزًا অর্থ বাকশক্তি রহিত হওয়া এবং হাতের ইশারায় মনোভাব প্রকাশ করা।

৭০১৭. ইব্ন ইসহাক (র.) হতে বর্ণিত, রাম্য হচ্ছে ইশারা করা।

৭০১৮. ইব্ন যায়দ (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا সম্পর্কে তিনি বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর প্রার্থিত নিদর্শন ছিল, তিনি তিন দিন পর্যন্ত কথা বলতে পারবেন না। তবে ইশারা করতে পারবেনা, অবশ্য তিনি আল্লাহ্র যিক্র করতে পারবেন। রাময্ মানে ইশারা করা।

৭০১৯. কাতাদা (র.) বলেন, রাময মানে ইশারা।

৭০২০. রবী' (র.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭০২১. সুদ্দী (র.) থেকে বর্ণিত, রাম্য অর্থ ইশারা।

৭০২১. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর (র.) বলেছেন, রাম্য অর্থ ইশারা।

৭০২৩. হযরত হাসান (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا প্রসংগে তিনি বলেছেন যে, হযরত যাকারিয়া (আ.)–এর জিহবাকে বেকার করে রাখা হয়েছিল। ফলে, তিনি হাতের ইশারায় তাঁর সম্প্রদায়কে বলতেন, সকাল–সন্ধ্যা তাসবীহ পড়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ (আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে, এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে) প্রসংগে ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন এর অর্থ ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে বললেন, হে যাকারিয়া! তোমার নিদর্শন হচ্ছে, তিনদিন মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না, তবে ইংগিতে কাজ সারবে। কথা বলতে অক্ষমতাটুকু মূক ও বোবাজনিত নয়, কোন আপদ–বিপদও রোগের জন্যে ও নয়। তোমরা প্রতিপালকে অধিক স্মরণ করবে, কারণ তাঁর যিক্র করতে তুমি বাধাপ্রাপ্ত হবে না। তাসবীহ–তাহলীল ও অন্যান্য যিক্রে তুমি বাধাগ্রস্ত হবে না।

৭০২৪. মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাউকে যিক্র পরিত্যাগের অনুমতি দিতেন তাহলে হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে অনুমতি দিতেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না, এবং তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ কর। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ মানে সন্ধ্যাবেলা ইবাদতের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালকের মাহাত্ম্য প্রকাশ কর। اَلْعَشِيِّ মানে মধ্যাহ্নের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

কবির ভাষায় فَلَا الظِّلَّ مِنْ بَرْدِ الضُّحٰى تَسْتَطِيْعُهُ + وَلَا الْفَيْئَ مِنْ بَرْدِ الْعَشِيِّ تَذُوْقُ (শীতার্ত সকালের ছায়া সইতে পার না, তুমি, শীতার্ত বিকেলের ছায়ার স্বাদও ভোগ করতে পার না তুমি।) সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথে ফাই (ছায়া الفئ)-এর সূচনা হয় এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়।

ابكار শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যেমন বলা হয়, اَبْكَرَ فلان فِى حَاجَةٍ (অমুক ব্যক্তি প্রয়োজনের খাতিরে প্রত্যুষে উঠেছে)। সুবহি সাদিকের শুরু থেকে মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বের হলে অনুরূপ মন্তব্য করা হয়। কাজেই এ সময়কে ابكار বলা হয়। اِبْكَارَ সম্পর্কে উমার ইব্ন আবূ রবীআহ্র উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ اَمِنْ اٰلِ نِعَمٍ اَنْتَ غَادٍ فَمُبْكِرٍ বিলাসী পরিবারভুক্ত তুমি কি ভোরে ও প্রত্যুষে জেগেছ? بكور সম্পর্কে কবি জারীরের উক্তি ঃ اَلَا بَكَرَتْ سَلْمٰى فَجَدَّ بُكُوْرُهَا + وَشَقَّ الْعَصَا بَعْدَ اجْتِمَاعٍ اَمِيْرُهَا

(আহা! সালমা যদি ভোরে ঘুম থেকে উঠত, তাহলে তার ভোরে সজাগ হওয়াটা মর্যাদাবান হতো এবং তার নেতার একত্রিত হবার পর যদি লাঠিটা ভেঙ্গে দিত।) এ হিসাবেই বলা হয় بكر النخل يبكر ابكر يبكر ابكاراً – يكورا (খেজুর বৃক্ষ নতুন ফল দিয়েছে) ফলের মধ্যে যেগুলো আগে পাকে সেগুলোকে الباكور বলা হয়।

আমরা যে মন্তব্য করেছি অনেক তাফসীরকারই অনুরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

৭০২৫. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, ابكار অর্থাৎ ভোর বেলার প্রথম অংশ আর العشى (অর্থ সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৭০২৬. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(٤٢) وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪২. স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নবীর মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, সর্বশ্রোতা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিলে, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে, তা একান্ত আপনার জন্যে আমি উৎসর্গ করলাম এবং যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মনোনীত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اصطفاك-এর অর্থ, তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে তাঁর আনুগত্যের জন্যে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁর যে পুরস্কার শুধু তোমার জন্যে নির্দিষ্ট, সেগুলোর জন্যে তোমাকে বেছে নিয়েছেন।

طَهَّرَكِ অর্থাৎ মহিলাদের দীন-ধর্মে যে সকল হীনতা, সংকীর্ণতা ও সন্দেহ বিদ্যমান, সেগুলো হতে তোমাকে পবিত্র করেছেন।

وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِيْنَ (এবং তোমাকে বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীত করেছেন) মানে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তোমার আনুগত্যের ফলে তোমার যুগের বিশ্বের সকল নারীর মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে তাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "সেখানকার শ্রেষ্ঠ মহিলা ইমরান কন্যা মারইয়াম (র.), এবং সেখানকার শ্রেষ্ঠ মহিলা খুওয়াইলাদ তনয়া খাদীজা (রা.)। তাঁর বক্তব্যে সেখানকার মধ্যে অর্থ, জান্নাতীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা।

৭০২৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর (রা.) বলেছেন, ইরাকে অবস্থানকালীন হযরত আলী (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, সেখানকার শ্রেষ্ঠ মহিলা হযরত খাদীজা (রা.) ।

৭০২৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, জান্নাতের মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমরান তনয়া মারইয়াম (র.) এবং জান্নাতের মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খুওয়াইলাদ তনয়া হযরত খাদীজা (রা.) ।

৭০২৯. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ প্রসংগে আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, বিশ্বের অন্য নারীদের পরিচিতি জানার চেয়ে ইমরান তনয়া মারইয়াম, ফিরআউনের স্ত্রী, খুওয়াইলাদ তনয়া খাদীজা (রা.) ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যা (রা.) ফাতিমা পরিচিতি জানাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

হযরত কাতাদা (র.) বলেন, আমাদের নিকট আলোচনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলতেন, উট-আরোহিণী কুরায়শ বংশীয় পুণ্যবান নারীগণই উত্তম নারী। শৈশবকালে ওরা সন্তান-দরদী এবং স্বামীর সম্পদের পরম সংরক্ষণকারিণী। হযরত কাতাদা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আমি যদি এই তথ্য পেতাম যে, মারইয়াম উটে চড়েছিলেন, তা হলে অন্য কাউকে তাঁর উপর মর্যাদা দিতাম না।

৭০৩০. হযরত কাতাদা (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاۤءِ الْعٰلَمِيْنَ ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, উট-এর আরোহিণী কুরায়শ বংশীয় পুণ্যবান মহিলারা শ্রেষ্ঠ মহিলা, তারা সন্তানের প্রতি

অধিক স্নেহময়ী, স্বামীর ধন-সম্পদের অধিক সংরক্ষণকারিণী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, মারইয়াম (আ.) কখনো উটে আরোহণ করেননি।

৭০৩১. হযরত আবূ জা'ফর (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ প্রসংগে তিনি বলেছেন, ছাবিত বানানী (রা.) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা চার জন। ইমরান বিনতে মারইয়াম ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মুযাহিম, খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লাদ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কন্যা ফাতিমা (রা.)।

৭০৩২. আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পরিপূর্ণতা বা কামালিয়াত লাভ করেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারইয়াম্ ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদীজা বিনত খুওয়ালিদ এবং ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ ব্যতীত কেউ কামালিয়াত অর্জন করতে পারেনি।

৭০৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ্ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কন্যা ফাতিমা (রা.) বলেছেন, একবার আমি হযরত আইশা (রা.)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তথায় প্রবেশ করলেন। তিনি চুপিসারে আমাকে কিছু বললেন, এতে আমি কেঁদে উঠলাম। তারপর পুনরায় আমাকে চুপিসারে কিছু বললেন, তাতে আমি হেসে উঠলাম। হযরত আইশা (রা.) আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আপনি কিন্তু তাড়াতাড়ি করে ফেললেন, সময় হলে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করব। ফলে তিনি আর উচ্চ-বাচ্য করেন নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইনতিকালের পর হযরত আইশা (রা.) পুনরায় আমাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, "হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রতি বছর একবার করে আমাকে কুরআন শুনান, এবার কিন্তু দু'বার শুনিয়েছেন। প্রত্যেক নবীকেই তাঁর পূর্ববর্তী নবীর অর্ধেক বয়স দেয়া হয়েছে। তাই 'ঈসা (আ.)-এর বয়স ছিল ১২০ বছর। এখন আমার বয়স ৬০ বছর। আমার মনে হয়, এ বছরই আমি ইহলোক ত্যাগ করব। এতে বিশ্বের সকল মহিলার চেয়ে তুমিই বেশী দুঃখিত হবে। তবে ধৈর্য ধারণে কোন মহিলার চেয়ে তুমি যেন কম না হও। তিনি বলেন, এতে আমি কেঁদে উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী শুধুমাত্র মারইয়াম ব্যতীত। ঐ বছরেই তিনি ইনতিকাল করলেন।

হযরত আম্মার ইব্ন সা'দ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের মহিলাদের মধ্যে খাদীজা (রা.)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, যেমন জগতের সকল নারীর মধ্যে মারইয়াম (র.)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (.র) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَطَهَّرَكِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমরা যা বলেছি তথায় তোমার দীনকে হীনতা ও সন্দেহপ্রবণতা থেকে পবিত্র করেছেন।" তাফসীরকার হযরত মুজাহিদ (র.) ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

৭০৩৪. আল্লাহ্ তাআলার বাণী إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ–এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তোমাকে ঈমানের দিক থেকে পবিত্র করেছেন।

৭০৩৫. আবূ নাজীহ (র.)–ও মুজাহিদ (র.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭০৩৬. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (এবং তোমাকে বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীত করেছেন)–এর ব্যাখ্যায় ইব্ন জুরাইজ (রা.) বলেছেন, বিশ্বের নারীদের মধ্যে অর্থ, সে যুগের সকল নারীর মধ্যে। ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করেছেন, ফেরেশতারা মারইয়াম (র.)–এর মুখোমুখি এসে এ সংবাদ দিয়েছিলেন।

৭০৩৭. ইব্ন ইসহাক বলেছেন, হযরত মারইয়াম (র.) ইবাদতখানাতেই থাকতেন। তাঁর সাথে ইউসুফ নামে একজন বালক থাকত, তার মাতাপিতা তাকে ইবাদতখানার জন্যে ওয়াক্ফ করার মানত করেছিল। তাঁরা উভয়ে সেখানে বসবাস করতেন। হযরত মারইয়াম (র.) ও ইউসুফের কলসীর পানি ফুরিয়ে গেলে তাঁরা উভয়ে মাঠে যেতেন এবং সেখান থেকে কলসী ভর্তি সুস্বাদু পানি নিয়ে আসতেন। এমনি এক সময়ে ফেরেশতাগণ হযরত মারইয়াম (র.)–এর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (আল্লাহ্ তোমাকে পবিত্র ও মনোনীত করেছেন এবং বিশ্বের নবীর মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন)। হযরত যাকারিয়া (আ.) এ ঘটনা শুনে বললেন ইমরানের মেয়ের বিশেষ একটা মর্যাদা আছে।

(٤٣) يَٰمَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّٰكِعِينَ ۝

৪৩. হে মারয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, সিজদা কর এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে রুকূ কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ.) সম্পর্কে তাঁর ফেরেশতাদের মন্তব্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। তারা বলেছিল, হে মারইয়াম! প্রতিপালকের অনুগত হও। তোমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্যেই রাখ। ইতিপূর্বে আমরা যুক্তি প্রমাণ সহ قنوت শব্দের অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এতদসম্পর্কে তথায় ব্যাখ্যাকারদের যে মন্তব্য ও মতদ্বৈতা ছিল এখানেও তা বিদ্যমান। তাঁদের কতেকের আলোচনা আমরা এখানেও করব।

কেউ কেউ বলেছেন যে, اقْنُتِي মানে তুমি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭০৩৮. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, اطيلى الركود তোমার দাঁড়ানো দীর্ঘ করবে। ركود মানে قنوت–।

৭০৩৯. মুজাহিদ (র.) হতে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭০৪০. ইব্ন জুরাইজ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– اقْنُتِي لِرَبِّكِ–এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র.) বলেছেন, তুমি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াবে, অর্থাৎ কুনূত দীর্ঘ করবে।

৭০৪১. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত, হযরত মারইয়াম (র.)-কে يَامَرْيَمُ اقْنُتِي বলার পর তিনি দাঁড়ানো আরম্ভ করলেন, দাঁড়াতে দাঁড়াতে তাঁর পায়ের গিটদ্বয় ফুলে গিয়েছিল।

৭০৪২. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত। হযরত মারইয়াম (র.)- কে যখন বলা হলো 'হে মারয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও, তখন তিনি দাঁড়ালেন এমন কি তাঁর পা দুটো ফুলে গিয়েছিল।

৭০৪৩. মুজাহিদ (র.) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, اُقْنُتِي لِرَبِّكِ অর্থ ঃ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক।

৭০৪৪. রবী' (র.) يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন কুনূত (قنوت) মানে দাঁড়ানো। তিনি বলেন তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাতে দাঁড়াও এবং সালাতের মধ্যে তাঁরই উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাক, সিজদা কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর।

৭০৪৫. মুজাহিদ (র.) يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ প্রসংগে বলেছেন, হযরত মারইয়াম (র.) সালাতে দাঁড়াতেন। তাঁর দুই পাও ফুলে যেত। এমনকি তাঁর পা দুটো হতে পুঁজ গড়িয়ে পড়ত।

৭০৪৬. আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি সালাতে দাঁড়াতেন এমন কি তাঁর দুটো পাও হতে পুঁজ গড়িয়ে পড়ত।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন ঃ এর অর্থ- "তোমার প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠ হও।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭০৪৭. হযরত সাঈদ (র.) হতে বর্ণিত। يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, তোমার প্রতিপালকের প্রতি একনিষ্ঠ হও।

তাফসীরকারদের অপর একদল বলেন, এর অর্থ তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য কর।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭০৪৮. কাতাদা (র.) اُقْنُتِي لِرَبِّكِ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য কর।

৭০৪৯. সুদ্দী (র.) বলেন اقْنُتِي لِرَبِّكِ-এর অর্থঃ তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য কর।

৭০৫০. আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন কুরআন মজীদের যেখানেই القنوت শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, সেখানেই এর অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্য করা।

৭০৫১. হাসান (র.) يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ প্রসংগে বলেছেন, তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, বিশুদ্ধ যুক্তিতর্ক ও দলীল দিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি যে, রুকূ ও সিজদা মানে আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রতি বিনয়ী ও নম্র হওয়া।

এ প্রেক্ষিতে আয়াতের মর্মঃ হে মারইয়াম! মনোনয়ন দ্বারা, হীনতা থেকে পবিত্রকরণ দ্বারা এবং তোমার যুগের নারী জাতির মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে যে সম্মান

দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তুমি তোমার প্রতিপালকের 'ইবাদতকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্যে নিবেদন কর। তাঁর 'ইবাদত ও আনুগত্যে বিনয়ী ও নম্র হও জগতের সে সকল লোকের সাথে যারা তাঁর জন্যে বিনয়ী হয়।

অতএব, আয়াতের অর্থ হবে– হে মারইয়াম। তুমি বিশেষভাবে ভক্তি সহকারে তোমার রবের ইবাদত কর। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্য হতে যারা বিনয়ের সাথে তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে তুমিও অনুরূপ আনুগত্য প্রকাশ কর। আর তা এ কারণে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাকে তোমার যুগের সমস্ত নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ও সম্মানিত করেছেন।

(٤٤) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

৪৪.এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা তোমাকে ওহীদ্বারা অবহিত করতেছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এরজন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ ذَالِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ (এটি অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি)–এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী ذَالِكَ দ্বারা সে সকল সংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا (আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.) ও নূহ (আ.)-কে মনোনীত করেছেন) থেকে আরম্ভ করে ইমরান পত্নী ও তাঁর মেয়ে মারইয়াম (র.), হযরত যাকারিয়া (আ.) ও তাঁর বান্দাদেরকে অবহিত করেছেন। এক্ষণে ذالك (তা) বলে সকল ঘটনাকে তিনি একত্রিত করলেন এবং বললেন, এ সংবাদগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ (গায়ব)। অদৃশ্য কথাটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, এ হচ্ছে অতীত জাতি ও সম্প্রদায়গুলোর অপ্রকাশিত সংবাদ যা হে মুহাম্মাদ (সা.)! আপনি নিজেও জানেন নি আপনার সম্প্রদায় ও জানেনি এবং ইয়াহুদ ও খৃস্টানদের গুটিকতক পাদ্রী ও যাজক ব্যতীত আর কেউ জানে নি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বলছেন এ সংবাদাদি ওহী দ্বারা তিনি নিজেই নবী–কে অবহিত করেছেন, যাতে এটি তাঁর নবূওয়াতের পক্ষে দলীল স্বরূপ হয়। এটি দ্বারা তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং এত দ্বারা যেন তাঁর রিসালাত অস্বীকারকারী ইয়াহুদী ও খৃস্টান কাফিরদের আপত্তি খন্ডিত হয়। তারা তো জানে যে, এসকল রহস্য ও সংবাদাদি অপ্রকাশ্য। তাই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর নিকটেও তা অজ্ঞাত। সুতরাং আল্লাহ্ পাক অবগত না করলে মুহাম্মাদ (সা.) তা অবগত হতে পারেন নি। কারণ মুহাম্মাদ (সা.) লেখাপড়া জানেন না। যাতে অধ্যয়নের মাধ্যমে কিতাব থেকে তিনি তা আহরণ করতে পারেন। তিনি কিতাবীদের সাথেও জড়িত নন, যাতে তাদের থেকে এটি অবহিত হতে পারেন। গায়ব (غيب) শব্দটি আরবী প্রবাদ ঃ غَابَ فُلَانٌ عَنْ كَذَا (এ থেকে অমুক তো অনুপস্থিত)–এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। তাই বলা হয় ঃ

يَغِيبُ عَنْهُ غَيْبًا وَغَيْبَةً (তা হতে অদৃশ্য হয় বা অদৃশ্য হওয়া)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ نُوحِيهِ اِلَيْكَ (আমি ওহী দ্বারা তোমাকে অবহিত করেছি) মানে এগুলো তোমার নিকট নাযিল করেছি। اِيحَاء শব্দের মৌলিক অর্থ ওহী প্রেরিত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা। এ প্রেরণ ও অর্পণ কখনো লেখনীর মাধ্যমে, কখনো ইশারা–ইঙ্গিতের মাধ্যমে, আবার কখনো ইলহাম ও রিসালাতের মাধ্যমে হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَاَوحَى رَبُّكَ اِلَى النَّحلِ (তোমার প্রতিপালক মৌমাছির নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন (১৬ ঃ ৬৮) অর্থাৎ এ ভাবটি তার অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন তথা ইলহাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّنَ (আরও স্মরণ কর যখন আমি হাওয়ারীদের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, (৫ ঃ ১১১) অর্থাৎ ইলহাম পদ্ধতিতে তাদের নিকট এ জ্ঞান প্রেরণ করেছিলাম।

রাজিয বলেন ঃ اَوْحَى لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقَرَّتْ (তার নিকট স্থিরতার ওহী করেছেন, ফলে সে সুস্থির হয়েছে) ঃ অর্থাৎ তার নিকট এটি প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا (তাদেরকে সকাল–সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে বললেন। (১৯ ঃ ১১)

অর্থাৎ এ বক্তব্যটি তাদের নিকট পেশ করলেন। ওহী (وحى) শব্দের মৌলিক অর্থ তা–ই যা আমি বর্ণনা করলাম অর্থাৎ তাদের নিকট প্রেরণ করা। অবশ্য মাঝে মাঝে এ প্রেরণটি ইঙ্গিতে মাধ্যমে হয় এবং মাঝে মাঝে হয় লেখনীর মাধ্যমে। এ প্রসংগেই উল্লেখ করা যায় আল্লাহ্র বাণী وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَاءِهِمْ (শয়তান তার বন্ধুদের নিকট ওহী প্রেরণ করে ৬ ঃ ১২১) অর্থাৎ প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা হিসাবে সে তার বন্ধুদের অন্তরে ঝগড়া বিবাদের মনোভাব সৃষ্টি করে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ (এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছে তাদেরকে আমি সতর্ক করি (৬ ঃ ১৯)। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.)–এর আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এটি আমার প্রতি প্রেরিত হয়েছে। প্রেরণের পক্ষ হতে প্রাপকের নিকট যা প্রেরিত হয় তা ওহী (وحى)। এজন্যে আরবগণ চিঠিপত্রকে ওহী নামে আখ্যায়িত করে। কারণ যে কাগজে এটি লিখিত হয়, সে কাগজে এটি স্থির ও বিদ্যমান থাকে।

কবি কা'ব ইব্ন যুহায়র বলেন ঃ

اَتَى الْعُجْمَ وَالْاٰفَاقَ مِنْهُ قَصَائِدٌ * بَقِيْنَ بَقَاءَ الْوَحْيِ فِى الْحَجَرِ الْاَصَمِّ

এর কয়েকটি মাত্র পংক্তি অনারব এলাকা ও বিশ্বে পৌঁছেছে এগুলো কঠিন শিলায় খোদাইকৃত লেখনীর ন্যায় অটুট রয়েছে। অর্থাৎ পাথরে খোদিত লেখার ন্যায়। কখনো কখনো শুধুমাত্র গ্রন্থ ও চিঠিতে লিখনকে ওহী বলা হয়। যেমন কবি রা'উবা–এর বক্তব্য ঃ

كَاَنَّهُ بَعْدَ رِيَاحٍ تَدْهَمُهُ + وَمُرْثَعِنَاتِ الدُّجُوْنِ تَثِمُهُ - اِنْجِيْلُ اَحْبَارٍ وَحَى مُنَمْنِمُهُ

প্রচণ্ড ঝড়ের আক্রমণে এবং মুষলধারায় প্রবল বর্ষণের আঘাতের পর সেটি যেন যাজকের ইনজীল এবং ঝকমকে লিখন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (অর্থঃ মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে সেটির জন্যে যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল আপনি তখন ওদের নিকট ছিলেন না)–এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম তাবারী (র.) বলেন, وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করছেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি তো তাদের নিকট ছিলেন না যাতে আমি যা আপনাকে শিখাচ্ছি তা আপনি জানতে পারতেন, তবে আমি আপনাকে যা অবহিত করাচ্ছি তা দ্বারা আপনি সে সকল সংবাদাদি ও ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন। لَدَيْهِمْ মানে ওদের নিকট। إِذْ يُلْقُونَ মানে যখন তারা নিজেদের কলমগুলো ঝর্ণায় নিক্ষেপ করেছিল। أَقْلَامَهُمْ মানে সে সকল তীর–বর্শা, যেগুলোর সাহায্যে বনী ইসরাঈল হযরত মারইয়াম (আ.)–এর দায়িত্ব গ্রহণ বিষয়ে লটারী অনুষ্ঠান করেছিল। وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (এবং যাকারিয়া (আ.)–কে দায়িত্ব দিলেন) আয়াতে আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। অনেক তাফসীরকার আমাদের বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭০৫২. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন,হে মুহাম্মাদ! আপনি তাদের নিকট ছিলেন না।

৭০৫৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মারইয়াম (আ.) তাঁদের নিকট আনীত হবার পর তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্যে হযরত যাকারিয়া (আ.) ও তাঁর সাথিগণ কলম দিয়ে লটারী অনুষ্ঠান করেছিলেন।

৭০৫৪. মুজাহিদ (র.) থেকে অপর এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭০৫৫. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মারইয়াম (আ.) তাদের নেতা ও ইমামের কন্যা ছিলেন। তাঁর লালন–পালনের ভার নেয়ার জন্যে বনী ইসরাঈলের সকলেই দাবী জানাল। কে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন তা নির্ধারণের জন্যে তাঁরা আপন আপন তীর দিয়ে লটারী অনুষ্ঠান করলেন। লটারীতে হযরত যাকারিয়া (আ.) জিতলেন। তারপর হযরত যাকারিয়া (আ.) তাঁর দায়িত্ব নিলেন ও তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখলেন।

৭০৫৬. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত । তিনি يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.)–এর দায়িত্ব কে নিবে এ বিষয়ে তাঁরা লটারী অনুষ্ঠান করেছিল। এতে হযরত যাকারিয়া (আ.) বিজয়ী হলেন।

৭০৫৭. ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত মারইয়াম (আ.)–কে যখন মসজিদে নেয়া হলো তখন মসজিদের খাদিমগণ তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে লটারী দাবী করল। তারা ওহী লিখত। সুতরাং কে দায়িত্ব নিবে সে ব্যাপারে আপন আপন কলম দিয়ে তারা লটারী অনুষ্ঠান করলেন।

৭০৫৮. ইসহাক (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেছেন মারইয়াম (আ.)-এর দায়িত্ব কে নিবেন, সে বিষয়ে তাঁরা আপন আপন কলম দিয়ে লটারী অনুষ্ঠান করেছিলেন। এতে হযরত যাকারিয়া (আ.) জিতেছিলেন।

৭০৫৯. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হযরত মারইয়াম (আ.) -এর ব্যাপারে লটারী দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করার পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাটি তাঁর অজানা ছিল।

اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ বলা হয়েছে এজন্যে যে, লটারীদাতাদের কলম নিক্ষেপের উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দেখে কোন ব্যক্তি মারইয়াম (আ.)-এর দায়িত্ব গ্রহণে যোগ্যতম ও অগ্রাধিকারী। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ -এর মধ্যে বাক্যের কিছু অংশ উহ্য রয়েছে। আর সেই উহ্য অংশ হচ্ছে لينظروا ايهم يكفل مريم وليتبسينوا ذلك ويعلموه যাতে তারা দেখে কে মারইয়াম (আ.)-এর দায়িত্ব নিবে, আর যাতে এটি তাদের নিকট স্পষ্ট হয়। যে ব্যক্তি এ ধারণা করে, اَيُّهُمْ -এর মধ্যে নসব-ই ওয়াজিব, সে ভুল করবে এবং সেক্ষেত্রে اَىٌّ শব্দের প্রশ্নবোধকতা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ প্রতীক্ষা, সুষ্ঠুতা এবং অবহিত হওয়ার সাথে اَىٌّ শব্দের ব্যবহার প্রশ্নবোধক। প্রশ্নবোধক اَىٌّ শব্দের অবস্থান বাক্যের প্রথমাংশে। কেউ যদি বলে لانظرن ايهم قام (আমি দেখব কে দাঁড়িয়েছে?) -এর অর্থ হবে আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করব তাদের মধ্যে কে দাঁড়িয়েছে। لَاَعْلَمَنَّ শব্দের অর্থও অনুরূপ। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে يكفل মানে يَضُمُّ - মিলিয়ে নেয়া, এটির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (তারা যখন বাদানুবাদ করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না) এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি তো মারইয়াম (আ.)-এর সম্প্রদায়ের নিকট ছিলেন না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারইয়াম (আ.) -এর দায়িত্ব গ্রহণে অধিক যোগ্য ও অগ্রগণ্য। বাহ্যিকভাবে তা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সম্বোধন বটে, তবে প্রকারান্তরে তা কিতাবীদের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদান। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, খৃস্টান কাফিরেরা আপনার ব্যাপারে কিভাবে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? অথচ আপনি তো তাদেরকে এসকল কথা জানান। কিন্তু আপনি সেগুলো দেখেন নি, আপনি তাদের সাথে ছিলেনও না, যেদিন তারা এসকল কর্ম করেছিল। যারা ঐসব কিতাব পড়ে অবহিত হয়েছেন, আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। যারা তাদের সাথে উঠাবসা করে, তাদের খবরাখবর রাখে আপনি তেমনও নন।

৭০৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) তিনি وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন তারা এ ব্যাপারে বাদানুবাদ করছিল। তারা যে সংবাদটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অগোচরে রেখেছিল সে সংবাদটি আল্লাহ্ তা'আলা সংগোপনে তাঁর হাবীব (সা.)-কে অবহিত করেন। যাতে তাঁর নবূওয়াত প্রমাণিত হয় এবং তাদের গোপন বিষয় প্রকাশ করায় তাদের বিরুদ্ধে তা দলীল হিসাবে গণ্য হয়।

(৪৫) اِذۡ قَالَتِ الۡمَلٰٓئِكَةُ یٰمَرۡیَمُ اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنۡهُ ۖ اسۡمُهُ الۡمَسِیۡحُ عِیۡسَی ابۡنُ مَرۡیَمَ وَجِیۡهًا فِی الدُّنۡیَا وَ الۡاٰخِرَةِ وَ مِنَ الۡمُقَرَّبِیۡنَ ○

৪৫. স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর পক্ষ হতে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার নাম মসীহ মারইয়াম তনয় ঈসা, সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে।

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনি তখনও তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল এবং তখনও ছিলেন না, যখন ফেরেশতারা মারইয়াম (আ.) কে বলেছিল, হে মারইয়াম (আ.)। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন।

التبشير মানে কোন ব্যক্তিকে এমন কল্যাণ লাভের সংবাদ দেয়া যাতে সে খুশী হয়। আল্লাহ্ পাকের বাণী بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ (তাঁর পক্ষ হতে একটি কালিমা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল প্রেরণ ও তাঁর হতে খবর প্রদান। যেমন বলা হয়, اَلْقَى فُلَانٌ اِلَيَّ كَلِمَةً سَرَّنِىْ بِهَا (অমুক তো আমার নিকট একটি বাণী পাঠিয়েছে, এর দ্বারা সে আমায় আনন্দিত করেছে) অর্থাৎ সে আমাকে এমন একটি সংবাদ দিয়েছে যাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ (এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের নিকট পাঠিয়েছেন (৪ ঃ ১৭১) অর্থাৎ ঈসা (আ.) সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার সুসংবাদ হযরত মারইয়াম (আ.)–এর নিকট। এটি তিনি মারইয়াম (আ.)–এর নিকট প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আয়াতের ব্যাখ্যা হলো হে মুহাম্মদ! তখন আপনি উক্ত সম্প্রদায়ের নিকট ছিলেন না! যখন ফেরেশতারা মারইয়াম কে বলেছিল হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পক্ষ হতে আপনাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছেন, তা হচ্ছে আপনার একটি সন্তান তাঁর নাম হলো মাসীহ ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ.)।

كلمة শব্দের ব্যাখ্যায় একদল তাফসীরকার বলেছেন, এটি তাফসীরকার কাতাদা (র.)–এর অভিমত– আলোচ্য আয়াতে كلمة শব্দটির অর্থ হলো كن অর্থাৎ হও।

৭০৬১. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী بكلمة منه-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, এর অর্থ হল كُنْ অর্থাৎ হও। كُنْ শব্দটিকে আল্লাহ্ তা'আলা কালিমা নামে অভিহিত করেছেন যেহেতু এটি তাঁর কালিমা হতে উদ্ভূত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু নির্ধারণ করলে বলা হয় هٰذَا قَدَرُ اللّٰهِ وَقَضَاؤُهُ (এটি আল্লাহ্‌র নির্ধারণ ও ফায়সালা) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্ধারণ ও ফায়সালা হতে উদ্ভূত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا (আল্লাহ্‌র নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে (সূরা আহযাবঃ ৩৭) এবং এটিই আল্লাহ্ পাকের আদেশ।

তাফসীরকারগণের একদলের মতে كلمة শব্দটি হযরত ঈসা (আ.)–এর নাম। আল্লাহ্ তা'আলা এ নামে ভূষিত করেছেন যেমন তাঁর সমগ্র জগতকে তিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্নভাবে নামকরণ করেছেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, الكلمة হচ্ছে ঈসা (আ.)।

৭০৬২. ইবন ওয়াকী হকরামা (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন, ইবন আববাস (রা.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। إِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঈসা (আ.)–ই আল্লাহ্ তা'আলার কালিমা।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আমার বিশুদ্ধ মত হচ্ছে প্রথমটি আর তা হলো, ফেরেশতাগণ হযরত মারইয়াম (আ.)–কে আল্লাহ্র পক্ষ হতে সুসংবাদ দিলেন, হযরত ঈসা (আ.)–এর রিসালাতের এবং আল্লাহর কালিমার। আল্লাহ্ যে সুসংবাদের আদেশ দিলেন তা হলো– স্বামী ও পুরুষ ব্যতিরেকে মারইয়াম (আ.) হতে একটি ছেলে সৃষ্টি করবেন। এজন্যেই পুংলিঙ্গ সর্বনাম ব্যবহার করে আল্লাহ্ তা'আলা (اسْمُهُ বলে) তার (পুং) নাম মাসীহ বলেছেন আর স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করে اِسْمُهَا বলেননি; অথচ كَلِمَةٍ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। কারণ নামের উল্লেখ যেমন মুখ্য উদ্দেশ্য, কালিমাঃ তেমন মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। নামটি অমুক ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু কালিমাটি এখানে সুংবাদ অর্থে ব্যবহৃত। ফলে সেটির ইঙ্গিত উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি সন্তান, জন্তু ও উপাধির ইঙ্গিত উল্লেখ করা হয়। এগুলো অবশ্য আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সুতরাং আমরা একটু আগে যা বলেছি, তার অর্থ এই ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে একটি সুখকর সংবাদ দিচ্ছেন, আর তা হলো ঃ একটি সন্তান, তার নাম মাসীহ।

বসরার অধিবাসী একদল ব্যাকরণবিদ মনে করেন, পূর্বে كَلِمَةٍ مِّنْهُ বলার পর اسمه বলা হয়েছে। অথচ কালিমাই হলো হযরত ঈসা (আ.)। কারণ মর্ম ও তত্ত্বের দিক দিয়ে সেই কালিমাটি ঈসা (আ.)। সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অপর আয়াতে প্রথমত স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করে বলেছেন–

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا (যাতে কাউকে বলতে না হয় হায়, হায়! ৩৯ ঃ ৫৭) তারপর পুংলিঙ্গ ব্যবহার করে বলেছেন بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيَاتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا (প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে (৩৯ ঃ ৫৯)। অনুরূপ জনৈক ব্যক্তিকে ذوالثدية (স্তনওয়ালা) নামে ডাকা হতো। কারণ তার হাত ছিল খাটো, স্তনের কাছাকাছি। সুতরাং ثدية যেন তার নাম–ই হয়ে গেল। এমন না হলে কিন্তু সে নামের তাসগীরে (আদরযোগ্য কাঠামো) هاء (হা) অক্ষরটি আসত না।

আমরা বসরাবাসী ব্যাকরণবিদদের যে মন্তব্য পেশ করলাম কুফাবাসী একদল ব্যাকরণবিদও তা বলেছেন। অর্থাৎ كلمة শব্দের মর্ম পুরুষ হওয়ায় (ه) সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। তবে পূর্বে كلمة শব্দটি উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও اسمه শব্দটিতে পুংলিঙ্গ সর্বনাম কেন আনা হয়েছে তাতে এরা ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তারপর বলেছেন যে, গুণ বর্ণনা, উপাধির বিবরণ এবং যে সকল নাম নামযুক্ত ব্যক্তিকে পরিচিত করার জন্যে নয় যেমন অমুক অমুক সে সকল নামে আরবরা এ রকম করেই থাকে। ذرية (যুররিয়্যাহ) خليفة (খলীফা) ও دابة (দাববাহ্) শব্দও অনুরূপ। তাই ذرية طيبة ও

ذرية طيب উভয় রূপে পড়া তাঁদের মতে বৈধ। পক্ষান্তরে طلحة اقبلت এবং مغيرة قامت বলা বৈধ নয়।

যারা ذى الثدية দ্বারা যুক্তি দেখিয়েছেন অপর পক্ষ কিন্তু তাদের এ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন ذى الثدية শব্দে هاء এসেছে এজন্যে যে, তা قطعة من الثدى (স্তনের একটি টুকরো) অর্থে ব্যবহৃত। যেমন বলা হয় كنا فى لحمه ونبيذة (আমরা গোশত ও পানীয়তে ছিলাম) অর্থাৎ এগুলোর এক একটি অংশ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এ বক্তব্যটি আমাদের প্রদত্ত বক্তব্যের ন্যায়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ اسمه المسيح عيسى بن مَرْيَمَ দ্বারা তিনি আপন বান্দাদেরকে হযরত ঈসা (আ.)–এর বংশীয় সম্পর্কের ব্যাপারে অবহিত করেছেন যে, ঈসা (আ.) হবেন তাঁর মাতা মারইয়াম (আ.)–এর সন্তান। সত্য বিকৃতকারী খৃস্টানরা আল্লাহ্ পাকের সাথে ঈসা (আ.)–এর পুত্রত্ব এবং মিথ্যুক ইয়াহূদিগণ হযরত মারইয়াম (আ.)–কে যে অপবাদ দিয়ে থাকে আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাও অপনোদন করা হয়েছে।

৭০৬৩. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ إِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলা যা বলেছেন তা–ই, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ওরা (ইয়াহূদী ও খৃস্টান) যা বলে তা ঠিক নয়। مَسِيح শব্দটি فعيل এর কাঠামোতে مفعول হতে فعيل-এর প্রতি স্থানান্তর করা হয়েছে। মূলে ছিল ممسوح স্পর্শকৃত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কুদরতীভাবে মসেহ বা ছুঁয়ে দিয়েছেন। ফলে তিনি সকল পাপ–পংকিলতা থেকে পবিত্র হয়ে গেছেন। এজন্যেই ইব্রাহীম (র.) বলেন, মাসাহ হচ্ছে আস-সিদ্দীক বা সত্যবাদী। অন্যরা বলেন, বরকত সহকারে আল্লাহ্ তা'আলা মাসাহ ও স্পর্শ করে দিয়েছেন।

৭০৬৪. ইবরাহীম (র.) হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৭০৬৫. ইবরাহীম (র.) হতে অপর এক সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন এর অর্থ বরকত করা।

৭০৬৬. সাঈদ (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বরকতযোগে তাকে মাসাহ করে দিয়েছেন। তাই তিনি মাসীহ নামে অভিহিত হয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (তিনি ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হবেন)–এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, وَجِيْهًا মানে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনি মর্যাদাবান, উচ্চস্তরের অধিকারী, সম্মানিত ও মহান। এ জন্যেই যে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত, রাজা–প্রজা নির্বিশেষে সবাই যাকে সম্মান করে, তাকে وَجِيْهٌ বলা হয়। এ থেকেই বলা হয় مَا كَانَ فُلَانٌ وَجِيْهًا (অমুক ব্যক্তি মর্যাদাবান ছিল না)। وَلَقَدْ وَجُهَ وَجَاهَةً –সে মর্যাদা লাভ করেছে। وَاِنَّ لَهُ لَوَجْهًا عِنْدَ السُّلْطَانِ وَجَاهًا

وَجَاهَةٌ (রাজার নিকট তার একটা মর্যাদা আছে। جاه শব্দটি وَجْه –এর পরিবর্তিত রূপ। সূচনার واو টি স্থানান্তরিত হয়ে মধ্যম স্থানে (عين –এর স্থানে) গিয়েছে, ফলে বলা হয় جاه–প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল وَجْهٌ –পরিবর্তিত রূপ جاه –এর ক্রিয়ারূপ جَاهَ يَجُوْهُ

আরবদের থেকে শ্রুত যে, اخاف ان يجوهنى با كثر من هذا (আমি আশংকা করছি যে, এর চেয়ে বড় কিছু নিয়ে আমার মুখোমুখি হয় কিনা।) وَجِيْهًا শব্দটি যবরযুক্ত হয়েছে عِيْسٰى (ঈসা) শব্দ থেকে নিশ্চিতকরণের (قطع) কারণে। যেহেতু عِيْسٰى শব্দটি সুনির্দিষ্ট (معرفه) এবং وجيه শব্দটি অনির্দিষ্ট (نكره) ও وجيه শব্দটি (نكره) -এর বিশেষণ। অবশ্য كَلِمَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কিত করে وَجِيْهٍ যেরসহ পড়াও সিদ্ধ। আমরা যা বললাম যে, আয়াতের অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতে, তিনি আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাবান, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার (র.) ও অনুরূপ বলেছেন।

৭০৬৭. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) وَجِيْهًا শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে মর্যাদাবান।

আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ এর ব্যাখ্যা ঃ

হযরত ঈসা (আ.) সে সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা নৈকট্য দান করবেন, এরপর তাঁর পাশে ও সান্নিধ্য নিয়ে যাবেন।

৭০৬৮. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামত দিবসে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৭০৬৯-৭০. রবী' (র) থেকেও অপর সূত্রে অনুরূপ দুটি বর্ণনা আছে।

(٤٦) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পূণ্যবানদের একজন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে আপনাকে আপনার একটি সুসংবাদ দিচ্ছেন, তা হচ্ছে ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ.) তিনি আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাবান এবং মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। এক্ষেত্রে يُكَلِّمُ শব্দটি عوامل বা কার্যকারক থেকে মুক্ত থাকায় এবং يفعل –এর কাঠামোতে আসায় যদিও পেশযুক্ত হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি যবরের স্থলে অবস্থিত। এটি কবির নিম্নোক্ত চরণের অনুরূপ।

بتّ أُعَشِّيْهَا بِعَضْبٍ بَاتِرٍ * يَقْصِدُ فِيْ أَسْوُقِهَا وَجَائِرِ

(আমি রাত্রি যাপন করেছি সুতীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে, সেই তরবারির সম্মুখ ভাগের লক্ষ্য থাকে শত্রুর বক্ষের দিকে।)

المهد শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে দুধ পান করার সময় শিশুর শয়নস্থান।

৭০৭১. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ মানে দুধ পানকালে শিশুর শোবার স্থান। كهلا ও محتنكا শব্দদ্বয় দ্বারা প্রৌঢ় বাক বুঝায়, যা কৈশোরের পর ধার্য করে পূর্বের স্তর। এ থেকেই বলা হয় رجل كهل (প্রৌঢ় পুরুষ) ও امراة كهلة (প্রৌঢ়া মহিলা)। কবি রাজিযও অনুরূপ বলেছেন : وَلَا اَعُوْدُ بَعْدَهَا كَرِيًّا * اَلْكَهْلَةَ وَالصَّبِيًّا (এরপর আমি তো আর ফিরে যাব না শৈশবও প্রৌঢ়ত্বের যুগে)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "হযরত ঈসা (আ.). কোলে থাকা অবস্থায় শৈশবেই মানুষের সাথে কথা বলবেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর মায়ের উপর আরোপিত মিথ্যুকদের অপবাদসমূহ দূরীভূত করবেন এবং তা তাঁর নবূওয়াতের উপর দলীল হবে। তিনি যৌবনের পর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছবেন। তিনি এসব করবেন মহান আল্লাহ্‌র দেয়া ওহী আদেশ–নিষেধ ও কিতাবে উল্লিখিত বিষয়গুলো দ্বারা।

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে হযরত মাসীহ (আ.) সম্পর্কে অবগত করেছেন। যদিও বা মানুষ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে কথা বলে। আল্লাহ্ তা'আলা এর দ্বারা খৃষ্টান কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করেছেন। তিনি সদ্য প্রসূত বাচ্চা ছিলেন, তারপর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছলেন। যুগের বিবর্তনে তিনি অবস্থান্তরিত হয়েছেন। বর্ষ পরিক্রমায় তিনি শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছেন, এক অবস্থা হতে অপর অবস্থায় গিয়েছেন। মুলহিদ ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা যা বলে, তিনি যদি তা হতেন অর্থাৎ ইলাহ্ হতেন তা হলে এ অবস্থান্তর তাঁর হতো না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের দাবী খন্ডন করেন। যারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাথে তর্ক করেছিল। এর দ্বারা তিনি যুক্তিতর্কে রাসূলুল্লাহ্(সা.)-কে ওদের বিরুদ্ধে বিজয় করে দিলেন এবং ওদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) অপর সকল মানব সন্তানের ন্যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন কিছু মু'জিযা, দিয়ে ভূষিত করেছেন, যা তাঁরই বৈশিষ্ট্য। আমাদের আলোচনার সপক্ষে দলীলগুলো নিম্নে বর্ণিত হল।

৭০৭২.মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ঈসা (আ.) –এর অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করছেন যে, তিনি তাঁর জীবনে শৈশব হতে কৈশোর ও প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছবেন যেমনিভাবে অন্যান্য মানব সন্তান পৌঁছে। তবে অতি শৈশবে কথা বলা তাঁর নবূওয়াতের প্রমাণ হয় এবং মহান আল্লাহ্‌র কুদরত ও ক্ষমতার সাথে বান্দাগণ পরিচিত হয়।

৭০৭৩. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ –এর ব্যাখ্যা তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) শৈশবে ও প্রৌঢ়ত্বে মানুষের সাথে কথা বলবেন।

৭০৭৪. রবী' (র.) থেকে বর্ণিত। وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ.) শৈশব ও প্রৌঢ়ত্বে মানুষের সাথে কথা বলবেন।

৭০৭৫. মুজাহিদ (র.) وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ–এর ব্যাখ্যায় বলেন, الكهل মানে اَلْحَلِيْمُ

৭০৭৬. ইব্‌ন জুরাইজ (র.) বলেছেন, তিনি (ঈসা (আ.), মানুষের সাথে কথা বলবেন শৈশবে, বার্ধক্যে এবং প্রৌঢ় বয়সে। ইব্‌ন জুরাইজ (র.) এও বলেছেন যে, মুজাহিদ (র.) বলেছেন, الكهل মানে সাবালক।

৭০৭৭. হাসান (র.) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا প্রসংগে বলেছেন, ঈসা (আ.) মানুষের সাথে কথা বলবেন, শৈশবে দোলনায় থেকে এবং পরিণত বয়সে

وَكَهْلًا (প্রৌঢ়) প্রসংগে অপর পক্ষ বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.)–এর পুনরাগমণের পর তিনি কথা বলবেন।

যাঁরা এমত পোষাণ করেন ঃ

৭০৭৮. ইব্‌ন যায়দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, শৈশবে হযরত ঈসা (আ.) মানুষের সাথে কথা বলবেন এবং যখন দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তখনও তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। তখন তিনি প্রৌঢ় বয়সে পৌঁছবেন।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ-এর ক্ষেত্রের (محل) সাথে সংযুক্ত (عطف) হওয়ায় كهلا শব্দে যবর দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ –এর ব্যাখ্যা হলো, হযরত ঈসা (আ.) সৎকর্মশীল ও ওলী আল্লাহ্‌গণের বন্ধু হবেন। কারণ, সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ মর্যাদা ও দীনের ক্ষেত্রে একদল অপর দলের সাথে সম্পৃক্ত।

(٤٧) قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৭. সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, আমার সন্তান হবে কী ভাবে? তিনি বললেন, এভাবেই, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনি যখন কোন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, ফেরেশতাগণ হযরত মারইয়াম (আ.)-কে যখন মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিলেন, তখন তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কোন্ পদ্ধতিতে আমার সন্তান হবে? আমি বিয়ে করব, সংসারী হব, সেই দাম্পত্য জীবনে স্বামীর পক্ষ হতে আমার গর্ভে সন্তান আসবে, না কি কোন মানুষের স্পর্শ ব্যতীত সরাসরি আমার উদরে সন্তান জন্ম নিবে? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তখন জানালেন,

আল্লাহ্ তা'আলা এভাবেই সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ কোন মানুষের স্পর্শ ব্যতীত তিনি তোমার থেকে সন্তান সৃষ্টি করবেন। তারপর তা মানুষের জন্যে নিদর্শন ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে স্থির করবেন। কারণ, তিনি যা চান সৃষ্টি করেন, বাস্তবায়িত করেন যা উদ্দেশ্য করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা স্বামীর মাধ্যমে ও বিনা স্বামীতে সন্তান দান করেন এবং পতি থাকা সত্ত্বেও অনেক নারীকে সন্তান হতে বঞ্চিত করেন। তিনি কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলে তা সৃজন করা তাঁর জন্যে কষ্টকর হয় না। তিনি যা ইচ্ছা করেন, যেভাবে ইচ্ছা করেন, তার জন্যে শুধু 'হও' বলে নির্দেশ দেন, ফলে তিনি যা চান যেভাবে চান বাস্তবায়িত হয়।

৭০৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَايَشَاءُ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মানুষ সম্পর্কিত কিংবা অন্য ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যা চান তা বাস্তবায়ন করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ তিনি যখন কোন কিছু স্থির করেন তখন বলেন 'হয়ে যাও' ফলে তিনি যা চান যেভাবে চান হয়ে যায়।

(٤٨) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

৪৮. অর্থ ঃ তিনি তাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল।

আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ يُعَلِّمُهُ-এর পঠন পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হিজায, মদীনা এবং কূফার কিছু সংখ্যক কিরা'আত বিশেষজ্ঞ " يا " যোগে يُعَلِّمُهُ পাঠ করেছেন। يَخْلُقُ مَايَشَاءُ-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁরা وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ পড়েছেন। يَخْلُقُ مَايَشَاءُ এবং فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ-এর সংবাদ দান পদ্ধতিতে এক্ষেত্রে يُعَلِّمُهُ তৃতীয় পুরুষ পড়েছেন। বসরার কিছু সংখ্যক এবং কূফার অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ, نُوْحِيْهِ اِلَيْهِ-এর সাথে সংযুক্ত করে (عطف) প্রথম পুরুষ وَنُعَلِّمُهُ পড়েছেন। যেন তিনি বলেছেন, এটি অদৃশ্যের সংবাদ যা আমি আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি এবং আমি তাকে শিক্ষা দিব কিতাব ...... । তাঁরা বলেন نُوْحِيْهِ-এরপর থেকে كُنْ فَيَكُوْنُ পর্যন্ত সম্পর্কযুক্ত এরপর وَنُعَلِّمُهُ বাক্যটির সাথে সংযুক্ত (عطف) হয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ মতামত এই যে, দুটোই ভিন্ন ভিন্ন পঠন-রীতি বটে; কিন্তু অর্থগত দিক থেকে পরস্পর বিপরীত নয়। কাজেই, পাঠক যে রীতিতেই পড়ুন তা সঠিক হবে। কারণ, উভয়ের অর্থ একই। উভয় রীতিতেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে অবহিত করা হয় যে, তিনি ঈসা (আ.)-কে কিতাব শিক্ষা দিবেন। এ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত মারইয়াম (আ.)-কে অবহিত করা হয় যে, তাঁকে সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হলো এবং তাকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক মর্যাদা, উচ্চাসন ও সম্মান দান করবেন। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে মারইয়াম! এভাবে স্বামী ব্যতীতই তোমার থেকে তিনি সন্তান সৃষ্টি করবেন। তারপর তাকে কিতাব অর্থাৎ লেখন পদ্ধতি শিক্ষা দিবেন। আরও শিক্ষা দিবেন হিকমত যা কিতাব ব্যতীত ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হবেন। আর তাওরাত বলতে এখানে ঐ কিতাব হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি নাযিল হয়েছিল তাও শিক্ষা দিবেন। যা মূসা (আ.)-এর যুগ থেকে ক্রমান্বয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এসেছিল এবং তাঁকে ইনজীল শিক্ষা দিবেন। ইনজীল হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাব। তা তখনও নাযিল হয়নি।

হযরত ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার মারইয়াম (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি তার প্রতি ওহী প্রেরণ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয়ে অবহিত করলেন এবং কিতাবের নামও বলে দিলেন। এজন্যে যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সূত্রে মারইয়াম (আ.) অবগত ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা একজন নবী প্রেরণ করবেন, তাঁর নিকট কিতাব নাযিল করবেন এবং সেই কিতাবের নাম হবে ইনজীল। তিনি হযরত মারইয়াম (আ.)-কে জানিয়ে দিলেন যে, যে নবী সম্পর্কে তুমি জেনেছ, শুনেছ, অন্যান্য নবীগণ যে নবীর বর্ণনা দিয়ে গেছেন এবং বলে গেছেন যে ঐ নবীর নিকট ইনজীল গ্রন্থ নাযিল হবে, সে নবী তোমার সন্তান। আল্লাহ্ যে সন্তানের সু-সংবাদ তোমাকে দিয়েছেন। আমরা যা বললাম অনেক তাফসীরকারও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন।

৭০৮০. হযরত ইবন জুরাইজ (র.) وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আমি তাকে লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দিব, সে নিজ হাতে লিখবে।

৭০৮১. কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, হিকমত অর্থ সুন্নাহ (রীতি-নীতি)।

৭০৮২. হযরত কাতাদা (র.) হতে বর্ণিত। হিকমত অর্থ সুন্নাহ্। তাওরাত ও ইনজীল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) তাওরাত ও ইনজীল পাঠ করতেন।

৭০৮৩. ইবন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, হিকমত অর্থ সুন্নাহ্।

৭০৮৪. মুহাম্মাদ ইবন জা'ফর ইবন যুবায়র (র.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছা কি, সে সম্পর্কে তিনি হযরত মারইয়াম (আ.)-কে অবহিত করলেন। বললেন, আমি তাকে শিক্ষা দিব কিতাব, হিকমত, তাওরাত, যা মূসা (আ.)-এর যুগ থেকে তা প্রচলিত ছিল এবং আমি তার নিকট প্রেরণ করব অন্য আরেকটি নতুন কিতাব, যা তাকে শিক্ষা দিব। এই কিতাব সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাদের নিকট কোন জ্ঞান ছিলনা। তবে পূর্ববর্তী নবীগণের নিকট থেকে তারা এতটুকু জেনেছিল যে, এ নামের একটি কিতাবের আবির্ভাব ঘটবে।

(٤٩) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۙ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ○

৪৯. আর আল্লাহ্ পাক তাকে (ঈসা (আ.)) বনী ইসরাইলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করবেন, (যে তাদের নিকট বলবে) নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন

নিয়ে এসেছি। নিশ্চয় আমি মাটি দ্বারা পক্ষী সদৃশ আকৃতি বানাব এবং তাতে ফুঁক দিব এবং আল্লাহ পাকের হুকুমে তা (জীবন্ত) পাখী হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করব এবং আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা তোমাদের ঘরে যা আহার কর, আর যা বাড়ীতে মওজুদ কর তা তোমাদেরকে বলে দেব। নিশ্চয় তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিদর্শন। যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হও।

এবং ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) وَرَسُوْلاً–এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন وَنَجْعَلُهُ رَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ (আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্যে রাসূল করব। এ আয়াতাংশে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ বাক্যে نجعله শব্দ উহ্য রয়েছে। তাই نجعل শব্দটি উল্লেখ করা হয়নি। যেমন, কবির উক্তি ঃ

وَرَاَيْتِ زَوْجَكِ فِى الْوَغٰى + مُتَقَلِّدًا سيفًا وَّ رُمْحًا তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার স্বামীকে দেখেছি তরবারি ও বর্শা সজ্জিত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ–এর ব্যাখ্যা ঃ

আয়াতাংশের অর্থ ঃ আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্যে রাসূল করে পাঠাব যে, সে নবী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী। সে বলবে এবং আমার বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমি তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি রাসূল এ কথার যথার্থতা এবং এ সংবাদের সত্যতার পক্ষে প্রতিপালকের পক্ষ হতে চিহ্ন ও নিদর্শন নিয়ে এসেছি।

৭০৮৫. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেই নিদর্শন দ্বারা আমার (ঈসা (আ.)) নবূওয়াত ছাবিত হবে এবং প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে আমি তোমাদের প্রতি রাসূল।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আমি তোমাদের জন্যে কাদামাটি দ্বারা একটি পাখী সদৃশ আকৃতি তৈরী করব। তারপর তাতে আমি ফুঁক দিব। ফলে, আল্লাহ্র হুকুমে তা পাখী হয়ে যাবে)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা যে, তিনি ঈসা (আ.) –কে বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল করে পাঠাবেন। তিনি বলবেন, "আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে। তারপর সেই নিদর্শনের বর্ণনা দিবেন এ বলে যে, আমি তোমাদের জন্যে একটি পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করব। الطير শব্দটি طائر (পাখী)–এর বহুবচন। এ শব্দটির পঠন পদ্ধতি নিয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। হিজাযের কিছু সংখ্যক কিরাআত বিশেযজ্ঞ একবচন হিসাবে পড়েছেন كَهَيْئَةِ الطَّائِرِ (একটি পাখী সদৃশ আকৃতি)

অন্যান্য সবাই বহুবচন হিসাবে পড়েছেন كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا –। যারা বহুবচন হিসাবে পড়েছেন, তাদের পঠন পদ্ধতি আমার নিকট গ্রহণীয়, কারণ তা হযরত ঈসা (আ.)–এর গুণ বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি নিয়ে তিনি তা করতেন। হযরত উছমান (রা.)-এর সময়ের পান্ডুলিপিতেও الطير শব্দটি এরূপই। অর্থের বিশুদ্ধতার সাথে মাসহাফ (মূল কপি)-এর অনুসরণ করা এবং মাসহাফের বিপরীত নয় বরং অনুকূল পড়াই আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। হযরত ঈসা (আ.) পাখীর আকৃতিতে যা বানাতেন, একদিন তা বানালেন।

৭০৮৬. মক্তবের কতক বালকের সাথে একবার হযরত ঈসা (আ.) বসে ছিলেন। তারপর তিনি একমুঠি কাদা হাতে নিয়ে বললেন, "এই কাদা দিয়ে আমি তোমাদের জন্যে একটি পাখী বানিয়ে দিব।" তারা বলল, "সত্যিই কি তুমি তা পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার প্রতিপালকের অনুমতিতে আমি তা পারব। তারপর মাটি দিয়ে তিনি একটি পাখীর আকৃতি বানালেন, তাতে ফুৎকার দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর অনুমতিতে পাখী হয়ে যাও, ফলে সেটি পাখী হয়ে তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে উড়তে লাগল। এ কান্ড দেখে বালকগণ সেখান থেকে বেরিয়ে গেল এবং তাদের শিক্ষকদের নিকট ঘটনাটি জানাল। তারা ব্যাপারটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করে দিল। ঈসা (আ.) তাতে চিন্তাযুক্ত হলেন। এদিকে বনী ইসরাঈল তাঁর ক্ষতি করার ইচ্ছা করল। তাঁর ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত হবার পর তাঁর মাতা তাঁকে নিয়ে একটি গাধায় চড়ে দ্রুত সরে পড়লেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কাদামাটি থেকে পাখী বানাতে মনস্থ করলেন, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন্ পাখী বানানো বেশী কঠিন? উত্তরে বলা হলো বাদুড়।

যেমন হাদীছে বর্ণিত আছে,

৭০৮৭. হযরত ইবন জুরাইজ (র.), আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন, "কোন্ পাখি বানানো বেশী কঠিন? তারা বলেছিল বাদুড় বানানো কঠিন। কারণ, তার সারা দেহ মাংসল। তারপর তিনি একটি বাদুড় বানিয়ে দেখালেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, فيه শব্দটিতে পুংলিঙ্গ সর্বনাম ব্যবহার করে فَاَنْفُخُ فِيْهِ বলা হলো কেন? অথচ আয়াতে আছে اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ এখানে هيئة শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ ? জবাবে বলা যায়, বাক্যের মর্ম হচ্ছে نفخ فِى الطَّيْرِ (পাখিতে ফুৎকার দিব) অর্থাৎ সর্বনামটি الطير শব্দের প্রতি প্রত্যাবর্তিত। যদি فَاَنْفُخُ فِيْهَا বলা হতো, তাও বৈধ হতো, যেমন সূরা মায়িদাতে আছে فَاَنْفُخُ فِيْهَا (সূরাহ মায়িদা –১১০) (আমি ফু ৎকার দিব আকৃতিতে)

উল্লেখ্য যে, অপর পাঠপদ্ধতিতে ফী (فِىْ) শব্দবিহীন فَاَنْفُخُهَا আছে, অবশ্য আরবগণ এরূপ করে থাকেন, কখনো فى যোগে আবার কখনো فى বিহীন। যেমন, কবির ভাষায় رُبَّ لَيْلَةٍ قَدْ بِتُّهَا (বহু

রাত আমি কাটিয়ে দিয়েছি) এবং কবি বলেন مَاشُقَّ جَيْبٌ وَلَا قَامَتْكَ نَائِحَةٌ وَلَا بَكَتْكَ جِيَادٌ عِنْدَ بَتٌّ فِيْهَا اسلاب তোমার শোক প্রকাশের জন্যে জামা ছেঁড়া হয়নি, কোন মাতমকারী মহিলা হাউমাউ করে কাঁদেনি এবং কোন অশ্বরাজি অশ্রু ফেলেনি)। এ ক্ষেত্রে قَامَتْكَ قَامَتْ عَلَيْكَ বাক্যটি অর্থে ব্যবহৃত। অন্য এক কবি বলেছেন أَحْدَىْ بَنِىْ عَيْذِ اللّٰهِ اسْتَمَرِبُهَا + حَلْوُالْعُصَارَةِ حَتّٰى يُنْفَخُ الصُّوْرُ গোত্রের একটি অংশ রসের মিঠাই খেয়ে চলেছি শিঙ্গাতে ফুঁ না দেয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ (আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করব) এর ব্যাখ্যাঃ

أُبْرِئُ মানে أَشْفِيْ (আমি আরোগ্য দান করবে) এ হিসাবে আল্লাহ্ রোগকে আরোগ্য করে দিলে বলা হয় أَبْرَءَ اللّٰهُ الْمَرِيْضَ (আল্লাহ্ তা'আলা রোগীকে আরোগ্য দান করেছেন)। এ থেকেই যখন কোন রোগী আরোগ্য লাভ করে, তখন বলা হয় برأ المريض فهو يبرأ برأ। কোন কোন সময় بَرِئَ المريض فهو يبرأ (রোগী সুস্থ হয়ে গিয়েছে) শব্দটি এ ভাবেও ব্যবহৃত হয়।

الاكمه শব্দের অর্থ নিয়ে তাফসীরকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, الاكمه সে ব্যক্তি যে রাত্রে দেখে না, দিনের বেলায় দেখে। যাঁরা এ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁদের আলোচনাঃ

৭০৮৮. হযরত মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, আকমাহ্(اكمه) সেই ব্যক্তি, যে দিনে দেখে এবং রাতে দেখে না।

৭০৮৯. হযরত মুজাহিদ (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আকমাহ্ (اكمه) মানে জন্মান্ধ । যাঁরা এমত পোষণ করেন তাঁদের আলোচনা

৭০৯০. হযরত কাতাদা (র.) বলেছেন, আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করতাম যে, আকমাহ (اكمه) সেই ব্যক্তি, যার জন্ম হয়েছে অন্ধ অবস্থায়।

৭০৯১. হযরত কাতাদা (র.) হতে অন্য সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭০৯২. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আকমাহ্ (اكمه) সেই ব্যক্তি, যে অন্ধ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছে।

অন্য তাফসীরকারগণ বলেছেন, আকমাহ্ (اكمه) অন্ধ ব্যক্তি।

যাঁরা এমতের অনুসারী ঃ

৭০৯৩. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ আলোচ্য আয়াতে আকমাহ্ মানে অন্ধ।

৭০৯৪. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, اكمه অর্থাৎ অন্ধ।

৭০৯৫. হযরত কাতাদা (র.) أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, اكمه অর্থ অন্ধ।

৭০৯৬. হাসান (র.) وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- অন্ধ।

তাফসীরকারগণের অপর কয়েকজন বলেছেন। আকমাহ্ (اكمه) অর্থ আমাশ (اعمش) তথা দুর্বল দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন লোক।

৭০৯৭. ইকরামা (র.) وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আ'মাশ (أَعْمَش) তথা ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আরবী ভাষায় كَمَهَ শব্দটি العمى (অন্ধত্ব) অর্থেই পরিচিত। এ থেকেই বলা হয় كَمِهَتْ عينه (তার চোখ অন্ধ হয়ে গেছে)। সুতরাং সে تكمه كمها (অন্ধ)। আর اَكْمَهْتُهَا اَنَا মানে আমি তাকে অন্ধ করে দিয়েছি। সুওয়ায়দ ইব্ন আবী কাহিল--এর কবিতায় রয়েছে كَمِهَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى ابْيَضَّتَا + فَهُوَ يَلْحَى نَفْسَهُ لَمَّا نَزَعْ (অর্থঃ তার চক্ষুদ্বয় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে অবশেষে সাদা হয়ে গেল। প্রাণ যখন বের করা হচ্ছিল। তখন সে আহাজারি করছিল।) এ প্রসংগে রূবাঃ --এর উধৃতিঃ هَرَّجْتُ فَارْتَدَّ ارْتِدَادًا الْاَكْمَهِ + فِىْ غَائِلَاتِ الْحَائِرِ الْمُتَهْتِهِ (অর্থঃ আমি তাকে ভীতি প্রদর্শন করেছি, তাতে সে ভীত বিহবল, বাক শক্তিহীন, বিপদে পতিত অন্ধের ন্যায় পশ্চাতে পলায়ন করেছে।)

--এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নিদশর্ন দিয়েছেন যে, তিনি (ঈসা) বনী ইসরাঈলকে এ কথাগুলো বলবেন যাতে তারা এ সকল শিক্ষামূলক বিষয়াদি ও নিদর্শনসমূহ থেকে তাঁর নবূওয়াতের প্রমাণ পেতে পারে। যেহেতু অন্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগের কোন চিকিৎসা নেই যে, চিকিৎসক ঔষধের মাধ্যমে তা সারাতে পারে। তিনি যখন এগুলো সারাতে পারছেন, তখন এটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। এটি তো মুজিযাসমূহের অন্যতম যা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দান করেছেন।

ইকরামা (র.) যে বলেছেন كمه মানে ক্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং মুজাহিদ (র.) যে বলেছেন এর অর্থ দিনে দেখে রাতে দেখে না এমন্তব্যগুলোর কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে এমন আলৌকিক শক্তি দান করেন যার মুকাবিলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। বনী ইসরাঈলকে তাঁর নবূওয়াতের প্রমাণ হিসাবে হযরত ঈসা (আ.) যদি বলতেন যে, তিনি ক্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ব্যক্তিকে আরোগ্য করেন কিংবা যে রাতে দেখে না এমন রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ করেন, তবে বনী ইসরাঈল এ বিষয়ের মুকাবিলা করতে পারত এবং বলত ঈসা! (আ.) এতে তো আপনার নবূওয়াতের কোন প্রমাণ নেই। কেননা আমাদের মধ্যে এমন বহু অভিজ্ঞ লোক আছেন, যাঁরা এমন রোগীদের চিকিৎসা করতে পারেন অথচ তারা আল্লাহ্র নবীও নয়, রাসূলও নয়।

এ আলোচনায় আমাদের বক্তব্যের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, اكمه এমন অন্ধকে বলা হয়, যে, রাতে বা দিনে কখনো কোন কিছুই দেখ না। আর কাতাদা (র.) একথাই বলেছেন যে, اكمه মানে জন্মান্ধ। এটিও প্রকৃত অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কারণ, এ ধরনর দুরারোগ্য ব্যাধির চিকি ৎসার দাবী কোন মানুষ করতে পারে না, একমাত্র এমন লোক ব্যতীত যাদেরকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় মু'জিযা দান করা হয়েছে। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসাও তেমনই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَاُحۡيِ الۡمَوۡتٰى بِاِذۡنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا تَاۡكُلُوۡنَ وَمَا تَدَّخِرُوۡنَ فِىۡ بُيُوۡتِكُمۡ (এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করব, তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর ও মওজুদ কর তা তোমাদেরকে বলে দিব), এর ব্যাখ্যা ঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, মহান আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে হযরত ঈসা (আ.) মৃতকে যিন্দাহ্ করতেন।

৭০৯৮. ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র.) বলতেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর বয়স যখন ১২ বছর, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাতা হযরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট সংবাদ পাঠালেন, তিনি তখন মিসরে অবস্থান করছিলেন। সন্তান প্রসবকালে তিনি আপন সম্প্রদায়কে ছেড়ে মিসর চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি তোমার ছেলে নিয়ে সিরিয়া চলে যাও। তিনি আদেশ পালন করলেন। হযরত ঈসা (আ.) ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত সিরিয়াতেই ছিলেন। নবূওয়াত প্রকাশের তিন বছর পর পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে ছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে আকাশে তুলে নিলেন।

বর্ণনাকারী ওয়াহ্ব (র.) মন্তব্য করেছেন যে, কখনও কখনও হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট এক একদলে পঞ্চাশ হাযার করে রোগী আগমন করত। যারা তাঁর নিকট পৌঁছতে পারত পৌঁছত। আর যারা তাঁর নিকট পৌঁছতে পারত না, তিনি নিজে তাদের নিকট যেতেন। মহান আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করার মাধ্যমে তিনি তাদের চিকিৎসা করতেন।

وَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا تَاۡكُلُوۡنَ (তোমরা যা খাও তা তোমাদেরকে আমি বলে দিব) মানে তোমরা যা খাও, আমি তোমাদের তা বলে দিতে পারব, কিন্তু আমি তা দেখিনা এবং আহারের সময় তথায় উপস্থিত ও থাকি না। وَمَا تَدَّخِرُوۡنَ (তোমরা যা মওজুদ কর) অর্থাৎ যা তোমরা উঠিয়ে রাখ ও লুকিয়ে রাখ, খাও না। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা জানিয়ে দিলেন যে, হযরত ঈসা (আ.) -এর নবূওয়াতের প্রমাণাদির মধ্যে তাও একটি। ইতিপূর্বে বর্ণিত মু'জিযাসমূহ তথা মাটি হতে পাখি বানানো, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করা ও মৃতকে জীবিত করা তো আছেই। এগুলো এমন সব ব্যাপার, যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য তাদের ব্যাপার ভিন্ন সত্যতার জন্যে, বক্তব্যের সত্যায়নের জন্যে যে সকল নবী, রাসূল ও প্রিয় বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এ ক্ষমতা দান করেন এবং অদৃশ্যের ব্যাপারে অবহিত করেন। যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَاُنَبِّئُكُمۡ بِمَا تَاۡكُلُوۡنَ وَمَا تَدَّخِرُوۡنَ فِىۡ بُيُوۡتِكُمۡ(আর যা তোমরা তোমাদের গৃহে আহার কর আর যা বাড়ীতে মওজুদ রাখ, তা তোমাদেরকে বলে দেব।) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে যদি কেউ প্রশ্ন করে এতে হযরত ঈসা (আ.)-এরনবূওয়াতের প্রমাণ কোথায়? কেননা, অনেক জ্যোতিষী ও গণককেও এ জাতীয় খবর দিতে দেখা যায়, আর ক্ষেত্র বিশেষে ঘটনা চক্রে সত্যও হয়ে যায়।

উত্তরে বলা হবে, ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, জ্যোতিষী ও গণক ব্যক্তিরা এতদ্ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ.) তথা নবী-রাসূলগণের ব্যাপার কিন্তু তেমন নয়

বরং হযরত ঈসা (আ.) চিন্তা, গবেষণা ও কৌশল ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহ্ কর্তৃক অবহিত করণের মাধ্যমে এসব সংবাদ দিতেন। জ্যোতিষ তার অংকের প্রতি এবং গণক তার গণনার প্রতি যেভাবে ব্যতিব্যস্ত ও বিচলিত হয়ে পড়ে হযরত ঈসা (আ.) কিন্তু সেভাবে বিচলিত হতেন না। এভাবেই অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আম্বিয়া কিরামের জ্ঞান আর কাফিরদের জ্ঞান এক নয়।

যাঁরা এমত পোষণ করেন

৭০৯৯. ইব্ন ইসহাক (র.) বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.) –এর বয়স যখন নয় কি দশ, তখন তাঁর মাতা তাঁকে এক মক্তবে ভর্তি করে দিলেন। জনৈক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি থাকতেন। অন্যান্য ছাত্রদেরকে শিক্ষক যেভাবে শিক্ষন দিতেন, তাঁকেও সেভাবে শিখাতেন। কিন্তু তাঁকে শিখাতে গেলে শিখানোর আগে তিনি নিজেই তা বলে দিতেন। শিক্ষক বলতেন, আরে! এ বিধবার ছেলের কান্ড দেখে তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ না? আমি কিছু শিখাতে গেলে দেখি উক্ত বিষয়ে সে আমার চেয়েও অভিজ্ঞ।

৭১০০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, ঈসা (আ.) বয়স্ক হলে পরে তাঁর মাতা তাঁকে তাওরাত শিখতে পাঠালেন। আপন এলাকার ছেলেপিলের সাথে খেলাধূলা করতেন বালকদেরকে তিনি বলে দিতেন ওদের বাবারা কখন কি কাজ করছে।

৭১০১. সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র.) আল্লাহ্ তাআলার বাণী وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ (আমি তোমাদেরকে বলে দিব তোমরা যা খাও এবং যা মওজুদ কর) প্রসংগে বলেন, হযরত ঈসা (আ.) যখন মক্তবে পড়ছিলেন, তখন অন্যাদেরকে বলে দিতেন নিজেদের ঘরে ওরা যা খেতএবং যা মওজুদ করত।

৭১০২. ইসমাঈল ইব্ন সালিম (র.) বলেছেন, আমি সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা.)–কে বলতে শুনেছি وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ আয়াত প্রসংগে তিনি বলেছেন, ঈসা (আ.) মক্তবের কোন একজন ছাত্রকে ডেকে বলতেন, হে বালক! তোমার পরিবারের লোকেরা আজ তোমার জন্যে অমুক খাবার লুকিয়ে রেখেছে, তুমি কি তা থেকে আমাকে কিছু খাওয়াবে?

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, নবীগণের কর্ম ও প্রমাণাদি এরকমই। তাঁরা এমন সব প্রমাণ নিয়ে আসেন, যা হাসিল করা কদাচিৎ সম্ভব বটে কিন্তু এমন মাধ্যমে নয়, যে মাধ্যমে অন্যরা অর্জন করে। বরং তাঁরা এমন মাধ্যমে সেগুলো অর্জন করেন যে, জগত জানে একমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রজ্ঞাবান ব্যতীত এটা জানা সম্ভব নয়।

وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ আয়াত সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করলাম ব্যাখ্যাকরগণের একটি পক্ষও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

যাঁরা এমন্তব্য করেছেন তাঁদের আলোচনা ঃ

৭১০৩. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ –এর ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণিত। ঈসা (আ.) বলতেন, আমি তোমাদেরকে বলে দিব গত রাতে তোমরা যা খেয়েছ এবং যা জমা করে রেখেছ।

৭১০৪. মুজাহিদ (র.) হতে অন্যসূত্রেও অনুরূপ হাদীস রয়েছে।

৭১০৫.ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বণিত, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ প্রসংগে আতা ইব্ন আবী রাবাহ্ (র.) বলেছেন, খাদ্য ও দ্রব্যাদি যেগুলো ওরা তাদের ঘরে জমা করে রাখত, আল্লাহ্ তা'আলাই তাকে তা জানিয়ে দিতেন।

৭১০৬. রবী' (র.) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা যা খাও মানে গত রাতে তোমরা যা খেয়েছ এবং জমা করে রেখেছ তা আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি।

৭১০৭. সুদ্দী (র.) বলেন, ঈসা (আ.) মক্তবের ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করতেন এবং তাদের পিতা–মাতা যা করছে, যা জমা রাখছে এবং যা খাচ্ছে তা বলে দিতেন। কোন একজনকে ডেকে তিনি বলতেন, বাড়ী গিয়ে দেখ তোমার মাতা পিতা তোমার জন্যে এটা–ওটা তুলে রেখেছে এবং ওরা–এটা ওটা খাচ্ছে। শিশুটি বাড়ীতে যেত এবং তার জন্যে রেখে দেয়া দ্রব্যটি তাকে দেয়ার জন্যে কন্নাকাটি করত। তারা শিশুটিকে জিজ্ঞেস করত কে তোমাকে বলে দিল যে, তোমার জন্যে এটা রেখেছি? উত্তরে সে ঈসা (আ.)–এর কথা বলত।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর লোকজন আপন শিশুদেরকে হযরত ঈসা (আ.)–এর নিকট যেতে দিতনা। তার বলত এ যাদুকরের সাথে তোমরা খেলতে যেওনা। ওরা ছেলেদেরকে একটি ঘরে আটক করে রাখল । খেলার সাথীদেরকে খোঁজে যখন ঈসা (আ.) আসতেন, তখন অভিভাবকগণ বলল, তারা তো এখানে নেই। ঈসা (আ.) বললেন এ ঘরে কি? ওরা বলল, শূকর পাল। ঈসা (আ.) বললেন, ওরা সব তা–ই হয়ে যাবে। পরে দরজা খুলে দেখল ওরা সবাই শূকরে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (বনী ইসরাঈলের যারা কাফির, তারা অভিশপ্ত হয়েছে। দাউদ ও ঈসা ইব্ন মারইয়াম –এর মুখে (৫ঃ ৭৮) এ ঘোষণার দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৭১০৮. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ প্রসংগে বলেন, যা তোমরা লুকিয়ে রাখ এ ভয়ে যে পরে কিছু আসবে না।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন– আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ অর্থ তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিলকৃত খাদ্যের যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা জমা করে রাখ, তা আমি তোমাদেরকে বলে দেব।

যাঁরা এমত পোষণ করেনঃ

৭১০৯. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী – وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ (এবং আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা তোমাদের ঘরে

জমা করে রাখ) প্রসংগে বলেন, হযরত ঈসা (আ.) –এর সম্প্রদায় যখন খাদ্য প্রার্থনা করল, তখন তাদের নিকট জান্নাত হতে ফল নাযিল হওয়া আরম্ভ হলো। তারা যেখানেই থাকুক, তাদের নিকট ফল আসত। তিনি সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিলেন যাতে খিয়ানত না করে এবং কোন কিছু জমা না করে এবং পরের দিনের জন্যে না রাখে। এটি ছিল ওদের জন্যে পরীক্ষা। ওরা যদি কিছু খিয়ানত করত কিংবা মওজুদ করে রাখত হযরত ঈসা (আ.) তা ওদেরকে বলে দিতেন। তাই তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাদেরকে বলে দিব যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা নিজেদের ঘরে মওজুদ কর।

৭১১০. কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তাআলার বাণী– وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ প্রসংগে বলেন–এর অর্থ হচ্ছে আকাশ হতে আগত খাদ্য, যা তোমরা খাও এবং যা তোমরা মওজুদ রাখ, তা সবই আমি তোমাদের বলে দেব। তিনি বলেন, খাদ্য নাযিল হবার কালে তিনি তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তারা তা আহার করবে, মওজুদ রাখবে না। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তা মওজুদ করেছিল এবং খিয়ানত করেছিল। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে খিয়ানত করায় তারা শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল। এটিই হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (এরপর তোমাদের মধ্যে যে অকৃতজ্ঞ হবে আমি তাকে এমন শাস্তি দেব যা বিশ্বের কাউকেই দেব না । ৫ঃ ১১৫)। আম্মার ইব্ন য়াসির হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। يَدَّخِرُونَ শব্দটি يَفْتَعِلُونَ ক্রিয়ার কাঠামোতে يذتخرون ছিল ذال বর্ণ যোগে কথিত বক্তার বক্তব্য ذَخَرْتُ الشَّيْءَ فَأَنَا أَذْخَرُهُ (আমি দ্রব্য সঞ্চয় করেছি, সুতরাং সঞ্চয় করব) হতে নিষ্পন্ন । তারপর ذكرت الشيء হতে উথিত يَدَّكِرُ শব্দের রূপান্তর পদ্ধতি মুতাবিক এটিকে يَدَّخِرُ পড়া হচ্ছে । অর্থাৎ শব্দটি ছিল يَذْتَخِرُ ذال ও تاء বর্ণদ্বয়ের উচ্চারণস্থল (মাখরাজ) কাছাকাছি। এ দু'টি একত্রিত হওয়ায় উচ্চারণ কষ্টকর হয়ে পড়েছে। ফলে একটি আপটির সাথে মিলিত হয়েছে এবং تاء বর্ণটি ذال অক্ষরে রূপান্তরিত হয়েছে। যেহেতু ذال অক্ষরটি উচ্চারণ ক্ষেত্রের দৃষ্টিতে تاء ও ذال –এর মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। আরবের কেউ কেউ অবশ্য ذال– এর চেয়ে تاء –কে প্রাধান্য দেয় এবং تاء –কে ذال–এর মধ্যে সন্ধি করে তারা تَذَّخِرُونَ -পাঠ করে থাকে। مذخرلك শব্দটিও এভাবেই নিষ্পন্ন । প্রথম পদ্ধতি তথা تاء অক্ষরে ذال-কে সন্ধি কর উভয়টিকে دال দিয়ে পরিবর্তন করে يدخرون পড়ার স্থলে অন্য কিছু পড়া জায়িয হবে না। যেহেতু এ পঠন রীতির অনুসারিগণে পক্ষ হতে সেটাই বর্ণিত এবং এটিই উত্তম ভাষ্য। যেমন কবি যুহায়র বলেন ঃ

إِنَّ الْكَرِيمَ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ * عَفْوًا وَيُظْلَمُ أَحْيَانًا فَيَظَّلِمُ

(যে দানশীল তোমাকে তার সম্পদ দান করে, তিনি তো ক্ষমাশীল, তবে মাঝে মাঝে অন্যায়ও করে।) এতে বুঝা যায় ظلم শব্দ হতে গঠিত يفتعل –এর ওযনে ظاء যোগেও ব্যবহৃত হয় আর طاء যোগেও ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (তোমরা যদি মু'মিন হও, তবে এতে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে) ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আল্লাহ্র অনুমতিতে মাটি দ্বারা পক্ষী সৃষ্টি, জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্যকরণ,

মৃতকে জীবন্তকরণ এবং জ্যোতিযগিরি জাদুগিরি ও হিসাব–নিকাশ ব্যতীত সরাসরি তোমাদের আহার ও মওজুদ সম্পর্কে সংবাদ প্রদান ইত্যাদি অলৌকিক ব্যাপারসমূহে তোমাদের জন্যে অনুধাবনের বিষয় রয়েছে। এতে গবেষণার বিষয় রয়েছে, তোমরা এতে গবেষণা করবে। ফলে অনুধাবন করতে পারবে যে, আমি আমার বক্তব্যে সত্যবাদী, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট আমি রাসূল। এর দ্বারা তোমরা জানতে পারবে আল্লাহ্‌র আদেশ–নিষেধের প্রতি আমি যে তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছি, তাতে আমি সত্যবাদী। যদি তোমরা মু'মিন হও অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র দলীল–প্রমাণাদি ও নিদর্শনাদি যথার্থ বলে মেনে নাও, তাঁর একত্ব বাদে স্বীকৃতি দাও এবং তাঁর নবী মূসা (আ.) ও তোমাদের নিকট আগত তাওরাতকে সত্য বলে মেনে নাও।

(৫০) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

৫০. আমি এসেছি আমার সম্মুখে তাওরাতের যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ ছিল তার কতকগুলোকে বৈধ করতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হলো, হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন, আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের প্রতিপালেকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে এবং আমার সম্মুখে তাওরাতের যা আছে তার সমর্থকরূপে। مصدقا শব্দটি যবরযুক্ত হয়েছে جِئْتُكُمْ ক্রিয়ার সাথে যুক্ত হবার কারণে, وَجِيهًا–এর সাথে যুক্ত হবার কারণে নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে তাঁর বক্তব্য لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ (আমার সম্মুখে তাওরাতের যা আছে)। مصدقًا শব্দটি যদি وجيها–এর সাথে যুক্ত (عطف) হতো তাহলে বাক্য হতো وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنَ التَّوْرَاةِ وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (তাওরাতের যা তার সামনে রয়েছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্যে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার কতক তিনি বৈধ করবেন।) আমার সামনে তাওরাতের যা আছে তার সমর্থকরূপে এ মন্তব্যটি হযরত ঈসা (আ.) এ কারণে করেছেন যে, ঈসা (আ.) তাওরাতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, তা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ধর্মীয় গ্রন্থ। অনুরূপভাবে প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবী–রাসূলের গ্রন্থ সত্য বলে মেনে নিতেন যদিও বা আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের শরীআত ও কর্মে পার্থক্য হয়ে থাকে। অবশ্য আমরা যতটুকু জেনেছি হযরত ঈসা (আ.) তাওরাত গ্রন্থে পুরোপুরি আমল করতেন এবং তাওরাতের কোন বিধানই তিনি বাদ দিতেন না। তবে এতটুকু বৈপরীত্য অবশ্য ছিল যে, তাওরাতের অনুসারীদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে সকল কঠোর বিধি–বিধান নাযিল করেছিলেন ইনজীলের অনুসারীদের জন্য তা সহজ করে দেয়া হয়েছে।

৭১১১. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ (র.) বলতেন, হযরত ঈসা (আ.) ছিলেন হযরত মূসা (আ.)–এর শরীআতের অনুসারী। তিনি শনিবারের অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা মানতেন। তিনি ইসরাঈলীদেরকে বলেছিলেন যে, তাওরাতে যা আছে তার একটু বিরুদ্ধেও আমি

তোমাদেরকে আহবান করব না। তবে তোমাদের জন্যে যা হারাম করা হয়েছিল, তার কতক আমি হালাল করব এবং তোমাদের বোঝা আমি লাঘব করব।

৭১১২. কাতাদা (র.) আল্লাহ্ তাআলার বাণী وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ (আমার সম্মুখে তাওরাতের যা আছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্যে যা হারাম করা হয়েছে তার কতক হালাল করতে আমি এসেছি।) –এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) –এর আনীত শরীআত হযরত মূসা (আ.) আনীত শরীআতের চেয়ে নমনীয় ছিল। হযরত মূসা (আ.)–এর আনীত শরীআতে তাদের জন্যে উটের গোশত মেদ, কিছু পাখি ও মাছ হারাম ছিল।

৭১১৩. রবী' থেকে বর্ণিত, হযরত ঈসা (আ.)–এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো তাদের জন্যে হালাল করেছেন। তাদের জন্যে চর্বি হারাম ছিল। ঈসা (আ.) –এর শরীআতে চর্বি হালাল করা হলো। মাছ ও পাখির কিছু কিছু হালাল করা হলো। অপর কতক জিনিস মূসা (আ.)–এর শরীআতে হারাম ও কঠোর ছিল ইনজীলে সেগুলো সম্পর্কে নমনীয়তা এসেছে। সুতরাং সর্ব বিবেচনায় হযরত মূসা (আ.)–এর শরীআতের চেয়ে হযরত ঈসা (আ.)–এর শরীআতে নমনীয় ও সহজ।

৭১১৪. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ প্রসংগে তিনি বলেন, হারামকৃত দ্রব্য ছিল উটের গোশত ও চর্বি। হযরত ঈসা (আ.) নবী হয়ে এলেন এবং এগুলো তাদের জন্যে হালাল করে দিলেন। তিনি ইয়াহূদীদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তারপর তারা তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে মতবিরোধ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল।

৭১১৫. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র.) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ –এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাওরাত যা আমার পূর্বে নাযিল হয়েছে আমি তা সমর্থন করি। আর وَلِأُحِلَّ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ মানে আমি তোমাদেরকে বলব যে, এটি তোমাদের জন্যে হারাম ছিল, তাই তোমরা বর্জন করেছ তারপর আমি তোমাদের বোঝা লাঘব করে দেব এবং তা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেব। ফলে তোমরা সহজ ব্যবস্থাটি গ্রহণ করবে এবং কষ্ট হতে মুক্তি পাবে।

৭১১৬. হাসান (র.) হতে বার্ণিত, وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ –এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন তাদের জন্যে কিছু জিনিস হারাম করা হয়েছিল, হযরত ঈসা (আ.) আগমন করলেন হারামকৃত বস্তুগুলো ওদের জন্যে হালাল করার জন্য, এতে তাঁর লক্ষ্য ছিল তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মনোভাব সৃষ্টি করা।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ (এবং আমি এসেছি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিদর্শন নিয়ে) প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমতঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আয়াতের অর্থ হচ্ছে আমি এসেছি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণ ও শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে এগুলো দ্বারাই তোমরা আমার বক্তব্যের যথার্থতা ও সত্যতা অনুধাবন করতে পারবে।

৭১১৭. মুজাহিদ (র) وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াত প্রসংগে বলেন যে, আয়াতে বর্ণিত নিদর্শন মানে হযরত ঈসা (আ.) যে সকল কথা নিয়ে এসেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে যা দান করেছেন।

৭১১৮. মুজাহিদ (র.) وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত ঈসা (আ.) ওদের জন্যে যে সকল বিষয় বর্ণনা করেছেন তা সবই আয়াত বা নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। مِّنْ رَّبِّكَ (তোমাদের প্রতিপালক হতে) মানে من عند ربكم (প্রতিপালকের নিকট হতে)।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এটিই সরল পথ।

(৫১) اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৫১. আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ।

প্রসংগে তাফসীরকারগণের অভিমতঃ

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, এর অর্থ হলোঃ হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন, আমি তো তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। এগুলো দ্বারা আমার বক্তব্য যে আমি সত্যবাদী তা তোমরা অনুধাবন করতে পারবে। সুতরাং হে বনী ইসরাঈল! মূসা (আ.)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যা আদেশ নিষেধ করেছেন তা পালনার্থে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা যে চুক্তি করেছ, তা পূরণ কর।

হে বনী ইসরাঈল! আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক যা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তা সত্য বলে মেনে নেয়ার প্রতিই তো আমি তোমাদেরকে ডাকছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, তিনি এটি দিয়েই এবং তোমাদের কিতাবে যা হারাম আছে তার কতক হালাল করার দায়িত্ব দিয়েই আমাকে প্রেরণ করেছেন। এটিই সুদৃঢ় পথ ও অবিচল হিদায়াত যাতে কোন বক্রতা নেই।

৭১১৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.), আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) তাঁর ব্যাপারে অশালীন মন্তব্যসমূহ হতে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন এবং ওদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিপালকের প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ মানে আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে উৎসাহিত করছি এবং যা তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি তাই সরল সঠিক ও সুদৃঢ় পথ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ আয়াতাংশের পঠনরীতিতে মিসরের অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ একাধিক মত পোষণ করেন। সাধারণ কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ মুবতাদা (উদ্দেশ্য) হিসিাবে اِنَّ শব্দে যের যোগে পড়েছেন। وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ .... اِنَّ اللّٰهَ

رَبِّي وَرَبُّكُمْ –এর দৃষ্টিকোণ থেকে اَنَّ শব্দটিকে اٰيَةٌ শব্দের সাথে মিলিয়ে এবং তা হতে বদল (بدل) মেনে নিয়ে অপর এক দল কিরাআত বিশেষজ্ঞ الف অক্ষরে যবর যোগে اَنَّ পড়েছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আমাদের মতে মিসরীয়দের ন্যায় যের যোগে اِنَّ পড়াই উত্তম। এজন্যে যে, মুবতাদা (উদ্দেশ্য) হিসাবে الف অক্ষরে যের হওয়াটা সকল কিরাআত বিশেষজ্ঞের মতে বিশুদ্ধ। যে বিষয়ে কিরাআত বিশেষজ্ঞগণ একমত তাই অকাট্য প্রমাণ। এর বিপরীত যদি কেউ একক মত পোষণ করে তবে তা হবে তার নিজস্ব মত। প্রতিষ্ঠিত প্রমাণের বিরুদ্ধে একজনের মতামত আদৌ বিবেচ্য নয়। এ আয়াত বাহ্যত যদিওবা নিছক সংবাদ প্রদান স্বরূপ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) –এর সাথে বিতর্ক উদ্দেশ্যে আগত নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পক্ষ হতে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)–এর জন্যে সুদৃঢ় প্রমাণ রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ্র অন্যান্য বান্দাদের ন্যায় তিনিও একজন বান্দা। তা ছাড়া, ওরা তাঁর যে পরিচিতি প্রকাশ করে, তা হতে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নবূওয়াত দান করেছেন এবং তাঁর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আলৌকিক ক্ষমতা ও মু'জিযাদি দান করেছেন। যেমনটি আপন আপন সত্যতা ও নবূওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ অন্যান্য নবীগণকে মু'জিযাদি দান করেছেন।

(٥٢) فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৫২. যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল তখন সে বলল, আল্লাহ্র পথে কারা আমার সাহায্যকারী ? শিষ্যগণ বলল, আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে্ ঈমান এনেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি এর সাক্ষী থাক।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বাণী فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ এখানে তিনি ঘোষণা করেন যে, ঈসা (আ.) যখন তাদের পক্ষ হতে অবিশ্বাস পেলেন। احساس (ইহ্সাস) শব্দের অর্থ পাওয়া। هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ (তুমি কি তাদের দেখতে পাও? (১৯ঃ৯৮) আয়াতটি এ প্রকারের। আলিফ বিহীন حس শব্দের অর্থ قتل (হত্যা) ও افناء (ধ্বংস করে দেয়া)। اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ (যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে হত্যা করতেছিলে (৩ঃ ১৫২) আয়াতটি এ জাতীয়। এতদ প্রসংগে কবি কুমায়তের চরণটি প্রাণধানযোগ্য ঃ

هَلْ مَنْ بَكَى الدَّارَ رَاجٍ اَنْ تَحِسَّ لَهُ * اَوْ يُبْكِيَ الدَّارَ مَاءُ الْعَبْرَةِ الْخَضِلُ

এ কবিতায় ان تحس له মানে ان ترق له (তুমি যেন তার জন্যে দয়াবান হও,) এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'আলা যাদের নিকট হযরত ঈসা (আ.)–কে পাঠিয়েছিলেন, সেই বনী ইসরাঈলের পক্ষ হতে যখন নবূওয়াতের অস্বীকৃতি পেলেন, তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের মনোভাব এবং আল্লাহ্র পথে আহবানে তাদের পক্ষ হতে বাধার সম্মুখীন হলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্র পথে আমার সাহায্যকারী কে আছ? অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রমাণ প্রত্যাখ্যানকারী, তাঁর দীন হতে ফিরে যাওয়া লোক

ও তাঁর নবীর নবূওয়াতের অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাথে আমার সাহায্যকারী কে আছ? الى الله-এর অর্থ হচ্ছে مَعَ اللهِ (আল্লাহ্র সাথে)। اِلى اللّٰ -এর অর্থ مع الله গ্রহণ এজন্যে সুন্দর হলো যে, আরবদের অভ্যাস, তারা যখন একটি বস্তুর সাথে অপর একটি বস্তুকে সংযোজন করে, তারপর একটির সাথে অপরটির সংযোজন সম্পর্কে সংবাদ দিতে যায়, তখন তারা কখনো সরাসরি مع শব্দ ব্যবহার করে আবার কখনো কে এর স্থানে اِلى শব্দ ব্যবহার করে। যেমন তারা বলে الذود الى الذود ابل (উটের সাথে উট সংযোজিত হলে উটের পাল হয়) অর্থাৎ একটি উটের সাথে অপর একটি উট যোগ হলে পরে একে উটের পাল বলে। অবশ্য সাধারণত একটি বস্তুর সাথে অপর একটি বস্তু থাকলে সাথী অর্থে اِلى শব্দ ব্যবহৃত হয় না এবং مع -এর স্থলে اِلى আনীত হয় না। সুতরাং অমুক এসেছে সাথে মালপত্র নিয়ে বুঝাতে قدم فلان ومعه مال বলতে হলে معه مال-এর স্থলে اليه مال বলা জায়িয হবে না। مَنْ اَنْصَارِى اِلى الله আয়াতাংশরে ব্যাখ্যায় আমরা যা বলেছি একদল তাফসীরকারও অনুরূপ বলেছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭১২০. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, مَنْ اَنْصَارِى اِلى الله অর্থ হলো من انصارى مع الله (আল্লাহ্র সাথে আমার সাহায্যকারী কে?)

৭১২১. ইব্ন জুরাইজ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, مَنْ اَنْصَارِى اِلى الله মানে مَعَ الله

হযরত ঈসা (আ.) কেন হাওয়ারীদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে।

৭১২২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে রাসূলুল্লাহ্ প্রেরণ করলেন এবং দীনের দাওয়াত ও প্রচারের নির্দেশ দিলেন। তখন ইসরাঈলীরা তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হলো। তাঁকে দেশ হতে বহিষ্কার করল। হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতা দেশ হতে বিতাড়িত হয়ে দেশে দেশে ঘুরছেন। তারপর এক গ্রামে জনৈক ব্যক্তির ঘরে তাঁরা মেহমান হলেন। বাড়ীওয়ালা তাঁদেরকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল। সে দেশে ছিল এক প্রতাপশালী অত্যাচারী শাসক। একদিন দেখা গেল বাড়ীওয়ালা লোকটি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও পেরেশান হয়ে বাড়ী ফিরল। হযরত মারইয়াম (আ.) তখন বাড়ীওয়ালার স্ত্রীর নিকট ছিলেন। হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন, ব্যাপার কি? আপনার স্বামীকে চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? উত্তরে মহিলা বলল, থাক, জিজ্ঞেস করে আর লাভ কি? হযরত মারইয়াম (আ.) বললেন, আমাকে শুনান, আশা করি আল্লাহ্ তাকে বিপদমুক্ত করতে পারেন। মহিলা বলল, আমাদের একজন রাজা আছে। আমরা যারা প্রজা, প্রত্যেকে একদিন করে রাজা ও তোর সৈন্য সামন্তকে আহার করাতে হয়, সাথে সাথে মদ পরিবেশনেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এ নির্দেশ কেউ অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়। আজ আমার স্বামীর পালা। তাঁর তো ইচ্ছা আছে ভোজের আয়োজন করার কিন্তু আমাদের সেই সামর্থ যে নেই। হযরত মারইয়াম (আ.) তাকে আশ্বাস দিলেন। বললেন, তাকে বলে দিবেন চিন্তা না করতে। আমি আমার ছেলেকে দু'আ করতে বলব। সে দু'আ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

মারইয়াম (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। ঈসা (আ) বললেন, আম্মি! আমি যদি তা করি তো এতে অকল্যাণ হবে। মাতা বললেন, না, তা হয় না, দেখছ না লোকটি আমাদেরকে কেমন আন্তরিকতার সাথে সাহায্য–সহযোগিতা করে যাচ্ছে? ঈসা (আ.) বললেন, ঠিক আছে, তাকে বলুন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বক্ষণে কড়াই, পাতিল ও মদের পাত্রে যেন পানি ভরে রাখে, তারপর আমাকে সংবাদ দেয়। লোকটি সবগুলো পাত্র পানিতে ভর্তি করার পর হযরত ঈসা (আ.)–কে সংবাদ দিল। তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করলেন তো কড়াই, পাতিলের পানি গোশত–রুটি ও ঝোলে পরিণত হলো এবং মদ–পাত্রের পানি মদে পরিণত হলো। গোশত, রুটি ও মদ এমন উন্নতমানের যা কেউ কখনো দেখেনি। রাজা এলেন খাবার খেলেন, মদ পান করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এ মদ কোথাকার আমদানী? লোকটি বলল, অমুক দেশ হতে এনেছি। রাজা বললেন, আমার মদও তো সে দেশ হতে আসে। স্ববিরোধী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে সত্য বলতে চাপ দিলেন। সে বলল, আমার বাড়ীতে একটি বালক আছে। সে আল্লাহ্‌র নিকট যা চায় তা আল্লাহ্ তা'আলা দেন এবং সে আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে মদে পরিণত করে দিয়েছেন। রাজার খুব আদরের একটি ছেলে ছিল। রাজার ইচ্ছা ছিল তাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বানাবেন কিন্তু কিছু দিন পূর্বে ছেলেটি মারা গেল। রাজা মনে মনে বললেন, যে লোক দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে মদে পরিণত করেন, সে দু'আ করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমার পুত্রকে জীবিত করে দিবেন। হযরত ঈসা (আ.)–কে রাজা তলব করলেন, এবং তাঁর পুত্রকে জীবিত করার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করার অনুরোধ জানালেন। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, অমন করো না, কারণ সে জীবিত হলে পরে তার জীবনে সে অত্যন্ত মন্দ লোক হবে। রাজা বললেন, তাতে আমার কোন চিন্তা নেই। আমি তো তাকে আগে দেখেছি, তার চরিত্র সম্পর্কে জানি, যা হোক আপনি আমার ছেলেকে জীবিত করার ব্যবস্থা করুন। ঈসা (আ.) বললেন, ঠিক আছে যদি আমি আপনার ছেলেকে জীবিত করে দিই, তাহলে কিন্তু আমাকে ও আমার আম্মাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবার অনুমতি দিতে হবে। রাজা এতে রাযী হলেন। ঈসা (আ.) আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করলেন, ছেলেটি পুনঃ জীবন লাভ করল।

এ ছেলেকে জীবিত দেখে রাজ্যের প্রজাগণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারা বলল, এরাজা আজীবন আমাদেরকে শোষণ করেছে, আত্মসাৎ করেছে আমাদের ধনসম্পদ। এখন তার মৃত্যু সন্নিকট। সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পুত্রকে উত্তরাধিকারী বানাবার। তাহলে যে ছেলেও আমাদেরকে খাবে যে ভাবে তার পিতা আমাদেরকে খেয়েছে। অনন্তর তারা আক্রমণ শুরু করল। হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতা সে দেশ ত্যাগ করলেন। এক ইয়াহূদী তাঁদের সাথী হলো। ইয়াহূদীর সাথে ছিল দুটো রুটি আর ঈসা (আ.) –এর সাথে ছিল একটি। এক সাথে আহার করার জন্যে ঈসা (আ.) লোকটিকে অনুরোধ করলেন। লোকটি ইতিবাচক উত্তর দিল। তবে যখন সে দেখল যে, ঈসা (আ.) –এর নিকট একটি মাত্র রুটি। তখন সে আপন কর্মে অনুতপ্ত হলো। উভয়ে নিদ্রামগ্ন হবার পর লোকটি তার একটি রুটি খেয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু যখনি এক টুকরা মুখে পুরে তখনই ঈসা (আ.) বলে উঠেন এই! তুমি কর কি? মুখে দেয়া টুকরা ফেলে দিয়ে সে উত্তর দেয় কই না তো, কিছুই করছি না। এভাবে সে পুরো রুটিটি শেষ করে দিল।

ভোরে উঠে ঈসা (আ.) তাকে খাবার নিয়ে আসতে বললেন, সে একটি রুটি নিয়ে আসল। ঈসা (আ.) বললেন, অপরটি কই? সে বলল, আমার নিকট তো একটি মাত্র রুটি ছিল। ঈসা (আ.) নীরব থাকলেন। তাঁরা যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে দেখা হলো এক বকরী পালকের সাথে। ঈসা (আ.) ডাক দিয়ে বললেন, হে বকরীওয়ালা! তোমার বকরীপাল হতে একটি বকরী আমাদেরকে দিবে কি? বকরী পালক বলল, হ্যাঁ আপনার সাথীকে পাঠান একটি নিয়ে যাবে। তিনি লোকটিকে পাঠালেন, সে বকরী নিয়ে আসল। তারা তা যবাই করে কাবাব করলেন। তিনি ইয়াহূদীকে বললেন, এস খাও, তবে হাড়গুলো আস্ত রেখে দিবে কিন্তু। উভয়ে খেয়ে নিল। তৃপ্ত হবার পর ঈসা (আ.) হাড়গুলো চামড়ায় রেখে তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র নির্দেশ দাঁড়িয়ে যাও। ম্যাঁ ম্যাঁ শব্দ করে বকরীটি দাঁড়িয়ে গেল। বকরীটি নিয়ে যাবার জন্যে ঈসা (আ.) মালিককে নির্দেশ দিলেন। বকরী পালক বলল, আপনি কে? আমি মারইয়াম ইব্ন ঈসা তিনি উত্তর দিলেন। 'আপনি জাদুকর' বলেই সে ভোঁ দৌড় দিয়ে পালাল। ইয়াহূদীর উদ্দেশ্যে ঈসা (আ.) বললেন, আমরা খেয়ে ফেলার পর যে পবিত্র সত্ত্বা এ বকরীটিকে জীবিত করলেন, তাঁর শপথ দিয়ে বলছি, তোমার নিকট কয়টি রুটি ছিল? ইয়াহূদী শপথ যোগে বলল, আমার নিকট একটি মাত্র রুটি ছিল। তাঁরা আবার যাত্রা করলেন। পথে দেখা এক গরুওয়ালার সাথে। তোমার গরু-পাল হতে আমাদেরকে একটি বাচ্চা দাও, আমরা যবাই করে খাব হে রাখাল! ঈসা (আ.) ডেকে বললেন। গরুওয়ালা বলল, আপনার সাথীকে পাঠান একটি নিয়ে যাবে। যাও তো, একটি নিয়ে এসো ইয়াহূদীকে তিনি নির্দেশ দিলেন ইয়াহূদী গিয়ে একটি বাছুর নিয়ে এলো তা যবাই করে, কাবাব করে নিলেন। লোকটি সব দেখছিল। ইয়াহূদীকে ডেকে ঈসা (আ.) বললেন, খাও তবে হাড়গুলো ভেঙ্গো না। সব হাড় আস্ত রেখে দিবে। আহার সমাপনের পর তিনি হাড়গুলো চামড়ায় রেখে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বললেন, আল্লাহ্র অনুমতিতে দাঁড়িয়ে যাও।" হাম্বা হাম্বা রবে গরুটি দাঁড়িয়ে গেল। গরুওয়ালাকে বললেন নাও, তোমার গোবাছুর নিয়ে যাও। আপনি কে? গরুওয়ালা বলল। আমি ঈসা, তিনি উত্তর দিলেন। "আপিন একজন বড় জাদুকর।" বলে সে পালিয়ে গেল।

ইয়াহূদীকে লক্ষ্য করে হযরত ঈসা (আ.) বললেন, যিনি আমাদের ভক্ষণের পর বকরীটিকে জীবিত করলেন, যিনি গরুটিকে জীবিত করলেন তাঁর শপথ দিয়ে বলছি, তোমার নিকট কয়টি রুটি ছিল। 'মাত্র একটি রুটি ছিল' সে শপথ সহকারে বলল।

তাঁরা পুনরায় যাত্রা করলেন। তাঁরা পৌঁছলেন এক গ্রামে। ইয়াহূদী মেহমান হলো গ্রামের একপ্রান্তে আর হযরত ঈসা (আ.) মেহমান হলেন অপর প্রান্তে, উচুঁ দিকটাতে। হযরত ঈসা (আ.)-এর লাঠির ন্যায় একটি লাঠি নিয়ে ইয়াহূদী বলল, এবার আমি মৃতকে জীবিত করব। সেদেশের রাজা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। ইয়াহূদী ডেকে ডেকে ঘোষণা দিচ্ছিল কারো চিকিৎসার প্রয়োজন আছে কি ? অবশেষে সে উক্ত রাজার নিকট এলো। রাজার অসুস্থতা সম্পর্কে অবগত হয়ে সে বলল, তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমি তাঁকে সুস্থ করে দেব। যদি গিয়ে দেখ যে, তিনি মারা গেছেন তবুও আমার নিকট নিয়ে আসবে, আমি তাঁকে জীবিত করে দেব। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, ইতিপূর্বে বহু ডাক্তার তাঁকে আরোগ্য করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

যে কেউ তাঁর চিকিৎসা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে তাকেই শূলিতে চড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। ইয়াহূদী জোর দিয়ে বলল, আমার নিকট নিয়ে আসুন, আমি অবশ্যই তাঁকে সুস্থ করে দেব। রাজাকে আনা হলে পরে সে লাঠি দিয়ে তার পায়ে আঘাত করতে লাগল, তাতে রাজা মারা গেলেন। মৃত অবস্থায়ই অনবরত লাঠি দিয়ে প্রহার করছিল আর বলছিল قُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র অনুমতিতে জীবিত হয়ে উঠ)। কিন্তু কোনই লাভ হলোনা। লোকজন তাকে ধরে নিয়ে শূলে চড়াতে প্রস্তুত। ইতিমধ্যে হযরত ঈসা (আ.)–এর নিকট সংবাদ পৌছল। তিনি আসলেন। তখন কিন্তু তাকে শূলের কাঠে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তিনি জনতাকে বললেন, আমি যদি তোমাদের রাজাকে জীবিত করে দিই, তোমরা কি আমার সাথীকে ছেড়ে দেবে? তারা বলল, হাঁ অবশ্যই। হযরত ঈসা (আ.)–এর দু'আয় আল্লাহ্ তা'আলা রাজাকে জীবিত করে দিলেন, রাজা উঠে দাঁড়িয়ে গেল এবং ইয়াহূদীকে শূল হতে নামানো হলো। ইয়াহূদী বলল, হযরত ঈসা (আ.)! আপনিই তো আমার প্রতি শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকারী। আল্লাহ্‌র শপথ দিয়ে বলছি, আমি কখনো আপনাকে ছেড়ে যাব না।

সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত। হযরত ঈসা (আ.) ইয়াহূদীকে বললেন, যে মহান আল্লাহ্ আমাদের ভক্ষণের পর বকরী ও গরু জীবিত করলেন, যিনি এ লোকটিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করলেন, শূলে দেবার উদ্দেশ্যে কাঠে উত্তোলনের পর যিনি তোমাকে নামিয়ে আনলেন, সেই মহান আল্লাহ্‌র শপথ, তোমার নিকট কয়টি রুটি ছিল? উল্লিখিত সব কিছুর শপথ দিয়ে ইয়াহূদী বলল, 'আমার নিকট মাত্র একটি রুটি ছিল'। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, "ঠিক আছে"। তাঁরা আবার যাত্রা শুরু করলেন। তাঁদের সামনে পড়ল গুপ্তধন। বন্য জন্তু নখে আঁচড়িয়ে মাটি সরিয়ে তা উন্মুক্ত করে রেখেছে। ইয়াহূদী জিজ্ঞেস করল হযরত ঈসা (আ.)–কে, এ সম্পদের মালিক কে? হযরত ঈসা (আ.) বললেন, ওসব কথা বাদ দাও, এমন কিছু লোক আছে যারা এ ধনের কারণে মারা যাবে। এদিকে ইয়াহূদীর মনে সম্পদের লোভ জাগছিল আবার হযরত ঈসা (আ.)–এর অবাধ্য হওয়াটাও সমীচীন মনে করছেনা। শেষ পর্যন্ত সে হযরত ঈসা (আ.)–এর সাথে চলে গেল।

চার বন্ধু সেই গুপ্তধনের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। গুপ্তধন দেখে ওরা একত্র হলো। দু'জন অপর দু'জনকে বলল, তোমরা যাও, আমাদের জন্যে খাদ্য ও পানীয় কিনে নিয়ে এসো এবং এ সম্পদ বহন করার জন্যে পশু কিনে নিয়ে এসো। দু'জন গিয়ে খাবার, পানীয় ও পশু কিনে নিয়ে এলো। তারপর ওদের একজন অপর জনকে বলল, এক কাজ করলে কেমন হয়? আমাদের অপর দুই সাথীর খাদ্যে আমরা বিষ মিশিয়ে দেই, তা খেয়ে ওরা মারা যাবে, আর আমরা দু'জনেই সব সম্পদ নিয়ে যাব। এতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি? দ্বিতীয় জন এতে সায় দিল। ওরা তাই করল, খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিল। সম্পদের পাহারায় নিয়োজিত দু'জন বলল, ওরা যখন খাদ্য নিয়ে আসবে, তখন আমরা দু'জন উঠে

ওদেরকে খুন করে ফেলব। তারপর খাদ্য ও পশু আমরা ভাগ করে নিব। প্রথম দু'জন খাদ্য নিয়ে আসার সাথে সাথে শেষ দু'জন হঠাৎ আক্রমণ করে ওদেরকে মেরে ফেলল এবং নিজেরা খাবার খেয়ে নিল। তাতে তারাও মৃত্যুবরণ করল। এদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ.)–কে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, এবার যাও ওগুলো নিয়ে আস। ইয়াহূদী গিয়ে গুপ্তধন নিয়ে এলো। হযরত ঈসা (আ.) সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন, ইয়াহূদী বলল, হে ঈসা (আ.) ! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, আমার প্রতি অবিচার করবেন না। এখানে তো আমি আর আপনি দু'জনই মাত্র, দু'ভাগেই ভাগ করবেন। তৃতীয় ভাগটি কার? হযরত ঈসা (আ.) বললেন, এটি আমার ওটি তোমার এবং তৃতীয় ভাগটি রুটিওয়ালার, যে ব্যক্তি বিতর্কিত রুটিটির মালিক। ইয়াহূদী বলল, আচ্ছা, আমি যদি সেই রুটিওয়ালার ঠিকানা দেই, তাহলে এভাগের মালামাল আমাকে দিবেন কি ? হযরত ঈসা (আ.) বললেন, তা তো বটেই। সে বলল, আসলে আমিই সেই রুটি–ওয়ালা। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, এই নাও আমার অংশ, এই নাও তোমার অংশ এবং এই নাও রুটিওয়ালার অংশ। এসবগুলো তোমারই, দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার সম্পদ এ টুকুই। গুপ্তধন কাঁধে নিয়ে ইয়াহূদী আপন দেশে যাত্রা করল। কিছুদূর যাবার পর যমীন তাকে গ্রাস করে নিলো। ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ.) আবার রওয়ানা করলেন। পথে হাওয়ারীদের সাথে সাক্ষাত, তারা মাছ শিকার করছিল। তিনি বললেন, তোমরা কি করছ? তাদের উত্তর, মাছ শিকার করছি। তিনি বললেন, "আমরা কি মানুষ শিকারে যেতে পারি না?" তারা বলল, আপনি কে? আমি ঈসা, ইবন মারইয়াম (আ.)? তারা তাঁর উপর ঈমান আনল এবং তাঁর সাথে রওয়ানা হলো। مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে আমার সাহায্যকারী কে? হাওয়ারিগণ বলল আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি, আপনি সাক্ষী থাকুন, যে, আমরা মুসলমান) আয়াতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৭১২২. হাসান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ প্রসংগে বলেন, হযরত ঈসা (আ.) সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং হাওয়ারিগণ তাঁকে সাহায্য করেছিল, তিনি তাঁর বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, হযরত ঈসা (আ.)–এর সাহায্য প্রার্থনার কারণ ছিল তারাই, যাদের নিকট তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। কারণ যাদের বিরুদ্ধে তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

যারা এমত পোষণ করেন ঃ

৭১২৩. মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ (যখন ঈসা (আ.) তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল)–এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছেন, তারা যখন কুফরী

করেছিল এবং তাঁকে হত্যার সংকল্প করে ছিল তখন তিনি مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ (আল্লাহ্র পথে আমার সাহার্যকারী কে?) বলে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট সাহায্য চেয়েছিলেন, হাওয়ারিগণ বলেছিল نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ(আমরা আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী) । আনসার (انصار)শব্দটি নাসীরুন (نصير)-এর বহুবচন, যেমনটি আশরাফূন (اشراف) শব্দটি শরীফুন (شريف) এবং আশহাদুন –(اشهاد) শব্দটি শাহীদুন (شهيد) এর বহুবচন।

হাওয়ারীদের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন যে, তাদের পোশাক ছিল সাদা ধবধবে। এজন্যে তাদেরকে হাওয়ারী (حوارى) (ধবধবে সাদা, ফর্সা) নাম রাখা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭১২৪. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাদের পোশাক শ্বেতবর্ণের ছিল। তাই তাদেরকে হাওয়ারী (حوارى) নাম রাখা হয়েছে।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, তারা ছিল রজক, ধোপা, কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার ও সাদা করে দেয়া ছিল তাদের পেশা তাই তাদেরকে হাওয়ারী নাম রাখা হয়েছে।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭১২৫. আবূ আরতা (র.) বলেছেন, হাওয়ারীরা হচ্ছে ধোপা, রজক– যারা কাপড় ধুয়ে কাপড় সাদা করত।

অপর একদল তাফসীরকার বলেন, তারা ছিল নবীদের (আ.) বিশেষ বিশেষ লোক ও অকৃত্রিম বন্ধু।

যাঁরা এ মত পোষণ করেন ঃ

৭১২৬. হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত। জনৈক সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তিনি বললেন, তিনি ছিলেন হাওয়ারীদের অন্যতম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো হাওয়ারী কারা ? উত্তরে তিনি বললেন, যারা খিলাফত লাভের যোগ্য।

৭১২৭. দাহ্হাক (র.) اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ (যখন হাওয়ারিগণ বলল)–এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা হচ্ছেন নবীদের (আ.) অকৃত্রিম বন্ধু ও সাক্ষী।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, হাওয়ারীদের পরিচিতিমূলক যে সব অভিমত আমরা উল্লেখ করলাম, তন্মধ্যে তাদের অভিমত যথার্থ, যারা বলেছেন হাওয়ারী মানে রজক , ধোপা, যেহেতু তারা

কাপড় ধৌত করত। ধবধবে সাদা ও শ্বেতবর্ণকে আরবী ভাষায় হুর (حور) বলা হয়। এজন্যেই সাদা খাদ্যকে হাওয়ারী (حوارى) নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং এজন্যেই শ্বেতকায় চক্ষু কোটর বিশিষ্ট পুরুষকে আহ্‌ওয়ার (احور) –আর মহিলাকে 'হাওরা' (حوراء) গোরাচোখী বলা হয়। হযরত ঈসা (আ.)–এর হাওয়ারীদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করাটা তাদের কাপড় ধৌত করে সাদা করে দেয়ার কারণে এবং তারা রজক ছিল এ কারণে। حوارى নামে অভিহিত হতে লাল।

তারপর হযরত ঈসা (আ.)–এর সংগীরূপে থাকা এবং তাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী মনোনীত হওয়ায় তারা এ নামেই পরিচিত হলো, এরপর এটি তাঁদের নামে পরিণত হলো। অবশেষে প্রত্যেক অকৃত্রিম বন্ধু ও সাহায্যকারী ব্যক্তি নামে অভিহিত হতে লাগল।

৭১২৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন। ان لكل نبى حواريًا وحوارى الزبير প্রত্যেক নবীর এক একজন হাওয়ারী থাকে, আমার হাওয়ারী হচ্ছে যুবায়র। অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর অকৃত্রিম বন্ধু ও সাহায্যকারী। গ্রামে ও শহরে বসবাসকারী মহিলাদেরকে আরবরা হাওয়ারিয়াত (حواريات) নামে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের শ্বেত ও সাদা বর্ণের আধিক্যের কারণেই তাদেরকে এ নাম দেয়া হয়েছে। এতদ্ প্রসঙ্গে কবি আবূ জালদা আল–ইয়াশকারীর চরণটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

فَقُلْ لِلْحَوَارِيَّاتِ يَبْكِيْنَ غَيْرَنَا ٭ وَلاَ تُبْكِنَا اِلاَّ الْكِلاَبُ النَّوَابِحُ

(ফর্সা ও রূপসী মহিলাদেরকে বলে দাও, তারা যেন আমাদেরকে নয়, অন্যকে কাঁদায়। শোকার্ত কুকুর ব্যতীত অন্য কিছু আমাদেরকে কাঁদাতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ মানে উপরে আমরা যাদের কথা বললাম, তারা বলল, আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি, আল্লাহ্‌কে সত্য বলে মেনে নিয়েছি, হে ঈসা (আ.)! আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী মুসলমান। এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে বিজ্ঞপ্তি যে, হযরত ঈসা (আ.) তথা সকল নবীগণকে দীন–ই–ইসলাম দিয়েই আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করেছেন, খৃষ্টধর্ম কিংবা ইয়াহূদী ধর্ম দিয়ে নয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যেভাবে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম হতে নিজের অবমুক্তির ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেভাবে হযরত ঈসা (আ.)–ও খৃষ্টধর্ম এবং খৃষ্টানদের সাথে সম্পর্কহীন ছিলেন। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তা ঘোষণা করলেন। অনুরূপভাবে নাজরান–প্রতিনিধিদলের বিরুদ্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পক্ষে আয়াতটি আল্লাহ্ তাআলার নিকট হতে একটি দলীল।

৭১২৯. মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবায়র (র.) হতে বর্ণিত, আপন সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে হযরত ঈসা (আ.) যখন অবিশ্বাস, বিশ্বাসঘাতকতা ও সীমা লংঘনের আলামত দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পথে আমার সাহায্যকারী কে আছে? হাওয়ারিগণ বলল, আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী,

আমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান এনেছি৷ তাদের এ বক্তব্যের জন্যেই তারা আপন প্রতিপালকের পক্ষ হতে অনুগ্রহ লাভ করেছিল। তারপর তারা বলল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা ইসলাম গ্রহণকারী। আমরা তাদের মত নই, যারা এ বিষয়ে আপনার সাথে অযথা বিতর্কে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ নাজরানের প্রতিনিধিদলের ন্যায় আমরা নই।

(٥٣) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

৫৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করেছি৷ সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত করুন৷

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, আয়াতখানা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে হাওয়ারিগণ সম্পর্কে একটি ঘোষণা। তাঁরা বলেছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার নবী ঈসা (আ.)-এর নিকট আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, তাতে আমরা ঈমান এনেছি, তথা সেটি সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি, মানে এত দ্বারা আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে আপনার নাযিলকৃত ধর্মের অনুসারী হয়েছি এবং আপনার বান্দাদের প্রতি প্রেরিত সত্যের আমরা সাহায্যকারী।

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ মানে আমাদের নামগুলোকে তাদের নামের সাথে যুক্ত করে দিন, যাঁরা সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন, যাঁরা আপনার একত্ববাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, যাঁরা আপনার রাসূলকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং যাঁরা আপনার আদেশ-নিষেধ পালন করেছেন। আপনি তাঁদেরকে যে মর্যাদা দান করবেন, তাতে আমাদেরকেও অংশীদার করুন, তাঁদের মত আমাদেরকেও উন্নীত করুন। হে আমাদের প্রতিপালক যারা আপনার সাথে কুফরী করেছে, আপনার পথে প্রতিবন্ধক স্থাপন করেছে এবং আপনার-আদেশ নিষেধের বিরোধিতা করেছে, তাদের সাথে আমাদেরকে তালিকাভুক্ত করবেন না।

এতদ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সৃষ্টজগতকে সে সকল লোকের পথ চিনিয়ে দিচ্ছেন, যাদের কাজকর্মে তিনি সন্তুষ্ট। যার ফলে অবশিষ্ট লোক এদের পথে চলে এদের মত গ্রহণ করে পরিণামে সে সকল মর্যাদা পায় যা প্রথমোক্তগণ পেয়েছেন। পক্ষান্তর যারা আম্বিয়া কিরাম ও দীন-ই-হানীফ ব্যতীত অন্য দীনের অনুসারী হতে চায় তাদ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে মিথ্যাবাদীরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তদুপরি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বিতর্কের উদ্দেশ্যে আগত নাজরানের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর যথার্থ অনুসারী যাদের-ব্যাপারে

আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট, তাদের বক্তব্য এ প্রতিনিধিদলের বক্তব্যের বিপরীত এবং তাদের পথও এদের পথের বিপরীত।

৭১৩০. মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন যুবায়র (র.) رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ আয়াত প্রসংগে বলেন, ওদের কথা ও বিশ্বাস এরকমই ছিল।

(٥٤) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۝

৫৪. এবং তারা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ ও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহ্ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র.) বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণ করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের কাফিররা ষড়যন্ত্র করেছিল, তারাই সেই দল যাদের পক্ষ হতে হযরত ঈসা (আ.) অবিশ্বাস ও কুফরী আভাস পেয়েছিলেন। তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক যে বর্ণনা দিয়েছেন তা হলো, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার লক্ষ্যে একে অন্যকে উৎসাহিত করা।

ঘটনা এরূপঃ হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাননীয়া মাতাকে তাঁর সম্প্রদায় দেশ হতে বহিষ্কার করে দিবার পর তিনি আবার তাদের নিকট ফিরে এসেছিলেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭১৩১. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, তারপর হযরত ঈসা (আ.) তাদের নিকট গেলেন অর্থাৎ হাওয়ারীদের নিকট গেলেন যারা মাছ শিকার করছিল। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা ঈমান আনল এবং তাঁর অনুসরণ করল। অবশেষে একরাতে তিনি ইসরাঈলীদের নিকট আগমন করলেন এবং প্রকাশ্যে ও সরবে তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিলেন। আর একথাই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন – فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ (তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং অপর দল কুফরী করল, (৬১ঃ১৪)। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ব্যাপারে যে কৌশল গ্রহণ করেছেন সুদ্দী (র.) এভাবে তার উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদের একজনকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি দেয়া হলো, যাকে হযরত ঈসা (আ.) ধারণা করে হত্যা করেছে। অথচ এর পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন।

যাঁরা এমত পোষণ করেন ঃ

৭১৩২. সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, ইসরাঈলীরা হযরত ঈসা (আ.)-কে ও তাঁর সঙ্গী উনিশ জন হাওয়ারীকে একটি ঘরে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমাদের

মধ্যে কে আছ, যে আমার আকৃতি ধারণ করবে। তারপর তাকে হত্যাকরা হবে, আর তার জন্য থাকবে **জান্নাত।** তাদের একজন হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতি গ্রহণ করে এবং হযরত ঈসা (আ.)-কে **আকাশে** উঠিয়ে নেয়া হয়। আর একথাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন এ আয়াতে وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -তারপর যখন হাওয়ারিগণ ঘর হতে বের হলেন, দেখা গেল সংখ্যায় তারা উনিশ জন। তখন তারা খবর দিলেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষ তাদেরকে গুণতে লাগল, তারা দেখল যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা থেকে একজন কম। এদের মধ্যে একজনকে তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর আকৃতিতে দেখতে পেল। তার ব্যাপারে তারা সন্দিহান হলো। এই ভিত্তিতে তারা তাকে হত্যা করলো। তারা তাকে হযরত ঈসা (আ.) মনে করেছিল এবং শূলিতে চড়িয়ে দিয়েছিল। আর একথাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, শূলিতেও চড়ায় নি, কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল, (৪ ঃ ১৫) -এ কথাও বলা যায় যে, তাদের সাথে মহান আল্লাহ্র কৌশল মানে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেয়া যেমন, আমরা اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ -এর ব্যাখ্যায় পূর্বেই এরূপ বর্ণনা করেছি।

(পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত)

ইফাবা. (উ.) ১৯৯২-৯৩/ অঃ সঃ /৪৪০২-৫২৫০